বঙ্কিম পুরস্কার ২০০১

অশ্বচরিত



অমর মিত্র

Table of Contents

বঙ্কিম পুরস্কার ২০০১

অশ্বচরিত



অমর মিত্র

অশ্বচরিত

অমর মিত্র

১

ভানুচরণ মানুষটি বড়ো অদ্ভুত। আসতে আসতে কী মনে হল ভেড়িবাঁধ থেকে নেমে ঝাউবনের দিকে চলে গেল, যেন ঝাউবনে তার কন্থক রয়েছে। ছিল পক্ষীরাজ, হয়ে গেল কন্থক। ছিল ভানুচরণ, ভানু দাস হয়ে গেল ছন্দক। ঘোড়া হারিয়ে আরও উদাস হয়ে গেছে। না হলে ঘোড়াটাকে খুঁজতে বেরিয়ে আপন মনে অন্য দিকে চলে যায়! বলে কিনা, 'ওই দিকে যাই, আপনি বাবু দেখে আসুন লায়কানখাস।' সেই থেকে শ্রীপতি একা। একেবারে একা।

ভেড়িবাঁধের বাঁদিকে ঝাউবন। ঝাউবনের ওপারে সিংহসমুদ্র। হাজার সিংহ একসঙ্গে গজরাচ্ছে। সিংহর কথা বলেছিল কে? ফরাসি সায়েব ফ্রেদরিক। লায়ন লায়ন! শ্রীপতিরও তাই মনে হয়। সিংহই বটে। তবে গর্জন যখন থাকে না, শুধু ঢেউ ভাঙে অন্ধকারে, পাড়ের কাছে সফেন সমুদ্র বার বার মাথা কোটে, তখন মনে হয় সিংহ নয়, ও তার কেশর ফোলানো সাদা পক্ষীরাজ। পালাতে গিয়ে সাগরে গিয়ে পড়েছে। বার বার মাথা তুলছে নোনা জলের বিপুলতা থেকে। ঘোড়াটা কাঁদছে।

হ্যাঁ, এই স্বপ্ন দেখেছে শ্রীপতি ক–দিন আগে। ইদানীং কতরকম স্বপ্ন যে দ্যাখে হারানো ঘোড়া নিয়ে! ভারতীকে নিয়ে। তার বউ মধুমিতা আর ভারতীকে নিয়ে। আবার ওই পক্ষীরাজকে নিয়ে। সব দুঃস্বপ্ন। দেখতে দেখতে গলা শুকিয়ে আসে। মনে হয় নোনাজলে ডুবে যাচ্ছে সে। নোনাজলের নীলে শুধু তার পক্ষীরাজের কেশর দেখা যাচ্ছে। সমুদ্র কাঁদছে সারারাত।

শ্রীপতি ঘাড় ঘুরোয়। রাতভর যে সমুদ্রের কান্না শোনা যায়, সেই সমুদ্র আর এই নীল জলধি এক নয়। মাটিতে আছড়ে মাটি যেন খেয়ে ফেলতে চাইছে বঙ্গোপসাগর। ভেড়িবাঁধের দক্ষিণ দিকে অনেক নীচুতে ধানি জমি, মাঠ। মাঠ আর মাঠ, তারপর এগিয়ে গাছগাছালির ছায়া। নুনমারাদের গ্রাম। নুনের খালারিগুলোকে পিছনে ফেলে এসেছে শ্রীপতি। এখন বিকেল, রোদ পড়ে গেছে। আর একটা দিন শেষ হয়ে যাচ্ছে দ্রুত। শ্রীপতি দেখছে তাকে ঘিরে ছায়া নামার আয়োজন।

ভানু কোথায় গেল কে জানে? ঘোড়া খুঁজেই বেড়াচ্ছে। খুঁজছে কিন্তু পাচ্ছে না। তবু যাচ্ছে। ঘোড়াটা যেন ভানুর। ভানুই যেন ওই ঘোড়ার মালিক, এমনই তার উদ্বেগ। মনে পড়ে শ্রীপতির, লোকটা যেদিন কাজ নিল তার হোটেলে, মানে তার পোষ্য হল, তার আশ্রিত হল, ঘোড়া দেখে বলল, ঘোড়ার কাজ কত কাল ধরে করে, ঘোড়া চেনে সে নিজেকে চেনার মতো করে, 'শুনুন বাবু, আমি যদি হই ছন্দক, ও হল কানহা, কন্থক।'

তারা কারা? শ্রীপতি অবাক হয়েছিল।

'মনে নেই বাবু, কে রাজপুত্রকে পৌঁছে দিল তপোবন ধারে? রাজপুত্র সাধু হয়ে গেল, রাজপুত্র হল ভগবান বুদ্ধ, তার ঘোড়া আর সারথি মাথা হেঁট করে ফিরল, সেই ঘোড়া হল আপনার ঘোড়া।'

হলে ক্ষতি কী শ্রীপতির? তবে কিনা পক্ষীরাজটি বোঝা যায়, কন্থক নাম শুনে সবাই হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। এ কেমন নাম? আর ভানু দাস যে কখন কী বলে, সংস্কৃত ভাষা বলে, ভূগোল বলে, ইতিহাস বলে, বলে কপিলাবস্তুর রাজপুত্রের কথা! তার কতটা সত্যি, কতটা মিথ্যে, কতটা বানানো তা কে ধরবে?

গায়ের ঘাম শুকোনোর মুখে। দক্ষিণের নোনা বাতাস হুড়মুড় করে আছড়ে পড়ছে শ্রীপতির গায়ে। আজ জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমা। জ্যৈষ্ঠ মাসটিও শেষ হতে গেল প্রায়। আকাশে মেঘ আসছে আর যাচ্ছে। রোদের তাত কমছে না। জ্যোৎস্নাও যেন গরম হয়ে উঠেছে, প্রকৃতি এমনই। এখন মেঘের ভিতরে চাঁদ এবং সমুদ্র একসঙ্গে জেগে উঠেছে উন্মাদের মতো। হাওয়ায় হাওয়ায় যেন টাল খাচ্ছে চাঁদও। ঠিক একটি মাস ভানুচরণের কন্থক—শ্রীপতির ঘোড়া পক্ষীরাজ নিরুদ্দেশ। এ বড়ো আশ্চর্য ঘটনা। তার হোটেল থেকে বোশেখি পূর্ণিমার রাতেই পালিয়ে গেছে ঘোড়াটা। সেই ঘোড়া খুঁজতে সে দুপুর দুপুর বেরিয়েছিল লায়কানখাসের দিকে। সেখানে নাকি একটা ঘোড়াকে চরতে দেখা গেছে গত পরশু। দেখেছিল অনন্ত সার। সে ওই লায়কানখাসে নুনের খালারি করেছে। সেখানে তার বউ মেয়ে সারাদিন খাটে। অনন্ত লবণ নিয়ে আসে দীঘায়। এখানে পাইকার থাকে, কিনে নেয়। দরকারে সেও কাগজ পেতে

বসে পড়ে। মোটা দানা লালচে নুন বেড়াতে আসা টুরিস্টদের জন্য নয়। আশপাশের গাঁয়ের গরিব লোক এসে কিনে নিয়ে যায়।

অনন্ত সার দেখেছিল লায়কানখাসে একটি ঘোড়া চরছে। দেখেইছিল শুধু, এর বেশি কিছু নয়। ঘোড়ায় তার কোনো কৌতূহল নেই। ঘোড়া থাকে তাদের যারা ঘোড়ায় চাপতে পারে। বড়ো মানুষের বাহন ওটি। কিন্তু তাকে যখন জিজ্ঞেস করছিল ঘোড়ার রক্ষক ভানু, সে অবাক। ঘোড়া তো দেখেছে লায়কানখাসে।

'দেখেছ, সত্যি দেখেছ, বাবুর অশ্ব, আমার কানহা?' ভানু প্রায় উদবাহু হয়ে ছুটে এসেছিল শ্রীপতির কাছে, পাওয়া গেল, ঘোড়া আছে।

গেল পাওয়া? শ্রীপতি তখন হোটেলের ঠাকুরের কাছে খোঁজ নিচ্ছিল তার বউ মধুমিতা এসে কোনো খোঁজ নিয়ে গেছে কিনা ঠাকুরের কাছে। নার্স ভারতী চৌধুরি নিয়ে কতটা, কীরকম খোঁজখবর করেছে, আর কী জবাব দিয়েছে ঠাকুর। ভানুর কথা শুনে সে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখেছিল তাতে উত্তেজনায় দপ দপ করছে ভানুর সর্ব অঙ্গ।

'আজ্ঞে লায়কানখাসে নাকি একটা ঘোড়া...।' ভানু কথা শেষ করেনি।

'কোন ঘোড়া, আমার পক্ষীরাজ?'

'আজ্ঞে ঘোড়া একটা, কন্থক হতে পারে, নাও হতে পারে।'

'ফের কন্থক, ওটি আমার পক্ষীরাজ।'

'আপনার নাম আপনার থাকুক, আসলে তো অন্য ব্যাপার, শুনুন বাবু, খবরটা দিল নুনমারা অনন্ত, একটা ঘোড়া চরতে দেখেছে সে লায়কানখাসে।'

'ডাক অনন্তকে।'

'আজ্ঞে, সে আর কোথায়, বলে চলে গেছে, ঘোড়াটা নিয়ে আসুন আপনি।'

'তুমি যাবে না ছন্দকমশায়?'

'আমি! আমি তো অন্য দিকে যাব, সব দিকে তো খোঁজ করতে হবে।'

'যদি লায়কানখাসে মেলে তো অন্য দিকে যাবে কেন?'

'তা ঠিক।' ভানু মাথা চুলকেছে, 'যদি না হয় বাবু, সে তো কতদিন রয়েছে আমার সঙ্গে, পালিয়ে এত কাছে কি থাকবে?'

'তাহলে আমি যাব না?'

'তা কেন, খবর যখন মিলেছে, যেতে আপনাকে হবেই।'

খবর দিয়ে ভানু চলে গিয়েছিল। ঠাকুর আটকে ছিল শ্রীপতিকে, 'বিশ্রাম নিয়ে যান বাবু, ঘোড়া যদি থাকে, ঠিক পাবেন, ভালো ঘাস পেলে ওরা নড়ে না, কিন্তু লায়কানখাসে কি ভালো ঘাস হয়, ও তো বালি জমি, ওখানে ঘোড়া যাবে কেন?'

'তাহলে যাব না?' শ্রীপতি দ্বিধায় পড়েছিল।

'না আজ্ঞে, যেতে তো হবেই। খবর যখন এয়েচে, ঘোড়া বলে কথা, ঘোড়া হারালে মানুষের যে কী হয়, তা যার হয় সে জানে।'

একটু বাদে বেরিয়েছিল শ্রীপতি। বেরিয়ে পুরোনো কাফেটেরিয়ার কাছে ভানুর সঙ্গে দেখা। ছুটে এসেছিল সে, 'বাবু আমি কি যাব, যাই কিছুটা, আপনাকে এগিয়ে দিই, হ্যাঁ, অনন্ত সার বলল একখান অশ্ব দেখেছিল লায়কানখাসের বালির ওধারে যে চরজমি ঘাসের, সেখানে, ঘাস খাচ্ছে, আমার অবশ্য কেমন লাগল শুনে।'

'কী রং সে ঘোড়ার?'

ভানু থমকায়, তারপর বলেছে, 'আজ্ঞে ওই কথাই তো আমি জিজ্ঞেস করলাম অনন্ত সারকে, ঠিক আপনি যেমন আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, এক্কেবারে এক কথা।'

'তা বলল কী সে?'

'কী বলল?' ভানু মাথা চুলকোচ্ছিল, 'সাদা না কালো, কালো না বাদামি! কোনটা? আজ্ঞে বাবু, সে তো ঘোড়া দেখেছে রং দ্যাখেনি—সে আমাদের কন্থক কি হবে?'

রং দ্যাখেনি অনন্ত সার। তখন তার লবণ ঝেঁটিয়ে তোলার সময়। সারাদিন যে জল শুকিয়েছিল রোদ্দুরের তাপে, তা থেকে যে মোটা মোটা স্ফটিক দানা বেরিয়ে আসে, তা ঝেঁটিয়ে বস্তায় ভরছিল সে। বিকেল হয়ে গিয়েছিল। সূর্য ওই সময় কোনাকুনি পশ্চিমে তালসারির দিকে, ওড়িশার উপকূলে নেমে যায়। দূরে সমুদ্রের ধার ঘেঁষে ঘেঁষে যে ঝাউবন চলে গেছে পশ্চিমে তার ভেতর টুপ করে পড়ে গেছে রক্তবলয়। ছায়ায় ছায়ায় অনন্ত, তার বউ আর মেয়ে দেখল একটি ঘোড়া যেন ঘাসের চরে দাঁড়িয়ে দুলছে। বেলা পড়ে এলে অতবড়ো মরুভূমির মতো বালুচর কেমন ঝাপসা ঝাপসা হয়ে আসে। চোখে ধন্ধ লাগায়। আর তাইই বোধ হয় লেগেছিল। তারপর তারা লায়কানখাস ছেড়ে অলংকারপুরের দিকে যখন এগোচ্ছে, তখনও আর একবার দেখা গেল ঘোড়াটাকে, অনন্তর কচি মেয়েটা আপনমনে বলে উঠেছিল, 'হা, দিখ অশ্ব।'

হ্যাঁ, তারা সকলে দেখেছে ঘাসের জমি ছেড়ে ঘোড়াটা বালির উপর এসে দাঁড়িয়েছিল। হাঁ করে চেয়েছিল সমুদ্রের দিকে। এতটা পর্যন্ত ঠিক বলে গেল অনন্ত একটু আগে লায়কানখাসে দাঁড়িয়ে। তারপর সব শূন্য। সব দেখেছে তবু রং দ্যাখেনি। দেখার হলে বলত ঠিক। রংটাই বাদ গেছে বোধ হয়। যদি জানত এতে শ্রীপতিবাবুর উপকার হবে তাহলে রংটা মনে রাখত ঠিক। একেবারে সামনে গিয়ে পরখ করে রাখত রংখানি। কী ভুলই যে করেছে। শ্রীপতিবাবু যে ইনামও ঘোষণা করে রেখেছে তাও কি জানত তারা? আজই অনন্ত সারকে বলেছে ভানু।

আশ্চর্য ব্যাপার! জগতে যে কত বিস্ময়ই না আছে! দুপুরে কিছু সময়ের জন্য কী রোদ্দুর না ছিল! এইসব মেঘ তখন সমুদ্রে গা ডুবিয়ে ছিল বোধ হয়। রোদে লায়কানখাস—বালির চর একেবারে মরুভূমি। মরুভূমির ওপারে যে ঝাউজঙ্গল, তার গায়েই ঘাসের জমি। কিন্তু সেই অঞ্চলে নুনমারারা ছাড়া আর কেউ ছিল না। আরও আশ্চর্যের ব্যাপার, শ্রীপতি গিয়ে লায়কানখাসে দাঁড়াতেই সমুদ্রে ডোবা মেঘ আবার আকাশে। ছায়া ঘনাইল বনে বনে।

শ্রীপতি বলল, 'কী রোদ!'

নুনমারা অনন্ত সার বলল, 'রোদ কোথায় বাবু, সকাল থেকে মেঘলা, নুন শুকোচ্ছে না।'

'আর সব খালারির লোক কোথায়?'

'এই মেঘে কাজ হয় বাবু! সব এখন অন্য কাজে লেগে গেছে। এই দেখুন না, একটুও জল শুকোয়নি।' বলতে বলতে পলিথিনের শিট, কলসি, বস্তা, কোদাল গুছিয়ে নিচ্ছিল অনন্ত সার, বিড়বিড় করছিল, 'বছরের মতো নুনের কাজ শেষ।'

ঘোড়ার খোঁজ পেল না শ্রীপতি। অনন্ত সারের মেয়েটা বলল সেও দেখেছে। এইতো পরশু দিন। সেদিন খুব চড়া রোদ্দুর হয়েছিল, নুনও বেরিয়েছিল অনেকটা। হ্যাঁ অশ্বই বটে! কিন্তু রং! তা তো দ্যাখেনি।

শ্রীপতি বলল, 'ঘোড়াটা দেখলি আর রং দেখিসনি! এ কীরকম হল! তাহলে কী দেখলি?'

তার কথা শুনে হাঁ করে চেয়ে থাকে মেয়েটা। বয়স কত হবে! বছর পনেরো। সারাদিন রোদ্দুরে নুন মেরেও চোখমুখে ক্লান্তির ছাপ নেই। কেমন ফুটফুটে ভাব। মুখে সর্বক্ষণ হাসি। বরং অনন্ত আর তার বউটা যেন নুয়ে পড়েছে। তাদের চোখমুখে রাজ্যের ক্লান্তি আর বিরক্তি। তারা বার বার আকাশের মেঘ দেখছিল।

অনন্তর মেয়ে বলল, 'কেনে অশ্বই তো দিখলাম।'

'রং ছাড়া কি বস্তু হয়! রং না থাকলে দেখবি কী?'

আসলে শ্রীপতি বুঝতে পেরেছে ব্যাপারটা। ওরা দেখেছে সন্ধ্যেয়। তাও অন্যমনস্ক ছিল। খেয়াল করেনি কী রঙের। এখন এদের কাছ থেকে আর কিছু জানা যাবে না।

অনন্ত সারের মেয়েটা অল্পবয়সি। গায়ের রংও ফর্সা। চোখমুখে শ্রী আছে। আর সময়টা তো জোয়ারের। ভরা কোটাল। ফুলেফেঁপে উঠেছে মেয়েটা। একেই বলে যৌবনের দীপ্তি। সেই দীপ্তি নিয়ে খিলখিল করে হেসে উঠেছে মেয়েটা। দাঁতে আঁচলের খুট চেপে ধরে বলে, 'কী জানি বাবা ত্যাখন মনে হয়নি তাই রং দেখিনি, কী ধলা কী কালা!'

এখন নুনমারাদের দিন শেষ। গত ছ–টা মাস শুকিয়ে শুকিয়ে জলবিন্দু লালচে সাদা স্ফটিকের দানা হয়ে গেছে। এই ছ–টা মাসে ওই লবণের গলে জল হয়ে যাওয়ার সময়। অনন্ত সার বিরক্ত। আসলে দিনের পরিশ্রমটা মাঠে মারা গেছে। তাই এখন কিছু ভালো লাগে না।

শ্রীপতি আশা নিয়ে গিয়েছিল বোধ হয় খোঁজ পাবে অশ্বের। কিন্তু পরশু বিকেলের পর তাকে আর কেউ দ্যাখেনি। ফেরার সময় এখন তাই মেজাজটা ভালো নেই। অনন্ত সারের ফুটফুটে মেয়ে কুন্তির হাসি বেজে উঠছে চারপাশে। মনখারাপের ভিতর মেয়েটার কথাই ভালো। সমুদ্রের লোনা হাওয়া, তার ভিতরে সেই কথা, 'অশ্বর বন্ন দেখার কী আছে, অশ্ব অশ্বই, হাঁ বন্ন ছিলনি।'

'বর্ণ ছিল না মানে, বর্ণ ছাড়া কিছু বোঝা যায়?'

শ্রীপতির কথায় মেয়েটা থমকেছে, তারপর জবাব দিয়েছে, 'কেনে ই বাতাস। ইর বন্ন কী, অথচ বুঝছনি বাতাস আছে।'

তাহলে ঘোড়াটা কি তখন বাতাসের দেহ নিয়ে ঘুরছিল লায়কানি চরে? বাতাসের দেহ পেলে জীবের জোর বাড়ে। হুড়মুড়িয়ে তছনছ করে দিতে পারে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। সেই বাতাসের দেহ নিয়ে বর্ণহীন হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল তার পক্ষীরাজ। ভাবতেই শ্রীপতির মুখে যেন আবছা হাসি ফোটে।

অনেকটা চলে এসেছে। বামে ঠিক নীচেই বড়ো খালটার একটা মুখ। সেখানে অকেজো লঞ্চ বাঁধা রয়েছে। মস্ত উঁচু ভেড়িবাঁধে হাঁটতে হাঁটতে শ্রীপতি দেখল সাঁই সাঁই করে বেলা মরে গিয়ে অন্ধকার নামছে। তার আবার মনে হল, বর্ণহীন ঘোড়া.....।

বর্ণহীন ঘোড়া কেমন দেখতে? কী তার রং! গায়ের রং, মাথার রং, কপালের রং, পুচ্ছের রং! লেজটা কি সাদায় বাদামিতে মেশানো? পুরো দেহটা কি সাদা ধবধবে দুধের রঙে ভরা? নাকি পেটের দু–পাশের পাঁজরের হাড় বেরিয়ে যাওয়ার কারণে সাদা রংটা কালচে মেরে গেছে। পোড়া পোড়া লোমে যেন পুরো দেহটা আচ্ছাদিত। কপালের উপর সাদা আর বাদামিতে মেশানো রং। তিনটে টিপ। চোখটা নীল আর কালোয় ভাসা। মানে ঠিক সমুদ্দুর থেকে তুলে আনা খাবলা রং। জিভটার রং ফ্যাকাশে রক্তহীন লাল। ঘোড়াটা সন্ধ্যেবেলায় যখন বেলাভূমি থেকে উঠে আসে, তখন শক্ত বাঁধানো পাড়ে, পিচ আঁটা রাস্তায় গম্ভীর শব্দ ওঠে ঠক ঠক ঠক ঠক। ডুপ ডুপ ডুপ ডুপ....।

বিকেলে বেলাভূমিতে যখন ঘোড়াটা দাঁড়িয়ে থাকে, তখন ওর সাদা গায়ে পশ্চিম দেশের রোদ পড়লে সেই সাদা রঙের একটু পরিবর্তন হয় নিশ্চয়ই। ঘোড়ার পিঠে যে ঝালর, তার রং লাল। লাল সাটিনের কিনারায় কিনারায় থাকবে জরির কাজ। ঘোড়ার পিঠে যে উঠে বসবে সে নিশ্চয়ই খুব ফুটফুটে একটা বাচ্চা। নীল সমুদ্র, সাজানো পক্ষীরাজ! কেমন দেখায়? সমুদ্র হল পক্ষীরাজের চালচিত্র।

পরশু সমুদ্রের বদলে ছিল লায়কানখাস। মানে ধু–ধু বালির তরঙ্গে ঢাকা পৃথিবীর মাটি। আলোতে চোখ ধাঁধিয়ে যায় বালির দিকে তাকালে। আর রাতেও সেই বালি সাদা দেখায়। দূরে সমুদ্রের গর্জন থাকে, চেহারা দেখা যায় না। ঝাউ আর ইউক্যালিপ্টাস জঙ্গলের আড়ালে কেশর ফুলিয়ে গর্জন করছে লায়কান দেবীর শিকল ছাড়া সিংহের দল। ঘোড়া শুধু ঢেউ ভাঙার শব্দ শুনছে। সমুদ্রের বদলে আবছা সাদা মরুভূমির ভিতর দাঁড়িয়ে।

অনন্ত সারের মেয়েটা বলেছে ঘোড়ার রং ছিল না। তাহলে! সমুদ্র বেলাভূমি, অন্ধকার ঝাউবন, ঘুমে ভরা পৃথিবী–এর কত রং! তার ভিতরে দাঁড়িয়ে রয়েছে পক্ষীরাজ। রঙে আরও প্রলেপ পড়ল। বর্ণহীন অশ্বের এত বর্ণ! শ্রীপতি সেই ভেড়িবাঁধের উপর দাঁড়িয়ে হো–হো করে হেসে ওঠে।

টুপ করে অন্ধকার নামে। দেখা যাচ্ছে দীঘার আলো। কাছেই অত মানুষের মেলা। অথচ এখানে! পৃথিবীই নেই এমন মনে হয়। সাদা ঘোড়াটার রং সমুদ্র থেকে লায়কানখাসে গিয়ে আস্তে আস্তে উবে গেছে ঠিক। বাতাসে সাদা বাদামি সব রং উবে গিয়ে যেমন হয়েছে ঠিক তেমন দেখেছে কুন্তি। শ্রীপতির বুকটা হঠাৎ কেঁপে ওঠে। ভয় ভয় করে। হাওয়া শুধু হাওয়া। শ্রীপতি বিড়বিড় করতে থাকে, 'না, না।'

২

সমুদ্র এদের বাঁচায়। সমুদ্র না থাকলে অনন্ত সার মরে যেত। লবণ ছাড়া আছে কী! সমুদ্রের জল শীতের সময় লবণে ভারী হয়। বড়ো বড়ো জোয়ারে জল চলে আসে লায়কানখাস অবধি। বড়ো জোয়ার মানে পূর্ণিমা অমাবস্যায়। সেই জল ধরে রাখা হয় মস্ত মস্ত গর্তে। জোয়ার সরে গেলে গর্তগুলো নোনাজলে ভরতি হয়ে যায়। আর মাটিতেও মিশে যায় নুন। তারপর সেই জল রোদ্দুরে ঘন করে, পরিশ্রুত করে ঢেলে দেওয়া হয় বড়ো বড়ো পলিথিনের শিটের উপর। জল শুকিয়ে শুকিয়ে নুন ফুটে ওঠে। অনন্ত সারের বাপ ঠাকুরদা নুন মারত জমি চষত। এখন জমি নেই, নুনে বেঁচে আছে।

আচমকা মেঘ এসেছে খুব ঘন করে। বছরের মতো নুনমারা শেষ। শ্রীপতি লায়কানখাস থেকে চলে আসার সময় অনন্ত বলেছে, 'বাবু কাজকর্ম হবে?'

'লোক তো রয়েছে আমার।'

'তবু।'

'টুরিস্ট ধরে আনিস বখশিস পাবি।'

যতদিন মেঘ থাকবে আকাশে ততদিন কষ্ট। মেঘ কেটে গিয়ে কবে মৌসির মাস—অঘ্রান আসবে, এখন সেই অপেক্ষায় আছে অনন্ত। অলংকারপুরের লবণমারাদের কারও কারও জমি আছে, লবণটা অতিরিক্ত আয়। অনন্ত সারের অতিরিক্ত আয় নেই।

লবণ মানে শ্রম। সারাদিন রোদে পুড়ে পুড়ে সমুদ্রের লবণ বার করে আনা, সেই লবণের সঙ্গে নিজের দেহের লবণও মিশিয়ে দিতে হবে। কথায় বলে, 'নুন না দিলি নুন পাবিনি।'

নুন দেওয়া মানে শ্রম দেওয়া। কপালের ঘাম পায়ে ফেলে ফেলে বিন্দু বিন্দু ধবধবে স্ফটিকের সন্ধান করা।

একদিন এদেশে লবণ নিয়ে বড়ো যুদ্ধ হয়েছিল। সেই যুদ্ধে এ তল্লাটের মানুষ শামিল হয়েছিল। তখন অনন্তর জন্ম হয়নি। লোকের কাছে শুনেছে সব।

লায়কানি বা নায়কানি অর্থে নৌকালি। নৌকালি সমুদ্রে থাকেন। সমুদ্র পাহারা দেন নৌকোয়। লায়কানি বুড়ির চেহারা যে দেখেছে সে ভোলেনি। রূপ কী! দেবীকে পুজো করে সমুদ্রে নেমে যাও, ভয় নেই। আর যদি দেবী অসন্তুষ্ট হন? একেবারে নৌকো সমেত মানুষকে বাতাস করে দেবেন। হাড়গোড় মাংস সমেত মানুষটা বাতাসে মিশে যাবে। সেই বাতাস হু–হু করে দৌড়ে আসবে সমুদ্দুর থেকে মাটির দিকে। দীর্ঘশ্বাস ফেলবে বার বার।

এইসব কথা নুনমারাদের জানা। লায়কানি এসেছিল জাহাজে চেপে। সাত ভউনি সাত জাহাজে চেপে সমুদ্দুরের সাত জায়গায় নামল। সেই সাত ভউনির একজন এই বন নায়কান। ওই চরভূমিতে তাঁর কত কালের জীর্ণ মন্দির। আগের কালে নায়কানির সিংহ ঝিঁঝির দিয়ে বাঁধা থাকত ঘনজঙ্গলের ভিতর এক আজানগাছে। এসব শোনা কথা, অনন্ত সার জানে, সক্কলে জানে। আজানগাছ দেখা সাধারণ মানুষের সাধ্য নয়।

রাতে নায়কানির চোখে আলো জ্বলে। তিনি সমুদ্রের পথে হেঁটে যান মস্ত এলোচুল নিয়ে। সেই ১৩৪৯–এর ঝড়ের আগে জঙ্গলে শুধু একটা মন্দিরই ছিল। আকাশছোঁয়া ঝাউয়ের ভিতরে আলো ঢুকতে পারত না। জঙ্গলের শৃঙ্খলে আঁটা সিংহটা মাঝেমধ্যে গর্জন করে উঠত বোধ হয়। সিংহকে কেউ দ্যাখেনি, গর্জন শুনেছে।

তখন এই এলাকা জুড়ে নুনমারাদের উপর পড়ে গেছে সাহেবদের নিষেধাজ্ঞা। হীরাপুরে ছিল মিলিটারি ঘাঁটি। তারা গাঁয়ের পর গাঁ জ্বালাতে জ্বালাতে চলে যাচ্ছে রাণীসাই, চন্দনপুর থেকে মীরগোদা অবধি। দিশি নুন থাকলেই পুলিশের লাঠি গুলি, ঘরে ঘরে আগুন। দুই পুলিশ, দুফা আর গুঁফার কথা এখনও কেউ না কেউ বলে। বলবে আরও বহুদিন।

লায়কানির কাহিনির মতোই এ কাহিনিও লোকমুখে ঘোরে। দেবী মাহাত্ম্য আর মানুষের যুদ্ধ এক হয়ে যায়। নুনমারাদের খুঁজতে খুঁজতে পুলিশ তখন গাঁয়ের পর গাঁ জ্বালাচ্ছে, সেই সময় লায়কান বুড়ি জঙ্গলে হেঁটে গিয়ে সেই সিংহের শিকল খুলে দিলেন। সমুদ্র ফুঁসে উঠল।

লায়কানখাসে তখন বড়ো বড়ো ঝাউ তেঁতুল। সেই সব গাছের কোনো একটায় এসে দেবী আশ্রয় নিয়েছিলেন। গাছ ফুঁড়ে বেরিয়ে সিংহের শিকল খুলে দেবী পানসি নিয়ে সমুদ্রে নামলেন। এলোচুলে পানসির উপর বসে আছেন লায়কানি। ক্রমাগত চুল আঁচড়ে যাচ্ছে তিনি। চুলের ভিতর দিয়ে মেঘ বেরিয়ে বেরিয়ে আকাশ ছেয়ে ফেলল, ঘোর বিপর্যয় শুরু হল।

দুর্দম ঢেউয়ে ঢেউয়ে সিপাই সান্ত্রি সব উধাও। ভাসিয়ে নিয়ে গেল সব। সমুদ্র ভেড়িবাঁধ ভেঙে ঢুকে পড়ল পুলিশ মিলিটারি ব্যারাকে। সায়েবদের হাত থেকে নুনমারারা বাঁচল।

জন্ম হল লায়কানখাসের। আকাশছোঁয়া বৃক্ষেরা সব মাটিতে শুয়ে পড়ল। খাঁ–খাঁ করতে লাগল সব। দূরে সমুদ্র নীল। আস্তে আস্তে বালি গরম হয়। গাছগাছালি পরিষ্কার হয়। লায়কানখাস মরুভূমি হয়ে গেল। নুনমারাদের ডাকলেন দেবী।

সিপাই সান্ত্রিরা গেল কোথায়? না হাওয়া হয়ে গেল। নায়কানি হাওয়া করে দিলেন সব্বাইকে। তারা বর্ণহীন হয়ে বাতাসে ঘুরতে লাগল। ঘুরতে ঘুরতে আছড়ে পড়ল ঝাউয়ের মাথায় মাথায়। একবার দক্ষিণ থেকে তারা উত্তরে যায়, আর উত্তর থেকে হাওয়া আসে দক্ষিণে। নায়কানি হাওয়াদের পাঠান তাঁর আর সব বোনেদের কাছে। ওই ওড়িশার ফুলবনি খাসে আছেন ফুলেশ্বরী, উত্তরে পানিপারুল বারঙ্গতে আছেন লঙ্কেশ্বরী....এইরকম সবাই হাওয়াদের নিয়ে খেলা করেন। সিপাই সান্ত্রিদের নিয়ে খেলা করেন।

অনন্ত সার ফিরতে ফিরতে মেয়েকে জিজ্ঞেস করে, ‘মনে নাই বন্ন?’

মেয়েটা মাথা ঝাঁকাতে থাকে, ‘উহুঁ।’

‘বন্ন দেখিস নাই তো কী দেখলি?’ অনন্ত জিজ্ঞেস করে।

‘অশ্ব!’

‘অশ্ব! বন্ন নাই! মানে বাতাস!’

অনন্ত সারের ভেতরটা কেমন ছমছম করে ওঠে। মানে নায়কানির অভিশাপ দেখল নাকি কচি মেয়েটা?

ফিরতে ফিরতে অনন্ত বলে, ‘ছিপতি বাবুর অশ্ব চাপা কি আজকের! ওই একটা জন্তু বটে, পিঠে চাপলেই রাজা। ওর বাপ চাপত, পিতাম’ চাপত, তার বাপ চাপত, নায়েবের বংশ কিনা।’

কুন্তি বিড়বিড় করে, ‘কী জানি কী বন্ন, হাঁ বাপ, সাদা হবে কি?’

‘খেয়াল হয় নাই।’

‘আমি তো ছিপতিবাবুর অশ্ব দেকিচি, দুধসাদা, সমুদ্দুর ধারে টুরিস চাপে না উ ঘোড়ার উপরে, পিঠে লাল ঝালর, জরি দিয়া।’

‘হাঁ তা তো জানি।’

‘তবে তো সি অশ্ব সাদাই হবে, ভানুবাবু উয়ারে নিয়া ঘুরে, যেন তারই ঘোড়া।’

‘কোনটা?’

‘যেটা দেকিচি পরশু দিন।’

‘মনে পড়ছে তোর?’ কুন্তির মা সরস্বতী জিজ্ঞেস করে।

‘বাহ্, তুমি দ্যাখো নাই ছিপতিবাবুর অশ্ব?’

‘হাঁ দিখেছি তো।’ বলল মা, ‘সাদাই বটে।’

‘তবে তো পরশু সাদা ঘোড়াই না দেখলাম।’ বলল কুন্তি।

'সত্যি!' অনন্ত জিজ্ঞেস করে।

'তাই তো হবে, ছিপতিবাবুর অশ্ব হলে তার বন্ন তো সাদাই বটে।' কুন্তি যুক্তি সাজায়।

অনন্ত সার থই পায় না মেয়ের কথায়। তিনজনে মাঠ পেরিয়ে একটা খাল পায়। খালে জোয়ারের জল ঢুকছে। কুন্তি পুবে তাকাল পিছন ফিরে। এখান থেকে সমুদ্র দেখা যায় সিধে। একটু উপরে মেঘের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেছে চাঁদের অংশ। জ্যোৎস্না ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ছে বালিভাসা মাঠে। গড়িয়ে যাচ্ছিল চাঁদের আলো বালির উপর। কুন্তি আবার ঘোড়াটাকে দেখতে চাইছিল দু–দিন বাদে। তার মনের ভিতরে ঘোড়াটাই ছিল এখন, এই দিনরাত্রির সন্ধিক্ষণে। না, কিছুই চোখে পড়ে না।

অনন্ত বলল, 'সাবধানে পার হ, সোতের টান আছে।'

তিনজন ছপ ছপ করে জল পেরিয়ে ভেড়িবাঁধে উঠতে থাকে। উঠে কিছুটা উত্তরে এগিয়ে নেমে যাবে বাঁধ থেকে পশ্চিমে। বাঁধে উঠে অনন্তর বউ সরস্বতী বলল, 'কামের কুছু বলল ছিপতিবাবু?'

'ও তো এয়েছিল অশ্বের খোঁজে।'

'না, অশ্বের বন্ন কীর'ম তা জানতে।' বলল কুন্তি।

'তার মানে অশ্বর খোঁজই লিয়া, বন্ন জানলে তো বুঝা যাবে সেইটাই কিনা।' বলে অনন্ত।

'কোনটা?' জিজ্ঞেস করে তার বউ।

'যিটা হারাইছে।' বলে অনন্ত।

তিনজনে নিশ্চুপ হয়ে গেল আচমকা। হাঁটছে ধীর পায়ে। একটু বাদে অনন্তর বউ বলে, 'দীঘায় কামকাজ হবে না, বলো না ছিপতিবাবুরে, হোটেলে কাজ নাই?'

'দালালি করতে হবে টুরিস–এর।'

'তাই করো।'

হাসে অনন্ত, 'এ মাসে নুন যেমন নাই, টুরিসও নাই, বর্ষাকালে কে আসে!'

'তবে হীরাপুর যাও শতপথীবাবুর বাড়ি।' কথাটা আচমকা বলল কুন্তি।

অনন্ত চমকে ওঠে। হীরাপুরের রজনী শতপথীর ঘর ছেড়ে সে এখন অলংকারপুর নিবাসী। এখন সে আর শতপথীবাবুর বাগাল নয়, শতপথীবাবুর মুনিষ নয়। কতদিন ছেড়েছে হীরাপুর! এই মেয়ের বয়স যতদিন হল তারও বছর দুই আগে। যতদিন ছেড়েছে হীরাপুর, সেই ষোলো–সতেরো বছর, তার আগের ষোলো–সতেরো বছর সে হীরাপুরের শতপথীবাবুর বাগাল, বাঁধা মুনিষ। শতপথীবাবু জমিদার না হয়েও জমিদার মানুষ। এদিকে, বাংলায় যত জমি, তার কম নয় ওড়িশায়। ওড়িশায় তাঁর চাষবাড়িতে কতদিন কাটিয়েছে অনন্ত! সেই সব কথা শোনায় বউকে। শতপথীবাবুর মন জুগিয়ে থাকতে পারলে আজ কি বউ মেয়ে নিয়ে নুনের খালারি করে পথে পথে ঘুরতে হত? অলংকারপুরের ভিটে তো সরকারি খাস জমিতে। শতপথীবাবুর বাড়ির শানের মেঝের সুখ গেছে সেই বর্গার লোভে। শতপথীবাবুর পিছনে ছাতা ধরে হেঁটে যার পেটে ভাত জুটত সে কিনা বলল, 'বাবুর জমিনে আমি ভাগচাষা।'

কুন্তি বলল, 'লিয়ে যাবা একবার হীরাপুর?'

'কেনে?'

'শতপথীবাবুর দালানকোঠা দিখে আসি।'

'কী হবে?'

'এমনি!' দীর্ঘশ্বাস ফেলে কুন্তি যেন তার মায়ের মতো হয়ে যায়।

অনন্ত বিড়বিড় করে, 'যাবার মুখ নাই, বাবুর আমি বাঁধা মুনিষ, খাওয়াপরার অভাব নাই, বাবু যাবে তালসারি, ''অ'ন্ত চ,'' বাবু যাবে চাষবাড়ি—সেই চন্ননেশ্বর ছাড়ায়ে, বালিমুন্ডা ছাড়ায়ে ঈশ্বরপুর, ''অ'ন্ত চ...''।'

বিড়বিড় করতে করতে থেমে গেল অনন্ত। ঈশ্বরপুর চাষবাড়িতে যখন ধান উঠত মৌসির মাস, আঘুনে, তখন মুনিষ অনন্তই তো বাবু। বিঘায় দশ মন হলে ছ–মন বাবু, চার মন চাষা। ও জায়গা এ জায়গার মতো নয় যে চাষা ধান বেশি নেবে আর মালিক পাবে কম, চাষা নেবে বারো আনা, মালিক চার আনা। ও জায়গায় যদি বাবু বলত নেবে পনেরো আনা, চাষা নেবে এক আনা, তবে তাই হত। বছর বছর চাষি পালটাত শতপথীবাবু। বোশেখ মাস পড়লেই ওই রোদে আবার ঈশ্বরপুরে চাষবাড়িতে হাজির শতপথীবাবু আর তার মাথায় ছাতা ধরা বাঁধা মুনিষ অনন্ত। জমি বিলি হবে একশো বিঘে, দুশো লোক হাজির। কেউ কথা বলে না বাবুর সামনে। মাথা নামিয়ে বিড়বিড় করে, 'চাষডা দাও দেখি বাবু।'

তখন বাবুর কী মেজাজ! বাবুর সঙ্গে মুনিষেরও। বাবু যদি বলে ধরে আনতে, সে বেঁধে আনে প্রায়। সন্ধ্যেবেলায় থানার দারোগা এল, আর কারা কারা এল, অনন্ত মুরগি ছাড়ায় একটা দুটো, তিনটে পর্যন্ত। দারোগার সঙ্গে বসে বাবুর মেহফিল চলে কত রাত্তির পর্যন্ত, সেই মেহফিলে কটকের মেয়েমানুষ পর্যন্ত আসত। সব কথা কুন্তির মা জানে। কুন্তির মাকে সব বলেছিল বিয়ের পর। কুন্তি শুনেছে তার মায়ের কাছে। সরস্বতী এখনও দুঃখ করে, একটা ভুলের কারণে চরম সব্বোনাশটা হয়ে গেছে তার স্বামীর, না হলে ওড়িশার চাষবাড়িতে মেয়ে বউ নিয়ে থাকতে পারত অনন্ত। বাঁধা মুনিষ ভাগ লেখানোর কথা ভাববে কেন? মনে পাপ ঢুকেছিল অনন্তর।

অনন্ত বলল, 'মুই তিন বিঘা চাষ করতাম তো বটে।'

'কামের কাম করতে, বাবু তুমারে ভালোবাসত তো?' মেয়ে জিজ্ঞেস করে।

'হ্যাঁ।' ঘাড় কাত করে অনন্ত।

কুন্তি বিড়বিড় করল, 'হীরাপুর লিয়ে যাবা?'

একই প্রশ্ন, একই জবাব। বাঁধা মুনিষ ভাগ লেখায় না। লেখানো ঠিক না। ওসব চিন্তা মাথায় ঢুকলে অধম্মো হয়। সেটেলমেন্ট জরিপ কালে—বিনাশ কালে তার বুদ্ধি নাশ হল। বাবু গিয়েছিল কটকে। বাবুর বেটা কাঁথিতে মোটর সাইকেল হাঁকিয়ে এবেলা যাচ্ছে ওবেলা ফিরছে। পার্টির লোক বর্গা লেখাচ্ছে জরিপে। সেটেলমেন্ট আমিন পান খাচ্ছে আর তদন্ত করছে। রজনী শতপথীর বাঁধা মুনিষকে ধরল পার্টিবাবু নির্মল করণ, 'বর্গা লিখাবি?'

'আজ্ঞে?'

'জমি চষিস তো?'

'মোর তিন বিঘা আছে।'

'ধান কে লেয়?'

'বাবু নেয়, সবটাই নেয়, খরচা দেয়।'

'তুই?'

'আমি বাবুর মুনিষ।'

আমিন খ্যা খ্যা করে হাসতে হাসতে বলল, 'ভাগ অর্ধেক অর্ধেক হবে, কী নাম, কত দাগ?'

নির্মল করণ বলল, 'দে, সব বলে দে।'

কুন্তি বিড়বিড় করল, 'বলে দিলে সব?'

'না, বাবুর জন্যি বসে থাকলাম তিন দিন, তিন দিন পরে কটক থেকে ফিরল বাবু, বলল, ''অ'ন্ত চ, বালিমুন্ডা ঈশ্বরপুর চাষবাড়ি।'' '

অনন্ত বউকে বলল, 'তোরা ফের, মু দীঘা ঘুরে আসি।'

'ইখন গে কী হবে, আঁধার রাত।'

'আঁধার কই, জোছনা রয়েছে এর'ম।'

কুন্তি বলল, 'হাঁ হাঁ যাও, মাইতিবাবুকে বলে এসো অশ্বের বন্ন ধলা।

'ধলা অশ্বই তো ছিল মাইতিবাবুর।' বলল সরস্বতী।

'সে কি মাইতিবাবু জানেনি?' অনন্ত বলে।

'জানবেনি কেনে, কিন্তু উনি তা'লে কেনে অশ্বের বন্ন খুঁজল মোদের কাছে?'

'আশ্চর্য তো!' অনন্ত দেখল হলুদ চাঁদের আলো পড়েছে মেয়ের মুখে। মেয়েটা তাকিয়ে আছে চাঁদের দিকে, দক্ষিণ–পুবে, ঝাউবনের মাথায়! কথাটা তো মিথ্যে বলেনি কুন্তি। 'মাইতিবাবু হোটেলিয়ার কি মাথা খারাপ হল? আপন অশ্বের বন্ন ভুলি গিলা!' বিড়বিড় করে অনন্ত। শ্রীপতি মাইতির মাথা কি তার মতো খারাপ হল? সে ছ–বছরে এসেছিল শতপথী বাড়ি। ছয় থেকে ষোলো, ষোলো থেকে তেইশ। তাগড়া শরীর হল তার। এক কিলো চালের ভাত সাবাড় করে। দশটা তরমুজ একা মেরে দিতে পারে। বাবু তাকে স্নেহ করে। গা–হাত–পা টেপায়। বলে, এবার তার বিয়ে দেওয়াবে। বিয়ের নাম শুনে গা গরম হয়ে ওঠে তার। বালিমুন্ডা, ঈশ্বরপুর যাচ্ছে আঘুন মাসে। ট্রেকার থেকে দু–মাইল হাঁটা। চাষবাড়িতে গিয়ে দেখল ফুটফুটে ধলা একটি মেয়েমানুষ। ঈশ্বরপুরের চাষবাড়িতে থাকত অবনী, অবনী পাতর, সে বলল, 'বাবুর রাখনি, কটক থেকে নিজে নিজেই চলে এসেছে।' কটকি মেয়ে বাবুর রাখনি। হাঁ করে বাবুর দিকে তাকিয়ে আছে অনন্ত। সেই সন্ধ্যেয় কথাটা বলে ফেলল, 'বাবু শুনছেন।'

বাবু বলে, 'কটকি কোনঠে গেল?'

অনন্ত বলে, 'বর্গাটা নাকি মানষের ভালোর জন্যি?'

বাবু বলে, 'অনন্ত তুই যা, কটকিরে ডাক দে, হাত–পা টিপুক ও, রান্না তো অবনী করছে, উ তার ভিতরে ঢুকি গিলা কেনে?'

অনন্ত বলে, 'বাবু বর্গা যে লিখানো হচ্ছে—!'

বাবু বলে, 'খুব জাড়, মেয়্যাছিলাডা কোনঠে?'

তিনবারের বার শোনে রজনী শতপথী। চমকে ওঠে। কী বলে অনন্ত? সিধে হয়ে বসে শতপথীবাবু, 'কী বলিস?'

তখন কটকি মেয়েমানুষ হাজির। অন্ধকারে দরজায় দাঁড়িয়ে ডাকে, 'বাবু!'

অনন্ত বলে, 'বাবু ডাকে, আপনি কানে শুনো না?'

কী মিহি কন্ঠস্বর তার! যেন বাঁশি বাজে অন্ধকারে, বলে, 'অবনীরে রান্নাটা দিখাইছিলাম!'

বাবু ভুলে গেল তার কথাটা, ডাকল তাকে, 'রাধে ইদিক আয়, যা অ'ন্ত।'

কুন্তি বলল, 'মাইতিবাবু তার অশ্ব ধলা না কালা ভুলি গিইছে।'

'নাকি মাইতিবাবু তার অশ্বটা কি না তা জানতে এয়েছিল।'

'তবে বন্ন কেনে?' কুন্তি জিজ্ঞেস করে।

'বন্নেই তো অশ্ব চিনা যায়।' বলল কুন্তির মা।

'অশ্ব খোঁজে না বন্ন খোঁজে মাইতিবাবু হোটেলিয়া?' জিজ্ঞেস করে কুন্তি।

'অশ্বই তো মনে হয়।' বলল কুন্তির মা।

না, 'বন্ন বুধ'য়।' বিড়বিড় করে কুন্তি।

অনন্ত বলে, 'আমি তা'লে যাই।'

মা মেয়ে ডান দিকে নেমে গেল অলংকারপুরের দিকে। অনন্ত সার চলল ভেড়িবাঁধ ধরে দীঘা নগরীর আলোর দিকে। বেশ জোরেই পা চালায় সে। গিয়ে শ্রীপতি মাইতিকে ধরতে হবে গাঁজায় দম মারার আগে। এখন শ্রীপতির নানান কাজ। যদি গাঁজা টেনে বসে থাকে তো একরকম। আর যদি হাসপাতালের নার্স দিদিমণির কোয়ার্টারে গিয়ে বসে থাকে, সে আর একরকম। তাহলে কথাটা বলা দুঃসাধ্য হবে। গাঁজায় চুর হয়ে থাকলে তবু কথাটা বলা যাবে। শ্রীপতিবাবু হয়তো বুঝবে, হয়তো বুঝবে না। না বুঝলেও দু–চার টাকা পাওয়া যেতে পারে। শ্রীপতি বলে গেছে

অশ্বের কোনোরকম খোঁজ পাওয়া গেলেই পয়সা মিলবে। এও তো একরকম খোঁজ দেওয়াই হল। ‘বাবু, আপনের অশ্বের বন্ন ছিল ধলা।’ সেই ধলা অশ্বই লায়কানখাসে সন্ধ্যেবেলায় দাঁড়াল এসে। কুন্তি ঠিক দেখেছে। মেয়ের বুদ্ধি আছে। বুদ্ধি শুধু তার ছিল না। ছিল না বলেই পরদিন সেই কটকি মেয়ে, বাবুর রাখনি রাধের সঙ্গে বলল কথাটা। আসলে সে তো কটকি নয়, চন্দনেশ্বরে শ্বশুরঘর, বাপের ঘর মোহনপুর। মোহনপুর ওড়িশায় নয়, বাংলায়। শ্বশুরঘর থেকে তাকে খেদিয়েছে। সে গিয়েছিল কটক, এক বাড়ির কাজের লোক হয়ে। স্বামী খেদানো মেয়েমানুষের কাজ তো ওই। সেখানে বাবু দ্যাখে তাকে। বাবু টাকাপয়সা দিয়ে, পথনির্দেশ দিয়ে চলে গিয়েছিল। সে ঠিক চলে এসেছে। রাখনিকে তো জমিও দেয় বাবুরা। ঈশ্বরপুরে বাবুর এত জমিন। তাকে তো দিতেও পারে যদি সে খুশি করতে পারে বাবুকে। স্বামীর ঘর সুখের হয়নি। হাউহাউ করে কেঁদেই ফেলল সে। বুড়া স্বামী, তার রং ছিল এক দোকানিয়ার ছেলের সঙ্গে। কী করবে সে? মন যে অমন হল।

অনন্ত সেই যুবতীকে ডাকল, ‘যার যেমন কপাল মা।’

মা শুনে ফুঁসে উঠল রাধা, ‘তুমি কেমন বেটাছেল্যা গো!’

অনন্ত বলে, ‘বাবুর রাখনি, তাই তো হবে।’

রাধা চোখের জল মুছতে মুছতে বলে, ‘আশীব্বাদ করো বাবুর সেবা করে যেন জীবনটা যায়। দোকানিয়ার ছেল্যা আমারই বয়সি হবে, তার কথা মু ভুলি নাই, কিন্তু সে মোর সব্বোনাশ করল শউর ঘরে ধাওয়া করে।’

অনন্ত বলল, ‘বর্গা জানো?’

‘বর্গাদারি, মোর বাপ বর্গাদারি করে।’

‘মু যদি বাবুর পাঁচ বিঘার বর্গাদারি করি, ভাগচাষির নাম লিখাই।’

হল সব্বোনাশ। সন্ধ্যেয় বাবু ডাকল তাকে আচমকা। ঘরে বাবুর রাখনি বাবুর ডানদিকে বসে আছে। তার বুকের আঁচল ফেলা, পক্ক বিল্বফলের মতো দুই বুক প্রায় উদ্ভাসিত, ঊরু পর্যন্ত কাপড় তোলা, বাবুর পেটে তার হাত। জল পাত্র, মদ, মাংস রয়েছে বাবুর সামনে। অন্ধকারে সে টের পেল বাবুর চোখ লাল। বাবু তাকে দেখে সিধে হতেই বাবুর মস্ত ছায়া দেওয়ালে টলমল করতে লাগল। সে দরজায় দাঁড়িয়ে। বাবু ডাকল রাধিকে।

রাধিকে খিলখিল করে হাসে, ‘কী বলো মোহন বাঁশি?’

বাবু সেই মেয়েমানুষের বুকে হাত মেলে দিল, ‘দলামলা কর।’

এ কাজ ছিল তার। এই কাজে তার সঙ্গে বাবুর অনেক কথা হত। কথা তার যত না বাবুর তত বেশি। ঈশ্বরপুরে এসে বাবু সন্ধ্যেবেলায় তাকে ডাকত, ‘অ’ন্তা।’

অনন্ত বলত, ‘রামাই পাতর, উটা বলে মোর দেশের মতো ভাগ দিবে।’

‘কত ভাগ?’

‘ও লিবে তিন ভাগ, আমরা পাব এক ভাগ, রামাই গোল উঠাচ্ছে, উটাকে ইবার খেদান বাবু।’

রামাই দূর হল। ওই এলাকায় কত জমি প্রত্যাশী মানুষ হামলে পড়ত বাবু গেলে। বাবু তো বছর বছর চাষা বদলাবে, অন্তত এক জমিতে দু–বছর চষতে দেবে না কাউকে। একই জমি যদি চষে চাষা, তবে নাকি সেই জমির উপর মায়া বসে যায়। ছাড়তে চায় না। তখনই গোলমাল শুরু হয়। চাষা মনে করে জমি তার নিজের।

বাবু বলল, ‘রাধেরে তুই কী বলিচিস?’

রাধিকা বাবুর গালে গাল ঘষল, আরও গা ঘেঁষে এল। বাবুর চুলে বিলি কাটতে কাটতে বলল, ‘ও কথা ইখন বলেন কেনে বাবু, ইখন আপনার লিশার সময়।’

সাতকাহন করে বলেছিল রাধিকা। যতটা সে বলেছিল, তার চেয়ে বেশি। সতেরো বছরের সম্পর্কে সন্দেহ ঢুকল। সেই মোহনপুরের মেয়ে, চন্দনেশ্বরের বউ, কটকের রাখনি ঈশ্বরপুরে এসে তিনদিন ধরে কী বিজবিজ করল বাবুর কানে, বাবু গেল খেপে। রাধিকা বলল, ‘ও আপনের সব সম্পুত্তি নেবে, বর্গাদারি করাবে।’

অনন্ত সার সমুদ্রের কাছে এসে পৌঁছেছে। সি–ডাইক বাঁ–দিকে ঘুরে গেছে। সে নেমে পড়ল বাঁধ থেকে। তারপর বেলাভূমি ধরে এগোতে থাকে। পূর্ণিমার জোয়ার এখনই ছুঁয়ে ফেলবে তার পা। সে দ্রুত হাঁটতে লাগল। উঠে এল বেলাভূমি থেকে উপরে, পাথুরে গার্ডওয়ালের সিঁড়ি ধরে। ক–দিন আগেও এই সমুদ্র নগরী, সৈকত শহর গমগম করছিল। এখন একেবারে নিঝুম। আরও নিঝুম হবে বর্ষা নেমে গেলে। তবে শনি, রবিবার তো চাপ থাকেই। লোক আসে। বাস থেকে দু–পাঁচজন অচেনা মানুষ নামে। শ্রীপতিবাবুকে ধরে হোটেলে একটা কাজ পেলে হয়। দেবে না শ্রীপতি? অশ্বের বর্ণের খবর নিয়ে এল সে। কেমন বর্ণ? না ওই যে ঢেউ ভাঙছে, সমুদ্র ফুলে উঠে ভেঙে পড়ছে জলের ফেনা, ওইরকম সাদা। ‘বাবু, সে অশ্বের বন্ন আছে, ভুল বলিছিলাম।’

হোটেল সমুদ্রপাখি কাফেটেরিয়ার উলটোদিকে শিবমন্দির যাওয়ার পথে। শিবতলা রোড। এ হোটেল বছর দেড়েক দোতলা হয়েছে। আগেও তো সে এসেছে এখানে। অন্ধকার হোটেলের সামনে দাঁড়িয়ে হাঁকল, ‘ছিপতিবাবু, বাবু আছেন নাকি?’

হোটেলের সামনের চালাঘর থেকে বেরিয়ে এল মধ্যবয়সি ঠাকুর, ‘কী চাই?’

অনন্ত বলল, ‘বাবু নাই?’

‘বাবুরে কী হবে, মোরে বল।’

অনন্ত বলে, ‘বাবুর অশ্ব।’

‘অশ্ব!’ হা–হা করে হাসল ঠাকুর, ‘অশ্ব কই?’

‘ধলা বন্ন তো?’

‘হ্যাঁ ধলা বন্ন, কী হয়েছে?’

অনন্ত চুপ করে থাকল। ঠাকুর লোকটি বড়ো পাটোয়ারি। ঠাকুর ঠাকুরানিই যেন হোটেলের মালিক। দোতলা বিল্ডিং কিন্তু সামনে টালির চালা, কিচেন। অনন্ত বিড়বিড় করে, ‘ধলা বন্ন তো?’

‘হ্যাঁ হ্যাঁ, ধলাও হতে পারে, কালাও।’ ঠাকুর পকেট থেকে বিড়ি বের করে ধরায়, ‘তোর মেয়ে না ওই কুন্তি, নুন বেচতে আসে বাজারে?’

মীরগোদায় নাকি এককালে সমুদ্র ছিল। সেই সমুদ্র, যে সমুদ্র দীঘায় আছে, তালসারিতে আছে, জুনপুটে আছে, খেজুরির ওদিকে আছে। সেই সমুদ্র যে সমুদ্রে সাগরদ্বীপ আছে, ছত্রিশ ঘণ্টা নৌকায় ভাসলে যে দ্বীপে পৌঁছানো যায়, দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা, কপিলমুনির আশ্রম।

মীরগোদা ওই সব সমুদ্র, বঙ্গোপসাগর থেকে অনেক উত্তরে, কিন্তু সেখানে বঙ্গোপসাগর ছিল। সমুদ্র কতদূর ছিল কে জানে? ভানু শুনেছে সব সমুদ্র থেকে ওঠা দেশ। মীরগোদায় নাকি জাহাজঘাটা ছিল। এখন সেসবের কোনো চিহ্ন নেই, জলই নেই, তো জাহাজ। কিন্তু জাহাজঘাটা আছে। ধু–ধু বালির দেশ মীরগোদা, উঁচু উঁচু বালিয়াড়ি। তার কোলে কোলে ঝাউগাছ। দূর থেকে দেখলে মনে হয় ঝাউছায়ার ওপারে আর এক সমুদ্র, ঝাউবনের ওপারে। জাহাজঘাটায় একটা নদীখাতের মতো ঢাল আছে। সেখানে গঙ্গা পুজো হয় পৌষ সংক্রান্তিতে। গঙ্গাপুজো তো সত্যিকারের সমুদ্রে হয়; মীরগোদায় সমুদ্র নেই কিন্তু গঙ্গাপুজো আছে। তার মানে সমুদ্র ছিল। সমুদ্র না হোক বড়ো নদী ছিল। সেই নদীতে জাহাজ ঢুকত। এখন এই গরমের দুপুরে ঝাউবন থিরথির করছে সবসময়। শোঁ–শোঁ ডাকছে। মীরগোদা ডেকেছিল ভানুকে। মীরগোদায় জাহাজঘাটা, সমুদ্র চিহ্ন ডেকেছিল ভানুকে। ডেকেছিল শ্রীপতি মাইতির হারানো পক্ষীরাজ তার বেগবান রূপ নিয়ে। ডেকেছিল তার কানহা, কন্থক শূন্যপৃষ্ঠ নিয়ে।

এই দক্ষিণ থেকে ওই উত্তরের পথের সবটাই বালি। রোদ্দুরের দিনে ওই পথে হাঁটাই দুষ্কর। বর্ষার জল পড়লে বালি বসে গেলে, মাথায় মেঘ থাকলে তবে আরামে হাঁটা যায়। এখন বালির গরম, গরম বালিতে পা ডুবে যায়, মাথায় গনগনে রোদ। কাল সন্ধ্যেতেও মেঘ ছিল, এক পশলা বৃষ্টি হয়েছিল। বালি যা ভিজেছিল রোদ উঠতে উঠতে আবার শুকনো। ভানু মীরগোদা জাহাজঘাটায় খোঁজ নিতে যাচ্ছে। কাল তাকে পঞ্চাশটি টাকা দিয়েছিল মাইতিবাবু, মীরগোদায় যদি ঘোড়াটার সন্ধান পাওয়া যায়। মীরগোদার দিকে যেতে পারে পক্ষীরাজ। সেইরকম খবরই না পাওয়া গেল দু–দিন আগে। ভানুর এক টাকাও খরচ হবে না, পুরোটা আয়। হারানো ঘোড়া কি তার কপাল ফেরাচ্ছে? পলাতক পক্ষীরাজ যদি তার হাতে ধরা দেয়, মাইতিবাবু বলেছে একখানা পাঁচশো টাকার নোট দেবে। ভানু আশায় আছে। ঘোড়াটা তাকে চেনে। ঘোড়াটা তার অবস্থা জানে। পাঁচশো টাকা পেলে সে যে ভোজপুর ঘুরে আসতে পারে তা জানে শ্রীপতিবাবুর পক্ষীরাজ। ধরা কি দেবে না কন্থক?

মীরগোদার একটা মানুষ ক–দিন আগে চুল ফেলতে গিয়েছিল চন্দনেশ্বরের মন্দিরে। মানত ছিল। মাথা কামিয়ে সে দুপুরে এসে উঠেছিল শ্রীপতির সমুদ্রপাখি হোটেলে। খেয়েদেয়ে রওনা হবে মীরগোদার দিকে। জাহাজঘাটার দিকে। বলল তাই, ঘর মীরগোদা, জাহাজঘাটা। আগে তো বলল জাহাজঘাটা। জাহাজঘাটা থেকে আসছে, দুপুরে মিল খেয়ে জাহাজঘাটা ফিরবে। যেন সে জাহাজঘাটা গিয়ে জাহাজ ধরবে। তারপর চলে যাবে জাভা, সুমাত্রা, বালি দ্বীপ। কথাটা বলতে বলতে হাসছিল শ্রীপতি মাইতি।

সেসব জায়গা কোন দিকে? লোকটা অবাক হয়ে তাকিয়েছিল। শ্রীপতি দক্ষিণে আঙুল তুলে দেখিয়েছিল, ‘সমুদ্রপারে, দ্বীপ।’

‘সাগরদ্বীপের নিকটে?’ জিজ্ঞেস করেছিল লোকটা।

শ্রীপতি হেসে মাথা নাড়িয়েছিল, ‘নাহ্, অনেক, অনেক দূরে।’

অচেনা লোক, সে যদি আশপাশের হয় তার কাছে খোঁজ নেয় শ্রীপতি তার পলাতক ঘোড়ার। মীরগোদা, জাহাজঘাটার দিকে কোনো ঘোড়াকে দেখেছে কি সে? ঘোড়া? অশ্ব! লোকটা অবাক হয়ে তাকিয়েছিল। সদ্য কামানো মাথায় হাত বুলিয়ে নিয়ে কী যেন ভেবেছিল, তারপর শ্রীপতিকে অবাক করে ঘাড় কাত করেছিল, ‘হ্যাঁ দেখা গেছে।’

‘দেখা গেছে!’ শ্রীপতি উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল, ‘সত্যি?’

'হ্যাঁ, অশ্ব তো?'

অশ্বই তো বটে, 'সাদা রঙের, সাদা ঘোড়া?'

'সাদা! সাদাই হবে হয়তো, সাদা না হলেও ঘোড়া যে তা ঠিক।'

'কোথায় দেখেছিলে?'

'আজ্ঞে জাহাজঘাটা ছেড়ে যাচ্ছিল।'

ভানু বিষম খেয়েছে, 'জাহাজ ছেড়ে যাচ্ছিল!'

'না, ঘোড়া মানে অশ্ব যাচ্ছিল জাহাজঘাটা ছেড়ে।'

ভানু মাথার চুল টেনে সাড় নিয়েছিল নিজের। শ্রীপতি মাইতির ঘোড়া হল পক্ষীরাজ। যদি আকাশে ওড়ে তো মানা যায়, কিন্তু জাহাজঘাটা ছেড়ে যাবে কোথায়? আর কন্থক কি ওভাবে যাবে? ভানু কথাগুলো ধীরে ধীরে শুনছিল। শ্রীপতি তাকে ধমকে উঠেছিল, 'থাম দেখি।' নেড়া মাথা লোকটা তার দিকে তাকিয়ে ছিল, সে কত সময় ধরে, কত দিন ধরে যেন! বিড়বিড় করছিল, 'জাহাজঘাটা থেকে সে যাচ্ছিল কাজু জঙ্গলের দিকে।'

'জঙ্গলের দিকে?' শ্রীপতি জিজ্ঞেস করেছিল নিশ্চিত হওয়ার জন্য।

'তাই তো বটে।'

'সাদা ঘোড়া?'

'তা জানে মোর ভাইপো।'

'ভাইপো! ভাইপো জানবে কেন?'

লোকটা গালভরে হেসেছিল, দেখেছিল তো তার ভাইপো, সুতরাং সে–ই জানবে, আর সে ঘোড়া বাদামি হতে পারে।

'বাদামি কেনে?' ভানু দুলে দুলে জিজ্ঞেস করেছিল, 'কানহা তো সাদা বটে।'

'বাদাম বনে ঢুকছিল তো, বাদামি হতে পারে তাই।' বিড়বিড় করেছিল মুণ্ডিত মস্তক মীরগোদা জাহাজঘাটার লোক, 'বাদামিই হবে।'

'সাদা নয়?' হতাশ হয়েছিল শ্রীপতি।

হতাশ শ্রীপতিকে দেখে লোকটা হাঁ–হাঁ করে উঠেছিল, 'হবে না কেনে, ঘোড়া তো সাদা হতিই পারে, মু তো দেখিনি নিজ চক্ষে, তবে কিনা ভাইপো বলল বাদাম বনে ঢুকছে, তাই বাদামি হতে পারে, ঘোড়া শুনলাম, ঘোড়ার আবার বন্ন কী, সাদা, কালো, বাদামি হতিই পারে।'

'নিজ চোখে দ্যাখো নাই?' ভানু তার নিজের মাথা দু–হাতে ধরে জিজ্ঞেস করে। 'না, কানে শুনিচি।'

'কী শুনেচ?'

'ঘোড়া, কিন্তু খচ্চরও হতি পারে।'

শ্রীপতি সব শুনে ভানুকে পাঠাল মীরগোদায়। পঞ্চাশ টাকা নিয়ে ভানু এল জাহাজঘাটা দেখতে। হারানো ঘোড়া খোঁজার চেয়ে কানের হারানো মাকড়ি খোঁজাও সহজ। ভানু অবাক হয়ে দেখল জাহাজঘাটায় বালি উড়ছে গরম বাতাসে। ঝাউবনের ভিতরে বসে থাকল সে বালির দিকে চেয়ে। যেন চেয়ে আছে সমুদ্দুরে, নাও আসছে, জাহাজও হতে পারে। খুব ক্লান্ত হয়েছিল ভানু। ঝাউবনের ছায়ায় তার ঘুম এসে গিয়েছিল। কেমন একটা তন্দ্রার ঘোর। তার ভিতরে স্বপ্ন দেখেছিল জলের ভিতর দিয়ে ফেনা উড়িয়ে আসছে তার কন্থক। ঠিক টিভিতে যেমন দেখায়—টিভিতে কোনো একটা বিজ্ঞাপনে আছে যেমন, তেমন। ঘুমের চটকা ভেঙে যেতেই বালির ঘূর্ণি দেখল দূরে। চোখে ঘোর লেগেছিল। মনে হচ্ছিল ভগবান বুদ্ধের ঘোড়া যেন কেশর ফুলোচ্ছে, খুরে বালি ওড়াচ্ছে।

জাহাজঘাটা ছেড়ে সে গেল মীরগোদা হাটে। হাট খুব বড়ো। শুধু কাজুর পাহাড়। বড়ো বড়ো বাদাম ব্যাপারিরা আসে। তারা সব কিনে নিয়ে যায় বালিসাই, কাঁথি, মেদিনীপুর, কলকাতা, আবার বালেশ্বরেও। হাটখানি বৃত্তাকার।

একদিকে যেমন বাদামের বেচা–কেনা, অন্যদিকে আলু, পটল, ঝিঙে, ওল, আর একদিকে মাটির হাঁড়ি পাতিল, এক জায়গায় শুধু গামছা, তারপর রঙিন মাদুর। মদরঞ্জি খুলে ব্যাপারি খদ্দের ডাকছিল। ভানু অবাক হয়ে দেখল সেই মদরঞ্জিতে ঘোড়ার ছবি। কেশর ফোলানো সাদা ঘোড়া। একেবারে সেই ঘোড়া। কী আশ্চর্য! ঘোড়া যেন উড়ছে। যেমন উড়ত শ্রীপতিবাবুর পক্ষীরাজ। আশ্বিনের নীল আকাশে তার ডানার পালক উড়তে দেখলে দিগবিদিক জ্ঞানহারা হয়ে সমুদ্রতীর ধরে পশ্চিমে। ভানু জিজ্ঞেস করল, 'এ যে দেখি পঙ্খিরাজ, এ কোন পঙ্খিরাজ, মাইতিবাবুর?'

'কোন মাইতিবাবু?'

'দীঘা, সমুদ্রপাখি হোটেল যাঁর।'

ব্যাপারি বলল, 'জানা আছে, ও হুটেলে একবার মিল খাওয়া হল।'

ভানু বলল, 'এক্কেবারে আমার কন্থক, রাজপুত্রর অশ্ব।'

ব্যাপারি হাসে, 'তা'লে নিয়ে যাও।'

'কত দাম?'

দাম শুনে ভানু পিছিয়ে গেল। সাড়ে তিনশো বটে। ব্যাপারি বলল, 'খুব কমই বটে, এ মদরঞ্জি দীঘায় মিলবে পাঁচশো টাকায়, কলকাতা যাবে ছশো টাকায়।'

ভানু আবার এগিয়ে এসে দেখছিল। কী সুন্দর এঁকেছে। যেন ছবিই তুলেছে মাইতিবাবুর ঘোড়ার। ব্যাপারি হেঁকে উঠল, 'আসল মদরঞ্জি, পঙ্খিরাজের মদরঞ্জি, বিলাত, আমেরিকা, বর্মা, সুমাত্রা, জাভা যাচ্ছে মীরগোদার মদরঞ্জি, জাহাজ ছেড়ে গেল!'

ভানু হাত বুলিয়েছে ঘোড়ার কেশরে। তলপেটে। পুষ্ট ঊরুতে। শিহরিত হয়েছে সে। কাঁপছিল যেন মাইতিবাবুর সাদা ঘোড়া। তো তখন একটা খদ্দের এসে গেল। এক ভুশকো লোক, কলকাতার বাদাম ব্যাপারি। সে শুধু এটা না ওটা দেখতে লাগল। ভানু আর কথা বলতে পারে না। যখন গেল, মদরঞ্জিওয়ালা ক্লান্ত। বিক্রি হল না, অথচ খাটনি গেল। এসবের মর্যাদা কি বাদাম ব্যাপারি দিতে পারে?

'এদিকে কোনো অশ্ব দিখেছ?'

'মদরঞ্জিতে তো দিখা হল।'

'না, না আসল অশ্ব, খাঁটি অশ্ব।'

'ও–ও তো খাঁটি অশ্ব।'

'না, না পরান আছে যার।'

'ওর–ও তো পরান আছে, ওতে শুয়ে নিদ্রা যাও, মনে হবে অশ্বে সওয়ার হয়েচ।'

আশ্চর্য কথা! মদরঞ্জির ব্যাপারি আধবুড়ো মানুষ, মাথার বাবরি চুল সব সাদা, ঠিক কন্থকের কেশরের রং, গায়ের ঘন নীল জামাটি অথই সমুদ্র, আর লুঙ্গিটিতে বালির রং।

ভানু বলল, 'তুমিই খোঁজ রাখতি পারো, মাইতিবাবুর পঙ্খিরাজ পলাতক, তাহার নাম কন্থক।'

লোকটা বলল, 'দ্যাখো আছে কুথাও।'

'শুনা গেছে বাদাম বনে ঢুকেছে।'

'খুঁজ লাও।'

'কিন্তু সিটা নাকি বাদামি বন্নের।'

'হতিই তো পারে।'

'খচ্চরের জাত।'

'খচ্চর তো অমনই হয়।'

'তা'লে কী হল?' ভানু মাথা চুলকোতে চুলকোতে জিজ্ঞেস করে।

মদরঞ্জিওয়ালার কাছ থেকে সরে ভানু আবার হাট ঘুরতে লাগল। এক জায়গায় প্লাস্টিকের মগ, জগ, বালতি ভরতি, এক জায়গায় মিঠাই। মিঠাই হল গুড়ের লাড্ডু আর জিবে গজা। তারপর চালের পাহাড়, গমের পাহাড়। তারপর বড়ো বড়ো ফজলি আম। হাট গমগম করছে লোকের হাঁকডাকে। গাছতলায় ভিখিরির দলও বসেছে। ভানু ঘুরতে ঘুরতে বাদাম ব্যাপারিদের কাছে যায়, 'জঙ্গলে অশ্ব দেখিছ?'

কোন জঙ্গল? না, কাজু জঙ্গল। 'কাজু জঙ্গলে অশ্ব থাকে বলল কে?' এক ব্যাপারি বলল, 'শিয়ালও নাই, খটাশ নাই, পোকামাকড় থাকতি পারে।'

'কিন্তু খবর আছে পলাতক ঘোড়া।'

এমনি করে জিজ্ঞাসার পর সে আবার এসে দাঁড়িয়েছে মদরঞ্জিওয়ালার কাছে। মদরঞ্জিওয়ালা জিজ্ঞেস করল, 'পাওয়া গেল?'

'কী পাওয়া যাবে?'

'তুমার সাদা পক্ষিরাজ।'

'কুথায় পাব?'

'কেনে, এই হাটে।' হি–হি করে হাসতে লাগল ব্যাপারি। তার হাসিতে লোক দাঁড়িয়ে পড়েছে। মদরঞ্জিওয়ালা ঘোষণা করে, 'হারানো অশ্ব যদি না মেলে হাটে তবে আসা কেন?' এত গমগমে ভিড়, এত বেচা–কেনা, এর ভিতরে যদি না থাকে সেই দুষ্টু পলাতক, তবে কী দেখল ভানু, মীরগোদায় হাট? জাহাজঘাটার হাট?

'এ হাটও কি জাহাজঘাটার?' ভানুর জিজ্ঞাসায় মদরঞ্জি ব্যাপারি আবার হাসে, 'তাই তো বলে। বলে এ হাট নাকি সেই আমলের যে আমলে সমুদ্দুর ছিল এখেনে। হাটেই প্রমাণ হয় জাহাজঘাটা সত্যি। হাট নয় তো, এ হল মীরগোদা বন্দরের কেনা–বেচা, এখেন থেকে জাহাজ ভরতি মাল চলে যেত জাভা, সুমাত্রা, বালি, তখন তো বিলেত, আমেরিকা ছিল না।'

একেবারে মাইতিবাবুর কথা। তো মদরঞ্জিওয়ালাই বলল, 'তুমি থেকে যাও আজ।'

'কোথায় থাকি?'

মদরঞ্জিওয়ালা বলল, 'আমার কাছে থাকো, এখন আর যাবে কোথায়?'

ভানু থেকে গেছে তার ঘরে। সেখানে যেতে হল অন্ধকারে জাহাজঘাটা পার হয়ে। তখন ঝাউবনে অন্ধকার, অন্ধকারে লুপ্ত সমুদ্র যেন জেগে উঠেছে জাহাজঘাটায়। উত্তর আকাশে ধ্রুবতারা জ্বলজ্বল করছে। সেই ধ্রুবতারা দেখিয়ে মদরঞ্জিওয়ালা, গৌরমোহন তাকে উত্তরে নিয়ে গেল তার বাড়ির দিকে। পিছনে পড়ে থাকল প্রাচীন সমুদ্র–চিহ্ন প্রাচীন মায়া।

অন্ধকারে তার হাত ধরে গৌরমোহন বলল, 'যে পালায় তাকে ফিরানো যায়?'

'ফেরে তো সব্বাই।'

মদরঞ্জিওয়ালা বলে, 'এভাবে খুঁজে পাওয়া যায়?'

'তবে কীভাবে?'

মদরঞ্জিওয়ালা বলল, 'তুমি তারা চেনো?'

'না তো।' চমকে উঠে ভানু আকাশে তাকায়।

'তবে ঠিক জায়গায় কে লিয়ে যাবে তুমারে, আকাশ, তারা না চিনলে ওই অথই সমুদ্দুরে দিকহারা হয়ে কূল খুঁজে পাবে না, বুঝা গেল।'

'গেল, কিন্তু আমার কন্থক তো রাজপুত্রের সাথি ছিল, সে সব চেনে।

'চিনলেও ফিরবে না, না চিনলেও ফিরবে না।'

গৌরমোহন মদরঞ্জিওয়ালার বাড়িখানি মাঠের ধারে। সেই মাঠে ঘোর আঁধার। গৌরমোহনের কম বয়সের বউ আছে। তার নাম কোকিলা। কোকিলার রংটি চকচকে কালো, চোখ দুটি যেন জোনাকির মতো জ্বলে–নেভে। কচি মেয়েমানুষ। তাকে দেখিয়ে গৌরমোহন বলল, 'এই কোকিলার করা, ঘোড়াখানি ওর আঁকা।

কোকিলা মাথায় ঘোমটা টেনে হ্যারিকেন পায়ের কাছে নামিয়ে রেখে বলল, 'উনি আমার গুরু, ওঁর শিক্ষা।'

গৌরমোহন বলল, 'বোসো ভানুবাবু, তুমার বাবুরে বোলো অমন একখান মদরঞ্জি নিতে, যদি তিনি চান অশ্বরে আশমানে উড়ায়ে দেব দু–খান ডানা ফিট করে।'

কোকিলা তখন বলল, 'সে পরে হবে, আপনি জলপানি কিছু খাবেন?'

ভানু দেখল তার উত্তরের অপেক্ষা না করে সে ঢুকে গেল ঘরের ভিতরে। ভানু আকাশে তাকিয়ে তারা দেখতে লাগল আর অপেক্ষা করতে লাগল কোকিলার জন্য। মীরগোদা–জাহাজঘাটার আকাশে, লুপ্ত সমুদ্রের ভিতর থেকে চাঁদ উঠছিল তখন। হলুদ আলোয় ঘুম এসে যাচ্ছিল মদরঞ্জিওয়ালার।

জল আনল গৌরমোহনের কোকিলা। রেকাবিতে গোটা আটেক বাতাসা। শুধু ফুল চন্দন নেই, থাকলে পুজোর উপাচার হয়ে যেত। দূরে বসেছে সে। ঢকঢক করে জল খেয়ে, বাতাসা চিবিয়ে দেবমন্দির শীতল হল।

ডুরে শাড়ি, আগুন রঙের লাল ব্লাউজ, মাথা ভরতি সিঁদুর, নাকে এক বিন্দু নথ, হাতে কাচের চুড়ি, কোকিলা দূর থেকে জিজ্ঞেস করে, 'বিত্তান্ত কী?'

ভানু দেখল মদরঞ্জিওয়ালা মাটির দেওয়ালে ঠেস দিয়ে ঘুমাচ্ছে পরিষ্কার। সে এবার ভালো করে দেখল কোকিলাকে, যুবতী জিজ্ঞেস করছে, 'ঘর কুথায় হল?'

'নাই, ইখন দীঘা, আরও বলতে হয় যদি এই মীরগোদা, জাহাজঘাটা।'

কোকিলা জিজ্ঞেস করে, 'মদরঞ্জিওয়ালার সঙ্গে কতদিন চিনা?'

ভানু মিথ্যে বলল, 'অনেকদিন, যতদিন জাহাজঘাটায় আসছি।'

'কতদিন আসছ?'

ভানু বলল, 'অনেক অনেকদিন, রাজপুত্র বিসজ্জন দিয়ে বিবাগি হয়েছি আমি আর কন্থক অশ্বটি।'

কোকিলা বলল, 'বুঝলাম না, তবে বলি, এক একজনকে অমন মনে হয়, কতদিনির চিনা, কতকালের!'

ভানু নিজেই জানে না তার বয়স কত। নিজেই জানে না তার নিজের বৃত্তান্ত। বাবা, মা, পরিবার, সব ভুলে গেছে। ভুলে গেছে মেশিন চালানোর কলাকৌশল। ভানু ভাবছিল বাবু শ্রীপতি মাইতিকে বলে কলকাতার দিকে গেলে হয় পক্ষীরাজকে খুঁজতে। উলুবেড়ে, হাওড়া পর্যন্ত গিয়ে ট্রেন থেকে নেমে গঙ্গা পার হয়ে বজবজ। বজবজ গিয়ে তার মিল মাইল চারেক। জুট মিল আবার যদি চালু হয়ে থাকে! কোকিলা আধো–অন্ধকারে তার মনের ভিতরে বেগ তুলছিল। হাত বাড়িয়ে কথা বলে যখন তার হাতখানির রঙিন কাচের চুড়িতে হ্যারিকেনের আলো পড়ে চোখের সামনে যেন রঙের বিচ্ছুরণ। হাঁটুর উপরে থুতনি রেখে মদরঞ্জিওয়ালি যখন বড়ো বড়ো চোখে আধবুড়োটে, ঢ্যাঙা, ছিরিছাদহীন ভানুর দিকে তাকিয়ে থাকে তার মুখখানি বড়ো সুন্দর। যখন সে মাথার খোঁপা ভেঙে হাত ঘুরিয়ে বুক চিতিয়ে, বুকের আঁচল সরলে তা তুলে নিয়ে খোঁপা বাঁধে, তখন সে সুন্দর। যখন কোকিলা বসে থেকে থেকে একটু চঞ্চল হয়, সেই চঞ্চলতা ছড়িয়ে পড়ে সর্ব অঙ্গে, কী সুন্দর তা! ভানু যেন তৃষ্ণার্ত চোখে দ্যাখে মদরঞ্জিওয়ালার নিকোনো ভিটে। যতই হোক ভিটেতে এখন অন্ধকার। কোথায় আছে কদমতলি, অকালেও বুঝি কদমফুলের বাস আসছিল ধীরে ধীরে। ভানুর মনে পড়ছিল লেবার কোয়ার্টার, আর বিবি তো বিবি, বিবির কোলে খোকা। ভানু মিস্ত্রির বউ দেশি নয়, বিহার ভোজপুর জেলার মেয়ে। ভোজপুর জেলা হবে কেন, বজবজেই তার জন্ম। তার বাপ, মা ওই জেলার। রামবিলাস দাস হল শ্বশুর, বিবি হল ফুলরানি।

'ঘরে কে আছে?' মদরঞ্জিওয়ালি কোকিলা শুধায়।

ভানু মাথা নাড়তে নাড়তে বলে, 'লোকটাকে ডাকো, ঘুমাই পড়ল।'

'ও ওর অভ্যেস, হাটবাজার ফিরে ঘুমাই নেয়।'

'কেনে?'

'এরপর বুনতে বসা হবে।'

'রাত্তিরে?'

'হ্যাঁ রাত্তিরে।'

ভানু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে, 'রাত্তিরে বুনা হয়?'

'হয়, আলো নিয়ে বসি দুজনায়।'

'আলো তো ওই হ্যারিকেন।'

কোকিলা খিলখিল করে হাসে, 'আসল বুনা তো মনে মনে, চোখ বুজেও বুনা হয়, তুমার মদরঞ্জিওয়ালা তো বলে আমি নাকি স্বপনেও বুনি।'

কথাটা ঠিক ধরতে পারল না ভানু। আবার ধরতে পারলও। সন্ধ্যেয় সমুদ্রপাখি হোটেলে মাইতিবাবুর নিজের ঘরে শুকনো নেশা হয়। আজ সে নেশা নেই। তবু ভানুর মনে হচ্ছিল কথাটা যেন বহুক্ষণ ধরে শুনছে সে। কোকিলা নাকি স্বপ্নেও মদরঞ্জি বোনে। সে যেন কোকিলার সামনে এক অনন্ত সন্ধ্যায় বসে আছে। সে বিড়বিড় করে, 'দুজনায় বোনো?'

খিলখিল করে হাসে আবার কোকিলা বধূ, 'তবে কি একজনে ঘুমাবে, একজন জেগে থাকলে অন্য জন ঘুমাতে পারে?'

ভানু দীর্ঘশ্বাস ফেলল। সে তো এখানে, ওখানে গরমের দিনে সমুদ্রতীরে চিত হয়ে পড়ে থাকে। আকাশে তারা দেখতে দেখতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়ে। তারাগুলি জেগে থাকে, কিন্তু সে তো বেশ ঘুমায়। কেন ঘুমাবে না, আকাশের তারা তার কে? মিল বন্ধ। বন্ধ তো বন্ধ—তিনটে লোক মরল গলায় দড়ি দিয়ে। ভানুর শ্বশুর রামবিলাস বলল, 'ভোজপুর জিলা, গাঁও ফিরি।'

ভানুর শাশুড়ি বড়ো ঘোমটা টেনে বলল, 'ফুলরানি ভি চলুক, জামাই, কামকাজ হলে তার করে দিয়ো, হামি তুমার সংসার ফের পেতে দিয়ে যাব, লেড়কি আমার একটি, তারে রেখে আমি গাঁও ফিরতে পারব না।

ফুলরানি বলল, 'তুম ভি হামাদের গাঁও চলো, খেতি কাম করে চলবে।'

শ্বশুর বলল, 'তিন বিঘা জমিন আছে, ঠাকুর সাহাব আছে, তার জমিন লিয়ে ভাগচাষ করা চলবে, ই মুলুকে মিল ফ্যাকটিরি আর খুলবে না, ই মুলুকে জমিন নাই, মিল ভি নাই, কামকাজ বন্ধ, আদমি গলায় রশি বেঁধে ঝুলে পড়ছে, জামাই, মোর গাঁ চলো।'

গেল না ভানু। ভোজপুর জিলার ট্রেনে সবাইকে তুলে দিয়ে হাওড়া থেকে বাসে চেপে বসল। ছেলের হাতে ঝুমঝুমি কিনে দিয়ে বাসে চেপে বসল। ফুলরানির চোখের জল দেখে সমুদ্রের দিকে রওনা হল। সমুদ্র তার বড়ো প্রিয়। যখন বজবজের জুট মিল ছিল, হাতে হপ্তার টাকা ছিল, কত সমুদ্র সে দেখেছে! সাগরদ্বীপের সমুদ্র, বকখালির সমুদ্র। তখন বিয়ে হয়নি। টুরিস্টপার্টির সঙ্গে তাদের কাজের লোক হয়ে কত সমুদ্রে গেছে! পুরীর সমুদ্র, কোভালাম সমুদ্র, ওয়ালটেয়ারের সমুদ্র, চেন্নাই পর্যন্ত। সমুদ্র সে যত দ্যাখে তত ভরন্ত হয়ে ওঠে মনে। আজ দেখল নতুন সমুদ্র। কোন সমুদ্রে জল নাই? ভানু মনে মনে বলল, 'মীরগোদার সমুদ্দুরে।'

'কোন জাহাজঘাটায় জাহাজ নাই?'

'মীরগোদার জাহাজঘাটায়।' ভানু মনে মনে উচ্চারণ করে।

'বন্দর আছে জাহাজ নাই?'

'মীরগোদার সমুদ্দুরে!' বিড়বিড় করে বলল ভানু।

কোকিলা অবাক, 'কী বলছ গো?'

ভানু বলল, 'বজবজ থেকে খিদিরপুর কাছে, সেখেনে পোট মানে বন্দর, মানে জাহাজঘাটা, জাহাজ মাল খালাস করে গঙ্গায় দাঁড়িয়ে, সমুদ্দুর পার হওয়া জাহাজ, সেই ডক মানে পোট, মানে জাহাজঘাটার বাজারটা কত বড়ো, বিলিতি মাল এসে নামে, আবার বিলেতে জাহাজ যায়, এখান থেকে জাহাজ যায় তো?'

কোকিলা বলল, 'জাভা, সুমত্রা, বালিদ্বীপ।'

ভানু হাসতে লাগল, বলল, 'মদরঞ্জি যায় জাভা দ্বীপ, মাইতিবাবু বলেছিল, তুমার বুনা ওই মদরঞ্জির অশ্ব যেন মোদের সেই ঘোড়া, অবিকল তাই, কোনো তফাত নাই।'

কোকিলা অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ঘোড়াটি বুনা হইছিল পুরো শুক্লপক্ষ ধরে, শেষ হল পুন্নিমের জোছনায়।'

'জোছনায়!' চমকে ওঠে ভানু, গায়ের রোম যেন সিধে হয়ে ওঠে কাঁটা দেয় সর্ব অঙ্গে।

'হ্যাঁ তাই, বোশেখি পুন্নিমের রাতি শেষ হল, চাঁদের আলোয় বুনা হইছিল।'

ভানু অবাক হয়ে দ্যাখে মদরঞ্জিওয়ালার যুবতী বধূকে। কোকিলা বধূকে। তার চোখ দুটি আঁধার সমুদ্রে নিমেষহীন। দূরে যেন জাহাজি আলো কিংবা নৌকোর সংকেত। কোকিলা বধূর চোখ দুটি যেন ধ্রুবতারা। একটি নয় দুটি ধ্রুবতারা। সেই তারা জাহাজি মল্লার মনে। সেই তারা দেখে জাহাজঘাটা চিনে ফেলছে তারা অকূল আঁধারে। ভানু দেখছে বধূর যৌবনে যেন ভরা কোটালের টান। আগুন রাঙা ব্লাউজের ভিতরে পূর্ণিমার চাঁদের মতো ভরন্ত বুক দুটি নিশ্বাসে প্রশ্বাসে থই থই করছে। কোকিলার মুখখানি কী সুন্দর। তার ফুলরানি কি এমনই, এমন রূপ ছিল? আস্তে আস্তে ফুলরানির মুখখানি মনের ভিতর থেকে উধাও হয়ে যাচ্ছে। ফুলরানির বাবা, মা, ফুলরানির কোলের খোকা, সবই কেমন ধোঁয়া হয়ে যাচ্ছে। শূন্য। যেন কোনো রং নেই। যেমন লায়কানখাসে ঘোড়াটাকে দেখা গিয়েছিল, কিন্তু তার কোনো বন্ন ছিল না। ভানুর মনে তো রং আছে। সেই রং কি ফুলরানির মন থেকেও সরে যাচ্ছে? ভানু মাথা দোলাতে লাগল, 'কোনো বন্ন নেই, হাওয়া, হাওয়ার মতন।'

'কী বলো?' জিজ্ঞেস করে কোকিলা বধূ।

ভানু বলল, 'কী যেন শুনলাম, জোছনায় বুনা হয়েছিল?'

'হ্যাঁ, চাঁদের আলোয়, চাঁদ একটু একটু করে বড়ো হয় শুক্লপক্ষে, চাঁদের আলো বাড়ে, পুন্নিমেয় চাঁদ উঠতে লাগল, চাঁদের আলোয় হলুদ হলুদ রং, তখন মদরঞ্জির বুক বুনা হল, আমি বুনিনি, কে যেন বুনাল? ঘুড়ার চোখ, কেশর!'

ভানু বলল, 'কী আশ্চর্য, সেদিনই তো মোর কন্থক হারাল, ভগবানের জন্মদিন!'

কোকিলা বধূ বলল, 'দুজনায় ঠিক করেছিলাম পুন্নিমের জোছনায় বুনা শেষ হবে, দুফরে দুজনায় ঘুমায় আছি, মেঘ গুড়গুড় শোনা গেল।'

'কী আশ্চর্য, তাই তো!'

'আমি চোখ খুলতে দেখি জানালার ওপারে খর রোদ্দুর আর নেই, কী রোদ হয়েছিল গো! তুমার মদরঞ্জিওয়ালা ফিরল মাদুরকাঠি নে, তখন বেলা এগারোটা, রং মিলায়ে এনেছিল, আমি তখন ওই ঘোড়া আঁকি ওই উঠানে কদমতলের ছায়ায় বসে, শুনছ তুমি, ঘুড়ার গলা আঁকি, চোখ!'

'শুনছি, শুনছি।'

'আমি উঠানের ধুলায় আপনমনে একটা ঘুড়া আঁকি, ছুটছে ঘুড়া, সামনের দুই পা বাড়ায়ে ধরেছে যেন হুই জাহাজঘাটার দিকে, পিছনের দুই পা ভাঙছে, গলা তুলেছে, কেশর ফুলাচ্ছে সেই ঘুড়া।'

'সকালে আঁকলে তো?'

'হ্যাঁ, বেলা এগারোটা, বললাম তো।'

ভানু বলে, 'কেন আঁকলে ধুলায়?'

'তা তো জানিনে, একা বসে আছি, মনে হল আঁকি। কে যেন মোরে দিয়ে আঁকাল ঘুড়াটা, তা দেখে তুমার মদরঞ্জিওয়ালা বলল, ''ওই ঘুড়া মদরঞ্জিতে তুলা হচ্ছে, হলুদ জমিনে সাদা ঘুড়া,'' তা শুনে আমি বলি পুন্নিমে রাত, জোছনায় আঁকা শেষ হবে সমস্ত রাত্তির ধরে, তো দুফরে ছায়া হল, মেঘ হল, ঠান্ডা বাতাস দিল...'

ভানু শুনছে সব। মিলে যাচ্ছে। কী রোদ আর কী রোদ! বাতাসে শনশনে আগুনের শলাকা। বালি আগুন। তারপর! দুপুরে যে ছায়া ঘনাইল বনে বনে। ঝাউবনের মাথা কালো হয়ে গেল। মেঘ গুড়গুড় করতে লাগল। কোকিলা বধূ যা বলছে সব যে অক্ষরে অক্ষরে সত্যি। বোশেখি পুন্নিমের দুপুরের কথা ভালো মনে আছে তার। ওইদিন রাতেই

তো দড়ি ছিঁড়ে, খুঁটো উপড়ে পালাল কন্থক, রাজপুত্রের ঘোড়া। কোকিলা বলছে, মেঘের গুড়গুড় শুনতে শুনতে দুজনে আবার ঘুমোয়। সে আর গৌরমোহন। তারপর এল বৃষ্টি। বৃষ্টিতেও ঘুমের ঘোরে থাকে যেন দুজনে। বৃষ্টির ছাঁট জানালা দিয়ে ঢুকে পড়েছে ঘরে। তারপর! যখন ঘুম ভাঙল, বুঝল সবটাই যেন স্বপ্ন। গোধূলির আলোর রং হলুদ হয়ে গেছে গো। সে আলোকে নাকি বলে কনে দেখা আলো। আমি আর ওই লোক উঠোনে দাঁড়ালাম। বালিমাটি দেখে ধরাই যায় না বৃষ্টি হয়ে গেছে। শুকনো বালি সব জল শুষে নিয়েছে।

ভানু শুনছিল, তখন সেই কনে দেখা আলোয় বসে উঠোনে আবার ঘোড়া আঁকল কোকিলা। কী যে হয়েছিল তার, শুধু ঘোড়া এঁকে যাচ্ছিল। উঠোনে বসল তারা দুজনে। চাঁদ উঠতে লাগল। বুনতে লাগল মাদুর! আকাশ ঝকঝকে নীল। চাঁদের হলুদ আলোয় ধীরে ধীরে ফর্সা হয়ে উঠতে লাগল চারদিক, এই উঠোন ভরে গেল সাদা আলোয়।

শুনতে শুনতে ভানুর বুক ধকধক করছিল। সে খুঁটিয়ে দেখছিল কোকিলা বধূকে। এই তো হরণ করেছে রাজপুত্রের অশ্ব। নিশীথে কি এর ডাক শুনেছিল ঘোড়াটি? না হলে এমন মিলে যা কী করে? হ্যারিকেনের নরম আলোয় যুবতী বধূ তাকে নেশা ধরিয়ে দিচ্ছিল। প্রতিটি অঙ্গের রেখায় তার চোখ পড়ে যাচ্ছে। কী সুন্দর বসেছে বধূ। কোমরে ভাঁজ পড়েছে একটি। কোমরের নীচের অংশটি ভারী। ছড়িয়ে পড়েছে এমন ভাবে যেন বড়ো নাও–এর তলদেশ। জলে ভেসেছে নাওখানি। এ যদি ডাকে কে না এসে পারে?

ভানু আচমকা বলল, ‘তুমি কে বলো দেখি?’

ঘাড় ঘুরিয়েছে এমনভাবে সে যেন সাপিনি সাড়া পেয়েছে বিপদের, চোখ ঝিকিয়ে উঠেছে তার, বলল, ‘ওকথা কেনে?’

‘তুমি আসলে কে, পরিচয় কী?’

কোকিলা বলল, ‘এ কথার মানে কী?’

ভানু বলে ওঠে, ‘কুহকিনী, তুমিই তাহলে সে? হায় কন্থক, কুহকিনীর মায়ায় ছন্দককে ভুললে তুমি!’

‘কার কথা বলো?’

‘জাদু করে, কুহক করে, নিশির ডাকে, তুমিই ডেকেছিলে তারে?’

ঝট করে উঠে দাঁড়ায় কোকিলা, স্বামীকে ডাকে, ‘ওগো ওঠো, ওঠো।’

ভানু দেখল চোখ মেলেছে গৌরমোহন। তার দিকে চেয়ে হাসল, লজ্জিত মুখ, সন্ধ্যেবেলায় ঘুমানো অভ্যেস হয়ে গেছে।

কোকিলা বলে, ‘ঘরে অতিথি, তখন থেকে মানুষটা চুপ করে বসে আছে, আমি কত কথা বলব মেয়েমানুষ, ওঠো।’

তারপর? কোকিলা ভাত রাঁধল। ভাত দিল। সে–রাতে আর তারা বুনতে বসল না মাদুর। গৌরমোহনের সঙ্গে এটা–ওটা আলাপ হতে লাগল। ভানুর বিছানা পড়ল দাওয়ায়। ভানুর ঘুম হল না। ভানু টের পেয়েছে কেন পালিয়েছে কন্থক। সে বোধ হয় বন্দি হয়ে গেছে। সকালের আলো ফুটতে না ফুটতে সে ধাঁ। ফিরে এল দীঘায় দীর্ঘ পথ হেঁটে। শ্রীপতি মাইতিকে পথেই পেল। প্রায় দৌড়ে গেল ভানু, ‘বাবু কি বেরোলেন?’

মাইতি বলল, ‘অশ্বর খোঁজ পেলি?’

ভানু ঘাড় কাত করল, ‘পেরায়, ধরা যাচ্ছে কিছুটা।’

মাইতি ফিরল। মাইতিকে ফিরতে দেখে হোটেলের রাঁধুনি ঠাকুরের বউঠাকুরানি যেন পথ রোধ করে দাঁড়াল, ‘কী হল বাবু, ফিরে এলেন যে, যাবেন না?’

‘কোথায় যাব?’ শ্রীপতি মাইতির ভ্রূ কুঁচকে গেল।

‘যেখেনে যাচ্ছিলেন।’ ঠাকুরানি হাসল, ‘ওই মর্কটটা না মীরগোদা গিয়েছিল!’

ভানু বলল, ‘তাতে তুমার কী হে?’

ঠাকুরানির সাদা দাঁতগুলি দেখা গেল, বলল, 'ঘুড়া খুঁজার নামে শুধু চরকিবাজি আর বাবুর কাছ থেকে টাকা আদায়!'

লেগে যাচ্ছিল। ঠাকুর এসে পড়ায় রক্ষে। ধমকে দিল ঠাকুরানিকে, তোর কীরে, যা যা, তরকারিগুলো কোট, মিল বিশটা হবে, বাবু ইলিশ আনলে হত, দশটা ইলিশের খদ্দের আছে।'

কতদিন ভেবেছে শ্রীপতি সামনের এই টালির চাল, কিচেন কাম ডাইনিংটা ভেঙে দেবে। ঠাকুর ঠাকুরানিকেও বিদায় দেবে। কিন্তু হচ্ছে না। সময় কই? পক্ষীরাজ পালিয়ে তার সব পরিকল্পনা ভেস্তে দিয়েছে। ইলিশের কথা মানে ঠাকুরকে টাকা দাও। মিল বেচে লাভের মুখ দেখাই যায় না। বিশটা না তিরিশটা সে খোঁজ রাখবে কে? এখন যে পথে পথেই কাটছে তার। ঠাকুরের হাতে একটা একশো, একটা পঞ্চাশের নোট দিয়ে ঘরে এসে উঠল শ্রীপতি। তর সইছে না। কী খবর আনল ভানু? তাহলে সেই মাথা কামানো লোকের কথা সত্যি?

ভানু হাঁক মারল, 'ঠাকুরানি জল আনো দেখি, চা আনো।'

শ্রীপতি বলল, 'কী দেখলি ভানু, কোথায় পঙ্খিরাজ?'

ভানু বলল, 'মদরঞ্জিতে বেঁধে ফেলেছে তারে এক কুহকিনী, জাদুকরি, শুনুন বাবু, কোকিলা বধূর কথা শুনুন।'

কোকিলা বধূ, গৌরমোহনের মদরঞ্জি, শুক্লপক্ষ ধরে ঘোড়াটি মাদুরে বুনে তোলা, বৈশাখী পূর্ণিমার সকালে উঠোনে ধুলোর উপরে আঙুল দিয়ে টেনে টেনে ঘোড়াটিকে এঁকে ফেলা—সব শুনতে শুনতে শ্রীপতির মাথা ঝনঝন করতে লাগল। ভানু সব বানাচ্ছে, না সত্যি দেখে এসেছে কোকিলা বধূ, জাদুকরিকে? শুনতে শুনতে শ্রীপতি ডাকল ঠাকুরানিকে, 'কলকে সাজা,' ভানু মাথায় করে কী খবর এনেছে তার কন্থকের!

ভানু খুব খুশি, বুঝতে পারছে মাইতিবাবুর মনে ঢেউ উঠেছে। তার কথা বিশ্বাস করছে শ্রীপতি মাইতি। বিশ্বাস যখন করছে তখন আবার পলাতকের সন্ধানে যেতে পারবে সে। এখানে, এই সমুদ্রতীরে পৃথিবীর তিনটি দিক। দক্ষিণে জলের সাম্রাজ্য, দক্ষিণে যেতে হলে নৌকো লাগবে। শ্রীপতির কলকের প্রসাদ পেয়ে ভানু ভাবল দক্ষিণেই বা যাবে না কেন? কন্থক কি উড়ে যেতে পারে না? সেই জাভা, সুমাত্রা, বালিদ্বীপ! কী হয়েছে ধরা যাচ্ছে না। তার ঘোড়ার একটু বার–মুখো মন আছে। কিন্তু যতই বার–মুখো হোক, সে ফিরে তো আসে। এই ঘোড়ার পালানো অভ্যেস আছে। আবার ফিরে আসার অভ্যেসও তো আছে। ভানু এখেনে আছে বছর পাঁচ। আগের খবর সে জানে না, তবে ঘোড়ার পালানোর খবরও শোনেনি। ওই ঘোড়া প্রথম পালানো ভানুর হাত থেকেই। চন্দনেশ্বর থেকে চোদ্দোবেড়িয়া সুবর্ণরেখার চরে। যায় আবার ফিরেও আসে। আর যায় তো আশ্বিনে। সেবার পুজোর আগে ঘোড়াটাকে নিয়ে ভানু গিয়েছিল চন্দনেশ্বর মন্দিরে মাথা কামিয়ে চুল দিতে। বাবু শ্রীপতি মাইতি তখন দীঘায় ছিল না, গিয়েছিল বালিমুন্ডা, চাঁদবালি। ওদিকে শ্রীপতির কিছু সম্পত্তি আছে, মাতুল সম্পত্তি ও পেয়েছে একশো বিঘের মতো। কিছুটা সেই সম্পত্তির টানে, আর কিছুটা অন্য ধান্ধায় গিয়েছিল শ্রীপতি ওদিকে। বাবু নেই, ঘোড়া আছে। ভানু ঘোড়ায় চেপে গেল চন্দনেশ্বর। ফেরার সময় তাকে ফেলে ঘোড়া ছুটে গেল দক্ষিণ–পশ্চিমে। সেই তার প্রথম পালানো। খোঁজ খোঁজ খোঁজ। ভানু খুঁজতে খুঁজতে, গাঁয়ের মানুষকে জিজ্ঞেস করতে করতে তাকে পেয়েছিল চোদ্দোবেড়িয়ায়, সুবর্ণরেখা আর সমুদ্রের মোহনার কাছে এক মস্ত ঘাসের চরে। তাদের ঘোড়া একা ছিল না সেখানে। ছিল আরও কয়েকটি ঘোড়া। কিন্তু তাদের ধরবে কে? লাফ দিচ্ছে সবুজ ঘাসে, আনন্দে চিঁহি চিঁহি ডেকে উঠেছে নীল আকাশে, পালক মেঘের দিকে তাকিয়ে, সমুদ্রের দিকে গলা বাড়িয়ে। ধরা তো যায়নি। এক মাদি ঘোড়ার নেশায় পড়েছিল কন্থক। মাদি ঘোড়া যার, সেই লোকও হাজির। গিরিমশায় চন্দনেশ্বর, হিনাড়ির লোক। তাকে ভানু ধরেছিল, 'এটা কি ঠিক হচ্ছে বাবু, ফিরিতে পেটে বাচ্চা লিয়ে চলে যাবে আপনের ঘুড়ি, এসব এমনি এমনি হয়? এ ঘোড়ার জাত জানেন, রাজপুত্র গৌতমকে বিসজ্জন দিয়ে শূন্যপৃষ্ঠে এই ঘোড়া আমাকে নিয়ে কপিলাবস্তু ফিরেছিল, মনে পড়ে বাবু? আমি ছন্দক সাথি। কিছু ছাড়ুন, নাহলে আমি আমার বাবুরে দি কেস করাব, ফোকটে পাল খাওয়াবেন, অমন একখান তেজি ঘোড়া পেটে ধরবে আপনের ঘুড়ি!'

একটা নয়, তিনটে ঘুড়ির সঙ্গে ফুর্তি করে ফিরে এসেছিল মাইতিবাবুর পক্ষীরাজ। তিনটে ঘুড়ির পেটে বীজ দিয়ে ক্লান্তও হয়েছিল যেন। আর ভানু তিন ঘুড়ির মালিকের কাছ থেকে পঞ্চাশ করে দেড়শো টাকা নিয়ে আবার ঘোড়ার পিঠে চেপেই পাঁচ দিন বাদে ফিরল দীঘা। দেড়শো টাকা ছাড়াও ঘুড়ির মালিকরা তাকে ওই ক–দিন পেট পুরে খাইয়েছিল। গিরিমশায় খুব আদর করেছিলেন। অন্যদের বাড়ি অনেক দূর।

কিন্তু কপাল ওই একবারই খুলেছিল। পরের বছর আবার যখন আশ্বিনে ঘোড়া ছুটল চোদ্দোবেড়িয়া, আরও ঘোড়া ছিল সেখানে, মাদি, মদ্দা, কিন্তু তাদের মালিকরা ছিল না। ভানু গাঁয়ে খোঁজ করল কাদের মাদি? খোঁজ না পেয়ে আবার যখন চোদ্দোবেড়িয়া ফিরল, তার ঘোড়া নিজের মনেই রওনা দিয়ে দিয়েছে দীঘার উদ্দেশে। একাই ফিরে এল। এবার ঘোড়া চোদ্দোবেড়িয়া যায়নি।

শ্রীপতি বলল, 'তা'লে বলছিস জাদুকরির পাল্লায় পড়েছে?'

'হ্যাঁ বাবু, কী তার যৌবন, দেখলে মাথা ঘুরে যাবে, সে হল জাদুকরি, কুহকিনী, কী না পারে, মানুষকে ঘোড়া বানাতে পারে, আবার ঘোড়াকে মানুষ।'

'ঘোড়া মানুষ হয়ে যায়?'

'হ্যাঁ বাবু, সে হল লাল জাদুকরি, অন্ধকারে লাল বেলাউজ, পক্ক বিল্বফলের মতো বক্ষদেশ, কী জানি বুঝতে পারলাম না ওই গৌরমোহনই মোদের ঘোড়াটি কি না।'

খ্যা খ্যা করে হেসে উঠল শ্রীপতি মাইতি, 'মদরঞ্জিওয়ালা?'

ভানু কলকের প্রসাদ নিয়ে জোরসে টান দিয়ে মাথাটি ঝাঁকিয়ে নিল, কলকবজাগুলো নাড়িয়ে চাড়িয়ে সেট করে নিল, বলল, 'হাসির কথা না, অনুমান মাত্র, তবে না হওয়ার পনেরো আনা সম্ভাবনা, কিন্তু এটা পরিষ্কার যে এই জাদুকরির জাদুতে রাজপুত্রের জন্মদিনে মোদের ঘর ছেড়ে বেরোল।'

শ্রীপতি বলল, 'খুঁজে বের করতেই হবে ঘোড়াটাকে।'

ভানু বলল, 'হ্যাঁ, মোর সমস্ত জীবন যদি চলে যায়, খুঁজে বেড়াব, কিন্তু কুহকিনীর কী হবে? একটা মদরঞ্জি কিনলে পারেন, ঘোড়া তার ভিতরে বন্দি হয়ে আছে বাবু, ঠিক যেন বন্দি অশ্ব, অশ্ব যে বন্দি হয় কে জানত?'

শ্রীপতি বলল, 'ওটা কি অনুমান?'

'হ্যাঁ বাবু অনুমান মাত্র, এক আনা হলেও সত্যি হতে পারে মোর কথা, তবে আমি খুঁজে বেড়াব সেটাও ঠিক, এবার বরং পুব দিকটা দেখে আসি, হিজলি মসলন্দি, রসুলপুরের দিকটা দেখা দরকার, কী বলেন?'

'কপালকুণ্ডলা! কপালকুণ্ডলা! হায় কপালকুণ্ডলে!' দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল শ্রীপতির আর্তনাদে, বিড়বিড় করে, 'ওদিকে নবকুমার হারিয়েছিল কাষ্ঠ আহরণে গিয়ে, কপালকুণ্ডলা তো কোনো মা–বাপের হারানো কন্যা, রসুলপুরের নদী, গঙ্গাসাগর মেলার আর কতদিন?'

ভানু অবাক! থই পাচ্ছে না শ্রীপতির কথায়। সাগর মেলায় যদি খুঁজতে হয় ঘোড়া তবে সে যাবে শ্রীপতির অত কষ্ট করার দরকার নেই। ঘরে বসে ঘোড়া পেয়ে গেলেই তো হল। হিজলি, মসলন্দি, রসুলপুর দেখে সে আরও পুবে চলে যাবে, নন্দীগ্রাম, চণ্ডীপুর হয়ে নরঘাট ব্রিজ পার হয়ে নন্দকুমার, তারপর তমলুক, মেচেদা, উলুবেড়ে। গঙ্গা পার হয়ে বজবজ, ফ্রি ইন্ডিয়া জুট মিল। সব দেখে আসবে। বাবু যদি বলে হাওড়া ইস্টিশন থেকে ট্রেনে চেপে ভোজপুর চলে যাবে।

এক মুহূর্ত আগে হাসছিল শ্রীপতি। এখন গুম মেরে আছে। সে ভানুর কথা শুনছিল না। তার মনখারাপ হয়ে গেছে হঠাৎ। কথা যদি সত্যি হয়ে থাকে, কুহকিনীর মায়ায় বন্দি হয়ে গিয়ে থাকে? কুহকিনী যদি তাকে মানুষ করে পোষে? কতকালের সম্পর্ক তার ঘোড়ার সঙ্গে। সে কেন, তার পিতৃপিতামহের সম্পর্ক ছিল এই পক্ষীরাজের পিতৃপিতামহের সঙ্গে। সব ছিল মাইতি বাড়িতে বাঁধা। এই ঘোড়ার মা ঘুড়িটা ছিল বড়ো তেজোময়ী, মনে আছে শ্রীপতির। একে পেটে ধরেছে তার মা। শ্রীপতির তখন বয়স কম। গর্ভিনীর উপর সওয়ার হয়ে সে এসেছে সমুদ্রের দিকে। অর্থাৎ জন্মাবার আগে থেকেই শ্রীপতিকে পিঠে চাপিয়ে ঘুরিয়েছে তার পক্ষীরাজ।

ঘোড়াটা এই সমুদ্রপাখি হোটেলের একটা বাড়তি সৌন্দর্য, এ কথা অস্বীকার করবে কে? টুরিস্টরা অবাক হয়ে দ্যাখে হোটেলের গায়ে ঘাস জমিতে জ্যোৎস্নায়, অন্ধকারে থম মেরে দাঁড়িয়ে আছে একটি ঘোড়া।

ভানু প্রায়ই ওকে রাজপুত্রের ঘোড়ার মতো সাজিয়ে নিজে মাথায় পাগড়ি বেঁধে মোচ পাকিয়ে লাগাম ধরে টানতে টানতে নিয়ে যেত সি–বিচে। সমুদ্রের তীরে তখন কত মানুষ। রংবেরঙের মানুষকে ডাকে ভানু, কান্থা কন্থক, রাজপুত্রের ঘোড়া পঙ্খিরাজ, পাঁচ রুপাইয়া, পাঁচ টঙ্কা!'

রাজা বাদশার বাচ্চারা ঘোড়ার উপর চেপে বসত। ভানু জলের কাছাকাছি দিয়ে ওকে টেনে নিয়ে যেত খুব মন্থর গতিতে। ঘোড়টা টুরিস্টদের মতোই অলস পায়ে অপরাহ্ন শেষের দিকে এগিয়ে যেত। হয় পশ্চিমে, নয় পুবে হাঁটতে হাঁটতে অন্ধকার নামাত।

ঠিক হারিয়ে যাওয়ার আগে ওর পিঠে রাজা বাদশার বাচ্চারা চাপেনি। শ্রীপতিই ওকে ব্যবহার করেছে নিজে। সেদিন ভোর থেকেই অশ্বারোহী শ্রীপতি মাইতি ইচ্ছেমতো চলাফেরা করেছে। ভোরে গেছে পুবদিকে ইলিশের আড়তে, সেই মোহনায়। সেখান থেকে ফিরে গেছে সাঁতরাপুর। সাঁতরাপুরে শ্রীপতির বাড়ি। অনেক কালের বাস।

বউ ছেলেমেয়ে, মা আর একটি ছোটো ভাই সেখানে থাকে। শ্রীপতি যখন সাঁতরাপুর থেকে বেরোয় তখন সূর্য ঠিক মাথায় মাথায়। রোদে মানুষ আর জন্তু উভয়েরই কষ্ট। বালির রাস্তা। বালিয়াড়ি ঝাউবন পেরিয়ে পক্ষীরাজ আস্তে আস্তে এগোয়। হাঁটতে হাঁটতে ওর রোগা রোগা হাড় জিরজিরে চারখানি পা বেঁকে যাচ্ছিল। এরই ভিতর মাঝেমধ্যে গা ঝাড়া দিয়ে উঠছিল জীবটা, মানুষের ভার বইতে পারছে না স্পষ্ট। রোদ্দুরে শ্রীপতিরও কষ্ট হচ্ছিল। মিশকালো দেহ, টকটকে লাল ফুলো ফুলো চোখ আগুনে বালি আর বাতাসে নিভে আসছিল যেন। তার দুই হাঁটু ঘোড়াটার পাঁজরের হাড়ের ছোঁয়া পাচ্ছিল। শ্রীপতি বুঝতে পারছে ঘোড়াটা রোগা, দুবলা হয়ে গেছে। কী জানি তা নয় হয়তো। জানোয়ারটাই বেগড়বাই করছে বোধ হয়। শ্রীপতি তখন গোড়ালি দিয়ে গোত্তা মারে। ঘোড়সওয়ারের হঠাৎ বুঝি ভয় হয়, মুখ থুবড়ে পড়বে না তো পক্ষীরাজ!

হোটেলে পৌঁছে ঘোড়া থেকে নামতেই ভানু বলল, 'বাবু, মাথায় একটা ছাতা দিয়ে এলে ভালো করতেন। কী রোদ্দুর কী রোদ্দুর! নিদেনপক্ষে পাগড়িও বাঁধতে পারতেন মাথায়।'

ভানু আবার বলেছিল, 'ছাতা থাকলে ঘোড়া একটুকুন ছায়া পেত।'

বলতে বলতে ভানু ঘোড়াটাকে ছায়ায় দাঁড় করিয়ে রাখে। শ্রীপতি তারপর রেজিস্টার দেখে টুরিস্টদের সুযোগসুবিধের ব্যবস্থা করতে যায় ভারতী চৌধুরির কোয়ার্টারের দিকে। হসপিটালের ডিউটি নিশ্চয় এতক্ষণে শেষ হয়েছে। দুপুরে ওখেনে খেয়ে ওখেনেই কাটাবে। ভারতী তার জন্য অপেক্ষা করছে ঠিক। ঘোড়া দাঁড়িয়ে রয়েছে ছায়ায়। বাতাসে আগুন ছুটছে।

তারপর সেই দুপুরে অন্ধকার ঘরে শুয়ে সে আর ভারতী শোনে প্রবল মেঘের কড়কড়ানি। মেঘের ছায়ায় সব অন্ধকার হয়ে এসেছে। এত মেঘ ছিল কোথায়? এল কখন, কোন পথে?

বৃষ্টির ভিতরে কখন যে ঘুমিয়েছে খেয়াল নেই। ঘুম ভাঙতে ঘড়িতে দেখে পাঁচটা। বৃষ্টি নেই। চাদ্দিকটা কেমন ঠান্ডা হয়েছে। সে ভারতীর ওখান থেকে বেরিয়ে হোটেলে ফিরে দেখে নিথর হয়ে ঘোড়াটা দাঁড়িয়ে আছে। হয় ওটি কোনো মূর্তি নতুবা ছবি। ওর মাথায় যে আকাশ তাতে আর মেঘের চিহ্ন নেই।

পরদিন ভোরে আর দ্যাখেনি পক্ষীরাজকে। খুঁটো উপড়ে চলে গেছে। কেউ নিয়ে গেল নাকি? তা তো নয়। তাহলে ওর চিঁহি চিঁহি চিতকার শোনা যেত। আর রাত এগারোটাতেও তো ওকে দেখেছে তার দু-নম্বর রুমের টুরিস্ট বুড়োটা। সেই যে উধাও হল, আর পাত্তা নেই। শ্রীপতি ভেবে পায় না গেল কোথায়। এটা তো আশ্বিন নয়, তবে!

'বাবু আছেন নাকি, মাইতিবাবু, সায়েব এয়েচে।' ডাক শুনল শ্রীপতি। বহুক্ষণ ধরে কে যেন ডেকে যাচ্ছে, বাইরে। ঘাড় ঘুরিয়ে সে দেখল দরজায় অনন্ত সার। তার পিছনে সোনালি চুল, খাটো ধুতি, পাঞ্জাবি পরা, নগ্নপদ সাহেব ফ্রেদরিক।

ভানু উঠে দাঁড়িয়েছে। 'গুড মর্নিং সায়েব, গুড মর্নিং, বাবু হেয়ার, কাম ইন।'

অনন্ত সারের সঙ্গে ফরাসি সাহেব ফ্রেদরিক ঢুকে এল। সাহেবকে যত দ্যাখে মুগ্ধ হয় শ্রীপতি। লাল টুকটুকে আপেলের মতো গায়ের রং, নীলকান্তমণির মতো চোখ দুটি, ঘাড় ছোঁয়া সোনালি চুল, ছবিতে দেখে যিশু খ্রিস্ট যেন বা। ভানু বলে, 'কেষ্ট ঠাকুর।' কিন্তু কেষ্ট ঠাকুরের গায়ের রং তো কৃষ্ণবর্ণ। এ তো সাহেব কেষ্ট। ফরাসি হিপি। উদভ্রান্ত ফরাসি যুবক। দলবল ওকে ফেলে বেনারস চলে গেছে। সাহেবের বড়ো ভালো লেগে গেছে এই সৈকত নগরী। শ্রীপতির সঙ্গে তার খুব বন্ধুতা। সাহেব বসেছে খাটের কোণে, অনন্ত দাঁড়িয়ে।

অনন্ত জিজ্ঞেস করে, 'বাবু অশ্ব মিলল?'

'না, তবে মিলে যাবে।' বলল ভানু।

অনন্ত বলল, 'বাবু আমি খুঁজে দেখি।'

'হাঁ হাঁ, খুঁজে নিয়ে আয়।' শ্রীপতি হাসে।

সাহেব একবার শ্রীপতি, একবার ভানু আর অনন্তর মুখের দিকে তাকাচ্ছে। ঠিক ধরতে পারছে না কী বলছে তিনজনে। শ্রীপতি সায়েবের দিকে চেয়ে হাসে, 'মাই লস্ট হর্স, অ্যাম ভেরি ম্যাচ সরি সায়েব, মাই পেট হর্স, দ্যাট পক্ষীরাজ!'

সায়েব হাসল, 'ওহহো, দ্যাট হর্স, সিপটি, আর প্রে ফর দ্যাট, য়্যু উইল গেট দ্যাট, সিপটি গানজা হায়?'

ভানু বলল, 'হায় হায়, গানজা হায়, টেক সায়েব।

অনন্ত ডাকল, 'বাবু আমি চোদ্দোবেড়িয়া ঘুরে আসব?'

'ওখেনে নেই,' ভানু বলল, 'খোঁজা হয়েছে।'

'তবে অন্যদিকে যাই।'

'যা, ঘোড়াটা আনলে পাঁচশো টাকা পুরস্কার।' বলল শ্রীপতি।

'এখন, রাহা খরচা তো চাই বাবু।'

ভানু টের পায় ঘোড়া খোঁজার ছুতোয় অনন্ত টাকা হাতাতে এসেছে। কিন্তু সে কিছু বলল না। টাকা যদি দু–দশটা পায় তার কী? ঠিক সময়েই এসেছে অনন্ত। ভানু তাকে ইঙ্গিত করে, 'বসে পড়।'

শ্রীপতি বলল, 'রাহা খরচ, যাবি কোথায়?'

'যেদিকে বলেন।'

'আগে খোঁজ নে, কোন দিকে আছে সে।'

ভানু হি–হি করে হাসে, 'না বাবু, আগে খোঁজ নিক কোথায় কোথায় নেই।'

'তার মানে?' শ্রীপতি অবাক।

ভানু বলে, 'যেখেনে যেখেনে নেই জানা যাবে, সেখেনে সেখেনে আর যেতি হবে না, কতদিন ঘুরবে বলুন লোকে।'

'ইয়েস ইয়েস।' ফ্রেদরিক সায়েব কী বোঝে ধরা যায় না, শ্রীপতির হাত থেকে কলকে নিয়ে জোর টান মেরে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলে, 'রাইট ভানু, নাইস!'

ভানু বলে, 'তবে আগে খোঁজ নিয়ে আয় কোথায় কোথায় নেই।'

অনন্তর মুখখানি অন্ধকার হয়ে গেছে। ঠিক ধরতে পারছে না ভানু তার পক্ষে না বিপক্ষে। যেখানে যেখানে নেই, সেইসব জায়গায় না গেলে খোঁজ পাবে কী করে সেখানে নেই। আর খোঁজ নিতে গেলে রাহা খরচ কি দেবে শ্রীপতি বাবু?

শ্রীপতি বলে, 'যা, বিশ টাকা নিয়ে যা ঠাকুরানির কাছ থেকে।'

দরজায় পাটোয়ারি ঠাকুরানি, কালো কালো মোটাসোটা, ঠিক যেন বড়ো বাড়ির বিড়ালটার মতো। খেয়েদেয়ে মোটা হয়েছে, মুখের কোণে দুধের চিহ্ন, খ্যা খ্যা করে ওঠে, 'ট্যাকা নাই, দেবেন তো আপনি দেন, ঘুড়ার ঠিক নাই, ট্যাকা যাচ্ছে, ওই ট্যাকায় ঘুড়া কিনা হয়ে যাবে।'

শ্রীপতি চুপসে যায়, ভানুকে বলল, 'তুই দিয়ে দে।'

'আমি কোথায় পাব?'

'দে আমি পরে দিচ্ছি।'

ভানুর কী মনে হল, পকেট থেকে বের করে পঞ্চাশ টাকাটিই দিয়ে দিল অনন্তকে, 'যা ভাগ তো, বাবু পঞ্চাশ দিলাম।'

'যা দিয়েছিস বেশ করেছিস, যা খোঁজ নিয়ে আয় কোথায় কোথায় নেই, আর কোথায় কোথায় আছে।'

অনন্তর মুখখানি হাসিতে ভরে উঠল। টাকা নিয়ে আর দাঁড়ায় না সে। তা দেখে ঠাকুরানি খুব রেগে গেছে। গজগজ করতে করতে বারান্দায় আর এক ধারে চলে গিয়ে চিতকার করল, 'রাজার ধনও ফুরায়ে যায় ইভাবে, আমরা ইখেনে থাকবনি, না কিছুতেই না, কবে থেকে বলছি বেতন বাড়াও...'

ভানু গুম মেরে গেছে। কী হল ধরা যাচ্ছে না। যে টাকা নিয়ে সে মীরগোদায় গিয়ে কুহকিনী দেখে এল, খোঁজ নিয়ে এল বন্দি ঘোড়ার, সেই টাকা নিয়ে চলে গেল অনন্ত। যাক, এসব পরে হবে। সে সাহেবের দিকে তাকিয়ে বলল, 'হেলো সায়েব; ইউ আর মাই ফেরেন্ড, ফেরেন্ড তো, হর্স লস্ট, তুমি সাক্ষী, আমি দিলাম পঞ্চাশ রুপিয়া, আই গেভ সায়েব, আই গেভ! তুমি সাক্ষী, সায়েব কুহকিনী বোঝো, জাদুকরি, ম্যাজিক গাল, ইয়াং গাল!'

ফ্রেদরিক মাস তিনেক আগে দীঘায় এসে আরও পাঁচজন হরি প্রেমিককে নিয়ে সমুদ্রপাখি হোটেলে উঠেছিল। সঙ্গে দুই যুবতী মেমও ছিল। তারপর দিন পনেরো বাদে তারা চলে গেছে ভারত তীর্থে। বেনারস কেদারবদরী গঙ্গোত্রী যমুনোত্রী সব দেখবে। শেষে পুরী হয়ে ফিরে আসবে এখানে। ফ্রেদরিক যায়নি। মাস খানেক শ্রীপতির হোটেলে ছিল, শেষে পয়সাকড়িতে টান পড়ায় জেলেপাড়ায় গিয়ে উঠেছে। ওখানে থাকে। কখনো গেরুয়া, কখনো সাদা, কখনো বা এক্কেবারে প্যান্ট পরে ঘুরে বেড়ায় এদিক–সেদিক। আর ইচ্ছে হলে কৃষ্ণ নাম করে। আর একটা গুণ আছে সাহেবের। কথায় কথায় বাজি ধরে। সায়েব যে পক্ষে বাজি ধরে, সেই পক্ষেই তার বাজি মিলে যায়। এই হোটেলে যখন ছিল সাহেবের সঙ্গে বাজি ধরে কতবার যে হেরেছে শ্রীপতি।

দূর ফরাসি দেশের এক গ্রাম থেকে যে যুবকটি কৃষ্ণ নাম করতে এদেশে এসেছে, তাকে দেখে শ্রীপতির এখন বিস্ময় লাগে না। এটা ফ্রেদরিকের দ্বিতীয় বার দীঘায় আসা। আর কোথায় কোথায় ঘুরেছে তা সে জানে না। জানে ফ্রেদরিকের কাছে কাঁচাটাকা আছে, তার লোভে ওর পিছনে পিছনে এখানের অনেকে ঘোরে!

শ্রীপতি নেশায় চুর চুর হয়ে জিজ্ঞেস করে, ‘হ্যালো ফ্রেদরিক, হাউ ডু ইউ ডু?’

‘গুড গুড, টুমিহ কিমন আছে?’

বাংলাটা অল্প অল্প শিখেছে সাহেব, জেলেপট্টিতে ওই আধো আধো বাংলা দিয়ে কাজ চালায়। শ্রীপতি বোঝে ফ্রেদরিক এখন শুকনো নেশায় আছে।

‘সিপটি, দিজ সি, লর্ড কৃষ্ণ কালার, ভাস্টনেস ইজ লর্ড কৃষ্ণা। হরে কৃষ্ণা হরে কৃষ্ণা সিপটি টুমি কী সার্চ করছে?’

‘মাই হর্স, দ্যাট হোয়াইট হর্স লস্ট।’

সায়েব হো–হো করে হেসে ওঠে, ‘ওহ আই হ্যাভ সিন দ্যাট।’

শ্রীপতি ব্যগ্র হয়ে জিজ্ঞেস করে, ‘কোথায়?’

‘ইন দিজ ওয়ালর্ড, এই পিঠিবীটে।’ সাহেব বুঁদ হয়ে বলে, ‘ইন ইয়োর হোটেল।’

শ্রীপতি বিড়বিড় করে, ‘সায়েব, দ্যাট হর্স হ্যাজ বিন টেকন বাই এ কুহকিনী, সায়েব, কুহকিনী বোঝো, এ লেডি।

সায়েব খুব কষ্ট করে উচ্চারণ করে, ‘কু–কু–হা—’

‘কুহা না, কুহ—কুহকিনী।’ ভানু বলে ওঠে।

‘কুহাকিনে, মিনস্?’

ভানু বলল, ‘মেয়েমানুষ, মেয়েমানুষ বোঝো তো সায়েব?’

শ্রীপতি বিরক্ত হল, ‘চুপ করবি, যা তো এখন।’

ভানু আর বসতে চাইছিল না মনে মনে। মাথার ভিতরে অনন্ত সমুদ্র ঢুকে যাচ্ছে যেন। কতদূর সমুদ্র? কত সময় ধরে ঢেউ ভাঙছে। ভাঙছে তো ভাঙছে। সে উঠে পড়ল। এখন ঝাউবনের ছায়ায় বসে সমুদ্র দেখবে। সমুদ্রতীরে বসে কন্থকের কথা ভাববে। কবে যে কে তাকে বলেছিল রাজপুত্র গৌতমের ঘোড়া আর সারথি ছন্দকের কথা, ভুলে গেছে, কিন্তু কথাটি গেঁথে আছে মনে। কন্থকের পালক সে ছন্দক। আহা সমুদ্রতীরে বসে সে কোকিলা বধূর মুখখানি মনে করার চেষ্টা করবে। কোকিলা বধূর মুখখানি দেখে ফুলরানির কথা মনে পড়ছে তার। ফুলরানির মুখখানি কেমন? সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে থাকলে তাও যেন ফিরে আসবে মনে!

ভানু চলে যেতে সাহেবও নিশ্চিন্ত হল, বলল, ‘হোয়াট ডু য়্যু মিন বাই দ্যাট কুহাকইনে কুহাক–ক–ইন্–এ?’

শ্রীপতি বলে, ‘কুহকিনী, এ লেডি সায়েব, ম্যাজিসিয়ান লেডি, ম্যাজিক করে, নিশির ডাক বোঝো সায়েব?’

সায়েব আন্দাজ করেছে, বলল, 'লেডি ম্যাজিসিয়ান, কুহাকই–ন্–নে।'

'জাদু করে নিয়ে গেছে সায়েব, ম্যাজিক করেছে।'

'ব্ল্যাক ম্যাজিক।'

'ইয়েস সায়েব।'

'কুহাক–ক–ইন্–নে ইজ আ উইচ? ওল্ড লেডি, আগলি অ্যান্ড ওল্ড?'

'নো সায়েব ইয়াং অ্যান্ড বিউটিফুল।'

'উইচ, ইয়াং লেডি উইচ?'

'উইচ কিনা বলি কী করে সায়েব, তবে ইয়াং অ্যান্ড বিউটিফুল লেডি, ভানু টোলড দ্যাট, ভানু স্পোক উইথ দ্য জাদুকরি, কুহকিনী।'

সায়েব বলল, 'দ্যাটস হোয়াই, আই লাভ দিস কানট্রি, ব্ল্যাক ম্যাজিকের দেশ হচ্ছে ইন্ডিয়া, আই ওয়ান্ট টু সি কুহাক কিন–এ, দ্যাট লেডি উইথ আ ম্যাজিক ওয়ান্ড, ওহ্ নাইস, উইচ–এর সাথে হামি ডেটিং করেগা?'

শ্রীপতি বলে, 'করো সায়েব, তবে বেশিরভাগ মেয়েমানুষ কুহকিনীই হয়, কী বলো?'

'ইয়েস দ্যাটস রাইট।'

'দ্যাট লেডি কলড মাই হর্স অ্যাট দ্যাট ফুল মুন নাইট, রাত্তিরে ডেকে নিয়ে গিয়ে বন্দি করে ফেলেছে সায়েব, হি হ্যাজ বিন পজেসড বাই কুহকিনী, সায়েব তুমি কপালকুণ্ডলা জানো?'

সায়েব বলল, 'জানিব সিপটি।'

'সায়েব তোমার মেয়েমানুষ ভালো লাগে, ডু য়্যু লাইক ওম্যান?'

সায়েব বিড়বিড় করছে, 'হরে কৃষ্ণা, হরে কৃষ্ণা!'

তারপরেই সায়েব হঠাৎ বলে, 'টুমার সহিট ডরকার আছে, টুমি সি–সাইড যাব?'

'কেন এখেনে হবে না?'

'হবে, হিয়ার সিপটি, হামাকে অ্যাডভাইস ডিবে টুমি।'

মানে পরামর্শ। কীসের পরামর্শ? আবার পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করবে নাকি? তার হোটেলে যখন সাহেব থাকত তখন রাস্তায় একবার থানার বড়োবাবু ওকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করেছিল, বাড়ি কোন দেশে, কী করা হয়, কতদিন থাকবে, কেন থাকবে। হাই কমিশন জানে কি না, ফরেনার বলে কথা। সব প্রশ্নেই ফ্রেদরিক ফুহ ফুহ করে নির্লিপ্ত থেকেছে। শেষে বলেছে ইন্ডিয়া ওর দেশ। লর্ড কৃষ্ণার দেশ।

'হেই সিপটি, আই ফেল ইন লভ। পরেম।'

শ্রীপতি চমকে উঠে, বলে কী! দেশে তো ওর অবিবাহিত জার্মান ওয়াইফ আছে। তিনটে বাচ্চা নিয়ে কানট্রিসাইডে টিচারি করে।

'ডু য়্যু নো দ্যাট ফিশারম্যান বেঙা, আই লিভ ইন বেঙাজ কটেজ।'

শ্রীপতি ঘাড় হেলায়, জানে।

সাহেব একটু চুপ করে বলে, 'ডু য়্যু নো বেঙাজ ওয়াইফ?'

খেয়াল করেনি শ্রীপতি কে বেঙা জেলের বউ।

সাহেব বিড়বিড় করে বলে, 'শি ইজ মাই লাভার, প্রেম–ই–কা!' বলে নিজের মনে হাসতে থাকে, 'বেঙা রাত্তিরে ফিশিং–এ যাবে, ওনেক ডুর, ইন দ্য ডিপ সি, হিজ ওয়াইফ কামস টু মাই রুম!'

বেঙা সমুদ্রে যায় মাছ ধরতে। সে সরকারের লঞ্চে কাজ করে। রাতে ওই সময় তার বউ সাহেবের ঘরে ঢোকে। সাহেব বেঙার হাতে টাকা গুঁজে দিয়েছে, পেয়িং গেস্ট হয়ে আছে তো! অনেক টাকা!

শ্রীপতি বলে, 'কুহকিনীর ফাঁদে পড়লে সায়েব, এবার বুঝছ কুহকিনী কারে বলে?'

ফ্রেদরিক হাসে, 'কুহাককিন–এ বাট শি ইজ বিউটিফুল সিপটি, নাইস ওম্যান, আই লাভ হার, ইফ য়্যু সি হার, য়্যু ক্যান ফিল হার বিউটি।'

শ্রীপতি বলল, 'য়্যু আর ইন ট্র্যাপ সায়েব। য়্যু হ্যাভ বিন ট্র্যাপড।'

'ট্র্যাপড! নো সিপটী, য়্যু সি হার, শি ইজ মাই রাঢিকা, আই ওয়ান্ট আ ফ্লুট, শি টোলড মি টু ব্রিং আ বনশি।'

হা–হা করে হাসে শ্রীপতি, 'বংশী, বংশী কোথায় পাবে? আমি মীরাগোদা যাব, টু সি দ্যাট কুহকিনী, জাদুকরি। চলো সায়েব সি–সাইড যাই, আই অ্যাম ইন ডিপ সরো সায়েব, কষ্টে আছি সায়েব।'

সাহেব আর শ্রীপতি বেরোয়। ঈষৎ স্খলিত চরণ। আকাশে পাতলা মেঘ। বেশ ছায়া হয়েছে চারদিকে। শ্রীপতির মনে হচ্ছে তাকে মীরগোদা গিয়ে খোঁজ নিতে হবে ঘটনাটা সত্যি কি না। নাকি ভানু শুকনো নেশা করে সমস্ত রাত জাহাজঘাটায় শুয়ে স্বপ্ন দেখেছে।

দুজনে ছায়ার পৃথিবী ধরে সমুদ্রতীরে নেমে এল ঝাউবনের ভিতর দিয়ে। এখন ভাঁটার সময়। জল বহুদূরে সরে গেছে। জলের উপর মেঘের ছায়ায় জল হয়ে উঠেছে ধূসর। ফ্রেদরিক জলের দিকে চেয়ে হাতজোড় করে কৃষ্ণ নাম জপছে, 'হরে কিরিষনা, হরে কিরিষনা, হেই সিপটি প্রে হিয়ার, য়্যু উইল গেট ইয়োর হর্স ব্যাক, হরে কিরিষনা হরে কিরিষনা।'

শ্রীপতি হাসে, 'সামোয়ান থেপট মাই হর্স, দ্যাট কুহকিনী জাদুকরি, সাহেব, বেঙার বউ তোমাকে কুহক করেছে না তুমি তারে করেছ?'

সাহেব শ্রীপতির কথার শেষ দিকটার মর্মার্থ ধরতে পারে না। সে তাকিয়েছিল পুবের দিকে। ওই দিকে জেলে বস্তি, আবার ওই দিক থেকেই আসছে যে মানুষটি তাকে ভালো চেনে সাহেব। ওই যে বেঙা, বেঙা আসছে। সমুদ্র থেকে ফিরেছে বেঙা। তাহলে এদিকে কেন, ঘরে যাবে তো? সায়েব বিড়বিড় করে ওঠে, 'বেঙা ইজ কামিং, বেঙা দ্য ফিশারম্যান, হেই সিপটি, মাই লাভার'স হাজব্যান্ড ইজ কামিং, ইয়ান ঘোষ! দ্য হাজব্যান্ড অব রাঢিকা, হেই বেঙা, হেই ফিশারম্যান।'

শ্রীপতি দেখল চার ফুট দশ ইঞ্চির বেঙা প্রায় দৌড়োতে আরম্ভ করেছে সাহেবকে দেখে। কী হল? সে কি জানতে পেরে গেছে সায়েবের কীর্তি? রোগা ডিগডিগে বেঙা জেলের শরীরের তুলনায় মাথাটি বড়ো। মাথা নাচছে, মাথার চুল নাচছে। বেঙার গায়ের রং আর সমুদ্রের রং এখন এক। তাই কখনো কোনো মুহূর্তে বেঙা তার ধূসর গাত্রবর্ণ নিয়ে সমুদ্রের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। শ্রীপতির তেমনই মনে হচ্ছে। তখন বেঙা আর তার চোখের সামনে দৃশ্য থাকছে না। এইরকম বার দুয়েক হল। মাথা ঝাঁকিয়ে নিল শ্রীপতি। বেঙা আবার সমুদ্র থেকে আলাদা হয়ে গেল।

বেঙা হাজির। হাঁপাচ্ছে। হাড় সর্বস্ব জীর্ণ দেহ শ্বাস–প্রশ্বাসে কাঁপছে। বুক উঠছে নামছে। কোমরে কপনি ব্যতীত বেঙার শরীরে আর কোনো সুতো নেই। কিন্তু সমুদ্রের জল শুকিয়ে নুনের আস্তরণ। ঘোলাটে দুই চোখ গহ্বরে।

বেঙা বলল, 'সায়েব, কুথায় গিসলি তুই, হিলশা এনেচি দুইখান, বরফ কল খারাপ হই গেছে, মাছ আজ সস্তা হবে মাইতিবাবু, আড়তে বিশ টাকা হই গেছে, বেলায় আরও কমবে, তারপরে বালির নীচয় মাছ পুতে ফেলতে হবে, পচ ধরবে।'

'মাছ উঠল কেমন?'

'বহুত!' বেঙা দুই হাত দু–দিকে প্রসারিত করে মাছের পরিমাণ দেখাতে দেখাতে তার হলুদ দাঁত বের করে ফ্যালে, 'কিন্তু গেল সব, রং খসতে আরম্ভ করেচে, এরপর পচতে আরম্ভ করবে, এই সায়েব ঘরে চল।'

'কবে বেরিয়েছিলি?' শ্রীপতি জিজ্ঞেস করে।

'পরশু, বহুত ভিতরে চলে গিসলাম।' হি–হি করে হাসে বেঙা, 'সায়েব সেই কালাপানির কাছে পেরায়, কাম সাহেব, কাম টু হিলশা, তোর খোঁজ করতি বলল পরি, সষসের তেলও লাগবে, অয়েল, সষসের অয়েল। বেঙা মাছ ভাজার মুদ্রা ফোটায় ডান হাতে, হ্যা–হ্যা করে হাসে, 'হিলশা মাছ ভাজা হবে কীসে সায়েব?'

সায়েব বুঝল। পকেট থেকে গোটা কয়েক দশ টাকার নোট বের করে বেঙার হাতে দিল। তারপর শ্রীপতির দিকে হাত তুলে হাসল, 'বাই সিপটি, হামি যাচ্ছে।'

'যাও ঘরে যাও, চ্যান করে লাও, তার হয়েচে মহা জ্বালা, ভবঘুরে সায়েব এসে ওর ঘাড়ে চেপে বসেছে, কুথায় কখুন যায় ঠিক নাই।' বলতে বলতে বেঙা বিচ ধরে উলটো দিকে হাঁটে। সঙ্গে শ্রীপতি মাইতি।

বেঙা বলল, 'ঘুড়া পাওয়া গেল বাবু?'

'নাহ্, খোঁজ করা হচ্ছে।'

'আমার এখন ইলিশের মরসুম, নাহলি আমিও খুঁজতাম।'

শ্রীপতি জিজ্ঞেস করল, 'তোর বউয়ের নাম পরি?'

'হ্যাঁ।' বেঙা দাঁত বের করে হাসে, 'সায়েবটা পরির রান্না খুব পছন্দ করে, সায়েবটা এট্টু আলাভুলা, হেলদোল নাই, সায়েব তো বটে, সব্বক্ষণ হরে কিষনো হরে কিষনো করতেছে, তাই দেখে পরিও বলে ও হল কেষ্ট ঠাকুর, ভগোয়ান ওরে পাঠাইচে, কত দেনা বলেন, মহাজনের সেই সুতলি জালের ট্যাকা এখনও শোধ করতি পারলামনি, জালটা থাকলি এত অভাব থাকতনি।'

জানে শ্রীপতি। তখন বেঙা তার হোটেলে ট্যুরিস্ট ধরে আনত। আসলে তো ও খালে–বিলে খেপলা জাল ফেলা জেলে। ওর বাপকে চিনত শ্রীপতি, সে ছিল ঢেঙা। ঢেঙার ছেলে এইটুকুন কী করে হয় তাও বড়ো বিস্ময়ের। ঢেঙার বউ আবার ছিল এইটুকুন। মায়ের মতো হয়েছে বেঙা। ওর মা বুড়ি, চুনো মাছ বেচতে আসত দীঘায়। তখন ঢেঙা জেলে ফাইলেরিয়ায় কাবু। সেই সময়েই বেঙা খেপলা জাল ফেলে রেখে আর পাঁচজনের সঙ্গে মস্ত এক সারণি জাল নিয়ে প্রথম নামল সমুদ্রে। বিশ হাজার টাকার জাল। এক মাসের ভিতরে সেই জালে এক হাঙর চেপে বসে কুটি কুটি করে দিল দাঁতে।

বাজার পার হয়ে যাচ্ছে দেখে শ্রীপতি বলল, 'তেল কিনবি না?'

বেঙা হাসে, 'বোতল কই?'

'তবে!' শ্রীপতি অবাক, 'বোতল চেয়ে নিয়ে যা দোকান থেকে।'

বেঙা বলে, 'থাক, ইলিশ ভাজা হয়ে গেল এতক্ষণে।'

'তার মানে?'

'ওই না বললি সায়েব টঙ্কা খসাবে? বাবু, এখন আমি তুমার হোটেলে মিল খেয়ে বারান্দায় ঘুমাব।'

'হোটেলে মিল খাবি, পয়সা?'

'ন্যাও যদি নেবা, আর না ন্যাও যদি না নেবা, একটু শুকনোও খাব, গা ম্যাজম্যাজ করতেছে, শালা সায়েব ঘরে শুধু কেত্তন করে, এখন গে দ্যাখো, হরে কিষনো লাগায়ছে ঠিক, পরির গালাগালিতে ও ঠান্ডা। দিনটা খারাপ, এত মাছ ধরা হল, সব বেকার—বরফ কলে বরফ জমতেছে না।

'আজ বেরোবিনে জলে?'

'নাহ্, সব দিন গাঙে থাকতি ভালো লাগে! মজরির টাকা পরি নেছে, আমারে সায়েব চল্লিশ রুপিয়া দিল, চিন্তা নাই, মিল খাব, ঘুমাব, শুকনো খাব, ভিডিও দ্যাখপ, সায়েব মরুগগে, হারামির বাচ্চা।'

শ্রীপতি ঘুরে তাকায়, 'তুই তো শালা নেমকহারাম, টঙ্কা নিলি, আবার খিস্তি করছিস সায়েবকে।'

বেঙা বলল, 'টঙ্কাও নেব, খিস্তিও করব, তবে সায়েব ঠান্ডা, নাহলি মাল অন্য দিকে ফুটে যাবে, আচ্ছা মাইতিবাবু, ও কি পলায়ে এয়েচে?'

‘পলায়ে আসবে কেন?’

‘দেশ ছেড়ে এখেনে কেনে এল সায়েব?’

‘এমনি, ইচ্ছে হয়েচে তাই।’ শ্রীপতি বলে।

‘ইচ্ছে হল কেনে?’

‘তা তো জানিনে, তবে ও খুব রইস আদমি, ধনীর ছেলে।’

‘পরিরে বলেচি টঙ্কা খিচে লিতে, মা’জনের ধার তো শোধ করতি হবে, পরিরে ও নামকেত্তন করতি বলে, পাগলা!’

শ্রীপতি তার হোটেলে পৌঁছে গেছে, হাঁক দিল ঠাকুরকে, ‘বেঙা মিল খাবে, ইলিশ এনেচ, সস্তা হয়েচে নাকি?’

ঠাকুর জবাব দেয় না। কিচেন থেকে বেরোয় না। কেন বেরোয় না তা বুঝল শ্রীপতি। ইলিশে ভালো পয়সা মেরেছে ঠাকুর। বেঙা বারান্দায় মেঝেতে বসে পড়ল পা ছড়িয়ে, মাথা দোলাতে থাকে, ‘নাহ্, সায়েবটা ভালোই, আমার চোদ্দোপুরুষির ভাগ্য ভালো সায়েব এসে উঠেছে মোর ঝুপড়িতে।’

‘যা চান করে আয়।’ শ্রীপতি বলে।

বেঙা হাঁক মারল, ‘ঠাকরানি তেল দ্যাও এট্টুখানি, ঠাকরানি হে, বাবু, ক–টা ঘর খালি আছে?’

‘গোটা তিনেক।’ বলল শ্রীপতি।

‘বিকেলে আমি ঢুকায়ে দেব যদি পাই, মিলের দাম ওতে শোধবোধ।’

‘যা যা, তোরে আর পার্টি আনতে হবে না।’

বেঙা উঠল। পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল টালির চালে ঢাকা কিচেনের ভিতরে। নাক টেনে গলা তুলে বলল, ‘ভালো ইলিশ এনেচে বাবু, খুব বাস ছেড়েচে। ঠাকরানির হাতের রান্না অমিত্তো, ঠাকরানি গো!’

ঠাকুর বেরিয়ে এল, ‘যা ভাগ, তোর ঘর নেই, এখেনে এলি মিল খেতি?’

বেঙা কান থেকে বিড়ি বের করে ঠাকুরের হাতে ধরিয়ে দেয়, ‘তুমার জন্যি যত্ন করে এনিচি ঠাকুর, রাগো কেন, তুমার ঠাকরানির রান্না খেতি এয়েচি, এদিকি আর কোনো হুটেল আছে যে এমুন অমিত্তো রাঁধবে, সি–হক বলো, টুরিস লজ বলো, কুথায় আছে এমন রাঁধনি, কে তুমার দাম দেবে?’

ঠাকুরের মুখে হাসি ফোটে, ‘বাবুরে বোঝা দেখি, বেতন বাড়াচ্চে না, শালা ঘোড়াটা পালিয়ে হয়েচে যত সব্বোনাশ!’

ভানু এবার শ্রীপতিকে নিয়ে চলল মীরগোদা, জাহাজঘাটা। দুটি সাইকেলে দুজনে। সকালবেলায় জোর বৃষ্টি হয়ে যাওয়ায় পথের বালি বসেছে যেমন, দু–এক জায়গায় কাদাও হয়ে গেছে। সাইকেল তুলে পার করাতে হয় সেই জায়গায়। ভানুর দুই চাকা গড়ায় আগে, পিছনে তাকে নিঃশব্দে অনুসরণ করছে শ্রীপতি। ভানু বকবক করেই চলেছে। শ্রীপতি হুঁ–হাঁ করে যাচ্ছে। ভানুই তাকে জোর করে নিয়ে যাচ্ছে। ক–দিন ধরে দীঘার বাজারে ঘোড়া আঁকা মদরঞ্জি খুঁজেছে শ্রীপতি। যদি পেয়ে যায়, দেখবে সে কেমন ঘোড়া। পায়নি দেখে ভানু বলেছে, 'চলুন মীরগোদা, আমার কথাটা যাচাই করে নিন।'

যেতে যেতে ভানু বলছে চোদ্দোবেড়িয়ার সেই পুরোনো অভিজ্ঞতার কথা। সেই যেবার প্রথম পালিয়েছিল পক্ষীরাজ। সেই চোদ্দোবেড়িয়ার সবুজ ঘাস জমিতে মাদি ঘোড়ার পিছনে মদ্দা ঘোড়ার কেশর ফুলিয়ে দৌড়। দূরে সমুদ্র। নীল আকাশ সেই সমুদ্রে ডুবে গিয়ে আকাশ সমুদ্র একাকার।

শ্রীপতি বলল, 'সব তো হল, এবার কোথায় গেল?'

ভানু বলে, 'যেখানে গেলে ও যেতে পারে সেখানে যাচ্ছি তো বাবু।'

'যাচ্ছি তো বটে, কিন্তু এসব কি হতে পারে?'

'কী হতে পারে না বলুন দেখি?'

'তোর সেই কোকিলা বধূ মোদের অশ্বটারে টেনে নিয়ে গেল?'

'কেউ না কেউ তো টেনেছে।' বলল ভানু।

'তা হবে কেন, এমনি যেতে পারে না?'

ভানু বলল, 'এমনি কি কিছু হয় বাবু, কিছু ঘটলে তবে তো কিছু হবে।'

শ্রীপতি চুপ করে গেল। ভানুর শেষ কথাটা তার মাথায় ঝিলিক মেরেছে। অসত্য তো বলেনি ভানু। কিছু ঘটলে তবে–না কিছু হয়। এই যে বোশেখ মাসে উধাও হল পক্ষীরাজ, কী ঘটেছিল তাহলে? সে তো পালায় আশ্বিন মাসে। তখন তাকে চোদ্দোবেড়িয়া ডাকে। ডাকে সব সুন্দরী ঘুড়ির দল। ডাকে সবুজ ঘাস, ঘন নীল সমুদ্র। কিন্তু বোশেখ মাসে তো চর শূন্য। কিছুই নেই। চরের ডাকে সে যায়নি। তাহলে গেল কেন? এইটিই খুঁজে বের করা দরকার।

ভানু ঘাড় কাত করে, 'ঠিকই বলেচেন বাবু, ওইটি খুঁজে বের করতে পারলে সব হয়ে যাবে, আর আমি তো ওইটিই খুঁজে বেড়াচ্ছি।'

'কী?'

'কন্থক কেন পালাল তার সাথিকে ছেড়ে তা খুঁজে বের করতে পারলে কোথায় পালাল তা খুঁজে বের করা কোনো অসুবিধের বেপার নয়, আর সেই জন্যিই না চলেছি জাহাজঘাটা।'

শ্রীপতি আচমকা বলল, 'তুই খুব চালাক, খুব চালাক, আমি কিছু বুঝিনে ভাবছিস? কেন যাচ্ছিস মীরগোদা?'

'আজ্ঞে কোকিলা বধূরে দেখতি, আপনারে দেখাতি।'

'তার সঙ্গে মোর অশ্বের সম্পক্কো কী?'

'অশ্বটারে সে ডাক দিয়ে তার মদরঞ্জিতে এঁকে ফেলেছে। আপনি বিশ্বাস করেন না করেন ওটাই সত্যি, ঘোড়াটা যে হাওয়া হয়ে গেল তার কারণ এটা হওয়া খুবই সম্ভব।'

দুজনে কথা বলতে বলতে প্যাডেল করছে। একই রেখায় দুটি সাইকেল চলেছে পর পর। রাস্তার দু–পাশে কাজুবাদাম বন। খুব ঘন নয়, হালকা, মাটির দিকটা একেবারে পরিষ্কার, গাছে গাছে ফাঁক অনেক। গাছগুলি নতুন

বৃষ্টিতে বেড়েছে। সবুজের উপর সবুজ পোঁচ পড়েছে যেন। পথের দু–পাশে যেখানে কাজু গাছ প্রায় মিলিয়ে গেছে, সেখানে ঘন কেয়াবন। কেয়াগাছ আধ মানুষ উঁচু হয়ে তলোয়ারের মতো পাতাগুলি ছড়িয়ে দিয়েছে চারপাশে। কেয়াপাতার সবুজ আর কাজু পাতার সবুজে ফারাক আছে। কেয়া আর কাজু বন ব্যতীত দূরে দূরে ঝাউয়ের অন্ধকার, কোথাও নারকেল সারি, তাল। এ ছাড়া নিম আছে, জাম, জামরুল আছে, কালকাসুন্দের গম্ভীরতা আছে। অনেক দূরে একটি অশ্বত্থও দেখা যায় আচমকা। এই যে গাছগাছালি, এর ভিতরেই কত পাখি! পথ নির্জন। কোথাও কোনো শব্দ নেই। পাখির ডাক কোনো আছড়ে পড়া শব্দ নয়। নির্জনতা ভেঙে ফেলা শব্দ নয়। পাখির ডাক যেন নির্জনতারই অংশ। এই যে একটানা ঘুঘুর ডাক, কুবো পাখির কুব কুব, একটি কুবোর ডাকে সাড়া দেওয়া আর একটি পাখির কুব কুব, চোখ গেল পাখির ডাক—সব যেন এই নির্জন পথেরই অংশ। এইসব পাখির ডাক শেষ হয় না। পার হয়ে যেতে যেতে আবার শোনা যায়। এইসব অদৃশ্য পাখির ডাকের সঙ্গে ঝলমলে নীল, ঝলমলে হলুদ, উজ্জ্বল শ্যামা পাখিরা এগাছ থেকে ওগাছে উড়ান দেয়। দূরে নারকেল গাছ থেকে সাড়া দেয় কাঠঠোকরা। ভিজে মাটিতে প্রাণ পেয়েছে ঘাসের বীজ। তার ভিতরে প্রাণ পেয়েছে পোকামাকড়। শূন্যতায় উড়ছে জঙ্গুলে মশা। পতঙ্গের দল। ফড়িং উড়ছে ঝাঁকে ঝাঁকে, ডানা ফনফনিয়ে।

শ্রীপতি বলল, 'এসব কে বিশ্বাস করে, জলজ্যান্ত ঘোড়া বাতাস হয়ে যাবে?'

ভানু বলে, 'লোকের বিশ্বাস অবিশ্বাসে কী যায় আসে?'

'তুই নিজে বিশ্বাস করিস?'

'চোখে তো দেখলাম বাবু।'

'চোখে কী দেখলি?'

'দেখলাম মদরঞ্জিতে অবিকল সেই ঘোড়া।'

শ্রীপতি বলে, 'মদরঞ্জিতে কেন, কত জায়গায় ঘোড়ার ছবি আছে।'

'তা থাকুক, কিন্তু বোশেখি পুন্নিমে? যেদিন হারাল কন্থক সেদিন জোসনায় বসে আঁকা হল যে।'

শ্রীপতি চুপ করে যায়। এসবে পাগলও বিশ্বাস করবে না, কিন্তু ঘটনা যদি সত্যি হয় তবে তো তা বড়ো বিস্ময়ের। আর সেই বিস্ময়ই যে তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে মীরগোদা, জাহাজঘাটা, অচেনা এক কোকিলা বধূর কাছে।

ভানু বলল, 'মানুষকে পশু করে দেয় না জাদুকরি?'

'কে বলেছে?'

একই কথা কানে শোনাচ্ছে ভানু ক–দিন ধরে। মাথাটা গেছে ওর। আরা–ভোজপুরে যাবে না, অথচ মাঝরাত্তিরে ঘুমের ভিতর গোঁ–গোঁ করবে, সেদেশে পাঠানো ছেলে বউয়ের জন্য নাকি মন খারাপ হয় ঘুমের ভিতরে। কান্না আসে। শ্রীপতি বলল, 'ওসব বললে লোকে তোকে মারবে, তোর গায়ে ঢিল ছুঁড়ে খেঁতো করবে।'

ভানু বলল, 'বশীকরণ, তন্ত্রমন্ত্রে আমিও বিশ্বাস করিনে বাবু, কিন্তু কোকিলারে যদি দ্যাখেন, মনে হবে ঘুড়ারে যদি কেউ ডেকে থাকে, সে, সে ডাকলে কে না যায়?'

দুজনে আবার চুপচাপ। সাইকেল চলছিল। ভানু অনেকক্ষণ বাদে বলল, 'বাবু ওই যে দেখতি পাচ্ছেন ঝাউবন, ওর ওপারে জাহাজঘাটা, মনে হচ্ছে না সমুদ্দুর ছিল, একেবারে দীঘার মতন লাগে। চোদ্দোবেড়িয়ায়ও এমন ঝাউবন আছে।

সাইকেল থেকেই ঘাড় তুলে দেখল শ্রীপতি। ঝাউবনের মাথা অন্ধকার। যেন মেঘ জমে আছে ওই আকাশে। জাহাজঘাটা, মীরগোদার কথা শুনেছে অনেক, কিন্তু আসা হয়নি। অনেকটা আগে ভানুর দেখাদেখি শ্রীপতিও নেমে পড়ল সাইকেল থেকে। বালি বাড়ছে। পথ ডানদিকে ঘুরে গেছে। জাহাজঘাটার দিকে পথ নেই। মোটাদানার বালি। ছোটো ছোটো স্তূপ।

ভানু বলল, 'এখেনে এককালে সত্যি কি সমুদ্দুর ছিল?'

হাসে শ্রীপতি, 'লোকে বলে, কিন্তু বালি আর বালিয়াড়ি মানে তো সমুদ্র না।'

'তাহলে কী?'

'কিছুই না, হাওয়ায় বালি উড়ে উড়ে এসে এখেনে এমন হয়ে গেছে।'

ভানু অসন্তুষ্ট হয়, 'আপনি যে কিছুই মানেন না বাবু, জাহাজঘাটা কি এমনি?'

শ্রীপতি আর ভানু বালি ঠেলে ঠেলে ঝাউবনের কাছে গেল। আর তখনই ঝাউবন থেকে কে বেরিয়ে এল, কে? শ্রীপতির বুক থমথম করে। এল কোন অচিন সমুদ্রে, সাগর ফুরোনো জাহাজঘাটায়, সেখানে ঝাউবনের ভিতর থেকে বেরোল কে? গলা তুলে দাঁড়িয়ে গেল শ্রীপতি, 'কপালকুণ্ডলে!' শ্রীপতি বিড়বিড় করে, 'আমি হারাইনি, আর ঘোড়াটা, কে, কে ও?'

এ তো প্রায় রক্তবসন। লালশাড়ি, লাল ব্লাউজ কপালে মস্ত সিঁদুরের টিপ, সিঁথিতে টানা সিঁদুর, কালো বরন, যৌবনে ঝলোমলো, 'কে ও?'

ভানু চাপা গলায় বলল, 'সেই কুহকিনী, লাল জাদুকরি, একা এই সমুদ্দুরে কী করছিল। এবার বিশ্বাস হল তো বাবু, ঘোড়াটা কেন পালাল বোশেখ মাসে।

শ্রীপতিকে দেখছিল কোকিলা। ভানুর দিকে তাকাচ্ছিলই না। ঝাউবন থেকে বোরোতে গিয়ে দুটো মানুষ দেখে গৌরমোহন মদরঞ্জিওয়ালার বউ অবাকই হয়েছে। ওদের ভেতরে একজন তার চেনা।

ভানু বলল, 'ভালো আছ তো, তুমার মদরঞ্জি দেখতে এল বাবু।'

'বাবু কে?' শ্রীপতির দিকে তাকিয়ে ভানুকে জিজ্ঞেস করল সে।

ভানু পরিচয় দিল, 'বাবু হল ভাগ্যহীন, ছিল এক পঙ্খিরাজ, সেই পঙ্খিরাজ যেটি তুমার মদরঞ্জিতে আঁকা হয়েছিল, যেটি আবার আমার সাথি জন্মজন্মান্তরের, কন্থক নাম।'

ঠোঁট বাঁকায় কোকিলা, 'কিন্তু মদরঞ্জিওয়ালা তো নেই।'

'নেই! কেন আবার পালাল?' ভানুর মুখ দিয়ে কথাটা বেরিয়ে এল আচমকা।

কোকিলা চমকে ঘাড় বাঁকিয়ে তাকায়, 'তার মানে।'

'বলছি ঘরে কি গৌরমোহন নাই?' জিজ্ঞেস করল ভানু ঢোক গিলে।

'থাকার কি কথা ছিল?'

'না থেকে যাবে কুথায়?'

'কেনে তার কি যাওয়ার জায়গা নাই?'

'আছে বলে মনে হয় না তো।'

খিলখিল করে হাসে কোকিলা। হাসির দমকে ভরা শরীর কাঁপে। বুকের আঁচল সরে যায়। ঘোর লাল ব্লাউজের নীচে ঢাকা পড়া পীনস্তন থরথর করে। আহা বুকের সুবাস যেন টের পাওয়া যায়। শ্রীপতির চোখে ঘোর লাগে। শরীরে যেন আগুন বয়ে যায়। আর তা টের পেয়েই বুকের আঁচল টেনে স্থির হল কোকিলা। মাথা নামিয়ে ঈষৎ ধরা গলায় জিজ্ঞেস করে, 'কাম আছে তো মানুষটার।'

'সে তো হাটবাজার, মদরঞ্জি বেচা, রাতি তো ফেরে?'

'ফেরে, আবার ফেরেও না।'

'পরদিন তো ফেরে?'

'না ফিরে যাবে কুথায়?' বলল কোকিলা বধূ। মুখ তুলে তাকায়। মুখে স্মিত হাসি। উজ্জ্বল চোখ দুটিতে ঝলমল করছে আলো। তা দেখে ভানু উতসাহিত, বলল, 'ওই কথাই তো বলছিলাম আমি, না ফিরে সে যাবে কুথায়, তুমি তারে আটক করেছ, তুমার কাছেই না ফেরবে, তুমার টানে না তুমার কাছে আছে।'

হাসিতে ঝিলমিল করে কোকিলা, যেন ঝাউবনের আড়াল, আবডাল থেকে রোদের ছটা এসে পড়েছে ভানু আর শ্রীপতির গায়ে। কোকিলা হাসতে হাসতে বিস্ময় প্রকাশ করে, 'আমি তারে আটক করেচি, বেশ কথা তো তুমি বলো হে ভানুবাবু!'

ভানু বলল, 'করো নাই?'

'কী করে করলাম?'

'তাহলে গৌরমোহন মদরঞ্জিওয়ালারে পেলে কী করে?'

শ্রীপতি ভাবছিল এই সাগর হারানো জাহাজঘাটায় রোদ ঝিমঝিম বেলায় কথা না বলে ওর বাড়ি গেলে হত। মেয়ে যখন এত সুন্দর, এমন পরিপাটি যৌবন যখন কোকিলা বধূর, তার ভিটে বাড়িটি পরিচ্ছন্ন হবে তো নিশ্চয়। সেখানে ছায়ায় বসে না হয় কথা হত। কথাবার্তায় তো মাদকতা রয়েছে। এই যে বলছে কোকিলা, কী করে পেল মদরঞ্জিওয়ালারে তা তারে জিজ্ঞেস করে যেন ভানু দাস।

'তার কি তা মনে আছে?'

'এর মধ্যে ভুলে যাবে?'

'ওকথা মনে কি থাকে!' বিড়বিড় করে ভানু। সে বলতে চায় যে কথা তা কি বুঝতে পারছে না কোকিলা বধূ? মদরঞ্জিওয়ালা গৌরমোহনের কি মনে থাকার কথা সেইসব কথা? যেন আগের জন্মের কথা সব। আশ্বিন মাস, সুবর্ণরেখা নদী পড়েছে সমুদ্রে যেখানে, সেই চোদ্দোবেড়িয়ার চর, চরে সবুজ ঘাসের ভিতরে দশটা মাদি ঘোড়ার ভিতরে সে একমাত্র পুরুষ। তাকে ঘিরে থাকে ঘুড়িগুলো। আকাশ কী নীল! সমুদ্র, নদী কত শান্ত! কত ভরন্ত! বাতাসে ঠান্ডা ভাব। কোথাও কোনো ধুলোময়লা নেই, ইশ! কীসব ভাবছে সে? কন্থক লাফ দিচ্ছে আশ্বিনের রাতে, চাঁদের আলোয়। সমস্ত রাত ঘুমোল না সে। কিন্তু তার সঙ্গে গৌরমোহনের কী সম্পর্ক? সম্পর্ক আছে গৌরমোহন তা জানে না, জানে যেন এই কোকিলা। আহা দুরন্ত ঘোড়াকে শান্ত করে দিয়েছে এই বধূ। মদরঞ্জিতে এঁকে ফেলেছে তাকে। তাকে টেনে এনেছে সমুদ্রপাখি হোটেল থেকে সেই চাঁদনি রাতে। টেনে এনেছেই। নাহলে অবিকল সেই অশ্ব কী করে আঁকা হয়ে যায় ওই দিনে? ভান দুলছে বাতাসে, বিড়বিড় করছে নিজের মনে, 'তুমি তো জানো সব, জানো না?'

ভানুর কথার জবাব দেয় না কোকিলা। সে ক্ষণে ক্ষণে অন্যমনস্ক হচ্ছে। কোথায় যে মন যায়। ভানু তার মনের কথা পড়তে পারছে। সে তো বর্ণহীন করে দিয়েছে পক্ষীরাজকে। নাহলে ওই গৌরমোহন, সে এল কোথা থেকে?

কোকিলা খিলখিল করে হাসে, 'এখেনে কথা হবে?'

'না, কিন্তু গৌরমোহন যখন নাই—।' বিড়বিড় করে মাঝখানে কথা থামিয়ে দেয় ভানু।

'তার কাছে এয়েছিলে?' ঠোঁট দিয়ে যেন অভিমান ঝরে পড়ে উড়ন্ত বালির মতো। বালি ঝরে যায় কোকিলার পলাশ লাল শাড়িতে। আঁচল নেড়ে বালি ঝরাতে থাকে মদরঞ্জিওয়ালার বউ। ভানুর চোখ আছে। ঠিক জায়গায় এসে পৌঁছেছে। যেন জাহাজঘাটার জাহাজে করে এসে নেমেছিল সেই কবে, কোন কালে? শ্রীপতি ভাবে এত যৌবন সে আগে দ্যাখেনি। মরা এক জাহাজঘাটা, বুড়ো হয়ে যাওয়া এক জাহাজঘাটায় এত যৌবন নিয়ে থাকে কী করে কোকিলা বধূ?

ভানু বলে, 'দুজনেরই কাছে এসেচি, তুমি হলেও হবে কোকিলা। বাবুর ঘোড়াটি সেই যে গেল ফিরল না, কী তেজ সেই ঘোড়ার! কুথায় যে হারাই গেল! হায় রাজপুত্র! তুমি চলে গেলে, তারে নিয়েছিলাম আমি!'

ভানুর কথায় কোকিলা হাসে। কী পুরু ঠোঁট জোড়া, গোলাপি ভাব সেই ঠোঁটে। নাকে কী সুন্দর নথ! রুপোর হবে, ঝুটোও হতে পারে ওই নাকফুল, কিন্তু যাই হোক না কেন মানিয়েছে সুন্দর। পায়ে নূপুর, পুরু করে আলতা পরা। শ্রীপতি দেখছিল এমন যৌবন সচরাচর বড়ো চোখে পড়ে না। এমন রূপ বড়ো একটা দেখা যায় না। সবাইকে হারিয়ে দিয়ে বসে আছে। সাইকেল ঠেলে ঠেলে শ্রীপতি হাঁটছে, ভানুর সঙ্গে। কোকিলা যায় আগে আগে, একটু

এগিয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখছে। কতবার যে দেখল। তার ডাকে কে না আসে! এমনই ভাব ঠোঁটের হাসিতে। দুটো পুরুষ কেমন তেজ হারিয়ে তার নূপুরের রিনরিন অনুসরণ করছে!

কোকিলা বলে, ‘কী যে কহ তুমি, কিছুই বুঝিনে, রাজপুত্তুরটা কে? কে কারে ছেড়ে গেল, কেন গেল? রাজপুত্তুর কী হেঁটে চলে গেল?’

ভানু বলল, ‘তাই–ই বটে, এবার ঘোড়া গেল, পড়ে থাকলাম আমি একা একা।’

কোকিলা বলল, 'সে দশদিকে ঘোরে, সে বলতে পারে ওসব কথা, খোঁজ নিতে পারে হারানো ঘোড়ার, আমি তো ঘরেই থাকি, কী করে বলি?'

'তিনি কখন ফিরবেন?'

মাথা নাড়ে কোকিলা। জানে না সে। মদরঞ্জি নিয়ে গৌরমোহন কাঁথিতে গেছে ভোরবেলা, দুয়ারে দুয়ারে ফেরি করে বেড়াবে। ফিরতে রাত হতে পারে, আবার এমনও হয় ফেরেই না গৌরমোহন। মদরঞ্জি কাঁধে কতদূর চলে যায়। হয়তো কী খেয়াল হল এগরা চলে গেল খড়্গপুরের পথে। নাহলে হয় চলে গেল নরঘাট হয়ে তমলুক শহরে। যতদূর যাবে মদরঞ্জি নিয়ে তত কদর ওই বস্তুর। গৌরমোহন মাঝেমধ্যে বলে কলকাতা চলে যাবে। কোকিলা না করেছে। কলকাতা শহরের কিছুই চেনে না সে। জানে না কেমন ওই শহর, তারা কেউ কোনোদিন কলকাতা যায়নি। শেষে ওদিকে গিয়ে কোনো বিপদে না পড়ে গৌরমোহন। ধীরে ধীরে বলছিল কোকিলা বধূ। স্তিমিত গলার স্বর। চোখ ঢুলে আসছে যেন। ঠিক দুপুরটি এখানে বড়ো নিঝুম। কোথাও কোনো সাড়া নেই। শ্রীপতির মনে হচ্ছিল মরা জাহাজঘাটা তো, জাহাজ যেন ছেড়ে গেছে লোকলশকর নিয়ে। তারপর গভীর নৈঃশব্দ্য আচ্ছন্ন করেছে মীরগোদার এই গৃহটিকে। যেন জাহাজে করে গৌরমোহন তার মদরঞ্জি নিয়ে জাভা, সুমাত্রা, বালিদ্বীপে বাণিজ্য করতে গেছে। প্রোষিতভর্তৃকা বধূ জাহাজঘাটায় দাঁড়িয়ে চোখের জল যখন মুছে ফেলেছে তখনই হাজির হয়েছিল ভানু আর শ্রীপতি। ভানু এখন পেট পুরে ভাত আর ইলিশমাছের টক খেয়ে তালপাতার চাটাইয়ে পড়ে নাক ডেকে ঘুমোচ্ছে দাওয়ার ওপ্রান্তে। এ ধারে পুরোনো, রং–ওঠা এক মদরঞ্জিতে শ্রীপতি বসে আছে, তার কয়েক হাত দূরে কোকিলা। শ্রীপতি ভাবছিল কেমন মানুষ গৌরমোহন, এমন বউ ঘরে রেখে মদরঞ্জি নিয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়, রাতে ফেরে না! আশ্চর্য তো!

কোকিলা বলল, 'দরকার নেই, মীরগোদার হাট, অলংকারপুরের হাটে তো আসে ব্যাপারির দল, তারা কিনে নিয়ে যায়, ক–খানা মদরঞ্জিই বা পড়ে থাকে যে ঘরে ঘরে ঘুরতে হবে ফেরিওয়ালা হয়ে।'

শ্রীপতি বিষণ্ণতা টের পায়। শ্রীপতি দেখল পান খাওয়া লাল ঠোঁট, মাথার এলো খোঁপা, আঁচলের আড়াল সরে যাওয়া স্তনের আভাস, কোমর থেকে ভারী নিম্নদেশ, সব নিয়ে গৌরমোহন মদরঞ্জিওয়ালার বউ একেবারে একা। যে কথাগুলো বলছে, তাও একা একাই। এখানে শ্রীপতি যে বসে আছে তাও যেন ধীরে ধীরে ভুলে যাচ্ছে সে।

শ্রীপতির কী মনে হল, জিজ্ঞেস করল, 'কী করে পেয়েছিলে গৌরমোহনকে?'

তার দিকে ফিরেও তাকায় না কোকিলা, আকাশে তাকিয়ে আছে, কথাটার জবাব দেবে না মনে হল। শ্রীপতি সিগারেট ধরায়, কড়া তামাকের গন্ধ বাতাসে ভেসে বেড়ায়। কোকিলা ফিরে তাকায়, বলল, 'মদরঞ্জিওয়ালা যে কীর'ম মানুষ তা বুঝা হল না এখন, ও কিন্তু আমারে শিখায়েছে এ কাজ, ও না শিখালে আমি কি পারতাম তুমার পঙ্খিরাজকে মদরঞ্জিতে ধরি ফেলতে!'

চমকে ওঠে শ্রীপতি। কেমন কেঁপে ওঠে ভিতরে ভিতরে। তার মনে হল কোকিলা বধূর কথায় মাটিও যেন কাঁপল। তাহলে ভানুর কথা সত্যি? এই কোকিলা বধূ লাল জাদুকরি? কুহকিনী? কী অদ্ভুত! ঘোড়াটাকে মাদুরে বেঁধে ফেলল? জলজ্যান্ত ঘোড়াটাকে ছবি করে দিল? মাদুরে বন্দি করে রেখেছিল তার পঙ্খিরাজকে? এ যে এক আশ্চর্য ঘটনা! 'ও কোকিলা, তুমি যা বলছ তা সত্যি?'

কোকিলা নেমে যায় উঠোনে। কোথা থেকে একখণ্ড মেঘ আকাশে এসে পড়েছিল, তা ঢেকে দিয়েছে রোদ। ছায়ায় আলোয় কোকিলা বধূ পায়চারি করছে উঠোনে। আঁচল দিয়ে ঠোঁট মুছল। সিঁথিটা ডগডগ করছে সিঁদুরের রেখায়। কত চুল তার মাথায়! একটি হাত পিছনে ঘুরিয়ে এলোখোঁপা ভেঙে ঘন কালো মেঘের মতো চুলের রাশ পিঠে ছড়িয়ে দেয়। ঘুরে ঘুরে আড়চোখে দ্যাখে শ্রীপতিকে। শ্রীপতি আবার বলল, 'সত্যি কথা বলছ?'

'মনে হচ্ছে যেন তাই।'

'সত্যি কিনা জানো না?'

মাথা নাড়ে কোকিলা, 'কী থেকে কী হয়েছে টের পাইনি, কীভাবে যে হয়ে গেল সব! মাটিতে, ধুলোয় আঁকলাম...।'

'আমার পঙ্খিরাজকে আগে কখনো দেখেছিলে?'

'মনে হয় দেখেছিলাম।'

'কোথায় দেখেছিলে?'

কোকিলা বলল, 'মনে মনে, না যদি দেখব তবে তারে আঁকলাম কেন?'

শ্রীপতি উঠে গেল উঠোনে। কোকিলা দাঁড়িয়েছে। বাতাসে ওর চুল উড়ছে। বুকের আঁচল উড়ে যেতে চাইছে। কোমরে আঁচল গুঁজে সে কদমগাছের গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল, হেসে বলল, 'তুমার পঙ্খিরাজ আমার নিকট বাঁধা পড়ে গেছে গো মাইতিবাবু।'

'এ তো ভানু বলেছে।'

'যা কহিছে ঠিক কহিছে।'

'ভানু কি তোমাকে বলেছিল?'

'জানি না, মনে নেই।'

'তুমি কি জাদু জানো?'

খিলখিল করে হাসে কোকিলা, 'জাদু তো জানিই।'

'কে শিখাল, গৌরমোহন?'

'তা জেনে তুমি কী করবে, জাদু কাউরে শিখাতে হয় না।'

'তবে?'

ওসব নিজে নিজে জানতে হয়। বলতে বলতে কদমতলের নীচে দাঁড়িয়ে মাথার পিছনে ভেসে থাকা চুলের রাশ ধরল সে দুই হাতে দুই মুদ্রা ফুটিয়ে, বলল, 'জাদু আমরা সবাই জানি, আমার মা ছেল বড়ো জাদুকরি, আকাশের জল নামাতে পারত।'

'সত্যি বলছ?'

'তার মা, আমার দিদিমার ক্ষমতা ছিল আরও বেশি, সে যদি চাইত সাগরের জল শুকায়ে দিতে পারত।'

শ্রীপতি বলল, 'তাই কি মীরগোদায় সমুদ্র নেই, জাহাজঘাটা রয়েছে?'

পানরাঙা ঠোঁটে হাসল কুহকিনী, জাদুকরি কোকিলা, বলল, 'সে গাছ হাঁটাতে পারত, তার কথায় পাথর গড়াত আপনা আপনি।'

'সত্যি বলছ?'

'মিথ্যে কেন কহিব, ইসব নিয়ে মিথ্যে বললে আমার বিদ্যে চলে যাবে, সেই কুহকিনী তো বাতাসে ঘুরে বেড়ায়।'

'তুমি গাছ হাঁটাতে শেখোনি?'

হাসে কোকিলা, 'না শিখিনি, কিন্তু শিখতে কতক্ষণ!'

'কে শেখাবে?'

'মা দিদিমা।'

'তারা কি বেঁচে আছে?'

'কুহকিনীর মরণ নাই, বাতাস হয়ে আছে গো, বন্নহীন হয়ে ঘুরি বেড়াচ্ছে এদিক ওদিক, যদি ডাকি এসে যাবে।'

'তুমি আকাশের জল নামাতে পারো?'

‘পারি।’ হাঁটতে লাগল কোকিলা। ঘুরে ভিটের পিছন দিকে চলে যায়। একটু ওপারে ঝাউবন। ঝাউবনের ধারে গিয়ে দাঁড়ায়, ‘বলে পারি। আমার মা দিদিমা এত পারত আমি পারব না?’

‘দিদিমাকে শিখিয়েছিল কে?’

‘দিদিমার দিদিমা আরব দেশ থেকে জাহাজে চেপে এসেছিল এই মীরগোদায়, তিনি ছেল আরবি জাদুকরি।’

দীর্ঘশ্বাস ফেলে শ্রীপতি, ‘সমুদ্র তো অনেককাল নেই।’

‘আমি তো অনেককালের কথাই বলছি মাইতিবাবু।’ এগিয়ে এল কোকিলা। কোকিলা নয়, এ যেন মেঘের ছায়া। নাকি মেঘ? মেঘ না হলে গায়ের রং এমন মেঘের মতন হয়! বাতাসে চুল উড়ছে। এমন উড়ছে যেন কোকিলাকে নিয়ে ওই চুল আকাশে উড়ে যাবে। শ্রীপতির মনে হল কোকিলা বধূ, গৌরমোহনের বউ আর যেন মাটিতে থাকবে না। ঝড় উঠছে নাকি? তাই তো? ঝাউবনের ওধারে দক্ষিণ–পশ্চিমে মেঘ উঠেছে সমুদ্র থেকে। সূর্য ঢেকে দিয়েছে মেঘ। ঠান্ডা বাতাস দিচ্ছে। কোকিলার আঁচল পড়ে গেছে গা থেকে। ঠান্ডা বাতাস সেই আঁচল ওড়াচ্ছে চুলের সঙ্গে। এবার সে যদি হাত তোলে আকাশে, আকাশ কি তাকে না টেনে পারবে? উড়তে থাকবে গৌরমোহনের বউ। শ্রীপতি ডাকল, ‘ঘরে চলো, ঝড় আসছে।’

খিলখিল করে হাসে কোকিলা, ‘আমি বাতাস খেতে এয়েচি।’

শ্রীপতি দেখল দপদপ করছে স্তনযুগল। গাঢ় লাল ব্লাউজ যেন পটপট করে ছিঁড়ে যাচ্ছে। সেলাইয়ের জোড় ফেটে যাচ্ছে, সামনের হুক, বোতাম যা থাকুক খুলে যাচ্ছে আপনা আপনি। দু–হাতে একটি নবীন তরুকে ধরে আছে কোকিলা বধূ। অদৃশ্য, বর্ণহীন কোনো পুরুষের হাত তাকে উন্মুক্ত করছে ধীরে ধীরে। গাঢ়, গভীর নিশ্বাস ফেলছে, গাঢ়, গভীর শ্বাস নিচ্ছে গৌরমোহনের জাদুকরি বউ, ভানুর লাল জাদুকরি। আশ্চর্য! এমন তো দ্যাখেনি কোনোদিন শ্রীপতি। গৌরমোহনের বউ দু–হাতে বেড় দিয়ে গাছটিকে বুকে টানল। দুই ঊরুতে বাঁধল বৃক্ষটিকে। তলপেটে, তার নীচে, ঊরু সন্ধিতে বৃক্ষের কাণ্ড যেন পুরুষ হয়ে উঠল।

শ্রীপতি নিশ্চল। সে এল কখন? জাদুকরির পিছনে পিছনে তাকে অনুসরণ করে? নাকি তার সঙ্গে কথা বলতে বলতে। তার মা, দিদিমার কথা শুনতে শুনতে। কথাগুলি কি শ্রীপতি তার ঘুমের ঘোরে শুনেছিল? ভাতঘুম তো এসেছিল। বাইরে তখন ঘোর রৌদ্র। তারপর কখন যে আলোর দুপুরে মেঘ এল। জাদুকরি ঘর থেকে বেরোল। তার নূপুরের শব্দে ঘুমের চটকা ভেঙে গেল শ্রীপতির। সে দেখল মাথায় মেঘ নিয়ে গৌরমোহনের বউ যাচ্ছে। সেই মেঘের প্রান্তে সোনালি রেখা, মেঘ ফেটে বেরুতে চাইছে যেন রংটি। সে পায়ে পায়ে এল তার আড়ালে আড়ালে। কিন্তু যে কথাগুলো শুনেছে সে দুপুর থেকে তা কি স্বপ্নের ভিতরে হয়েছে? ঘুমের ভিতরে শোনা? নাকি মনে মনে জেনেছে শ্রীপতি? জাদুকরি না হলে পুরুষমানুষকে গাছ করে রেখে দেয়? তারপর সেই গাছ হাঁটিয়ে ঘরে নিয়ে আসে, তারপর সেই গাছ মানুষ হয়? ওই দ্যাখো জাদুকরি তার কালো মেঘের মতো শরীর মেলে ধরেছে গাছের সামনে। যে বয়সে যৌবন সবচেয়ে মোহময় হয়, সবচেয়ে সুন্দর হয়, সেই বয়সই তো জাদুকরির। এখন কী করে গৌরমোহন তাকে ফেলে গঞ্জে গঞ্জে মদরঞ্জি হেঁকে বেড়ায়? মদরঞ্জিতে ঘোড়াটা বন্দি হল, সেই ঘোড়া নিয়ে চলে গেল গৌরমোহন। বন্দি করেছিল কে? সেই কোকিলা।

বাতাস উঠেছে খুব। বাতাসে বালি উড়ছে। বাতাসে গাছ তার মাথা দোলাচ্ছে। গাছ দুলছে, পুরুষ যেমন দোলে নারী সংলগ্ন হলে। কোকিলা যেন গাছের মাথা ধরে দোলাচ্ছে তার সর্ব শরীর। মেঘ ছেয়ে ফেলছে সমস্ত আকাশ। মেঘের গা থেকে সোনালি মেঘের আলো পড়েছে কোকিলার মুখে। ঝাউ, আমলকী, হরিতকী, আম, কাঠালের বন, যুবতীর নবীন শরীর পেয়ে উন্মত্ত হয়ে উঠেছে যেন। কোকিলা বধূও হয়ে উঠেছে ঝড়ের মতো প্রবল। গাছ আঁকড়ে ঝড়ের সঙ্গে দুলছে।

আর দাঁড়ায় না শ্রীপতি। আড়াল থেকে সরে চলে আসে ভিটেয়। ভানু উঠে বসে আছে। শ্রীপতির মাথা ভরতি বালি, জামাকাপড়ে কাঠকুটো, শুকনো পাতার কুচি। ভানু তাকে দেখে হাসল, ‘বাবু কি কোকিলার সহিত অরণ্যে গমন করেছিলেন?’

ভানু এমন। কখন যে সাধু হয়ে সাধু ভাষায় কথা বলতে আরম্ভ করবে তা শ্রীপতিও জানে না। ভানু তার কথার জবাব না পেয়ে বলল, 'অরণ্যে অশ্ব খুঁজা হল? কন্থক অরণ্যে নাই?'

শ্রীপতি হাঁপাচ্ছে বলল, 'ও জাদুকরি।'

'কে, কার কথা বলছেন বাবু?'

'তুই যার কথা বলেছিলি, কোকিলা বধূ।'

'কেন আপনারে কী জাদু করল?'

শ্রীপতি বলল, 'দেখতে পেলে জঙ্গলের গাছ করে রেখে দিত, ঘোড়াটার তাই হয়েছে।'

'সত্যি!'

'হ্যাঁ, বাতাসও করে দিতে পারে।'

'পারেই তো, অনন্ত সারের মেয়েটা বন্নহীন অশ্বর কথা বলেছিল।'

শ্রীপতি বলল, 'এখন কী উপায়?'

ঝড় উঠল। ঝড়ের শোঁ শোঁ শব্দ শোনা যাচ্ছে। বাতাসে উন্মত্ত হয়েছে গাছগাছালি, বনবাদাড়, আকাশ। বালি উড়ছে। বাতাসে ভিজে মাটির গন্ধ। গন্ধটা ঘিরে ধরছে ক্রমশ। আঁধার ঘনিয়ে এসেছে। উঠোনের কদম গাছটি আছাড়িপিছাড়ি করছে। ভানু আচমকা উঠে দাঁড়ায়, 'বাবু, সে বাইরে রয়েছে, এই ঝড়ে বাইরে থাকা কি ঠিক!'

শ্রীপতি বলল, 'সে জাদুকরি, সেই–ই ঝড় তোলে, আকাশের জল নামায়। গাছের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে তোর কোকিলা, বনের ভিতরে আছে, কী আশ্চর্য মেঘ তার মাথায়! সোনালি মেঘ!'

'সোনালি মেঘ! কী বলেন বাবু?'

'হ্যাঁ, স্পষ্ট দেখলাম।'

'বাবু, সে ঝড়ে বাইরে থাকবে—?' লাফ দিয়ে ভানু উঠোনে নামে। শ্রীপতি আর কী করে বসে থেকে? সেও নেমে এল। বেগবান বাতাস তাদের উড়িয়ে নিয়ে যাবে যেন। ভানু ডাকতে ডাকতে ছুটল, 'কোকিলা, ও কোকিলা!'

ছুটে আসছিল গৌরমোহনের বউ। বুকের কাছে কাঠকুটোর পাহাড়, মাথার চুল ঝাপটা মারছে পিঠে। শাড়ি আলুথালু, বাতাসে বসন এলোমেলো। সে ভয়তরাশে ছুটে আসছিল, 'কী ঝড় উঠল গো, সেদিনের মতো!' বলতে বলতে তার যেন খেয়াল হয়, ছুটে দাওয়ায় উঠে গেল। কুটোর বোঝা রাখল দাওয়ার এক ধারে। তারপর উঠোনে নামতে নামতে শাড়িতে গা ঢাকতে লাগল। শ্রীপতির নজরে এসেছে, ব্লাউজটা খুব ছেঁড়া। লাল শাড়িটিও। আঁচল টানতে টানতে বিড়বিড় করল কোকিলা, 'ফেঁসে গেল।'

শ্রীপতি দেখল ছেঁড়া শাড়ি দিয়ে ব্লাউজ ঢাকতে পারছে না গৌরমোহনের বউ। এ কী দশা! বিড়বিড় করল কোকিলা, 'বনে গেলে কাপড় ফাঁসেই, কী করব, উপায় নেই। কুটো ছাড়া রান্না হবেনি। না আছে কেরাচিন, না আছে কয়লা, ঘরে অতিথ!'

'আমরা চলে যাব।' ভানু বলল।

'কুথায় যাবে, সে আসুক।' বলতে বলতে সে উঠে যায় দাওয়ায়। ঘরের ভিতর ঢুকতে ঢুকতে বলে, 'মদরঞ্জির যা খাটনি, দাম মেলে না। ওর চেয়ে যদি কাপড় বুনত সে লোক, বাঁচা যেত, বনে ঢুকলেই পুরোনো কাপড় ফেঁসে যায়।'

শ্রীপতি চুপ করে আছে। ভানু বিড়বিড় করে, 'মাদুর না বুনলে মোদের অশ্বটিরে বন্দি করতে পারতে কি? বাবু, ওসব জাদুকরির ছল!'

শ্রীপতি মাথা নামিয়েই থাকে। চুপচাপ। বৃষ্টি এল যেন। ঠান্ডা বাতাসের ঝাপটা এসে লাগল শ্রীপতির গায়ে! বেশ ধারালো ভাব সেই বাতাসে। আকাশ থেকে এক ফোঁটা জলও পড়ল শূন্য উঠোনে, জাদুকরির দেশে।

ঠাকুর বলল, 'ভানুটা সেয়ানা, ছন্দক, কন্থক সব মিথ্যে! আপনি ওর খপ্পরে পড়ে গেছেন বাবু?

শ্রীপতি ফিরেছে কাঁথি থেকে। মীরগোদায় গত রাত্তিরে ছিল, বিকেলের ঝড়ের পর সন্ধ্যের সময় গৌরমোহন মদরঞ্জিওয়ালা ফিরেছিল একরাশ না বিক্রি হওয়া মাদুর নিয়ে। কিন্তু যার যেমন কপাল, সেই ঘোড়া আঁকা মাদুরটাই কিনে নিয়েছিল কাঁথির এক গেরস্ত। শুনে ভানুর যত দুঃখ, শ্রীপতির তার চেয়ে কম দুঃখ হয়নি। ঘোড়াটা তো তার। কিন্তু ভানু বলছে ঘোড়াটার উপর এমন মায়া বসে গিয়েছিল যেন ঘোড়া আর তার নিজেতে কোনো তফাতই ছিল না। ভানু বলছে, ঘোড়া হারায়নি, যেন সে নিজেই হারিয়ে গেছে। কত জন্মের, কতকালের সাথি তার!

ঠাকুর বলল, 'ভানুর কথা রাখুন, ও আপনারে কুহক করেচে।'

'তার মানে?' চমকে ওঠে শ্রীপতি!

'মানে ও আপনারে জাদু করেচে বাবু, ঘোড়া হারাইছে ঘোড়া পলাইছে, তার জন্য দশদিক খুঁজি বেড়াতি হবে? ভানুরে তাড়ান।'

'পাওয়া যাবে কী করে?'

ঠাকুর বলল, 'ও নিজেই ফিরে আসবে।'

'এ সময় তো যায় না।'

'দ্যাখেন কেউ চুরি করল কি না।'

কথাটা যে মনে হচ্ছে না শ্রীপতির তা নয়। চুরিও তো করতে পারে কেউ। চুরি করে বেচে দিয়েছে ওড়িশার ওদিকে। যাই হোক না, খুঁজতে তো হবে। থানায় একবার যাওয়া দরকার। ডায়েরি করা হয়েছিল প্রথম দিনই। থানা কি কোনো খোঁজ পায়নি?

ঠাকুর জিজ্ঞেস করল, 'কাল রাতি ছিলেন কোথা?'

শ্রীপতি জবাব দিল।

'সেখেনে কী?'

ঠাকুর যেন জেরা করছে। শ্রীপতি বিরক্ত হল। কিন্তু বিরক্ত হলে কী হবে, ঠাকুর তো ছিনেজোঁক। ধরেছে যখন ছাড়বে না। শ্রীপতি গায়ের জামা খুলে পাখার নীচে বসে হাওয়া খাচ্ছে, বলল, 'চা হবে?'

'হবে, কিন্তু আপনি হলেন মালিক। মালিক ওই খালভরাটার সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে, ওর কথায় উঠছে বসছে, বাবু, মোদের যে লাগে!'

'ঘোড়াটার খোঁজ করব না?'

'করবেন, কিন্তু তা বলে মীরগোদা গিয়ে থেকে গেলেন, পেলেন ঘোড়া?'

শ্রীপতি বলল, 'চা–টা আনো দেখি, বকতে ভালো লাগছে না।'

ঠাকুর বেরিয়ে গেল। ঠাকুর এই হোটেলের আয় থেকে কত যে সরায় তা তো শ্রীপতি জানে না। এই যে কাল রাতে ছিল না, ঘরখানা ভাড়া দিয়ে রোজগার করেছে কি না কে জানে। কাল তো বলেই গিয়েছিল না ফিরতে পারে। ফিরলে সোজা বাড়ি চলে যাবে।

গৌরমোহন মদরঞ্জিওয়ালা লোকটা ভালো। তারা ফিরে আসতে চেয়েছিল রাত্রেই, লোকটা আসতে দেয়নি। আজ সকালে তাদের নিয়ে চলে গিয়েছিল কাঁথিতে। দুপুর দুপুর। গৌরমোহনের সঙ্গে সেই গেরস্ত বাড়িতে পৌঁছোল।

শুনল মাদুর নেই। মাদুর তার ছেলের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে কলকাতায়। আজ সকালের বাসেই চলে গেছে তার চেনা লোকের সঙ্গে।

গৌরমোহন বলেছিল, ‘শ্রীপতিবাবু যদি বলেন তো আর একখানা অমন বুনে দিতে পারি, বাবুর কি চাই?’

‘পারবে বুনতে?’ ভানুর কথায় সন্দেহের ভাব।

‘পারব না কেন, ঘোড়া শুধু! বাঘ, গোলাপ বাগান, তাজমহল, নদী, পাহাড়, সমুদ্দুর, সব মাদুরে এঁকে দিতে পারব।’

‘ঘোড়াটা হবে কি?’ ভানু জিজ্ঞেস করেছিল।

‘খুব হবে।’

‘ঘোড়াটা তো চলে গেল কলকাতায়।’

গৌরমোহন হেসেছিল, ‘আবার হবে, কোকিলা এঁকে দেবে।’

‘কারে আঁকবে?’ ভানু বলেছিল।

‘কেন ঘোড়ারে।’

‘কোন ঘোড়া?’

‘আজ্ঞে হর্স ঘোড়া।’ গৌরমোহন বলেছিল, ‘অশ্ব যাহারে কয়।’

‘পক্ষীরাজ কি?’ শ্রীপতি জিজ্ঞেস করেছিল।

‘কন্থক কি, রাজপুত্রের ঘোড়া?’ ভানু জিজ্ঞেস করেছে।

‘যদি বলেন দুটো ডানা জুড়ে দেব।’

‘ওফ্! না, বাবুর ঘোড়া!’ ভানু বলেছিল অসহিষ্ণু হয়ে, ‘যে ঘোড়াটা পালিয়েছে, সেই ঘোড়া, খাঁটি অশ্ব, কন্থক যেন হয়, শূন্যপৃষ্ঠ ঘোড়া রাজধানীতে ফিরল।’

ঘোড়ার অর্ডার দিয়ে ভানুকে নিয়ে শ্রীপতি ফিরে এসেছে দীঘায়। সমস্ত পথটা ভানুর বকবকানি শুনতে হয়েছে তাকে। ভানু এখন চোল ধরেছে যাবে কলকাতায়। কলকাতায় চালান হয়ে গেছে ঘোড়া। কুহকিনী তাকে বন্দি করেছিল। তারপর তা কলকাতায় বেচে দিয়েছে গৌরমোহন। কেন বেচবে না, কলকাতায় যে ঘোড়ার মাঠ আছে। সেই মাঠে কত ঘোড়া না দরকার হয়। রেসের মাঠেই বিক্রি হয়ে গেছে শ্রীপতির ঘোড়া, তার কন্থক।

ভানুর কথা কখনো সত্য মনে হয়, কখনো মনে হয় অলীক। গাঁজায় দম দিয়ে ভানু ওইসব বলছে যেন। গৌরমোহনকে নিয়ে তারা গেরস্ত বাড়িতে হানা দিয়েছিল দুপুরবেলায়। গেরস্ত মানে এক বুড়ি। মস্ত এক পুরোনো বাড়ি। সেই বাড়ির কত দরজা কত জানালা, সব বন্ধ। সদর দরজা খুলে বেরিয়ে এসেছিল যে বুড়ি, তার কি একশো, দেড়শো বছর বয়স, নাকি আরও বেশি? চামড়া থলথলে, কোমর বাঁকা, চোখে মোটা কাচের চশমা। বুড়ি হি–হি করে হেসেছিল গৌরমোহনকে দেখে, ‘আবার এয়েচ, এবার কী নিয়ে এলে ও মানষি, তুমার ঘুড়াটা খুব সোন্দর।’

ভানু হামলে পড়েছিল, ‘অশ্বটা কই?’

‘কলকেতায়।’

‘কলকেতায় গেল কী করে?’

‘আজ সকালের বাসে চলে গেছে, ও জিনিস কেউ ঘরে রাখে?’

‘রাখে না?’ অবাক হয়েছিল শ্রীপতি।

‘না, ডাকাতি হয়ে যেতে পারে, পারে না?’ বুড়ি ফোকলা গালে হেসে বলেছিল, ‘দেখলেই মনে হচ্ছিল খাঁটি অশ্ব, আহা কেমন বুনেচে মদরঞ্জিওয়ালা, কাল রাতভর ঘোড়া দাপাইছে শানের মেঝেতে।’

'তবে!' ভানু ঘুরে তাকিয়েছিল শ্রীপতির দিকে। শ্রীপতি অবাক হয়ে বুড়ির কথা শুনছিল। বুড়ি বলছে মদরঞ্জির ঘোড়ার কথা। একেবারে আরবি ঘোড়া, ও ঘোড়ায় চেপে জজ–ম্যাজিস্ট্রেট ঘুরত পথে পথে।

'কবে?' ভানু জিজ্ঞেস করেছিল।

'এখন না, কতকাল আগে!' বুড়ি উবু হয়ে বসে পড়েছিল ভাঙা বারান্দায়, বিড়বিড়িয়ে বলে ছিল, 'আগের জন্মেও হতি পারে, মনে হয় তেমন!'

ভানু বলেছিল, 'এখন তো জজ–ম্যাজিস্টর মোটরে চাপে।'

'কী জানি!' বুড়ি মাথা নেড়েছিল, 'এমন সোন্দর ঘোড়া, এমন তার রূপ যে দেখলিই পছন্দ হবে, কীর'ম চিকন গতর, আহা ভালো জিনিসই বেচেছিল মদরঞ্জিঅলা।'

ভানু বলেছিল, 'দেখুন বাবু কী বলে, ও তো রাজপুত্রের ঘোড়া বিশ্বাস হল বাবু? ও আসলে সেই ঘোড়া, কন্থক।'

গৌরমোহন হেসেছিল, 'কোকিলার হাতের কাজ অমন, কিন্তু এসব নেবার লোক কই, বুড়ির কী খেয়াল হল, নিল।'

বুড়ি আবার উঠে দাঁড়িয়েছিল, 'মোর বেটা যখন চাপবে ওই ঘুড়ার উপর, বেটা যেন রাজপুত্তুর।'

গৌরমোহন হে–হে করে হেসে উঠেছিল, 'ভানুবাবু, তুমার মতন কথা বলে বুড়ি মা।'

ভানু গম্ভীর হয়ে বলেছিল, 'যা বলেছে ঠিকই তো বলেছে, বুড়িমার ছেলের ঠিকানাটা দাও দেখি গৌরবাবু।'

'ঠিকানা কে দেবে?' বুড়ির মাথায় কিছুই নেই। ছেলের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে পাড়ার লোক ধরে। সে কলকাতায় পান ব্যাবসা করে। আদায়ে যাচ্ছিল। কাজে, অকাজে বুড়ির ছেলের কাছে ওঠে। ঠিকানা যদি জানে, তবে সে। বুড়ি কিছুই জানে না।

'ছেলে কী করে?' ভানু জিজ্ঞেস করেছিল।

বুড়ি মাথা নেড়েছে, 'জানে না।'

'ছেলে কি রেসের মাঠে বাজি ধরে?'

মাথা ঝাঁকিয়ে ছিল বুড়ি দেওয়াল ধরে, 'কী জানি!'

'ছেলে কি ঘোড়া ছুটোয়?'

'কী জানি!'

'ছেলের নাম কী?'

বুড়ি ফোকলা গালে হেসে বলেছিল, 'খোকা।'

'খোকা মানে?'

'খোকা মানে খোকা। আহা খোকার কী রূপ, ঘোড়ায় চাপলি রাজপুত্তুর।'

ভানুর তখন সন্দেহ হয়েছিল। মদরঞ্জিওয়ালাকে জিজ্ঞেস করেছে, 'সত্যি সত্যি ছেলে আছে তো?'

'আমি কী জানি!'

'বাহ্! ঘোড়াটা কার কাছে গেল, তা জানবে না গৌরবাবু?'

গৌরমোহন বলেছিল, 'পয়সা পেয়েছি, হয়ে গেছে।'

'বাহ্ রে! অত সোন্দর ঘোড়াটা দিল তুমার কোকিলা বধূ, তারে কোথায় পাঠাচ্ছ, সে খোঁজ রাখবে না?'

মাথা দুলিয়েছিল গৌরমোহন, দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিল, 'নাহ্! অত মায়া রাখলি পরের কাজটা হবে না।'

'কিন্তু অমন একখানি আরবি ঘোড়ার মতন ঘোড়া!' শ্রীপতি বলেছিল।

'যাক, অমন কত হবে।'

'সত্যি হবে?'

'তাই–বা কী করে বলি!' গৌরমোহন বিনবিন করছিল।

'বলা যায় না?' ভানুর জেরার শেষ নেই।

'না, কখন কে ধরা দেয় তা কি বলা যায়?'

ভানু গা টিপেছিল শ্রীপতির, 'শুনছেন কথা?'

'শুনছি।'

'এবার বিশ্বাস হচ্ছে?'

'হচ্ছে।' বলে গৌরমোহনের কথা শুনছিল শ্রীপতি। গৌরমোহন বলছিল, 'সবই কোকিলার মর্জি। কখন তার মন হবে আঁকার, তবে তো সে আঁকবে। কখন তার কাছে ধরা দেবে ঘোড়া, তবে তো সে তাকে এঁকে দেবে মদরঞ্জিতে।' এ হল এক খেলা, এ খেলা বলে বোঝাতে পারবে না গৌরমোহন।

বুড়ি ঢুকে গিয়েছিল বাড়ির ভিতরে। দরজা টেনে দিয়ে সেই নিঝুম পুরী থেকে বেরিয়ে এসেছিল তিনজন। বেরোতে বেরোতে ভানু জিজ্ঞেস করেছিল আবার, 'বুড়ির কোনো ছেলে আছে কি?'

'কী দরকার ওসব খোঁজে?' গৌরমোহন বলেছিল।

ভানু বলেছিল, 'ঘোড়াটা কার কাছে পাঠাল, ও বুড়ি সহজ নয়। খোকা! নামটা পর্যন্ত বলল না, খুব সেয়ানা!'

তারপর তো গৌরমোহনকে অর্ডার দিয়ে ফিরেছে তারা। ভানু বাস স্ট্যান্ড থেকে সমুদ্রের পাড়ে চলে গেল। শ্রীপতি পাখার বাতাসে ঘাম শুকোচ্ছে, চায়ের গ্লাস নিয়ে ঢুকেছে ঠাকুর, বলল 'বউদিমণি এয়েছিল।'

'হুঁ।' শ্রীপতি চায়ে চুমুক দিল।

'নার্স দিদিমণিও এয়েছিল।'

'হুঁ।' শ্রীপতির কিছুই শুনতে ইচ্ছে করছে না। কাল দুপুরে মীরগোদার বালিয়াড়িতে দেখা কোকিলা বধূ, তারপর ঝড়ের ভিতরে মনে আঁকা কোকিলা বধূ, রাতের অন্ধকারে নিঝুম হয়ে থাকা কোকিলা বধূ তার মাথার ভিতরে মেঘের মতো ছেয়ে গেছে যেন। কী আশ্চর্য সেই সোনালি মেঘ!

ঠাকুর ডাকল, 'বাবু শুনছেন?'

'শুনছি।'

ঠাকুর বলে, 'ভারতী দিদিমণি আর বউদিমণির মুখোমুখি দেখা এখেনে।'

'হুঁ।' শ্রীপতি চোখ বুজে আছে। কাল থেকে ভানু ছিল তার পাশে ছায়ার মতো। ভানুর জ্বালায় কি একা হওয়ার উপায় ছিল? বাসেও সারাক্ষণ ভানু তার কানের কাছে বকবক করে গেছে। এখন শ্রীপতি যেন নিশ্বাস ফেলতে পারছে। ভাবছিল গৌরমোহনের কোকিলার কথা। কী তার হাতের গুণ। চাঁদের আলোয় বসে বন্দি করে ফেলল পক্ষীরাজকে। যাকে কোনোদিন সামনাসামনি দ্যাখেনি, তাকে মনে মনে অবিকল এঁকে ফেলেছে মদরঞ্জিতে!

ঠাকুর ডাকল, 'বাবু কি ঘুমোলেন?'

রাগ হয়ে গেল শ্রীপতির, একটু একা হওয়ার উপায় নেই!

ঠাকুর বলল, 'তুলকালাম হয়ে গেছে দুজনায়।'

'কী হয়েছে?' ভ্রূ কুঁচকে শ্রীপতি জিজ্ঞেস করে।

'কী হয়নি তাই বলুন? মেয়েছেলে মেয়েছেলেয় মারামারি হতে যাচ্ছিল। হয়নি আমার জন্যে, লোক জমে গিয়েছিল, থাক ওসব কথা, আপনি বরং বিশ্রাম নিন, রাতে খাবেন তো?'

'কথা থাকবে তো বললে কেন?'

'না বললেও তো উপায় নেই বাবু।' ঠাকুর চলে গেল। চলে গেল শ্রীপতির মাথা ভার করে। ভানুকে সমুদ্রের ধারে পাঠিয়ে একা হয়ে শ্রীপতি হিসেব কষছিল কীভাবে কোকিলা বধূ ঘোড়াটাকে এঁকে ফেলেছিল। মদরঞ্জির ঘোড়াটাকে সে নিজে না দেখলেও ভানুর কথায় বোঝা গেছে অবিকল পক্ষীরাজ! এখন তো ভানুর বদলে মাথায় ভারতী চৌধুরি আর মধুমিতা মাইতির কণ্ঠস্বর! ঠাকুর কথাটা কাল সকালেও বলতে পারত। মাথা ভার করতে বলে দিয়ে নিশ্চিত খি–খি করে হাসছে বাইরের অন্ধকারে বসে। শ্রীপতি ডাকল, 'ঠাকুর, ও ঠাকুরমশায়!'

'আজ্ঞে।' ঠাকুর সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দিল, দরজায় এসে দাঁড়াল।

'ভারতী কী বলতে এসেছিল?'

'কিছু না, খোঁজ নিতে এয়েছিলেন আপনি কোথায়, বাবু বলে যাননি?'

'টায়েম পেলাম কই?'

'বাবু, আপনি ওই ভানুরে তাড়ান।'

'ও কী করল?'

'ওই তো আপনাকে ঘুরোয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে, সাইকেল কই?'

'মীরগোদায়।'

'ভানুরটা?'

'মীরগোদায়, আমরা তো ওখেন থেকে কাঁথি গেলাম আজ সকালে।'

'এবার সাইকেল কী করে পাবেন?'

'মদরঞ্জিওয়ালা ফেরত দিয়ে যাবে।'

ঠাকুর বলল, 'যেখেনে যান ওই দুজনকে বলে যাবেন তো, গিন্নি ব্যস্ত হন, আবার উনিও তো পেরায় গিন্নির মতোই ব্যস্ত, দুজনে কেউ কাউরে সহ্য করতে পারেন না, আর পারার কথাও তো নয়।'

শ্রীপতি চুপ করে থাকে। বলে যায় ঠাকুর। বলতে বলতে ঠাকুর দ্যাখে শ্রীপতিবাবুর চোখ বোজা। ঘুমিয়ে পড়ল! ঠাকুর আলতো করে ডাকে, 'বাবু শুনছেন!' সাড়া না পেয়ে ঠাকুর বেরিয়ে যায়। বাইরে অন্ধকারে এসে ভাবল গিয়ে খবর দেবে নাকি হাসপাতালের সিস্টার ভারতী দিদিমণিকে! উনি বাবুর বিয়েওয়ালা মেয়েমানুষ নন, কিন্তু বাবুর ওপরে ওঁর দাবি যেন সেইরকম, তার চেয়েও যেন বেশি। এতে বাবুর দুই ছেলেমেয়ের মা মধুমিতা মাইতির খুব রাগ। সেদিন ঝগড়ায় যা জানা গেছে তা হল নার্স দিদিমণি ভারতী চৌধুরি নাকি অনাথ। বাপ–মায়ের খোঁজ নেই ওঁর। বাবুর বউ তো যা–তা বলে কাঁদিয়ে দিল ভারতী চৌধুরিকে। মেদিনীপুরের অনাথ আশ্রমের মেয়ে সিস্টার দিদিমণির জন্মের ঠিক নেই!

ঠাকুর ডাকল, 'ঠাকরানি শুনছিস?'

ঠাকুরানি রান্নাঘর থেকে সাড়া দেয়, 'কী?'

'আমি যাই দিদিমণিরে খপর দিই।'

'কীসের খপর?'

ঠাকুর জবাব না দিয়ে অন্ধকারে বেরিয়ে পড়ে। ঠাকুরের পক্ষপাত আছে নার্স দিদিমণিতে। বাবু শ্রীপতি মাইতির মা যখন হাসপাতালে গিয়ে মরো মরো, সেবা করেছিল ভারতী চৌধুরি। সেই থেকে আলাপ। প্রেম এখন গভীর, তাই তো জানে ঠাকুর, কিন্তু তা যদি হয় সব কথা শুনে বাবু চোখ বুজে পড়ে থাকল! ঠাকুর হাঁটছে অন্ধকারে। শ্রীপতি মাইতির মনের তল বোঝা ভার, নইলে ভানুকে কেউ ঘোড়া খুঁজতে পাঠায়? ভানুর সঙ্গে বেরোয় ঘোড়ার খোঁজে? ভানুর মতো আধপাগলার হাতে ঘোড়ার দেখভাল করতে দেয়?

ঠাকুর ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে শ্রীপতি উঠে বসে। ঘরের আলো নিভিয়ে দিয়ে অন্ধকারে নিশ্চুপ বসে থাকে। তার সমস্ত শরীরে দু–দিনের জমা ক্লান্তি। গত রাতে তো প্রায় ঘুম হয়নি মীরগোদায় গৌরমোহনের ভিটেতে। দাওয়ার এক ধারে ভানু অন্য ধারে সে শুয়েছিল, কিন্তু তাতে কী হল? উঠোনে তো বসেছিল দুজনে। মদরঞ্জিওয়ালা আর তার বউ কোকিলা। তারা দুজনে কত রাত পর্যন্ত উঠোনে বসে বিনবিন করছিল। অমন মেয়েমানুষ কাছেপিঠে থাকলে কি ঘুম হয়? অথচ তার মনে যে কু–ভাব জেগেছিল তাও তো নয়। সে অবাক হয়ে দেখেছিল আধো জ্যোতস্নায় জাদুকরি কুহকিনী বসে আঁক কাটছে উঠোনের ধুলোতে। গৌরমোহন উবু হয়ে বসে তা দেখছে। তারা কখন যে ঘরে গিয়েছিল তা জানে না শ্রীপতি। তবে রাত দেড়টা পর্যন্ত তার নিজেরই সাড় ছিল তো। হাতের রেডিয়াম ডায়াল সে দেখছিল বারে বারে।

ঠাকুরানি দরজায়, ‘খাবেন তো বাবু?’

‘না।’

‘খেয়ে আসা হয়েচে?’

‘হ্যাঁ।’

‘এ কীরকম কথা, গেরস্তর অকল্যাণ হবে।’

হেসে ফেলল শ্রীপতি, ‘গেরস্ত তো আমি নিজে।’

‘রানছি তো আমরা।’

‘রানছ বলে গেরস্ত হলে?’

‘হ্যাঁ হলাম।’ ঠাকুরানি সরে যায় বিড়বিড় করতে করতে, ‘না খাবে তো রাতে থাকা কেন, বাড়ি ফিরলেই পারতে, বউদিমণি খুশি থাকত।’

শ্রীপতি শুয়ে পড়ে। জানালা খোলা। জানালার পাশেই দাঁড়িয়ে থাকত তার পক্ষীরাজ। আশ্চর্য! চোখ বুজলেই মনে হচ্ছে যেন আছে। এই ঘরটা তার নিজের। খুব চাপ না থাকলে এই ঘর ভাড়া দেওয়া হয় না। সেই পঁচিশে ডিসেম্বরের সময়ে বা পয়লা বৈশাখের সময়ে খুব চাপ পড়ে, পুজোর সময়ও। কতরকম মানুষ, কতরকম জোড় তাদের! শ্রীপতির মনে হয় সেও যেন জোড়ে এসে ওঠে এই হোটেলে। কীরকম লাগে তখন? কিন্তু জোড়ের আর একজন কে? ভারতী, না মধুমিতা। নাকি—? শ্রীপতি চোখের উপরে আড়াআড়ি তার হাতটা ফেলে দেয়। অন্ধকারের ভিতরে ভারী নিশ্বাসের শব্দ কানে আসে তার। চমকে ওঠে। ঠিক যেন পক্ষীরাজ। জানালা দিয়ে মুখ বাড়াচ্ছে ঘোড়াটা। কী অদ্ভুত জীব! কতদিন মধ্যরাতে জেগে উঠে শ্রীপতি দেখেছে ঘোড়াটা পাথরের মূর্তি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু তার নিশ্বাসের শব্দ কানে আসছে। আবার এক–একদিন দেখেছে ঘোড়াটা তাকিয়ে আছে আকাশে। আশ্চর্য! ঘোড়ারা রাত জাগে! এক–একদিন দেখেছে ঘোড়ার মুখ তার জানালায়। জানালা দিয়ে ঘরের অন্ধকারে তাকিয়ে আছে পক্ষীরাজ। এখন তন্দ্রার ঘোরে শ্রীপতির মনে হচ্ছে ঘোড়া আছে জানালার ওপারেই। ঘোড়া না থাক তার ছায়া আছে। বর্ণহীন ছায়া। নাকি বর্ণহীন অশ্ব? বর্ণহীন অশ্ব কি দেখা যায়? জলের মতো ঘোড়া? পক্ষীরাজ জলের মতো হয়ে গেছে! বাতাসের মতো? ভানুর কথা যদি সত্যি হয় তবে তার পক্ষীরাজ এখন কলকাতা শহরে। ভানুর কথা যদি সত্যি হয় তবে ঘোড়াটা এখন রেসকোর্সের জকিদের আস্তাবলে। আর না যদি সত্যি হয় তবে ঘোড়াটা কি সত্যিই বর্ণহীন হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তার জানালার ওপাশে? চোখ থেকে হাত সরায় শ্রীপতি। দেখল জানালা থেকে একফালি জ্যোতস্না এসে পড়েছে খাটের উপরে। বিছানার বাকি অংশে গ্রিলের নকশা আঁকা হয়ে গেছে। জানালার ওপারে কে যেন দাঁড়িয়ে। কে? কে হতে পারে? হতে পারে তো পক্ষীরাজই। ওই জায়গা পক্ষীরাজের। পক্ষীরাজ হারিয়ে জায়গাটা শূন্য হয়ে পড়ে আছে। মাটি কি একা থাকে? সে মাটিতে হয় গাছ থাকে, না হয় ফসলের খেত থাকে। মানুষ হেঁটে বেড়ায়। পাখিরা খুঁটে খেতে নামে। কিছু না হলে

পোকামাকড়, লতাগুল্ম তো থাকে। ভিতরে ইঁদুর থাকে, সাপ থাকে, ব্যাং থাকে। উপর দিয়ে হাওয়া বয়ে যায়। রাতে জ্যোতস্না পড়ে ভরা মাটিতে। এখন শূন্য ভুঁইয়ের জ্যোতস্না যেন ডাকছে তাকে। শ্রীপতি দেখছে জানালার মুখ অন্ধকার হয়ে গেল।

'কে?' ডাকল শ্রীপতি, 'পক্ষীরাজ?'

'আমি।'

'কোথায় গিছিলি রে?' শ্রীপতি জিজ্ঞেস করল ভাঙা গলায়।

'আমি!'

'কে?' শ্রীপতির মনে হল ঘোড়াটা নয়। হারানো ঘোড়া কি এত সহজে ফিরবে? তাহলে কে? গৌরমোহন? নাকি কোকিলা? শ্রীপতি ডাকল, 'কোকিলা!'

'আমি?'

'তুমি কি ঘোড়াটারে নিয়ে গেলে কুহক করে?'

শ্রীপতি শুনল, 'আমি মাইতিবাবু।'

শ্রীপতি বলল, 'কী করে কুহক করলে? তারে কি নিশীথে ডেকে নিয়ে গেলে উঠোনে আঁক কষে? ও কোকিলা!'

'কোকিলা কে?' জানালার অন্ধকার ডাকল তাকে, 'ও মাইতিবাবু!'

শ্রীপতি এবার তার রেডিয়াম ঘড়িতে সময় দেখল সাড়ে বারোটা। গভীর ঘুমে তলিয়ে যেতে যেতে জেগে উঠল, নাকি এ তার স্বপ্ন? জানালার ওপারে শূন্য ভুঁই আর শূন্য থাকল না। ভরে উঠল কতদিনে বাদে!

অন্ধকার থেকে চাপা স্বর উড়ে এল, 'আমি ভারতী।'

'ভারতী!' উঠে বসল শ্রীপতি, ভারতী চৌধুরী তার জানালায় দাঁড়িয়ে ডাকছে, 'মাইতিবাবু ও মাইতিবাবু, কোকিলা কে?'

শ্রীপতি মাইতি খাট থেকে নেমে অন্ধকারে গায়ে শার্ট গলিয়ে দরজা খুলল নিঃশব্দে। অন্ধকারে দরজায় তালা লাগাল। চাবিটা শার্টের পকেটে রেখে বেরিয়ে এল সমুদ্রপাখি হোটেল থেকে। ঠাকুর ঠাকুরানির জেগে থাকার কথা নয় এই সময়। সমস্ত দিন এত খাটে যে শুলে মড়ার মতো ঘুমোয় দুজনে।

রাস্তায় চলে এসেছে ভারতী, 'কখন থেকে ডাকছি!'

'ভাবলাম, ঘোড়াটা বোধ হয় ফিরে এল।'

'তুমি ফিরেছ তা ঠাকুর বলে গেল, এলে না তো।'

শ্রীপতি বলল, 'কাল সকালে যেতাম।'

'কোকিলা কে?'

'যে কুহক করে।'

'কে কুহক করে?'

শ্রীপতি বলল, 'কোকিলা বধূ, চলো তোমাকে ঘরে দিয়ে আসি, এত রাতে একা বেড়ানো কি ঠিক হয়েছে তোমার?'

'তোমার বউও তো ওই কথা বলল।'

'কী বলল, সে কোথায়?'

'সে তোমার সংসারে, বাড়িতে।'

'তো বলল কখন?'

‘তুমি শোনোনি? ঠাকুর তোমাকে বলেনি?’

‘বলেছে।’

‘আমি নাকি কুহকিনী, আমি কি তোমাকে কুহক করে ডাকি?’

শ্রীপতি হেসে ফেলল। মধুমিতা কি কথাটা ভানুর কাছে শুনেছে? হোটেলের পঞ্চম ঠাকুর যেমন এই নার্স দিদিমণির পক্ষে, ভানু তেমন মধুমিতার পক্ষে। তার দুই সাকরেদ দুই পক্ষ নিয়েছে, মনে হয় শ্রীপতির। কিন্তু ভানু যে কুহকিনীর কথা মধুমিতাকে বলবে তা ভাবতে পারেনি সে।

‘তোমার বউ আমার মাথা হেঁট করে দিয়েছে।’

‘রাগ কোরো না।’ শ্রীপতি বলল, ‘তুমি তো জানো ও তোমাকে সহ্য করতে পারে না।’

‘কেন পারে না? আমি কি তোমার সম্পত্তির ভাগীদার হচ্ছি?’

‘আহা তা কেন, ভাগীদার তো হয়েছ।’

‘আমি কি কুহক করতে পারি, কীভাবে কুহক করে? সেই সন্ধ্যে থেকে বসে আছি তোমার জন্য, মনে মনে কত টান না টানছি, ভেবেছিলাম ফিরলেই ঠাকুরের কাছে সব শুনে তুমি আসবে, এলে না তো?’

দরজা খোলে ভারতী। শ্রীপতি ভাবল এবার চলে যায়। কিন্তু ছাড়বে কেন ভারতী, তার জামা টেনে ধরল পিছন থেকে, ‘যাচ্ছ!’

গলার স্বরে এমন মায়া যে বুকে ধক করে লাগে। ওই মায়ায় না সে ভারতী চৌধুরির টানে পড়েছে সেই কতদিন থেকে! মা ছিল হাসপাতালে, ভারতী ছিল মায়ের সিস্টার। তখন ভারতী আর মধুমিতার কী ভাব! যেন দুই বোন। দুই সখী। মা সুস্থ হয়ে ঘরে ফিরলে সখীর কাছে আসতে লাগল ভারতী। তারপর সমুদ্রপাখি হোটেলে শ্রীপতির খোঁজে। কবে যে শ্রীপতির দিকে তার মন পড়ল তা শ্রীপতিও জানে না। আর শ্রীপতিরই বা কবে মন গেল তার দিকে তা কি সে নিজে জানে? মধুমিতার সখী, সই হয়ে গেল শ্রীপতির সখী! শ্রীপতি বলল, ‘কাল সকালে না হয় কথা সব শুনব।’

‘না, থেকে যাও।’

‘তোমার এখেনে থাকা কি ভালো দেখায়?’

‘তুমি কি থাকোনি আগে?’

‘ভোরবেলায় উঠে গেছি।’

‘আজও না হয় তাই যেয়ো।’

শ্রীপতি বলল, ‘না আজ যাই।’

‘না থেকে যাও, তুমি গেলে আমি ঘরে থাকব না, অসহ্য! ঘরটাকে যেন সেই জেলখানা মনে হচ্ছে কাল থেকে। বেরোতে পারছিনে, তোমার বউ আমাকে বেজন্মা বলে গালি দিল, আমি নাকি কুহকিনী!’

‘ওসব ভানু বলেছে মধুমিতাকে।’

‘ভানু!’

‘হ্যাঁ ভানু।’ শ্রীপতি ঢুকে পড়েছে ভারতীর ওয়ান রুম কোয়ার্টারে। বসেছে সিঙ্গল বেড খাটটিতে। ভারতী বসেছে মেঝেয় তার পায়ের কাছে, আচমকা সে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে, ‘তুমি শুনেও এলে না!’

‘আমার মন ভালো নেই।’

‘কেন, কী হল?’

‘ঘোড়াটা।’

‘আবার একটা কেনো না হয়।’

মাথা নাড়ে শ্রীপতি, ‘টাকায় সব হয়? কিনলে হবে? ওই ঘোড়াটা পাব?’

‘ঘোড়া তো পাবে।’

‘যা হয় পেলেই হল, তাহলে তুমি এত রাত্তিরে গেলে কেন আমাকে ডাকতে?’

‘মন টানছিল।’ বিড়বিড়িয়ে বলে ভারতী।

‘মন আমারও টানছে,’ বলল শ্রীপতি, ‘ঘোড়াটা বোধ হয় কলকাতায় চালান হয়ে গেছে।’

‘কে বলল?’

‘শুনছি তাই, ভানু বলছিল, অদ্ভুত সব কথা বলে ও, বলে কিনা ও হল ছন্দক...।’

ভারতী বলল, ‘ভানুর কথা বাদ দাও, কোথায় গিয়েছিলে ওর সঙ্গে, ঘোড়া খুঁজতে?’

শ্রীপতি বলল, ‘ঘোড়াটারে কুহকে টেনে নিয়ে গেছে।’

‘কে?’

‘সে একজন।’ শ্রীপতি বিছানায় কাত হল, ‘তুমি কোথায় ঘুমোবে?’

‘ঘুমোব না।’

‘জেগে থাকবে?’

‘কথা বলব।’ ভারতী দেওয়ালে পিঠ দিয়ে বসেছে, ‘তোমার বউয়ের মুখ এত খারাপ, কী নোংরা, অমন মেয়েছেলেরে সহ্য করো কী করে?’

শ্রীপতি কথা বলে না। সাড়া না পেয়ে ভারতী তার কথা থামায় না, বলে, ‘আমার না হয় বাপ মা ছিল না, আমি আকাশ থেকে নামলাম, না আস্তাকুঁড়ে জন্মালাম সে আমার ব্যাপার, বাপ মায়ের কোলে না জন্মেও অমন ভাষা তো মুখে আসে না আমার।

‘থাক।’ শ্রীপতি হাত তোলে।

‘থাকুক, আমারও বলতে ঘেন্না হয়, কত আশায় নিজের দুঃখের কথা বলেছিলাম ওকে।’

‘কী আশা, ও তোমার দুঃখে কাতর হবে?’

‘না, তবে দুঃখটা বুঝবে।’

‘বুঝে কী করবে, স্বামীকে দিয়ে দেবে তোমার হাতে?’

বড়ো বড়ো চোখে তাকিয়ে আছে ভারতী, মাথা নাড়ছে, ‘তা কেন, তবে ও যে দশজনের সামনে পথে দাঁড়িয়ে সবাইকে শোনাবে আমার আশ্রমের কথা তা কি আমি জানতাম? আশ্রমে কি সুখে ছিলাম আমি?’

শ্রীপতি দেওয়ালে তাকাল। অনাথ আশ্রমের ছবি। কে যেন এঁকে দিয়েছিল ভারতীকে। সে কে? ভারতী তা বলেই না। তবে স্কেচ পেনে আঁকা কালো রেখায় টানা আশ্রম বাড়িটা দেখলে শ্রীপতির চোখের সামনে সব পরিষ্কার হয়ে ওঠে। মেদিনীপুর শহরের পশ্চিম প্রান্তে, কংসাবতী নদীকে বাঁ-দিকে ফেলে রেখে সেই ফুলপাহাড়ির গায়ে জেলখানার মতো উঁচু প্রাচীরে ঘেরা অরফ্যান হোম। হোমে চুলোচুলি করতে করতে, ঝগড়া করতে করতে বড়ো হয়েছে ভারতী। কিন্তু এখন সে একেবারে শান্ত। কীরকম জামা ধরে টানল তাকে পেছন থেকে, অবোধ প্রাণী যেন।

প্রাচীরের আড়ালে অনাথ মেয়েরা আর তাদের গার্জেন, সুপারিনটেন্ডেন্ট সুলতা দত্ত, মোটাসোটা কালো চেহারা, চোখে হাই পাওয়ারের চশমা। ‘দিদি একদম হাসতে জানত না। দিদি কড়া শাসনে রাখত আমাদের। পান থেকে চুন খসার উপায় ছিল না। কতরকম শাস্তি ছিল আমাদের, তা কি জানো তুমি মাইতিবাবু? ভাত তো বন্ধ হলই, আরও কতরকম। একটা মেয়ে বছর পনেরো হবে বোধ হয়, সে হোমের বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখত ফুলপাহাড়ির টিলার উপর বসে একটা ছেলে ছবি আঁকছে। ছবি আঁকতে আঁকতে ছেলেটা একদিন তাকে দেখতে পেল। ওই দ্যাখো, ওই যে বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটি, দূর থেকে চেনা যেত না তো, তাই কেমন অন্ধকার অন্ধকার লাগছে। ছেলেটা নেচার স্টাডি করত। ওদিকটা তো খুব সুন্দর ছিল, শালবন, ইউক্যালিপ্টাসের সার, টিলা,

লালমাটি, আর বাঁশি বাজানো সাঁওতাল ছেলে, বাগাল ছেলে, গোরু মোষের পাল। তো কী হল জানো মাইতিবাবু, ছেলেটা দেখত একটা মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে বারান্দায়, কতদূরে! মুখই চেনা যায় না। আর সেই মেয়েটাও দেখত ছবি আঁকছে একজন। তাকে সে চিনতে পারত না। বোঝা যেত একটি পুরুষ। তারপর সেই পুরুষ একদিন ফুলপাহাড়ির ইরিগেশন বাঁধে দাঁড়িয়ে হাতছানি দিল। তার কাঁধ ছুঁয়েছে বাবরি চুল, পাজামার সঙ্গে নীলরঙের পাঞ্জাবি, চোখে সোনালি ফ্রেমের চশমা। মেয়ে সাড়া দিল হাত তুলে। তারপর একদিন দুপুরে পাঁচিল টপকে সে পালাল। বিকেলের প্রেয়ারের সময় ধরা পড়ে গেল সে নেই।'

'কী নাম ছিল?'

'ধরো মীনাক্ষী, সুলতা দত্তর ছিল শকুনের চোখ, ধরে ধরে সব মেয়েকে জেরা করতে লাগল। কেউ কেউ তা জানত। সবাই মুখে কুলুপ এঁটে বসেছিল। সুলতা দত্ত তখন পুলিশে গেল। সারারাত কোনো মেয়ের ঘুম নেই। তারা সবাই ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে লাগল। মীনাক্ষী যেন না ফেরে। ওকে যেন পুলিশ না পায়। কিন্তু পরদিন পুলিশ পেল ওকে। পুলিশের গাড়ি ফেরত দিয়ে যায় মীনাক্ষীকে। সঙ্গে একরাশ ছবি। সব সেই ছেলেটার আঁকা। ছেলেটাকে হাজতে ভরে ছবিগুলো কেড়ে নিয়েছিল পুলিশ—ওই যে সেই ছবি।

'সুলতা দত্ত সব মেয়েকে ডাকল পরদিন। সবার সামনে দাঁড়িয়ে কত কথা! মীনাক্ষীর মাথা কিন্তু একটুও নীচু হয়নি। সিঁথির সিঁদুরও তোলেনি সে। সুলতা বোঝাচ্ছিল, এর ফল কী হতে পারে। আর একটা অনাথ আশ্রমে শিশু আসবে জগতে। অনাথ আশ্রমের মানুষ বাড়বে। তাহলে কোনোদিন কোনো অনাথ আশ্রম বন্ধ করা যাবে না, পাঁচিল ভাঙা যাবে না অনাথ আশ্রমের?'

'তারপর?'

'সুলতাদি বলত, ''যত তাড়াতাড়ি অ্যাবলিশ হয়ে যায় অনাথ আশ্রমগুলো তত ভালো।'' '

'তারপর কী হল?'

বলতে বলতে ঘুমিয়ে পড়েছিল ভারতী। যতবার এই ঘরে ঢোকে শ্রীপতি, অনাথ আশ্রমের ছবিটা দেখে মনে পড়ে যায় ভারতীর দেওয়া বিবরণ। এখন দেওয়ালে পিঠ দিয়ে ভারতী চোখ বুজে আছে, শ্রীপতি ডাকল, 'ঘুমোলে?'

জবাব পায় না শ্রীপতি। এখন সে চলে যেতে পারে, কিন্তু বাড়িটা যে খালি থাকবে, দোর খোলা থাকবে। সে জানালার ধারে বসে সিগারেট বের করে পকেট থেকে। তখন ভারতী জেগে ওঠে তন্দ্রা ভেঙে, সে চোখ মেলেই জিজ্ঞেস করল, 'কোকিলা বধূ কে, তুমি যে বলছিলে?'

হোটেলের টাকা এসেছিল ভীমাপুর, বালিমুন্ডার জমি বেচে। বালিমুন্ডা ওড়িশায়, জলেশ্বর থেকে আরও দক্ষিণ–পশ্চিমে এগিয়ে সমুদ্রের কাছাকাছি। সেই যে কবে সমুদ্র সরে গিয়েছিল তা কেউ জানে না, কতকাল আগে! কত শত বতসর আগে শ্রীপতির ঠাকুরদা শ্রীনিবাস মাইতি বলত। তখন শ্রীপতি কত ছোটো, কিন্তু কথাগুলো মনে এমন ধরেছিল যে ভোলেনি। সমুদ্র কখনো সরে, কখনো এগিয়ে এসে ভাঙে। যদি সরে তো বানিগাছের জঙ্গলে ফেলে যাওয়া চর ঢেকে যায়। সেই চর আস্তে আস্তে উর্বরা হয়। ঝরা পাতা মাটিতে পচে পচে বালি মাটি ক্রমশ ফসল ধারণের উপযোগী হয়ে ওঠে। সময় দিতে হবে তো তাকে। তখন আগে জমি দখলের কথা। বালিমুন্ডার জমি ছিল পাহাড়ি জমিদারদের সম্পত্তি। তাদের বাড়ি সাগরেশ্বরে। সাগরেশ্বর এদিকেই। এদিকে বলেই শ্রীপতির ঠাকুরদা, তার বাবা পত্তনি পেয়েছিল অত সম্পত্তি। খাজনা সামান্য, জমি অঢেল। তারপর জমিদারি অধিগ্রহণের সময় ওই সম্পত্তি ভুয়ো কাগজে শ্রীপতির ঠাকুরদা নিজের নামে করে নেন। তিনি ছিলেন নায়েব। নায়েবে কী না পারত তখন! সাগর কেনাবেচাও করতে পারত শোনা যায়।

বালিমুন্ডার জমিতে গোলমাল এদিকের মতো নয়। ওদিককার চাষা মানুষ খুব ভীরু, শান্ত। এদিকের চাষারা যেমন দাবি করে, বর্গা লেখায়, জমি দখল করে নেয়, ওদিকে সেই সমস্যা নেই–ই। মালিক আর চাষা। চাষা গলা তুলে কথা বলল তার চাষ চলে গেল। কত মানুষ চাষের জন্য বসে থাকে। অঘ্রানে ধান ওঠার পর, সব হিসেবনিকেশ করে শ্রীপতি ফিরে এলে প্রায়ই ওদিকের লোক হোটেলে এসে তাকে খোঁজে চাষের ব্যবস্থা করার জন্য। সেইরকম একটা লোক এসেছিল। যে চাষাকে দেওয়া হয়েছিল বিঘে দেড়েক, সে নাকি আচমকা মরে গেছে, সামনে বর্ষা, জমি কী পড়ে থাকবে, না মাইতিবাবু চাষে দেবেন? চাষে যদি দেন তো সে করতে পারে। অনেক দিন ধরে তো ঘুরছে সে মাইতিবাবুর জমি চাষের জন্য। ‘চাষবাড়িতে বাবু কবে যাবেন?’

‘কী নাম?’ শ্রীপতি জিজ্ঞেস করে।

‘আজ্ঞা মোর নাম বিষ্ণু, বিষ্ণুপদ পাতর।’

‘চাষবাড়ির রামচন্দ্র কী বলল?’

‘আজ্ঞা আপুনার নিকট পাঠাই দিলা, আপুনি না কহিবে তো হিবে কী করে?’

খুশি হল শ্রীপতি। রামচন্দ্র মণ্ডল তার চাষবাড়ির নায়েব। সে যে ওখেনে বসে উলটো কলকাঠি নাড়ছে না তাতে আশ্বস্ত হওয়া গেল। জমি এখনও বহুকাল থাকবে। রাখবে শ্রীপতি। এভাবে জমি তো এপারে রাখা যায় না। ফ্যামিলি সিলিং আইন সব জমি খাস করে দিচ্ছে। দেশ থেকে যদি জমির মালিক চলে যায়, তবে সে দেশের থাকে কী? জমি না থাকলে মানুষেরই বা থাকে কী? মানসম্মান সবই তো জমি দেয়। জমিই টাকা দেয়। হোটেল দিয়েছে শ্রীপতি মাইতিকে। জমি যত ইচ্ছে ফুর্তি দেয়। শ্রীপতি ইচ্ছে করলেই তার চাষবাড়িতে মেয়েমানুষ রাখতে পারে। রাখেনি ওসব। যদি রাখত, জেনেও কিছু বলত না মধুমিতা। অথচ ভারতী চৌধুরিকে মানবে না। মেনে নেবেই না। আশ্চর্য!

শ্রীপতি বলল, ‘মরল কী করে চাষা?’

‘আজ্ঞা জমিনে হাল নামাইছিলা, এক হাল করার পর দুফুরে ঘরে ফিরিলা, বুকে বেদনা উঠিলা তখন, ছটফট কইরতে কইরতে মরি গিলা যোগেন।’

‘তার কে আছে?’

‘বেটা আছে, বহু আছে।’

‘বেটা কত বড়ো?’

'জুয়ান বেটা।'

'কী করে?'

'চাষ কাজ করে, মজরি খাটে।'

'সে কী করবে?'

'সে তো করিবে কইছিলা, কিন্তু রামচন্দ্রর কহিলা হিবেনি, বাপ চষিত তাই বেটাও চষিবে ইমন কানুন নাই।'

'নাই তো।' শ্রীপতি খুব খুশি হল এই খবরে। এদিকে হলে অন্যটাই ঘটত, বাপ চষত, তাই ছেলে চষবে। এইভাবে বাপের পর ছেলে, ছেলের পর নাতি, বংশ পরম্পরায় জমি চষলে সে জমিতে চাষার অধিকার জন্মে যায়। তার সেই অধিকার থেকেই বর্গাদারি হয়। একই জমি বছরের পর বছর চষতে চষতে চাষার মায়া বসে যায় সেই জমিতে। চাষা সেই জমি নিজের মনে করতে আরম্ভ করে।

শ্রীপতি জিজ্ঞেস করে, 'যোগেনের বেটার নাম কী?'

'আজ্ঞা মহাদেব, মহাদেব পাতর বটে।'

'তুমি বিষ্ণু পাতর?'

'আজ্ঞা ঠিকই কহিছেন।'

'যে মরেছে সে তোমার কে হয়?'

'আজ্ঞা বড়ো ভাই বটে।'

'বড়ো ভাই! তাহলে তো তুমি ও জমিন পাবে না।'

'আজ্ঞা রামচন্দ্রর কহিলা মহাদেব পাবেনি, মুই না পাব—কেনে?'

'তুমি তো যোগেনের ছোটোভাই।'

'তা তো ঠিক।'

'অন্য জমিন চষো।'

লোকটা হতাশ হয়ে মুখ অন্ধকার করে বসে আছে বারান্দায়। বালিমুন্ডা কেন জমিন সব জায়গায় রাখার রীতিই তো এই। লোকটার মুখ দেখে কষ্ট হচ্ছে, কিন্তু রীতিটা ভাঙা কী ঠিক হচ্ছে? ঠিক হবে? এইসব ছোটো ছোটো ব্যত্যয়ই তো বড়ো হয়ে চেপে বসে। যোগেন মরতে তার ভাই জমিতে নামল। পরের বছর হয়তো যোগেনের বেটা মহাদেব কৌশল করে ওই জমিতে নামবে যোগেনের ভাই বিষ্ণুর বদলি হয়ে। এমন তো হতে পারে যোগেনের ভাই নামেই নিচ্ছে জমি, আসলে চষবে মহাদেব। সেই কৌশলেই এসেছে লোকটা।

ভানু এসে দাঁড়াল, বলল, 'এ কে বাবু?'

জবাব দিল না শ্রীপতি। ভানু বসল বারান্দার কোণে রাখা বেঞ্চিতে। এই লোকটা, বিষ্ণু পাতর বেঞ্চিতে বসার সাহস দেখায়নি। ভানুরও প্রথম প্রথম ও সাহস ছিল না। এখন তো সে খাটের কোণেও বসে।

বিষ্ণু পাতর ডাকল, 'বাবু!'

'অন্য জমিন নাও।'

'অন্য জমিন তো নাই, চাষ চইলছে, ওটা মোর বড়ো ভাই চষত, সে হাল করিছিলা, মোরে দিলা ফসল ফাঁকি মারিব না।'

'বড়ো ভাই করত বলে তুমি করবে এটা তো হতে পারে না।' শ্রীপতি বলল।

'আজ্ঞা!' লোকটা কালো চোখে তাকিয়ে আছে। ভীরু দৃষ্টি।'

শ্রীপতি বলল, 'ভাত খেয়ে যাও, খবরটা দিলে ভালো, রামচন্দ্রকে আসতে বলো।'

তখন ভানু মাথা গলাল এই আলাপে, 'ঘোড়া দেখেছ?'

‘ঘুড়া?’ লোকটা অবাক।

‘হ্যাঁ, অশ্ব, সাদা, ধবল অশ্ব।’

‘আছে তো।’

‘কোথায় আছে?’

‘আজ্ঞা ওদিকি।’

‘বেওয়ারিশ ঘোড়া?’

‘আজ্ঞা না।’

ভানু বলল, ‘বাবু, ওদিকে যেতে পারে?’

শ্রীপতি ঘরে ঢুকে গেছে। গায়ের জামা খুলে পাখা চালিয়ে বসেছে। ভানু তার দরজায় এসে জিজ্ঞেস করল কথাটা। শ্রীপতি মাথা দোলায়। ভানু ঠিক বুঝতে পারে না বাবু কী বলছে, হ্যাঁ কিংবা না। বাবুর মতলবটা জানা গেলে সে বালিমুন্ডা যাত্রা করতে পারে। বালিমুন্ডা যাওয়ার সাধ তার বহুদিনের। কলকাতায় যাওয়ার কথায় বাবু রাজি হচ্ছে না। ভানু ঠিক বুঝতে পারছে না বাবু বিশ্বাস করেছে কিনা কোকিলা বধূর কুহক করার ঘটনাটি। ঠিক সেই কথাটিই তুলল শ্রীপতি, ‘বালিমুন্ডা যাবে কী করে?’

‘আজ্ঞে যেতে তো পারে, পারে কি না?’

‘সে তো কলকাতায় মদরঞ্জির সঙ্গে চলে গেছে।’ শ্রীপতি বাঁকা হাসল।

ভানু হাত কচলায়, ‘ওটা তো অনুমান মাত্তর।’

‘অনুমান কেন হবে, ওটাই তো সত্যি বলেছিলি।’

‘আজ্ঞে দেখা তো চোখে হয়নি।’

শ্রীপতি বলে, ‘তাহলে গৌরমোহনের বউ কী করল?’

ভানু মাথা চুলকোয়, ‘বালিমুন্ডা ঘুরে আসা ভালো, ওদিকে যদি পালায়, কোথায় যে গেল, আমার কিছুই ভালো লাগছে না বাবু।’

শ্রীপতি জিজ্ঞেস করল, ‘মদরঞ্জি কী হল?’

‘হয় নাই এখনও, বললাম তো।’

‘তুই গিয়েছিলি?’

‘হ্যাঁ, সাইকেল তো নিয়ে এলাম।’

‘গিসলি, বলিসনি তো?’

ভানু টের পায় বাবুর যাওয়ার সাধ হয়েছিল। তার মানে? ভানু মনে মনে হিসেব করে নেয়, তার মানে কোকিলার সন্ধানে যাবে ভেবেছিল বাবু। কী সব্বেনাশ! কুহকিনী ঠিক কুহক করেছে। আগে নিল ঘোড়া, এবার নেবে ঘোড়ার মালিক শ্রীপতি মাইতিকে। মাথায় টোকা মারে ভানু। যাক গে! এতে তার বালিমুন্ডা যাওয়া আটকাবে কেন?

শ্রীপতি বলল, ‘কোকিলা কী বলল?’

‘দেখা হয় নাই।’ মিথ্যে বলল ভানু।

‘কেন?’

‘বাপঘরে গেছে।’

‘বাপঘর কোথায়?’

‘আজ্ঞে তা তো জানা নাই।’

শ্রীপতি বলল, ‘মদরঞ্জি কবে হবে?’

‘হবে শিগগির হবে।’

শ্রীপতি বলল, ‘রামচন্দ্রকে লিখে দিলে হবে, ও খোঁজ করবে বালিমুন্ডায়।’

‘আজ্ঞে হবে না।’

‘হবে না কেন?’

‘ঘোড়া কি ওকে চেনে, রামচন্দরকে?’

‘ও তো ঘোড়া চেনে।’

‘ঘোড়া চেনে, কিন্তু আমার কন্থককে কি চেনে?’

গালে হাত দিল শ্রীপতি, ‘চেনে না?’

‘কেউ কাউরে চেনে না।’

‘তা ঠিক।’

‘তবে আপনার রামচন্দর কী করবে?’

‘তাহলে যা তুই।’ শ্রীপতির মনে হল ভানুকে পাঠানো দরকার। কেন দরকার তা সঠিক জানে না শ্রীপতি, কিন্তু ভানু যখন যেতে চাইছে খুব করে, ভানু যাক। গিয়ে রামচন্দ্রকে কড়কে দিয়ে আসুক। রামচন্দ্র ঠিক কাজ করেনি এই বিষ্ণু পাতরকে পাঠিয়ে। রামচন্দ্র কি জানে না কোন রীতিতে জমি চাষে দেয় শ্রীপতি? রীতি ভাঙলে বিপদ। কেউ যদি তার বাবা, তার বড়ো ভাই চষত বলে সেই অধিকারে জমি চায় তা কি মানা হবে? শ্রীপতি বলল, ‘চলে যা, ওই লোকটার সঙ্গে চলে যা।’

ভানু উল্লসিত হয়ে ওঠে, বালিমুন্ডা যদি পছন্দের জায়গা হয় তবে সে থেকে যাবে ওখানে। তার ভালো লাগছে না দীঘা। ঘোড়াটা হারিয়ে যেতে তার মনও ভেঙে গেছে। ঘোড়া ছাড়া কী করবে তুমি ছন্দক, কাকে নিয়ে বাঁচবে? রাজপুত্র নেই, তার ঘোড়া নেই, তবে কে আছে সঙ্গে? ভানুর মুখ দেখে শ্রীপতি যেন আন্দাজ করে ব্যাপারটা, জিজ্ঞেস করে, ‘কবে ফেরা হবে?’

‘আজ্ঞে অশ্ব খুঁজে পাই।’

‘যদি না পাস?’

‘খুঁজি না কেন।’

‘তোকে যেতে হবে না।’

‘আজ্ঞে।’ ভানু হতভম্ব, ‘যাব না?’

‘যাবি, আজ মঙ্গলবার, রবিবার ফিরবি।’

ভানু হাত কচলায়, ‘যদি দেরি হয়?’

‘আমি লোক পাঠিয়ে নিয়ে আসব তোকে।’

‘আজ্ঞে?’

‘এখানকার থানা জলেশ্বর থানায় খবর দেবে, সে দেবে বালেশ্বর থানায় খবর, পুলিশ তোকে তুলে নিয়ে আসবে।’

‘আজ্ঞে?’

‘কথা তো কথা, রোববারেই ফিরতে হবে।’

ভানু চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। ধুস! সে মীরগোদা চলে যাবে, সেখানে গিয়ে মদরঞ্জির কাজ শিখবে কোকিলা আর গৌরমোহনের কাছে। কোথায় তার ফুলরানি, কোথায় জুট মিল! সব ত্যাগ করে এই সমুদ্রের ধারে এসে পড়েছে কি শ্রীপতি মাইতির বাঁধা মুনিষ হতে? সে ছিল রাজপুত্রের সাথি, সেই রাজপুত্র হয়ে গেল মহামানব, হায় রাজপুত্র! আমার কথাটি ভাবলে না? ঘোড়াটাও ভাবল না। ফেলে চলে গেল!

শ্রীপতি বলে, 'অত দূর বালিমুন্ডায় কি যেতে পারে পক্ষীরাজ?'

ভানু হাসে, 'কোন দিকে না যেতে পারে ঘোড়া?'

'তুই যাবি, রোববারে নায়েব রামচন্দ্রকে নিয়ে ফিরবি।'

'অশ্ব?'

'এর মধ্যে যদি পাস তো পাবি, না পাবি তো ও কোকিলার কুহকে আছে।

ভানু মাথা দোলায়, 'তা কেন, আমি গিয়েছি শুনে সে আত্মগোপন করতে পারে বাবু।' চোখ ছলছল করে উঠল ছন্দকের, 'অতি নিষ্ঠুর প্রাণী ওই ঘোড়া!'

শ্রীপতি বলল, 'কাঁদছিস, কেঁদে লাভ নেই, শোন, কী করতে হবে, তুই যোগেন পাতরের জমিটা অন্য লোকের হাতে বন্দোবস্ত দিবি, যোগেনের চোদ্দোপুরুষের কেউ যেন ও–জমিতে না নামে, জমি তো আমার সম্পত্তি, ওদের না, যোগেন মরল বলে তার ভাই, ছেলে কেউ যেন না চষে।'

ভানু অবাক হয়ে শোনে। কথাটা অদ্ভুত লাগে! জমিটমি তার ধাতে আসে না। জমি বন্দোবস্ত করে আসতে বলছে শ্রীপতিবাবু। যেরকম এখানে বলে তার ঠিক উলটো করতে বলছে। ওই যে লোকটা দরজার মুখে চলে এসেছে, মাইতিবাবুর কথায় সে ঢুকে পড়ল ভিতরে, 'বাবু পঞ্চাশ টঙ্কা ব্যয় কইরে আসিছি, পরের বার না হয় নতুন করি বন্দোবস্ত দিবেন।'

শ্রীপতি মাথা নাড়ল, 'পঞ্চাশ টঙ্কা নিয়ে যাও, দুপুরে খাও, আজ থাকো, কাল ভোরে চলে যাও, সে ভাড়াও দিচ্ছি।'

'কিন্তু চাষ না হিলে খাব কী?'

'যোগেন বেঁচে থাকতে কী খেতে?'

ভানু মনে মনে একটা ছক বাঁধতে থাকে। সে বলল, 'বাবু, একে থাকতে বলেন, একে নিয়েই তো যাব আমি বালিমুন্ডা।'

'রহিব কেনে, জমিন যদি না পাই।' লোকটা অভিমানে ফুঁসে ওঠে।

শ্রীপতি বলল, 'পরের বার পাবে, আর ভানু যাচ্ছে ও যদি বদলাবদলি করে দিতে পারে, অন্য জমির চাষাকে এই জমিতে বসিয়ে তোমাকে সেই জমিতে যদি দিতে পারে, তবে তো হয়ে যাবে।'

লোকটা এতে একটুও আশ্বস্ত হয় না, বিড়বিড় করে, 'তা কি হিবে? সব জমিনে চাষ লাগি গিলা পেরায়, ওদিকি পানি আগেই নামিছে।'

'দেখা যাক কী হয়!' ভানু বলল।

পরদিন ভোরে ভানু চলল বালিমুন্ডায় অশ্বের খোঁজে। যেতে যেতে বিষ্ণু পাতরকে বলল, 'ওই জমিনেই তোকে বসিয়ে দেব, বাবু না জানলেই হল।'

'কিন্তু পরে তো জানিবে, চাষের সময় না যাক আঘুন মাসে বাবু তো যাবে, তখন জানিলে তো মোর সব্বোনাশ হই যাবে।'

হি–হি করে হাসে ভানু, 'বাবু কি জানে, কোন জমি যোগেন পাতর চষত?'

মাথা নাড়ে লোকটা, 'তা জানিত না, জানিত শুধু রামচন্দর।'

'ওকে বুঝাতে হবে, ও যেন বলে যোগেনের জমি অন্য চাষায় চষে।'

'মিথ্যা কহিবে?'

'হাঁরে হাঁ, কহিবে তো কহিবে, কহিবে যোগেন পাতরের জমি তু চষিস না, তাতেই বাবু সন্তুষ্ট।'

'বাবু যদি সন্ধান লিয়া দিখে?'

'অত সময় নাই বাবুর, জ্যান্ত অশ্বটা হারাইছে, সেই অশ্ব খুঁজতে যাচ্ছি আমি বালিমুন্ডায়—হা–হা–হা।' ভানু খানিক হেসে নেয় বাসে ওঠার আগে। কাঁথি থেকে বালিমুন্ডার বাস মিলবে। আপাতত তারা কাঁথি চলল, বাসে উঠে ভানুর মনখারাপ, 'শুধু কী বাবুর অশ্ব, আমারও তো।'

বালিমুন্ডায় নেমে ছ–মাইল হেঁটে ভীমাপুর, ভীমাপুরেই বাবুর চাষবাড়ি। ভীমাপুর কে চেনে, সবাই বলে, বাবুও বলে বালিমুন্ডা। ভানু পুরোটা পথ ঘুমিয়েছে। বাস থেকে নেমে বিষ্ণুকে বলল, 'তোর কোনো চিন্তা নাই, চিন্তা করব আমি।'

হাঁটা পথ সি–ডাইক ধরে। সি–ডাইক থেকে সবসময় সমুদ্র দেখা যায় না, আবার দেখাও যায় কখনো কখনো। ভানুর বেশ লাগে। বেলা দুপুর। আকাশে ঘন মেঘ। বালিমুন্ডা বাজারে ভাত, ডাল, পোস্ত–আলু খেয়ে নিয়েছে দুজনে। সব টাকা বাবু শ্রীপতি মাইতির।

যেতে যেত বিষ্ণু বলল, 'এতদূর কি অশ্ব আসিবে?'

'না আসিবে তো না আসিবে, শূন্যপৃষ্ঠ অশ্ব, কোথায় যায় কে জানে!'

'তবে যে আপুনি এলা?'

'এলা তো এলা।' ভানু হে–হে করে হাসে, বলে, 'ওদিকে এখন বৃষ্টি নামেনি, টুরিস্টও নাই তেমন, কোকিলা বধূর মায়ায় পড়েছে বাবু, পড়ুক, আমি ক–দিন বালিমুন্ডা দেখে যাই, এই একটা সুযোগ, অশ্বও তো ঘুরছে।'

বিষ্ণু বলল, 'কিন্তু মোর জমিন কি হিবে?'

'হিবে রে হিবে। ভানু হাসে, 'সব হিবে, না হিবে তো আমি এলাম কেন, বাবুর সঙ্গে তোর সব বাতচিত আমি শুনেছি, শুনে মনে হল তোর উপগার করতে যদি পারি মোর ভালো হয়।'

'কী কহিলা?'

'কেন বুঝতে পারছিসনে?'

'হাঁ, বুঝিবার না পারি, কহ ফের।'

ভানু হাসে, 'না আর শুনতে হবে না।'

বিষ্ণু বলল, 'জমিন দিবে তো দিবে, এক দু–সন চাষ চলিবে, উহার পর তো আর জমিন রহিবে না।'

'কেন?'

'গরমেন লিয়া লিবে।'

'কী নেবে?'

'জমিন, ভীমাপুর বাকি রহিছে, গাং থিকে আসিছে ভীমাপুরের দিকে, মিলিটারির জন্য গরমেন লিচ্ছে।'

'বাবু জানে?'

'জানে।'

'কই বাবু তো কিছু বলে না।'

'কী কহিবে, বাবুর কী, টঙ্কা লিবে জমিন দিবে, মোরা তো চাষা, মোদের কী হিবে জগন্নাথো জানে।'

ভানু অবাক। এ কেমন ব্যাপার?

লোকটা তো সমস্ত পথে এইসব কথা একটাও বলেনি। দীঘাতে বসেও বলেনি; সন্ধ্যেবেলায় অত যে গাঁজাটানা হল সমুদ্রের ধারে বসে, লোকটা তো কিছুই বলেনি। এখন যা বলছে তাতে তো ভীমাপুর গেল বলে। মৌজার পর মৌজা নাকি 'গরমেন' মিলিটারির জন্য নিয়ে নিচ্ছে। এ খবর তো সবাই জানে, ভানু জানে না?

ভানু বলল, 'তা'হলে কেন এলাম, এদিকে কি কন্থক আসবে?'

'এলা মোর জমিন ঠিক করি দিতা।'

‘জমিন! ফুহ্! যদি গরমেন লিয়ে লেয়, জমিন পাবি কোথায়?’

বিষ্ণু পাতর বলল, ‘গরমেন তো টঙ্কা দিবে।’

‘টঙ্কা তো মালিক পাবে।’

‘পাঁচ বছর যদি জমিনে চাষা হাল দিয়া থাকে, সেও কুছু পাবে।’

‘পাঁচ বছর আছিস?’

‘পাঁচ পুরুষা আছি বাবু।’

‘তবে তো গরমেনের টঙ্কা পাবি।’

মাথা নাড়ে বিষ্ণু, ‘এক জমিনে হিবে তবে তো পাব!’

‘এক জমিন!’

‘হাঁ, নাহলে কোন জমিন লিখিবে মোর নামে?’

এতক্ষণে ভানুর মাথায় যেন ঢুকছে সবটা। বিষ্ণু পাতর যে এত হাঁকপাক করছে ওই জমির জন্য, তার কারণও ওইটা। এখানে তো বছর বছর চাষা বদলানো হয় জমির, যাতে চাষা না বলতে পারে কোন জমি সে বছরের পর বছর চষছে। আর বাবুও তো সেই কারণে চাষা বদল করে যাতে চাষার চাষের অধিকার না জন্মায় কোনো বিশেষ জমিতে। এখন সরকার জমি অধিগ্রহণ করলে কী হবে? বাবু তো মালিক হয়ে সব টাকা নিয়ে ঘরে উঠবে, চাষি কী পাবে?

ভীমাপুর যেতে যেতে সাগর পিছনে থাকল। আকাশে আঙুল তুলে বিষ্ণু পাতর পশ্চিমে দেখিয়ে বলল, ‘ওদিকে দে–পাল, মহাপাত্র নগর, কুসমাড়। সব নিয়ে নিয়েছে সরকার। ধান জমি, বাস্তু জমি, ডোবা, পুকুর কিছুই বাদ যায়নি, এক ছটাকও না। টাকার জন্য ভুবনেশ্বর ছুটতে হচ্ছে সবাইকে। কী ধুন্ধুমার হচ্ছে! এর টাকা ও তুলে নিচ্ছে।’

ভানুর কাছে এ ব্যাপার একদম নতুন। সে আকাশ দেখতে পেল সি–ডাইক থেকে, ঝাউবন, ঘন কেয়াবনের আড়াল থেকে গ্রামগুলো দেখা যায় না। বিষ্ণু পাতর বলছে, ‘সার্ভেয়ার আসিবে উহাকে টঙ্কা দিলে তবে নাম তুলিবে।’

‘বাবুর নাম?’

‘বাবুর তো নাম রহিছে সরকারি খাতায়, বাবু তো মালিক, কিন্তু চাষার তো নাম নি, চাষার নাম লিয়া তো যত ধুন্ধুমারি।’

‘হুম!’ ভানু বিজ্ঞের মতো হাঁটে। হাঁটতে হাঁটতে মনে পড়ে, জিজ্ঞেস করে, ‘ঘোড়া কি দ্যাখোনি, রাজার মতো চলন তার, মুখখানিতে দুঃখী–দুঃখী ভাব।’

‘বাবুর অশ্ব তো?’

‘হাঁ, আগে দ্যাখো নাই?’

মাথা নাড়ে বিষ্ণু, ‘নাহ্!’

‘এদিকে আসবে না, কী বলো?’

‘কুছুতেই না, এত দূরে এলা কি চখে পড়তনি?’

‘তবে কেন এলাম?’ নিজেকে প্রশ্ন করে নিজেই, তার উত্তর দেয় ভানু, ‘এমনি এলাম!’

‘মোর তরে রামচন্দরকে কহি যাও।’

ভীমাপুরে চাষ জমি শুধু। গাঁয়ের উত্তর–পুব দিকটায় বসতি। বসতির লোক মানে হতদরিদ্র, চোখে তাকানো যায় না। আট–ন বছরের ছেলেমেয়ের কোমরেও কিছু নেই এমন। ডাগর মেয়েমানুষ, বউ–ঝিরা কোনোরকমে গা ঢেকে আছে, হয় ঝোপের আড়ালে, না হয় ভিটের আড়ালে তাদের সবসময় সতর্ক থাকতে হয় কখন ভিনদেশি পুরুষ

ঢুকে পড়ে গাঁয়ে, কখন অচেনা পুরুষের সামনে প্রায় আবরুহীন হয়ে পড়ে যেতে হয়। মাথা নামিয়ে পথটা হেঁটে গ্রামের সীমানায় এসে বাবুর কাছারি ঘর পেল ভানু। তাকে পথ দেখিয়ে দেখিয়ে নিয়ে এসেছে বিষ্ণু পাতর।

'কাছারিবাড়িটি পাকা, মাথায় অ্যাসবেস্টসের ছাউনি। এখনও ইলেকট্রিক আসেনি এদিকে। 'না আসুক, কাছারিবাড়িই বা আর ক-দিন?' ভানুকে বলল রামচন্দ্র। রামচন্দ্রকে চেনে ভানু। সে তো দীঘায় যায় প্রায়ই। রামচন্দ্র মাদুর পেতে দিয়েছে বারান্দায়, বিষ্ণু পাতর বসে আছে উঠোনে। ঠান্ডা বাতাস বইছে। বৃষ্টি এল বলে। ভানু বসেছে মস্ত শালখুঁটির গায়ে পিঠ দিয়ে। এ বাড়ি বাবু শ্রীপতি মাইতির ঠাকুরদার আমলের। কী জাবদা বাড়ি, চুন সুরকির গাঁথনি বটে, কিন্তু খুব পোক্ত। শালখুঁটিগুলো কী মোটা মোটা। ভানু বিড়ি ধরিয়ে তাকাল সামনের দিকে। যতদূর চোখ যায় জমি আর জমি। ভানু জিজ্ঞেস করল, 'সব বাবুর?'

'বাবুর আছে, আবার ভুবনেশ্বরের পাণ্ডাদেরও আছে।'

'আলাদা করা আছে তো?'

হি-হি করে হাসে রামচন্দ্র, 'একসঙ্গে থাকতে পারে?'

রামচন্দ্র লোকটা খুব স্বাস্থ্যবান। একেবারে ষাঁড়ের মতো চেহারা। যেমন তার গায়ের রং, তেমনই তার হাবভাব। বাবুর বদলে ভানু এসেছে, তাতেই রামচন্দ্র খুশি, বলল, 'কতবার আপুনারে কহিছি ভানুবাবু, বালিমুঁড়া ভীমাপুর দেখে যান, এতদিনা সময় হিলা।'

ভানু বলে, 'হিলা তো বিষ্ণুর জন্য।' রামচন্দ্রের মুখের ভাষা ভানুর মুখে।

'ওর কী হইছে?'

'কী হইছে জানো না?'

রামচন্দ্র বলে, 'আর হিবে কী, লুটিশ এসে গেল, আপুনি ইটা লিয়ে বাবুরে দিখাও।'

'কী লুটিশ?'

'সরকারের।' বলে থমথম করে বাতাস গিলল যেন রামচন্দ্র, 'বাবুর তো কোনো মন নাই, কেস-কাছারি না হোক ভুবনেশ্বরে গিয়া বেশি টঙ্কা আদায় তো করিবে, কী হিবে, কত টঙ্কা দিবে ইসব নিয়ে কথা তো কহিবে সরকারের সহিত, ইত জমিন!'

'কত জমি?'

'দেড়শো বিঘা হবে।'

'বাবু যে বলে পঞ্চাশ বিঘা।'

'ওইর'ম কহে, জমিনের কাগজপত্তর তো সব মোর কাছে।'

বিষ্ণু পাতর কথা শুনছিল। সে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল কখন তার কথা তোলে ভানুবাবু। কিন্তু ভানুবাবু যেন তাকে ভুলেই গেছে। তার কোনো কথাই তো বলছে না। এদিকে অন্ধকার হয়ে এল প্রায়। বৃষ্টি এসে গেলে বিপদ হবে। এখেন থেকে মাইল দেড়েক তার ঘর।

ভানু বলল, 'কতদিন ধরে ভাবি বালিমুন্ডা-ভীমাপুর আসব।'

'ইহার পরে তো আসা হতনি।'

'কেনে হতনি?'

'বাহ্, শুনছ কী, লুটিশ পড়া মানে আর ক-দিন! এই কাছারিবাড়ি, জমি সব নিয়ে নেবে।'

'সব?'

বিষ্ণু পাতর আর অপেক্ষা করতে পারে না, উঠে দাঁড়ায়, 'ভানুবাবুকে লিয়া আসিছি দীঘা থিকে, মোর কথাডা ভাবো রামচন্দরবাবু।'

রামচন্দ্র বলে, 'বাবু কী কহিল?'

‘বাবুর তো জমিনই লিয়া লিবে সরকারে।’

‘সে সরকার আর বাবুর বেপার, তুমি চাষে নামিবে, উয়ার পর সেই কারণে সরকারের নিকট থিকে টঙ্কা লিবে, বাবু না কহিলে হিবে? ইয়ার পর বাবু যদি বুঝে ফ্যালে রামচন্দ্র ইচ্ছামতো জমিন সাজায় দিইছে, মোর তো চাকুরি রহিবেনি।’

ভানুর দিকে তাকায় বিষ্ণু পাতর। ভানু দেখছিল দূরদিগন্তে, যেদিকে সমুদ্র, সেদিকে বৃষ্টি নেমেছে যেন। ঘোর হয়ে উঠেছে খোলা জমির শেষ দিক, আকাশ কালো হয়ে আছে, মেঘ কুণ্ডলী পাকিয়ে সরছে একটু একটু করে। মেঘ দেখে, বৃষ্টির চিহ্ন দেখে তার যে কেন মনে পড়ে গেল ঘোড়াটার কথা, সে ঘুরে বসল, রামচন্দ্রকে বলল, ‘বাবুর অশ্ব, হারাই গিইছে।’

‘অ্যাঁ।’ চমকে গেল রামচন্দ্র, ‘আজই সকালে গোটায় অশ্ব দেখিলাম, সত্যি হারাই গিছে?’

‘হাঁ, অশ্ব খুঁজতে তো আসা।’

‘কী কইরে হারাই গেল?’

ভানু বলতে থাকে। শুনতে শুনতে রামচন্দ্রর নিশ্বাস গাঢ় হয়। বুক ফুলতে থাকে, বলে, ‘কুহকেই পলাইছে।’

‘নিশির ডাক তো?’ ভানু সমর্থন চায়।

‘হাঁ, নিশির ডাক, এই তো দিন বিশ আগে, এক রাত্তিরে ঘুমের ভিতর শুনলাম কে যেন ডাকিছে, রামচন্দর হে...।’

‘সত্যি?’

‘হাঁ সত্যি।’

‘এদিকে কুহকিনী আছে?’

‘কুহকিনী যেখেনে থাকুক, ডাকে যদি তুমারে শুনিতে হিবেই।’

‘শুনলে রক্ষা নাই?’ ভানু জিজ্ঞেস করে।

‘না, তবে মনে জোর থাকিলে রক্ষা হয়, মু তো বাহার যাই নাই।’

কথা শুনতে শুনতে বিষ্ণু পাতর অধৈর্য হল, বলল, ‘রামচন্দরবাবু মোর কী হিবে, পানি আসি গিলা।

‘আসি গিলা তো বারাণ্ডায় আয়।’

‘না, বলি কী, পানি আসি গিলা, চাষে ইখন যদি না নামি কবে নামিব, তুমি হাঁ করো, দীঘা থিকে ভানুবাবুরে লিয়া আসছি।’

ভানুর যেন খেয়াল হল, বলল, ‘হাঁ, হাঁ, যোগেন পাতরের জমিনে নামাই দাও রামচন্দর, জল তো নামল বটে।’

‘বাবু কহিছে?’ রামচন্দরের কণ্ঠস্বর শীতল।

‘বাবু কী আর কহিবে, তুমি নায়েব, তুমি হাঁ করলেই হবে।’

‘আর যোগেনের বেটা?’

‘সে তো কহিছেনি।’ বলল বিষ্ণু পাতর।

‘কহিছেনি মানে!’ রামচন্দ্র যেন মেঘের মতো ডাক দেয়, ‘কহিছে তো বটে, সকাল থিকে ছিলা ইখানে।’

‘তবে কী হবে?’ ভানু বোঝে বিষ্ণু মিথ্যে বলেছে দীঘায় গিয়ে।

বিষ্ণু বলে, ‘বাবুর তো কত জমিন! বড়ো বাবুর জমিন মু তো এককালে চষিছি।’

রামচন্দ্র বলে, ‘সকালে আসো খুড়া ভাইপোয়।’

‘ভাইপোরে অন্য জমিন দাও, ওইটা মোরে দাও।’ বিষ্ণু পাতর প্রার্থনা করে।

‘সে কী হিবে না হিবে মু বুঝিব, সকালে আস।’

বৃষ্টি এসে গেল। বৃষ্টি মানে! এত বৃষ্টি যেন জন্মে দ্যাখেনি ভানু। কাছের সমুদ্র থেকে মেঘ উঠতে লাগল আর ভাসাতে লাগল যেন ভীমাপুর, দে–পাল, কুসমাড়, মহাপাত্রপুর। মেঘ গজরাতে লাগল। বারান্দায় আর দাঁড়ানো যায় না। ঘরের ভিতরে ঢুকে গেল ভানু আর রামচন্দ্র। বর্ষার ভিতরে বিষ্ণু পাতর রওনা দেয়। রামচন্দ্র কাছারি ঘরের ভিতর থেকে একটা তালপাতার টোকা তাকে দেয় সকালে ফেরত দেওয়ার কড়ারে।

কাছারিবাড়িতে চারখানা ঘর। ভানুকে যে ঘরটা দেবে রামচন্দ্র সেই ঘর পরিষ্কার করছে একজন। মাথায় এতখানি ঘোমটা। এই ঘরে রামচন্দ্র থাকে। বাবুর ঘর, আরও একটি ঘর বন্ধ করা আছে। মাঝেমধ্যে খুলে ঝাড়পোঁছ করা হয়। রামচন্দ্র হ্যারিকেন জ্বালে। ভানুকে জিজ্ঞেস করে, কিছু খাবে কি না। ভানু মাথা নাড়তে রামচন্দ্র বলে, 'রাতে কুকড়া মারা হবে, তা বাবুর খপর কী, অশ্বটা বড়ো পেয়ারের ছিল তো!'

'বালিমুন্ডার অশ্বটা সাদা ছিল?'

'হাঁ, ধবল বন্ন।' রামচন্দ্র বলে।

'সেই অশ্ব হতে পারে, আসলে ওর নাম তো কন্থক, ভগবানের ঘোড়া।'

'ওটা তো মহাপাতর বাবুর খরিদ করা।'

'কে মহাপাতর বাবু?'

'জলেশ্বরে ঘর, বালিমুন্ডায় বেওসা, বড়ো সাইকেল দুকান, ইবার মোটর সাইকেল দুকান খুলিবে কহিছেন।'

'অশ্বটা দেখা দরকার।'

'হাঁ, তবে উটা ওঁর খরিদ।'

'যদি মোর কন্থক অশ্ব খরিদ করে থাকেন?'

কন্থকের কথা জানে রামচন্দ্র, সে কী যেন বলতে গিয়ে থেমে যায়, তারপর জিজ্ঞেস করে, 'আজ কী তিথি হইছে বলো দেখি, অমাবস্যা কি?'

'কেনে?'

'অমাবস্যায় উ মেয়েমানুষ খুব ডরায়।'

'কোন মেয়েমানুষ?'

'ওই যে উ ঘরে কাম করছে, রাঁধাবাড়া করে, বড়ো দুঃখী।'

'দুঃখী কেন?'

'সোয়ামি নেয় না, সোয়ামি ফের বেহা করিছে।'

ভানু বলল, 'এখেনে কী করে?'

'ওই যে কাম করে কাছারির।'

'থাকে কোথায়?'

রামচন্দ্র হেসে ফেলে, 'চান্দ কম থাকলে খুব ডরায়, তুমি রহিছ, রাঁধাবাড়া কে করিবে, কহিলাম রহি যেতি।'

'ঘর কোথায় হল?'

'ছ–মাইল হবে, দে–পালে ঘর ছিলা, তো সে ইখন মিলিটারি–সরকার লিয়া লিইছে।'

ভানু টের পায় কথার পারম্পর্য রাখতে পারছে না রামচন্দ্র।

ভীমাপুরের অন্ধকার অনেক বেশি কালো। নিশ্ছিদ্র। এ অন্ধকারের গা থেকে কোনো আলো বেরোয় না, যেমন মীরগোদায়, প্রাচীন জাহাজঘাটার কোলে। ভানুর মনে হয় মীরগোদার অন্ধকার অনেক পুরোনো, ভীমাপুরের অন্ধকার নবীন, তাই এর তেজ বেশি। এ অন্ধকারে নিজের হাত–পাও দেখা যায় না। আকাশ চেনা যায় না গ্রহ তারাদের চক্ষুতে। কেননা আকাশের প্রতিটি বিন্দু এখন ঘন মেঘে প্লাবিত। বারান্দায় বসে ভানু অন্ধকার দেখছিল। তার পাশে বসে আছে নায়েব রামচন্দ্র। বৃষ্টি থেমেছে। অন্ধকারে ব্যাঙের দল ডেকে যাচ্ছে অবিশ্রান্ত। দূরে, চাষজমি পার হয়ে আরও দূরে, ভীমাপুর পেরিয়ে দিগন্তের আকাশ আলো হয়ে আছে। মেঘ কতটা ভয়াল তা দেখানোর জন্যই যেন ওই আলো। ও আলোয় মাটি দেখা যায় না। নিজেকেও না। ওই হল মহাপাত্রপুর, দে–পাল, কুসমাড়। ওখানে এখন তারকাঁটা। মানুষের ঢোকার সাধ্য নেই। ওদিকের সমুদ্র সেনাবাহিনীর দখলে।

‘তোমরা সমুদ্দুরে যাও না?’

‘এদিকি সমুদ্দুরি যাবার উপায়নি।’

‘কেন?’

‘পাড় বরাবর তারকাঁটা লাগাইছে মিলিটারি।’

‘ওদিকে কী হয়?’

রামচন্দ্র বলল, ‘আজ ইত মেঘ, পানি, আজ হিবে কি না কে জানে, না হিলে আশমানগোলা দিখতে পেতি।’

‘সে কী?’

‘আশমানে আগুন।’

‘বাবু এসব জানে?’

‘কেনে জানিবে না।’

‘বাবু এসব কহে না তো?’

‘কী আর কহিবে!’ দীর্ঘশ্বাস ফ্যালে রামচন্দ্র।

‘রামচন্দ্র তোমার ঘর কোথায়?’

‘অলংকারপুর।’

‘কোন অলংকারপুর?’

‘দীঘা অলংকারপুর।’

‘ঘরে যাও না?’

‘ভিটা তো নাই।’

‘নাই কেন?’

মাথা নাড়ে রামচন্দ্র, ‘জানিনি, বাবুঘরে মানুষ হইছি।’

‘মা বাপ?’

‘নাই।’

‘বিয়ে?’

‘হয় নাই, বাবু কহিলে তো হিবে।’

'বাবু কহিলে হিবে।' রামচন্দ্রের কথার প্রতিধ্বনি শোনা যায় ভানুর মুখে, বিস্মিত ভানু জিজ্ঞেস করে, 'বাবু তাই কহিছে?' ভানুর মুখে আবার রামচন্দ্রের ভাষা উচ্চারণ।

'হাঁ বটে।'

'বাবু যদি না কহে?'

'কী আর হিবে!' রামচন্দ্র দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

রান্নাঘরটি কাছারিবাড়ির পশ্চিম ধারে। কাছারিবাড়ির বারান্দার পশ্চিম দিকেই বসে আছে রামচন্দ্র আর ভানু। কথা বলতে বলতে ভানু দেখছিল ত্রস্ত পায়ে মেয়েমানুষটি হ্যারিকেন হাতে এক একবার বেরিয়ে আসছে রান্নাঘরের আড়াল থেকে। আচমক ডাকল রামচন্দ্রকে, 'শুনিবা হে।'

রামচন্দ্র বসেই সাড়া দেয়, 'কী কহ?'

'কুকড়াটি মারি দিবে তো।'

'দিব।' বলে রামচন্দ্র উঠে দাঁড়ায়। বারান্দা থেকে নামে তার মস্ত আঁধারময় দেহখানি নিয়ে। অদৃশ্য হয়ে যায় অন্ধকারে। আর কোথাও কোনো সাড়া নেই। ব্যাঙের ডাক এই আঁধারময় প্রকৃতির অন্তর্গত হয়ে যাওয়ায়, কোনো শব্দই যেন আর কানে আসছে না। অনেকটা সময় বাদে ভানুর মনে পড়ল কন্থকের কথা। ঘোড়াটাই তাকে টেনে নিয়ে বেড়াচ্ছে। ভানুর আর দীঘায় মন নেই। হোটেল, টুরিস্ট–এ মন নেই। ঘোড়াটি তাকে যেন কুহক করছে দূরে, আড়ালে কোথাও দাঁড়িয়ে। বাবু শ্রীপতি মাইতি এমনি দিলখোলা মানুষ, তার টাকা ঠাকুর খায়, ঠাকুরানি খায়। খায় হাসপাতালের নার্স ভারতী। যদি কোকিলা বধূ তাকে কুহক করে ডাকতে পারে, সেও লুটতে পারে বাবুর টাকা। কিন্তু কোকিলা–গৌরমোহন কী তেমন? বাবুকে ভারতী চৌধুরির হাতের থেকে টেনে আনার জন্য বাবুর বউ যথেষ্ট নয়। গিন্নি শুধুই গিন্নি। ছেলেমেয়ে মানুষ, সংসার, গয়নাগাটিতে সন্তুষ্ট। বাবু তো অর্ধেক দিন বাড়িই যায় না, হোটেলের ঘরে কাটিয়ে দেয়। কিংবা সমস্ত দিন পড়ে থাকে ভারতী চৌধুরির ঘরে, বাবুর বউ তাকে কুহক করতেই পারে না। বউটাকে কত সাবধান করেছে ভানু, কিন্তু বউয়ের সেই সাধ্যই নেই যে স্বামীকে নিজের কাছে টানে। শুধু মুখ চালালে হবে? অশ্রাব্য ভাষা বলে বাবুর সুন্দরী বউ।

অন্ধকারে যেন একবার মোরগের 'কঁক' আর্তনাদ শোনা গেল। তারপর সব চুপচাপ। কোনো কথাও শোনা যাচ্ছে না। মোরগ মেরে ছাড়িয়ে দিচ্ছে বোধ হয় রামচন্দ্র। ভানু দূরের আলোর দিকে তাকিয়ে থাকে। তখন আবার মনে পড়ে পক্ষীরাজের কথা। কাল রামচন্দ্রের সঙ্গে খোঁজ করতে হবে সাইকেল দোকানি জলেশ্বর নিবাসী মহাপাত্র বাবুর। হতেও পারে চোরাই ঘোড়া কিনেছে সাইকেল দোকানি। তার ঘোড়া চুরি হয়ে গিয়েছিল এমনও তো হতে পারে। ভানু পকেট থেকে বিড়ি বের করে ধরাবে তো দেশলাই নেই। দেশলাই কোথায়? ভানু অন্ধকারে তাকায়, যদি রামচন্দ্র আবির্ভূত হয়। যদি দে–পাল মহাপাত্রপুরের মেয়েমানুষটি হ্যারিকেন হাতে বেরিয়ে আসে কাজে? কিন্তু তাদের তো কোনো সাড়াশব্দই নেই। ভানু গলাখাঁকারি দেয়, চাপা গলায় ডাকে, 'রামচন্দর।'

এত আস্তে ডাকল যে নিজের ডাক নিজেই শুনতে পায় না ভানু। অনেক সময় তো গেছে রামচন্দ্র, 'একটা পাখি মারতে এত সময় লাগে!' ভানু উঠে দাঁড়ায়। নেমে আসে উঠোনে নিঃশব্দ পায়ে।

রান্নাঘরে টেমি জ্বলছে। ধোঁয়াটে লাল আলো। কাঠের উনুনে ভাত চেপেছে বোধ হয়! ভানু দাঁড়াল রান্নাঘরের ছোটো, অপরিসর দরজায়, 'রামচন্দর হে।'

জবাব নেই। জবাব নেই মানে কেউ নেই। ভানুর হাতে বিড়ি। ভানু গুড়ি মেরে ভিতরে ঢুকে গেল। বিড়িটা বাড়িয়ে ধরল টেমির উপর। তারপর জ্বলন্ত বিড়ি হাতে গুড়ি মেরে বেরিয়ে এল। জোরে ধোঁয়া টেনে অন্ধকারে উগরে দিল। মিহিদানার মতো এক এক বিন্দু বৃষ্টি যেন পড়ছে উপর থেকে। এভাবে শিশির পড়ে। হিম পড়ে ভিজে যায় মাটি। কিন্তু সেই ঋতুর তো এখনও অনেক দেরি। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকল ভানু। কোথায় গেল ওরা দুজনে? ভানু ভাবল ঘরে ঢুকে ব্যাগ থেকে টর্চটা নিয়ে আসে। কিন্তু অন্ধকারে তার ভালোই অভ্যেস আছে। সে একটু একটু করে এগোয়। রান্নাঘরটা বেড় দিয়ে পিছন দিকে যেতেই চাপা হাসির শব্দ শুনতে পায়। বউটা হাসছে। আলো জ্বলছে

চাতালের মতো জায়গায়। ওখানে টিউব–ওয়েল। পাখির পালক ছিঁড়ে জলে ধুচ্ছে রামচন্দ্র। ভানু অন্ধকারে দাঁড়িয়েই থাকে।

‘ভালো করি ধুয়া করো নায়েব।’ বউটি মিহিগলায় বলে।

‘আর কত ধুব?’

‘পালক রহেনি যেনে, ফিরে ধোও।’

‘না, লক রহিছে একা।’

‘থাউক না লক, মুর ডর লাগে, একা ইখানে রহিবে?’

‘কীসের ডর?’ নায়েব রামচন্দ্র উঠতে যায়।

‘উঠো কেনে, বসো নায়েব, কাম সারা হক।’

‘আলো তো রহিছে।’

‘বড্ড আন্ধার, তুমি রহ নায়েব।’

‘লক একা কী ভাবে?’

‘কী আর ভাবে? তুমি রহ।’

ভানু পায়ে পায়ে সরে এল। ধীরে ধীরে বারান্দায় উঠে এল। এ জায়গায় মাটিতে খুব বালি। কাদার বংশ নেই, তবু পা–টা ধুয়ে নিতে পারলে ভালো হত। বারান্দার সিঁড়িতে বালতি ভরা জল আর ঘটি রয়েছে। আন্দাজে তার জায়গাও নিরূপণ করা যায়। ভানু চুপচাপ বসেই থাকল বারান্দার মাদুরে, শালখুঁটিতে হেলান দিয়ে। শূন্য লাগছে। কী শূন্য! অন্ধকারের মতো শূন্যতা! ভানু তাকিয়ে আছে অন্ধকারের সীমানায়, দূর মহাপাত্রপুর, কুসমাড়ের দিকে, আঁধার ছাওয়া আলোর দিকে, কিন্তু তার চোখেরও যেন কোনো সাড় নেই। রামচন্দ্র বিয়ে করবে কি করবে না, কবে করবে, কাকে করবে, সব নাকি বাবু শ্রীপতি মাইতি বলবে। আবার বাবু শ্রীপতির কত জমি, তার হিসেব তার নিজের চেয়ে রামচন্দ্র জানে ভালো। রামচন্দ্র এক নম্বরের নিরেট, নির্বোধ। বাবুর সব জমি মিলিটারি নিয়ে নিলে রামচন্দ্র করবে কী? কোথায় যাবে? তার এই মেয়েমানুষই বা যাবে কোথায়? কোন অন্ধকারে বসে ভয় পাবে আর রামচন্দ্রকে অনুনয় করবে থেকে যেতে?

এ কেমন মানুষ রামচন্দ্র? বিষ্ণু পাতরকে জমি তো ও নিজেই দিতে পারে। না দিবি যদি পালা। পালা এ নায়েবি ছেড়ে। জমির দাম বুঝে নিয়ে বাবু শ্রীপতি মাইতি দীঘার হোটেলে বসে পা নাচাবে, আর রামচন্দ্র তখন করবে কী? ওই তো আলো হাতে রামচন্দ্র। তার পাশে পাশে মেয়েমানুষটা, হাতে ধোয়া মাংসের থালা। ভানু চোখ বোজে। কানে উড়ে আসে রামচন্দ্রর কণ্ঠস্বর, ‘বেশি ঝাল না দিব।’

‘কেনে, কচি ছানা নাকি তুমি?’

‘না, নতুন লক রহিছে, ঝাল খায় কি না খায়!’

‘নতুন লক কী কহিছে?’

‘কহে নাই, ঝাল নাহয় না দিলা।’

মেয়েমানুষটি খিলখিল করে হাসে, ‘তুমি কোনঠে যাবা, আস।’

‘ওই বারাণ্ডায় বসি।’

না এই বারাণ্ডায়, পাকশালের দোরে বসো।

‘নতুন লক, বাবু পাঠাইছে।’

‘তো কী হল, মোর যে ডর লাগে।’

‘ডর লাগিলে হেঁকে লিবি।’

‘এই যে মু হাঁকছি, আস হে, ডর লাগিছে।’ মেয়েমানুষটা হি–হি করে হাসে, বলে, ‘তুমার নতুন লক নিদ গিইছে।’

রামচন্দ্র মেয়েমানুষটার সঙ্গে রান্নাঘরের দাওয়ায় উঠে যায়। ভানু একা বসে থাকে। একা সময় কাটে না। এখন এক ছিলিম গাঁজা টেনে নিলে হত, এই রামচন্দ্র কি কলকে সাজাতে পারে? কলকে, গাঁজার ছিলিম সবই আছে তার কাছে, আগুন তো লাগবে। আগুন নিয়ে বসে আছে মেয়েমানুষটা ওখানে। নেশাটা একটু একটু করে চাগাড় দিয়ে উঠছে। এক ছিলিম টেনে ব্যোম হয়ে বসে থাকত নাহয় ভানু, তখন মেয়েমানুষটা ভয় পেত আর রামচন্দ্র তাকে পাহারা দিত, ভয় ভাঙাত। ডাকবে কি ভানু নায়েব রামচন্দ্রকে? বাবু শ্রীপতি মাইতির পোষ্য রামচন্দ্রকে, রামচন্দ্র হে.....।

নিজের গলার স্বর ভানু নিজেই শুনতে পায় না। রান্নাশাল থেকে এক এক টুকরো কথা উড়ে আসছে এদিকে। ভানু আবার নেমে যায় অন্ধকারে। আগুন পেলেই হয়ে যাবে, এক টুকরো কাঠের আংরা। সে নিজেই কলকেতে সব সাজিয়ে টেনে নিয়ে ঠান্ডা হবে। আগুন নিয়ে বসে আছে ওই যে রামচন্দ্র নায়েব আর মেয়েমানুষটি। মেয়েমানুষটি গুনগুন করছে, তা শুনছে বসে রামচন্দ্র। মেয়েমানুষটির রান্নায় সাহায্য করছে রামচন্দ্র। ভানুর চোখ বুজে যায়, সে নিরালম্ব হয়ে পড়ে। এই দৃশ্যটি তার অবিকল চেনা। খুব চেনা। কবে যেন দেখেছিল এমন! ফুলরানি তো তার বিয়ে করা বউ, ছেলের মা, এই মেয়েমানুষটা কে রামচন্দ্রর? কেউ না, কিন্তু অবিকল ফুলরানি আর ভানু হয়ে উঠেছে তারা। ভানু কঁকিয়ে উঠে অন্ধকারে হাত বাড়িয়ে অন্ধকারকে অবলম্বন করে নিজের পতন রুদ্ধ করতে চায়। টলতে থাকে।

রামচন্দ্র ঝপ করে নেমে এসেছে উঠোনে, ‘তুমি ভানুবাবু!’

‘হাঁ, আগুন দিবি?’

‘আগুন কী হিবে?’

‘কী হবে! আগুন নাই, গাঁজার কলকে সাজাতে হবে তো।’

রামচন্দ্র নিঃশব্দে রান্নাশালে উঠে গিয়ে দেশলাই নিয়ে ফেরে, বলল, ‘হ্যারিকেন দিব?’

‘কলকেটা সাজাতে পারবে রামচন্দর?’

‘হাঁ, হাঁ।’

‘তবে আস।’ ভানু প্রায় টেনে আনল রামচন্দ্রকে।

গাঁজার কলকে সাজাতে রামচন্দ্র নিপুণ। বাবু এলে তো দিনে বার দুয়েক সাজাতে হয় তাকে। পারবে না কেন? আর ওই যে মেয়েমানুষটা রান্নাশালে, ও–ও খুব ভালো পারে। রামচন্দ্ররও ওই অভ্যেস আছে কিনা। তাকে বাবুই তো ধরিয়েছে।

ভানু বলল, ‘রামচন্দর, বাবুর জমি বন্দোবস্ত দিয়ে কী হয় তোর?’

‘আজ্ঞা কুছু না।’

‘কিছু না কেন, শ–টাকা চা, বিষ্ণু পাতর দিয়ে দেবে।’

‘আজ্ঞা তা অন্যায্য।’

ভানু হি–হি করে হাসে, ‘রামচন্দর, মেয়েমানুষটা তোর কেডা?’

‘আজ্ঞা কেউ না।’

‘কেউ না তো এখেনে থাকে?’

‘আজ্ঞা বড়ো দুখী, ওর ভাতার ওকে খেদাই দিইছে।’

‘কেন খেদাল?’

‘আজ্ঞা কাঁচা টঙ্কা পাইছে, দু–বিঘা জমিন ছিল, ভিটা ছিল, সব তো মিলিটারি নিল, চালিশ হাজার টঙ্কা পেল, টঙ্কা ওর মাথা ঘুঁরাই দিইছে, টঙ্কা লিয়ে বালেশ্বর চলি গিইছে।’

ভানু বলে, 'ওর ডর লাগবে না?'

'আজ্ঞা?'

'তুই এখেনে বসে আছিস, ডর লাগবে না?'

'আজ্ঞা?'

'আজ্ঞা, আজ্ঞা করিস কেন, ও তোরে ডাকে।'

'হাঁ, খুব ডরায়।'

'ডরায় কেন?'

'উয়ার সোয়ামি যদি ঘুরে আসে।'

'তা'লে তো ও সোয়ামি পাবে।'

রামচন্দ্র মাথা নাড়ে, 'ও যাবে না।'

'কেন যাবে না?'

'ওর ডর লাগে।' বলতে বলতে রামচন্দ্র উঠে পড়ে, 'মেয়্যাছেল্যাটা খুব ডর খায়, এমন মেঘের রাতি, আশমানে চন্দ্রমা নাই, ঘুটঘুট করে আন্ধার, মেয়্যাছেল্যাটার খুব ভূতের ভয়।'

'তুই যা রান্নাশালে।'

রামচন্দ্র বলে, 'ও খুব দুখী, এখন কুথাও ওর ঘর নাই।'

'ঘর নাই তো থাকে কুথায়?'

রামচন্দ্র বলে, 'মোর ইখানে।'

'তুই মেয়েমানুষ রেখেছিস?'

'আজ্ঞা না, ও খুব ডরায়, মু যাই, একা একা রান্নাশালে আছে উ।'

রামচন্দ্র চলে যায়। ভানু থমথমে হয়ে যায়। ভোজপুর জেলার ট্রেনের কথা মনে পড়ে কতদিন বাদে। খোকার হাতে ঝুমঝুমি দিল, ফুলরানির বড়ো বড়ো দুই চোখ ভরা জল। সেই জল নোনা। ফুলরানি কাঁদলে সে হাত চাপা দিত ওর চোখে। তবে না কান্না থামত। হাত ভিজে যেত নোনা জলে। ভানু দূরের অন্ধকারের উপর ছাওয়া ফ্যাকাশে আলোর দিকে চেয়ে নিশ্চুপ। ফুলরানির চোখের জল আর থামছে না। ভানু স্পষ্ট দেখতে পায় দু–চোখ সমুদ্র হয়ে যাচ্ছে যেন। সে দু–চোখে হাত চাপা দেয়। হু–হু করে জল গড়িয়ে আসছে বুকের উপর। হায় কন্থক, শূন্য করে দিলে ভানুচরণকে! ছন্দক এখন কী নিয়ে থাকে?

মেয়েমানুষটার নাম সুভদ্রা। সুভদ্রা বলেই তাকে ডাকছিল রামচন্দ্র। পরিপাটি করে খেতে দিল ভানুকে। একেবারে গেরস্ত ঘরের রান্না। এ রান্নার স্বাদ দীঘার হোটেলে মেলে না। আবার এমন রান্না কোকিলা বধূও করেনি। কোকিলা বধূর হাতে রান্না এমন ধোঁয়াটে মাংস তো জোটেনি তাদের। ওদের অভাবের সংসার। ভাতে, তরকারিতে অভাবের ছায়া। আর মন না দেওয়ার চিহ্নও তো পেয়েছিল ভানু। রান্নাবান্না হলেই হয়, আসল হল মদরঞ্জি। মদরঞ্জি যে কতরকমে সুন্দর করা যায় তাই নিয়েই ভেবে মরে কোকিলা।

ভাত দিল। ভাত খাওয়ার পর হাত ধোয়ার জল দিল। পান দিল। ভানু বসে বসে সিগারেট টানতে লাগল। সিগারেট বেরোল রামচন্দ্রের হাত থেকে। রামচন্দ্র তাকে সিগারেট দিয়ে গেল রান্নাশালের দাওয়ায়, 'মেয়েমানুষটা খাবে, ডর লাগলে খাবে কী করে?'

তারপর এক সময় সুভদ্রার খাওয়া হলে রামচন্দ্র ফিরে এল, বসল ভানুর পাশে, জিজ্ঞেস করল, 'ভানুবাবু তুমি এলা কেনে?'

ভানু বলল, 'আমার কন্থককে খুঁজতে, আমাকে ছাড়া সে তো থাকতে পারে না।'

'আর?'

'আর কী?'

'অশ্ব যে মিলিবেনি তা কি জানোনি ভানুবাবু?'

'যদি মিলে যায়?'

রামচন্দ্র বলল, 'বাবুরে কহিবা?'

'কী?'

'সুভদ্রার কথা।'

'কী, তুই তারে সাহস দিস, তাই?'

'হাঁ বটে।' ভানুকে অবাক করে রামচন্দ্র সেই কথাই বলল, 'মেয়্যামানুষটা খুব ডরায়, উয়ার পাশে তো থাকতা হিবে।'

ভানু বলল, 'থাক না, কে তোরে বারণ করে?'

'বাবুরে কহিবা?'

'কী কহিব?'

রামচন্দ্র বলে, 'ই মেয়্যাছেল্যাটার কথা।'

'কী?'

রামচন্দ্র বিড়বিড় করে, 'কীভাবেই–বা কহিবা, আচ্ছা থাক, বাবুরে কহিতে হিবেনি, বাবু কবে আসিবে?'

'বাবু আর আসবে না, আমি রিপোর্ট নিয়ে যাব।'

'তুমি কহ বাবুর আসা দরকার।'

'কেন?'

'লুটিশ পড়ছে, কোন জমির চাষা হিবে কোন জন তা যদি বাবু কহি দেয় উয়াদের সুবিধে হয়।'

'সে তো দেরি আছে।'

'হাঁ, ধান উঠার পর তো হবে, ই চাষটা হ'ই যাবে।'

‘তখন বাবু আসবে।’

‘না, না ইখন আসা দরকার, লিস্টি হিবে তো, নাম মোর নিকট রহিছে।’

ভানু বলল, ‘চাষারা তাদের নাম লিখাবে, বাবুর কী?’

‘বাবু তো টঙ্কা লিবে।’

‘টঙ্কা লিবে!’ অবাক হয়ে গেল ভানু। মিলিটারি জমি নেবে, সেই জমির দাম বাবুকে দেবে। আর চাষা পাবে ফসলের দাম। তার সঙ্গে বাবুর পাওনার কোনো সম্পর্ক নেই। বাবুর টাকা থেকে কেটে তো তাদের দেবে না। কিন্তু রামচন্দ্র নায়েব বলছে অন্য কথা, সরকারি লোক বলে, যদি বাবু চাষার নাম না বলে তবে তারা চাষার ফসলের দাম দেবে না, কিন্তু টাকা তো ধরা আছে। দশটা ফসলের দাম ঠিক হয়েছিল মহাপাত্রপুর, দে–পাল, কুসমাড় মৌজার অধিগ্রহণের সময়। পাঁচ বছর, দশ ফসল। দেড়শো বিঘের দেড়শো চাষি হোক আর এক চাষিই হোক, ফসলের দাম তো মোটা। সরকারি লোক বলে গেছে বাবু চাইলে তারা ওই টাকার অর্ধেক বাবুকে দিয়ে বাকি অর্ধেক নিজেরা নিয়ে নেবে। শুধু বাবুকে সই করে দিতে হবে লিস্টিতে। লিস্টি তারা আনবে। সব ভুয়ো নাম। রামচন্দ্র নায়েবও সই করবে লিস্ট আরও পাকা করতে।

ভানু বলল, ‘উত্তম প্রস্তাব।’

‘হাঁ, বাবুকে আসিতে হিবে, বাবু এলা মু বাবুর সহিত ভুবনেশ্বর যাবা, ভুবনেশ্বরে গিয়া সার্ভিয়ার নায়েব বাবুর সহিত কথা কহিতে হিবে, কম টঙ্কা তো লয়, লাখো টঙ্কা হই যাবে, বাবুর পঁচাশ হাজার, নায়েব বাবু পঁচাশ হাজার নিবে, সব উয়াদের বেপার।’

ভানু বলল, ‘তোর কী হবে?’

‘কী আবার হিবে?’

‘তুই কত পাবি?’

‘মু পাবা কেনে?’

‘বাহ্, দালালি করছিস, পাবি না?’

রামচন্দ্র মাথা নাড়ে, ‘বাবু যা দিবে। বাবুর নিমক খাওয়া মানুষ মু, যাই মেয়্যাছেল্যাটা একা রহিছে।’

‘থাক না একা।’

‘উ ডর খায়, একা থাকিবে কী করি?’

‘তাহলে ও সোয়ামির কাছে ঘুরে যাক।’

‘সোয়ামি নেয় না।’

‘ফের বিয়া করুক।’

‘তা কী হয়?’

‘হয় না?’

‘কী জানি!’ উঠে পড়ে রামচন্দ্র, ‘হয় কি না বাবু কহিবে, বাবুর নিকট ই কথাটা কহিবে?’

‘কহিব।’

‘মু কহি কি, বিষ্ণু পাতর ঘুরছে দশটা ফসলের দাম লিবে তাই।’

‘চাষা তো।’

‘কোন জমির চাষা তার কি ঠিক আছে?’

ভানু বলল, ‘তুই যা।’

'হ্যাঁ যাব, সুভদ্রা ডর খায়, একা রহিতে পারেনি, কথাটা যদি না কহিতে পারো বাবুরে ভীমাপুর আসিতে কহ, জমি চলি যাবে, বাবুর তো সব জানা দরকার।'

ভানু দেখল অন্ধকার বারান্দার অপর ধারে স্ত্রীলোকটি বসে আছে। লম্বা কাছারিবাড়ি, পর পর ঘর। শেষ ঘরটির দরজার কাছে বসে স্ত্রীলোকটি চেয়ে আছে এদিকে। অন্ধকারে তার চক্ষু দুটি টের পাওয়া যায়। দৃষ্টির আলো অনুভব করা যায়। আবার ঝিপঝিপ করে বৃষ্টি এল। সুভদ্রা তাদের কথা শুনছে। তাদের দুজনের কারোর গলাই নরম নয়। ভানু মনে মনে ভাবে তাকে খুব বড়ো মুরুব্বি ভেবেছে দু–জনে, তাই মাংস রেঁধে খাইয়ে জপাচ্ছে রামচন্দ্র। আকারে ইঙ্গিতে মনোবাসনা প্রকাশ করছে। আর ভানুকে তো ভালো করে সন্তুষ্ট করতেই হবে, ভানু যদি দীঘায় ফিরে বাবুর কাছে সাতকাহন করে তো রামচন্দ্রর কপালে দুঃখ আছে। কাছারি ঘর তো ফুর্তির জন্য নয়। ভানু চাপা গলায় বলল, 'যতই ডরাক উ মেয়েমানুষ, বাবু এরকম দেখলে রেগে যাবে।'

'কেনে?'

'কেনে তা বোঝো না?'

'ও বড়ো দুখী।'

'দুখী হোক, মেয়েমানুষ তো, তারপর স্বামী ত্যাগ দেওয়া।'

'কেনে সে মেয়্যামানুষ কি মেয়্যামানুষ লয়?' আচমকা যেন খেপে যায় রামচন্দ্র, 'দুখী, অনাথ, উয়ার কি সাধ–আহ্লাদ নাই?'

'আছে তো কী হবে?'

'কী হবে মানে?' রামচন্দ্র ফুঁসে ওঠে।

ভানু হাসে মনে মনে, বলে, 'কাছারি ঘরে রেখো না।'

'তবে যাবে কুথায়?'

'তাতে তুমার কী?'

'দুখী যে।'

'হোক দুখী।'

'ইটা তুমি কী কহ ভানুবাবু?' রামচন্দ্র যেন নাচার হয়ে জিজ্ঞেস করে।

'আমি কী কহি, বাবু কহিবে এইরকম।'

'কহিছে কুছু?' রামচন্দ্র সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠে।

'বাবু কি জানে?'

'ওই পাতর হারামিটা ইসব কহে নাই তো?'

'না–ই মনে হয়।'

'উয়ারে কুছুতেই জমিন দিব না।' রামচন্দ্র গরগর করতে থাকে।

ভানু বোঝে উলটো বিপদ। রামচন্দ্র তার রাগ ঝাড়ছে বিষ্ণু পাতরের উপর। সে বলল, 'ও কী করবে, বাবু যদি আসে তো দেখবে।'

'তখন নাহয় সুভদ্রা অন্য কুথাও রহিবে।'

'সে এখনই থাকুক না কেন।' ভানু বলে।

'ইটা তুমি কী কহ ভানুবাবু, উ বড়ো দুখী, ডরায় খুব, একা কুথাও রহিতে পারে না, উদিকে ঠিকেদার, পুলিশ, মিলিটারি, লেবার, তারা যদি উয়াকে ধরে? তারা মেয়্যামানুষ খুঁজে সর্বক্ষণ।'

ভানু দেখল মেয়েমানুষটি যেন গুটিয়ে গেছে। কী অদ্ভুত ভঙ্গি! যেন হাত–পা শরীরের ভিতর ঢুকিয়ে বসে আছে স্তূপ হয়ে। সে রামচন্দ্রকে দেখল। মোষের মতো পুরুষমানুষটা নিশ্বাস ফেলছে জোরে জোরে। খুব রেগে গেছে শ্রীপতি মাইতির পোষা পুরুষটি। ভানু তার গায়ে হাত দিতেই ঝটকা মারে রামচন্দ্র, বলে, ‘গাঁ তো লিবে, সেই সঙ্গে সব লিবে ইটি কি জানো ভানুবাবু?’

ভানু দেখল সুভদ্রা উঠে ঘরে গেল। ভানু আর রামচন্দ্রর কথা বোধ হয় তার সহ্য হচ্ছে না। ভানু তার গলার স্বর খাটো করে আনে, চাপা গলায় জিজ্ঞেস করে, ‘কী হয়েছিল?’

‘কী হয় নাই কহ।’

‘বাবু কি জানে?’

‘বাবু কেনে জানিবে, উ তো বাবুর কেহ নি।’

‘কী হয়েছিল?’

‘বলছি তো ঠিকেদার, পুলিশ, লেবার, মিলিটারি সবু মেয়্যামানুষ খুঁজে, আর কী কহিব ভানুবাবু, ইখনও ডরায়।’

ভানু নিশ্চুপ হয়ে গেল। বহু দূরে আকাশের গায়ের আলো যেন সার্চলাইট। সার্চলাইট দিয়ে মেয়েমানুষ খোঁজা কি দ্যাখেনি ভানু? মন ভার হয়ে গেল। কিন্তু কৌতূহল তবু যায় না, জিজ্ঞেস করে, ‘বিচার হয় নাই?’

‘কে বিচার করিবে?’

‘থানায় যায় নাই?’

‘থানা তো ফের ধরিবে, উয়ার সোয়ামি টঙ্কা লিয়ে মুলুক পার হয়ে বালেশ্বরে চলি গিইছে, ভুবনেশ্বর, কটকও চলি যেতি পারে। কে উয়ার পিছে দাঁড়াই দুটা কথা কহিবে, কাঁচা টঙ্কার লোভ, সোয়ামিই উয়াকে ঠিকাদারের হাতে বিচে দিয়া চলি গিইছিল কি না কে কহিবে।’

ভানু বলল, ‘ডাকবি ওকে।’

‘আসিবেনি, ডরায়।’

‘আমাকে ডরাবে কেন? ভাত তো দিল।’

‘ডাকিব কেনে?’

‘একবার দেখব, বাবুকে তো কহিতে হবে।’

‘কহিবে?’ রামচন্দ্র আশান্বিত হয়ে ওঠে।

‘হ্যাঁ কহিব, কিন্তু আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি বাবু কিছুই জানে না!’

‘না, বাবুর তো ইটা জানার বেপার নি।’

‘না, না, জমি যে চলে যাবে।’

‘শুনিছে বাবু, বাবু তো জমিনের হিসাবই জানেনি।’

ভানু বলল, ‘তবে আর বাবুর কথা ভাবিস কেন?’

রামচন্দ্র মাথা দোলায়, ‘বাবু তো, মহাজন, মালিক হইছে। মোর সব ভার বাবুর, না কহিলে হিবে কেনে, বাবু কহিলেই তো উ ইখানে রহিতে পারে, বাবু না কহিলে উর তো থান নাই ই কাছারি ঘরে।’

‘বাবু যদি না কহে?’ জিজ্ঞেস করে ভানু।

‘না কহিবে কেনে?’

‘দশ হাত ঘোরা মেয়েমানুষ।’

‘দশ হাত!’ গরগর করে ওঠে রামচন্দ্র, ‘ঠিকেদার, লেবার, পুলিশ মেয়্যামানুষ খুঁজে, উয়াদের থাবায় পড়ি গিইছিল, আর যতন নায়েকের মেয়্যা, হরিহর দঁডপাটের মেয়্যা, আফুল পয়ড়ার বিধবা বুন, সব বালেশ্বরে গিয়া

লাইনে দাঁড়াই গিছে, ইয়া ছাড়া উপায় নি। গলায় দড়ি দিয়া মরিছে সুফল দাশের বউ, ইসব তো বাবুর জানা উচিত।'

'জেনে বাবুর কী হবে?'

'জমিন চলি গিলে, গাঁ গিলে ইমন হয়, ইটা বাবুর জানা উচিত।'

ভানুর মনে পড়ল শ্রীপতি মাইতির মুখখানি। কী সুখী কী তৃপ্ত! এই দেড়শো বিঘের এক ছটাকও শ্রীপতি মাইতির হাতে করা নয়। সব ঠাকুরদা, তার বাবার আমলের। পাহাড়ি জমিদারের আমলের মধ্যস্বত্ব। ভানুর ওদিকে হলে কবে এসব জমি দখল হয়ে যেত, খাস হয়ে যেত। এখানে তা হবার নয়। ওসব আইন এদিকে নেই। কত জমি না ছিল! জমি বেচেই তো হোটেল হল দীঘায়। জমির আয়েই তো চলে। ধান চাল বেচা টাকা কম নিয়ে যায় এদিক থেকে শ্রীপতিবাবু! জমিন নিয়ে নেমেছে জগতে, সুতরাং জমিন থাকলে কী হয়, জমিন চলে গেলে কী হয় তা জানবে কী করে শ্রীপতি? জেনেই বা করবে কী? কম টাকা ক্ষতিপূরণ পাবে? তাতে কোন মেয়েমানুষ ধর্ষিত হল, লাইনে গেল, গলায় দড়ি দিয়ে ম'লো সে খোঁজ রাখবে কেন সে? ভানু বলল, 'বাবুর তো কাছারি, ভেবে দ্যাখো, বাবু যদি রেগে যায়।'

রামচন্দ্র বলে, 'একই কথা কহ কেনে বারে বারে, উ কাছারিতে রহিবে।'

'কাছারি তো বাবুর।'

'তবু রহিবে, কোনঠে যাইবে, শুনো ভানুবাবু, তুমি বাবুরি বুঝাও, কাছারি ঘর, জমিদারি, মা'জনি যদি সব উঠি যায় তো বাবুর কী রহিবে?'

চমকে ওঠে ভানু, 'তার মানে?'

'মহাজনবাবু, জমিদারবাবুর যদি জমিদারি না রহে তো কী রহে?'

'কেন টঙ্কা, বদলে তো টঙ্কা মিলবে।'

'তা মিলিবে, কিন্তু টঙ্কা তো কত লকের অছি।'

'বাবুর থাকবে।'

'টঙ্কায় কী হবে, জমিন, ভুঁই না থাকিলে তো চাষা থাকেনি, চাষা না থাকিলে কী থাকে বাবুর?' 'কাছারিও তো রহিবেনি।'

'কাছারি না থাকলে তোরা কোথায় যাবি?'

'যাব, কিন্তু ভুঁই যাতে না যায় বাবুরে সে ব্যবস্থা করিতে কহ।'

'কী করে হবে?'

'হিবে, যদি সবটা না নেয় তো হিবে।'

'সবটা নেবে না?'

'কী জানি! মোর মাথার ঠিক নাই।' মাথা ঝাঁকাতে থাকে রামচন্দ্র, তারপর বলে, 'ভুঁই না রহিলে মু তো নায়েব রহিব না।'

'না।'

'ভানুবাবু, তুমি বাবুরে কহ রামচন্দর আর সুভদরা কাছারিবাড়িতে রহিছে, উপায় নি সুভদরার, জমিন চলি গিলে ইসব হয়, ভুঁই ঠিকেদার, পুলিশ, মিলিটারির নিকট গিইলে ইমন হয়, তখন কাছারিঘর থাকেনি, চাষাও থাকেনি, চাষাবউ ডরায়, বাবুর ইটা জানা দরকার।'

ভানু শুনছিল। শুনতে শুনতে টের পাচ্ছিল রামচন্দ্র সরে যাচ্ছে তার কাছ থেকে। এই রামচন্দ্রকে সে গত বছরও দেখেছে। তখন মুখ দিয়ে কথা বেরোত না। এখন কিনা বাবুর বাধ্য রামচন্দ্র একটা জলজ্যান্ত মেয়েমানুষ নিয়ে কাছারি ঘরে বাস করছে। আর তার বসবাসের পক্ষে যুক্তি খাড়া করছে। মহাপাত্রপুর, দে–পাল, কুসমাড় গ্রামের

দিকের জ্বলন্ত আকাশ বদলে দিয়েছে রামচন্দ্রকে। অবাক হয়ে দেখল ভানু, ওদিকের আকাশের অন্ধকারে আগুনের গোলা উঠে যাচ্ছে। ঝলসে যাচ্ছে মেঘ। ভানু একা বসে আছে। দেখতে পাচ্ছে সমুদ্রের অন্ধকারে গিয়ে পড়ছে আগুনের গোলা, রকেট উঠছে। দেখছে পোড়া আকাশ থেকে ছাই ঝরছে। ভানুর বুক হিম হয়ে গেল। এমন জ্বলন্ত আকাশের নীচে তার কন্থক কি বাঁচবে? ভানু দেখল আকাশ দিয়ে যুদ্ধ বিমান যাচ্ছে। আষাঢ়ের মেঘ পুড়ে যাচ্ছে। সার্চ লাইট নীচে পড়ছে। ভানু ঢুকে গেল ঘরে। জানালা দিয়ে দেখতে লাগল। সার্চলাইটে ঘোড়াটাকে খুঁজছে নাকি? ভানু খোঁজে এক কারণে, তারা খোঁজে অন্য কারণে। ভানু গুঙিয়ে ওঠে, 'কন্থক হে! পুড়ে যাবি, ফিরে আয়, আকাশ তোরে কুহক করেছে, ফিরে আয়।'

ভানুর চোখ দিয়ে আচমকা জল গড়াতে থাকে। মনে পড়ে শাক্য সিংহ অবতরণ করলেন অশ্ব থেকে। শাক্য সিংহ তাদের বিসর্জন দিয়ে প্রবেশ করলেন বনমধ্যে। শূন্যপৃষ্ঠ কন্থকের চোখে জল। ছন্দকের চোখে জল। ভালোবাসার বড়ো টান! তুই আমার কেউ না, তবু তুই–ই আমার সব। আয়, ফিরে আয় কন্থক। রাজপুত্র তো রেখে গেছে আমাদের। যত দিন, যত যুগ, যত সহস্র বছর যায় যাক, আমি তোকে নিয়ে থাকব, তুই আমাকে নিয়ে থাকবি। ঘোড়া না থাকলে ঘোড়াওয়ালা ভানু দাস কে? ঘোড়ার দেখাশুনোই যখন হবে না, এ পৃথিবীতে ছন্দকের কাজটা কী?

ভানু ভোরবেলায় কাছারিবাড়ির উঠোনে যখন দাঁড়াল, অন্ধকার সবে ফিকে হচ্ছে। ঠিক মাথার উপর নৌকোর মতো এক ফালি চাঁদ ভেসে আছে। অমাবস্যা সামনে। ভানু দেখল আকাশ পরিষ্কার। দক্ষিণ–পশ্চিমে শুধু লম্বা লম্বা মেঘের আঁচড়। এখন হাঁটতে হাঁটত যাবে মহাপাত্রপুরের দিকে। দেখে আসবে কী হয়েছে। তখন কাছারিবাড়ির কোল থেকে ডাকল মেয়েমানুষটা, 'শুনিবা, ও ভানুবাবু?'

ভানু ঘুরে দেখল মেয়েমানুষটা বেরিয়ে এসেছে। নেমেছে সবে উঠোনে। আলো ফুটছে। ভানু কাল অন্ধকার রাতে সুভদ্রাকে দ্যাখেইনি। আর মাথায় তো ছিল মস্ত ঘোমটা। এখন তা নেই। আঁধার কেটে যাচ্ছে। হাসছে সুভদ্রা। ভানু দেখল চুল এলো করা, কপালে মস্ত একখানি সিঁদুরের টিপ। বড়ো বড়ো টানা চোখে তাকিয়ে আছে সুভদ্রা। ভানু ডাকল তাকে হাতছানি দিয়ে। এলোচুলে স্মিত হাস্যে এগিয়ে আসতে লাগল সুভদ্রা। ভিজে বালিমাটিতে। তার পায়ের চিহ্ন পড়ছে, নরম, সুশোভন। সুভদ্রা তার সামনে এসে বলল, 'কুনথে যাও।'

'দেখে আসি।'

'কী দিখে আসিবা?'

'মহাপাত্রপুর, দে–পাল, কুসমাড়! ওদিকে চাঁদবালি তো?'

'হ্যাঁ।'

'চাঁদবালি, চাঁদিপুর আসা হইছিল অনেক আগে।'

'তবে তো ইসব জায়গা তুমার চিনা অছি!'

'নাম শুনছিল, বালিমুন্ডা, ভীমাপুর, মহাপাত্রপুর—সব।'

'কী দিখতে যাবা?'

'দেখি কী হয়েছে।'

সুভদ্রা মাথা নাড়তে থাকে, 'লাভ নাই।'

'কেন?'

'সব তারকাঁটা দিয়া, বন্দুক লিয়ে মিলিটারি দাঁড়াই রহিছে।'

'তবে!' ভানুর বুকটা কেন যেন ধক ধক করে ওঠে।

'তবে কী?'

'সাগর দেখতে এলাম তো।'

'চাঁদিপুর চলি যাও, বালিমুঁড়া থিকে টেকার মিলিবে।'

'চাঁদিপুর আমার যাওয়া।' ভানু বলতে বলতে থেমে যায়, কী যেন বলবে? পেটে এসে মুখে আসছে না। কাঁথি থেকে বাসে করে মোহনপুর ঘুরে বালিমুন্ডা এসেছে। বালিমুন্ডা নাকি চন্দনেশ্বর দিয়েও আসা যায়, অনেক দূর! সমুদ্রের ধারে ধারে, গাঁয়ের পর গাঁ পেরিয়ে। একই তো সমুদ্র। যে সমুদ্র সাগরদ্বীপে, সেই সমুদ্র দীঘায়, সেই সমুদ্র তালসারি, চোদ্দোবেড়িয়ায়—। হ্যাঁ চোদ্দোবেড়িয়া। চোদ্দোবেড়িয়া কি এদিক থেকে কাছে হবে? সুবর্ণরেখা নদীর সেই মোহনা। যেখানে ঘোড়াটা পালায়। ভানু জিজ্ঞেস করল চোদ্দোবেড়িয়ার কথা, জানে কি সুভদ্রা?

সুভদ্রা মাথা নাড়ে, 'না তো, কুনদিকে হিবে, ও কি মিলিটারির ভিতরে পড়ি গিইছে?'

'কী করে জানব?'

সুভদ্রা বলে, 'সমুদ্দুরের ধার সবু মিলিটারি লিয়া লিবে, কীর'ম আগুন ছুটায় রাতি, কাল তুমি দিখেছ?'

'তুমি দেখেছ?' ভানু জিজ্ঞেস করে।

'হাঁ, কত দিখিছি, একদিন দিনেরবেলায়, মেঘলা ছিলা সিদিন, আশমান যেন পুড়ি গিলা ভানুবাবু।'

'কবে?'

'কবে যেন, হাঁ পুন্নিমের দিন, বোশাখখো মাসের পুন্নিমে, রাতে যদি আগুন ছুটত অমন তবে নীল আশমান, নীল চাঁদ, নীল জুছনা সব পুড়ে যেত, এক–একদিন যে কী ডর লাগে!' সুভদ্রা মাথা নামায়, বিড়বিড় করে, 'ওদিকি গিয়া লাভ নি, মিলিটারি বন্দুক রাখিবে বুকের উপর।'

ভানু বলল, 'তবু দেখে আসি।'

'তুমি পুরুষমানুষ, জানে না মারিলে কী আর হিবে!' সুভদ্রা সরে যেতে থাকে। ভানু তখন ডাকল তাকে, 'শুনি যাও, সত্যি সেদিন অমন হয়েছিল?'

অন্ধকার মুছে চরাচর আলোয় ভরে যাচ্ছে। সুভদ্রা দাঁড়াল সেই আলোর ভিতরে, 'কী?'

ভানু জিজ্ঞেস করে, 'কী হয়েছিল বলো দেখি।'

'নায়েব শুনাবে।'

'তুমার স্বামী কোথায়?'

'নায়েব শুনাবে। নায়েব সব জানে।' সুভদ্রা আগের কথাটিই বলে। আকাশের কথা, জ্যোৎস্নার কথা এড়িয়ে যায়।

'জানে, আরু বেশি জানে মোর থিকে।' বলতে বলতে সুভদ্রা মাথায় কাপড় টানল, চাপা গলায় বলল, 'নায়েব ভগমান!'

ভানু বলল, 'দে–পাল, কুসমাড়, মহাপাত্রপুরের মানুষ কোথায় গেল?'

'ক–ঘর চাষা ছিলা, সবু ভাগচাষা, ঘর ছিলা বাবুগণের জমিনে, কে কুনথে গিলা কী জানি! দে–পালের জমিন ছিলা খাস, তাই কহে, উ জমিন নাকি উয়াদেরই ছিলা।'

'তোমাদের?'

'মোদের ঘর, গাছগাছালি খেতি ছিলা, টঙ্কা দিল।'

'যাদের আপন জমি ছিল, কোথায় গেল?'

'গিইছে কোনথে আর কী জানি?' সুভদ্রা বলল, 'পুলুশ, মিলিটারি যদি জিগায় কী কহিবে? কহিবে ভুল কইরে চলি আসিছি।'

ভানু ফিরে এসে বারান্দায় পা ঝুলিয়ে বসে। সুভদ্রা কাছারিবাড়ির পিছন দিকে চলে গেল। নায়েব বেরিয়ে এল বাইরে। ভানুকে জামাকাপড় পরা দেখে বলল, 'কী হিলা, চলি যাবা নাকি?'

'মহাপাত্রপুর যেতাম।'

হাই তুলতে তুলতে মাথা নাড়ে নায়েব, 'কেনে যাবা?'

'সমুদ্দুরটা দেখে আসতে।'

'সমুদ্দুর, গাঙ, কি দিখোনি?'

ভানু কী করে বোঝায় বালিমুন্ডায় আসা তো এদিকের সমুদ্র দেখতে। সমুদ্র তার নেশা। এক–এক জায়গায় সমুদ্রের এক–একরকম চেহারা। এক–এক জায়গায় বেলাভূমি এক–একরকমের। ভানু যদি না দেখে যায় তো আসা কেন এতদূরে? তার আবার মনে পড়ে গেল চোদ্দোবেড়িয়ার কথা। 'চোদ্দোবেড়িয়া কি চেনো রামচন্দ্র?'

রামচন্দ্র বলল, 'নাম শুনা।'

'নাম শুনা মানে?'

'ওই নামে একটা জায়গা অছি, তা জানা।'

'কী করে জানলে?'

'বালিমুঁড়ায় শুনা।'

'কী শুনেছ?'

'চোদ্দোবেড়িয়ার স্বন্নরিখা নদী সমুদ্দুরে নামিছে।'

'হ্যাঁ, কতদূর সেই জায়গা এখেন থেকে?'

'তা তো জানিনি।'

ভানু জিজ্ঞেস করল, 'এখেন থেকে সেখেনে যাওয়া যায়?'

'যাওয়া যাবেনি কেনে, নিকটেই তো মনে হয়।'

'নিকটে!' ভানু উত্তেজিত হয়ে ওঠে, 'কতদূর?'

'তা তো জানা নাই, তবে চোদ্দোবেড়িয়া ফিরত লকের সহিত দিখা হইছিলা।'

'কোথায়?'

'বালিমুঁড়ায়, সি লক তার ঘুড়ি লিয়া ফিরছিলা।'

'তাই!' ভানু উত্তেজিত হয়ে বারান্দার থেকে নেমে পড়ে। ঘন ঘন শ্বাস নিতে থাকে, নিশ্বাস ফেলতে থাকে। তাহলে কি চোদ্দোবেড়িয়াতেই গেছে তার কন্থক? খবর তো পেয়েই ছিল ভানু, ওদিকে কোনো ঘোড়া যায়নি। চোদ্দোবেড়িয়ার দিকের লোকের সঙ্গে দেখা হয়েছিল তার চন্দনেশ্বরে। কিন্তু রামচন্দ্র যা বলছে তার মানে চোদ্দোবেড়িয়া থেকে ঘুড়িকে নিয়ে ফিরছিল ঘুড়ির মালিক। ঘুড়ি চোদ্দোবেড়িয়া গিয়েছিল কেন? না, ঘোড়ার টানেই। সেই ঘোড়া কে? না, শ্রীপতিবাবুর পক্ষীরাজ ভানুচরণের কন্থক। এইসময়ে গিয়েছিল কীভাবে? এইসময়ে তো ওই দিকে কোনো ঘোড়া যায় না। ঘোড়া যদি না যায়, ঘুড়ি যাবে কেন? তাহলে কি গোপন সন্ধি হয়েছিল বালিমুন্ডার ঘুড়ি আর কন্থকে? তারা দুজনে কি আগের আশ্বিনে ঠিক করে রেখেছিল বৈশাখী পূর্ণিমার রাতে মিলবে চোদ্দোবেড়ায়ায়? তারপর দিন গুনতে আরম্ভ করেছিল কবে আকাশে দেখা দেবে ভগবান বুদ্ধের মুখের মতো পূর্ণশশী! পবিত্র হলুদ চাঁদ। পবিত্র নীল চাঁদ। পবিত্র রুপোলি চন্দ্রমা।

ভানু বলল, 'তাহলে তো যেতে হয়।'

ঘুরে তাকায় রামচন্দ্র, 'কুনথে?'

'কেন চোদ্দোবেড়ে!'

রামচন্দ্র হেসে বলে, 'মু তো আজগার কথা কহি নাই, সোউ আশ্বিনার কথা গেল সনের কথা।'

ভানু কিন্তু হতাশ হয় না। একবার গিয়েই নাহয় দেখা যাক চোদ্দোবেড়িয়ায় আছে কি না। কিন্তু রামচন্দ্র বলে, 'তার চেয়ে মহাপাতর সাইকিল দোকানির সহিত কথা কহ বালিমুঁড়ায়।'

'চোদ্দোবেড়িয়ায় নাই?'

'না, নাই।'

'তুমি কী করে জানলে?'

খি–খি করে হাসে রামচন্দ্র, 'জানি, আশ্বিনে ইদিকের মাদিগুলা উদিকে যায় মদ্দার খুঁজে, ইখন সি টায়েম লয়।'

রামচন্দ্র নিমদাঁতন নিয়ে হাঁটল মাঠপানে। ভানু একা দাঁড়িয়ে থাকল উঠোনে। যাচ্ছিল মহাপাত্রপুর, দে–পাল, কুসমাড় দেখতে, যাওয়া হল না। চোদ্দোবেড়িয়ার খবর যদি–বা পেল, কিন্তু তার আসল হদিশ দিতে পারছে না রামচন্দ্র। এখন বালিমুন্ডায় গিয়ে খোঁজ নিতে হবে সাইকেল দোকানি যে ঘোড়া কিনেছে সেই ঘোড়া তার হারানো ঘোড়া কি না।

সুভদ্রা চায়ের কাপ নিয়ে এল, 'ভানুবাবু, যদি কাছারিবাড়ি উঠি যায়, নায়েব কুনথে রহিবে?'

'সে তো নায়েব জানে।'

'না, বাবুর তো ঢের কারবার।'

'ঢের আর কই, হোটেল আর এই চাষবাড়ি।'

সুভদ্রা বলল, 'আরু চাষবাড়ি নাই?'

'ওদিকের অবস্থা তো এমন নয়।'

'কিমন?'

'নায়েব তো নাই ওদিকে, জমি সব বর্গা বন্দোবস্ত দেয়া আছে, আর এত জমিনও রাখার হক নাই ওদিকপানে।'

সুভদ্রা কথাটা ঠিক বোঝে না। হাঁ করে শোনে। ভানু বলল, 'বাবু মোরে বলেছিল রামচন্দরকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে।'

'কেনে?'

'তা বাবুই জানে।'

'উ যাবে কহিছে?'

'কথাটা ওকে বলাই হয়নি।'

'উয়ার যাবা হিবেনি।' সুভদ্রা ধীরে ধীরে স্পষ্ট করে বলল।

ভানু বলল, 'আসলে ভীমাপুরের কোনো কথাই তো মোর জানা নাই, বাবু তো কিছুই বলে না, হয়তো বাবু ই নোটিশ লিয়ে নায়েবের সাথে কথা কহিবে।'

'বাবু কি জানে লুটিশ আসিছে?'

মাথা নাড়ে ভানু, 'কী করে বলি?'

'নায়েব কী করে যাবু, নায়েব যদি যায় মু কুনথে যাবু?'

'কেনে? কাছারিতে রহি যাও।'

মাথা নাড়ে সুভদ্রা, 'ডর লাগিবে, আর যদি টের পায় উয়ারা মু একা রহিছি, মোকে টেনে লিয়ে যাবে, নায়েব খুব শক্তি ধরে, নায়েবকে ডরে উয়ারা, নায়েবের নিকটি রহিছি তাই বাঁচি অছি, উ ভানুবাবু, ই জায়গা কিমন তা দিখছনি, কেহ কুনথে আছে?'

ভানু দেখল কথাটা তো সত্যি। প্রায় মাঠের ভিতরে বাবুর চাষবাড়ির কাছারি ঘর। এখানে একা একটা পুরুষমানুষের থাকাই গা ছমছমে, তায় একটি মেয়েমানুষ, যে কয়েকবার ঠিকেদার, পুলিশের হাতে পড়েছে! কিন্তু মহাপাত্রপুর, দে–পাল, কুসমাড় তো অনেকদূর। অত দূরের লোক খবর পাবে কী করে কাছারিবাড়িতে নায়েব নেই?

ভানুর মনের কথাটি ধরে নিল সুভদ্রা, বলল, 'মাঠে মাঠে আসিবে শেল, খট্টাশের দল, মু কুনথে যাবু তখুন?'

ভানু মাঠের দিকে তাকায়। শূন্য জমির কোথাও কোথাও ধান রোয়া হয়েছে, কোথাও রোয়া করতে চাষিরা নেমে পড়েছে। সব বাবু শ্রীপতির জমি ছাড়া আর কিছুই নেই এদিকে। ভীমাপুরের বসতবাটিগুলি অনেক দূরে। কিন্তু খবর না পেলে মাঠ পার হয়ে কী করে আসবে তারা?

সুভদ্রা বলল, 'বালিমুঁড়া থিকে সবু মানুষ খপর জানি যাবু নায়েব উদিক যাচ্ছে, কত লক কত জিনিস আনিবার দিবে, আর ইদিকে সবসময় ঘুরঘুর করে চৌকিদার, শয়তানের চর, মুর কী হিবে ভানুবাবু?'

ভানু বলল, 'দ্যাখো নায়েব কী বলে।'

'নায়েব তো বাবুর কথা মান্য করিবে, তুমি কহিলে না কহিবেনি নায়েব।'

‘এ তো খুব বিপদ, বাবু বলল রবিবার ফিরতে, না হলে বালেশ্বর থানায় জানাবে, পুলিশ চলে আসবে এখেনে।’

‘কী কহ তুমি!’ ভয়ে আঁতকে উঠল সুভদ্রা, ‘পুলুশ কেনে হিথা আসিবে, কী সব্বুনাশ!’

ভানু বলল, ‘অত ডরাও কেন? পুলিশ কি তুমারে খোঁজে?’

‘কী জানি!’

‘পুলিশ কি জানে না তুমি এখানে আছ?’

‘জানেনি হয়তো, আবার জানিবারও পারে, নায়েবের নিকট রহিছি তাই কুছু কহিছেনি, নায়েব তো বাবুর লক, বাবুর কত জমিন, নায়েবের নিকট মানে বাবুর নিকটেই রহিছি, পুলুশ তাই চুপ করি রহিছে।’

ভানুর অবাক লাগে কথাগুলো শুনে। পুলিশ কেন একটা মেয়েমানুষের পিছনে ঘুরবে? গাঁ–ঘরের সব উঠে গেছে। কুসমাড়, দে–পাল, মহাপাত্রপুরের সব তছনছ হয়ে গেছে, এখন কি মেয়েমানুষের অভাব হবে? সুভদ্রাই কি এই এলাকার একমাত্র ভোগের মতো মেয়েমানুষ? আর কোনো অনাথিনী নেই এদিকে যাকে পুলিশ, ঠিকেদার হিঁচড়ে টেনে নিয়ে যেতে পারে! ভানু জিজ্ঞেস করে, ‘পুলিশ তোমারেই খোঁজে কেন?’

‘তুমি চা শেতল করি দিলা।’ সুভদ্রা এড়িয়ে যায় ভানুর জিজ্ঞাসা। ভানু চায়ের কাপ হাতে তুলে বোঝে একেবারে জল। তা দেখে সুভদ্রা বলে, ‘মোরে দাও, গরম করি আনি।’

‘না থাক, আমি ঠান্ডা চা–ই খাই।’ বলে ঢক ঢক করে প্রায় শীতল পানীয় গলায় ঢেলে হাতের ধার দিয়ে ঠোঁটের কোণ মুছে ভানু বলল, ‘কী হয়েছিল বলো দেখি?’

‘নায়েব জানে।’ সুভদ্রা বলে।

নায়েব রামচন্দ্র আসছিল স্নান সেরে। পাহাড়ের মতো মস্ত দেহ। গায়ে রংটি নিপিশ কালো, ঠিক ওর দেহের পক্ষে যা মানানসই, তাই। সুভদ্রা মাথার কাপড় আরও একটু টেনে বলল, ‘নায়েব চলি গেলি মুও যাবু উয়ার সহিত।’

‘কোথায়?’

‘নায়েব যেখেনে যাবে।’ সুভদ্রা সরে যায় রান্নাশালের দিকে।

রামচন্দ্র বলল, ‘চলো তুমারে লিয়া বালিমুঁড়া যাব।’

ভানু বসে আছে বারান্দায়। তার কৌতূহল ক্রমশ বাড়ছে। কী হয়েছিল এমন যার জন্য পুলিশ সুভদ্রার পিছনে পড়ে আছে! সে নায়েবকে বলল শ্রীপতি মাইতি যা বলেছিল তা। রোববারে যাওয়ার কথা শুনে প্রথমে নায়েব রামচন্দ্র বলল, ‘হ্যাঁ যাই বাবুকে সব তো জানানো দরকার।’

‘সুভদ্রা থাকবে এখানে?’

নায়েব খেয়াল করেনি, চমকে ওঠে, ‘কী কইরে রহিবে?’

‘কেনে?

‘ফাঁক পেলিই চৌকিদার খপর দিবে, মেয়্যামানুষটার বড়ো বেপদ হবে।’

ভানু বলল, ‘কী হইছে কহিবে?’

‘হাঁ, কহিব।’ বিড়বিড় করে রামচন্দ্র, ‘দে–পাল যখন দখল লিতে এল পুলুশ আর গরমেন, আর ঠিকেদারের লোক, উফ। উ মেয়্যামানুষটার কী সাহস! ইত সাহস ছিলা, সবু কুনথে গিলা, ইখন সবু সময় ডরে।’

সুভদ্রা উঠোনের মধ্যিখানে এসে ডাকছে রামচন্দ্রকে, ‘শুনিবা নায়েব।’

নায়েব গেল। ভানু দেখল নায়েব দাঁড়াতে সুভদ্রা হাত নেড়ে নেড়ে কীসব বলছে চাপাগলায়।

মহাপাত্রপুর, দে–পাল, কুসমাড়ের সব জমি একসঙ্গে অধিগ্রহণ হয়নি। একটু একটু করে হয়েছে। সমুদ্রতীরের এক অংশ, দে–পালের উত্তর–পশ্চিম সেনাবাহিনীর দখলে তো ছিলই। কাঁটাতারে ঘেরা ছিল। চাঁদমারি ছিল ভিতরে। সমুদ্রে কামানের গোলা গিয়ে পড়ত। ওদিকটায় জেলে নৌকো তার অভ্যাসেই যেত না। এই অভ্যাস তো অনেককালের। এখন জানা যাচ্ছে দে–পালের বাকি অংশটায় নোটিশ করা ছিল। সরকার তার প্রয়োজনে ভবিষ্যতে নেবে। এখন আরও জানা যাচ্ছে নোটিশ দেওয়া ছিল মহাপাত্রপুর এবং কুসমাড়েও। ভীমাপুরেও ছিল নোটিশ। এইসব নোটিশ প্রায় বছর তিরিশ–পঁয়ত্রিশ আগের। ভূমি অধিগ্রহণ দপ্তর বালেশ্বর থেকে নোটিশ পাঠিয়ে জানান দিয়েছিল মানুষকে যে, ওইসব জমি যে–কোনো মুহূর্তেই সরকার দখল নেবে। কিন্তু সেই প্রাথমিক নোটিশের পর সরকার চুপচাপ হয়েছিল তো এত বছর। সেই পঁয়ত্রিশ বছর আগে যে উদ্বেগ ছড়িয়েছিল মানুষের ভিতর তা ক্রমে ক্রমে নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। তারা জানত সরকারের কখনো মনে হয়েছিল এইসব অঞ্চল অধিগ্রহণ করে কিছু করা যেতে পারে। পরে সরকার ভেবে দেখেছে তা করে লাভ নেই, সুতরাং পরিকল্পনা ত্যাগ করেছে সরকার। ভূমি অধিগ্রহণের নোটিশে, ভূমি অধিগ্রহণের কথাই ছিল, তাতে কোন কারণে অধিগ্রহণ তা উল্লেখ করা হয়নি সেই সময়ে, সুতরাং মানুষজন জানতও না কেন নোটিশ পড়েছিল। কেউ কেউ বালেশ্বরে গিয়ে জেনে এসেছিল যে নোটিশটা সেনাবাহিনীর কারণে। আবার যারা তা জানিয়েছিল, তারা এ কথাও বলেছিল ওইরকম বহু জায়গায় বহু কারণে নোটিশ পড়ে, তারপর আর কাজ হয় না। প্রকল্প বাতিল হয়। এগোয় না কাজ, সুতরাং ওই নোটিশও যে উচ্ছেদের তা মনে করার কোনো কারণ নেই। মানুষজন চুপচাপ হয়ে গিয়েছিল সরকার তরফে আর কোনো চাঞ্চল্য না দেখে।

তারপর তো এত বছর কেটে গেছে। এত বছরে পুরোনো অনেক মানুষ চলেও গেছে। পঁয়ত্রিশ বছর আগে যারা জমি হারাবার ভয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে বালেশ্বর, কটক ছুটোছুটি করেছিল তাদের অনেকেই এখন বেঁচে নেই। যারা বেঁচে আছে অশক্ত হয়ে, তারাও গতায়ু মানুষের মতো বাকি জীবনটুকু নিরুদ্বেগ হয়েই কাটিয়ে দিতে পারবে ভেবেছিল। কিন্তু তা হয়নি। আচমকা দ্বিতীয় নোটিশ পড়ল এত বছর বাদে। তারপর তৃতীয় নোটিশ। খবরের কাগজে ঘোষিত হল গ্রামসমূহের দাগ নম্বর, খতিয়ান নম্বর। তখন জানা গেল দে–পালের যতটুকু দখলে ছিল সেনাবাহিনীর, তার চেয়ে বেশি অংশ পঁয়ত্রিশ বছর আগে গেজেট প্রকাশ করে, খবরের কাগজে ঘোষিত করে সরকার কাগজেকলমে দখল নিয়ে নিয়েছিল। তখন নাকি ক্ষতিপূরণও নিয়েছিল অনেকে বালেশ্বর, ভুবনেশ্বরে গিয়ে। যারা নেয়নি তারা নিতে পারে তা এখনও। টাকা কোর্টে জমা আছে, কিন্তু আশ্চর্যের যে, তখন কাগজে–কলমে ভূমি অধিগ্রহণ দপ্তরের কাছ থেকে প্রতিরক্ষা দপ্তর জমি বুঝে নিয়ে ফেলে রেখেছিল। ছুঁয়েও দ্যাখেনি। আর তাই পুরোনো, আদি বাসিন্দারা ধরে নিয়েছিল সরকার নেবে ভেবেছিল, কিন্তু নেবে না। ক্ষতিপূরণ দিয়েও কত জমি শেষ অবধি নেয় না সরকার, এ কথা তো বালেশ্বর গিয়ে তারা শুনে এসেছে। সরকারের কোনো আমলা হয় মনে করেছিল ওই জমি নিতে হবে, পরে অন্য আমলা ভেবেছে না নিলেও তো হয়। সরকারের টাকা কত দিকে কত ভাবে যায়, সুতরাং ক্ষতিপূরণের টাকাও হয়তো গেছে সেইভাবে। জনসাধারণ জানে সরকারই মালিক, টাকার মালিক—সুতরাং ও টাকা গেলে কী হবে সরকারের? দে–পাল থাকবে দে–পালের মানুষের কাছেই। কিন্তু শেষপর্যন্ত হল কী?

শেষপর্যন্ত, তা পঁয়ত্রিশ বছর বাদে হলেও দে–পাল থাকল না দে–পালের মানুষের কাছে। এই ঘটনা থেকে ধরা গেল যে, সরকারি চিঠি এমনি এমনি আসে না। সরকারি নোটিশ ফেলনা নয়। তার ভাষা বিবরণ প্রায় সবটাই অবোধ্য হলেও যে আইন এবং আইনের ধারা মোতাবেক নোটিশ বা চিঠি আসে তার ক্ষমতা অপরিসীম। ওই আইন বা আইনের ধারা বলে একশো–দুশো বছরের প্রাচীন বাসিন্দা, পরিবারকে উচ্ছেদ করা সহজ ব্যাপার। আর নোটিশে যাঁর স্বাক্ষর থাকে, বা যাঁর হয়ে যিনি স্বাক্ষর করেন জেলার সেই কালেক্টর বাহাদুরের ক্ষমতার কোনো শেষ নেই। তিনিই জেলার মাথা। তাঁর কথাই শেষ কথা। আর তিনি এমন কোনো কাগজে স্বাক্ষর করেন না যে কাগজ

অগ্রাহ্য করা যায়। যে নোটিশ ছেঁড়া কাগজের ঝুড়িতে ফেলা যেতে পারে সেই নোটিশ কালেক্টর বাহাদুর কেন পাঠাবেন?

পঁয়ত্রিশ বছর আগে কালেক্টর বাহাদুর যে নোটিশ পাঠিয়েছিলেন এই গ্রামের বাসিন্দাদের কাছে, সেই নোটিশ সক্রিয় হল এতদিন বাদে। এতদিন বাদে ধরা গেল বালেশ্বর গিয়ে পঁয়ত্রিশ বছর আগে যা জেনেছিল দে–পালের মানুষজন, তা অর্ধসত্য। কোনো প্রকল্প সরকার ত্যাগ করে বটে, কিন্তু বেশিরভাগ প্রকল্পই ত্যাগ করা হয় না। প্রকল্পে বরাদ্দ অর্থ কমে গেলে ফাইল চাপা পড়ে থাকে অন্য ফাইলের নীচে। বরাদ্দ অর্থ এসে গেলে ফাইল জেগে ওঠে। আর একটি সত্য এই যে, প্রকল্প যদি বাতিল হয় তবে পূর্বের নোটিশ বাতিল করে কালেক্টর বাহাদুর নতুন নোটিশ পাঠান। পঁয়ত্রিশ বছর অনধিগ্রহণের কোনো নোটিশ যখন আসেনি, প্রকল্প জীবিতই ছিল। তার বলে দে–পাল চলে গেল সরকারের হাতে আচমকা আবার। আর যে জমি আগে কাগজেকলমে দখল নিয়েছিল সরকার, যে–জমি পঁয়ত্রিশ বছর আগে দখল নিয়ে ফেলে রেখেছিল সেনাবাহিনী সকলের অজ্ঞাতে, সেই জমির বেশিরভাগটাই ছিল সরকারের খাসজমি, তা এক সকালে খুঁটি দিয়ে কাঁটাতার দিয়ে দখলের কাজ আরম্ভ করলে গ্রামের মানুষের সঙ্গে কর্তৃপক্ষের সংঘাত শুরু হল।

লোকে জানল এমনভাবে হয়। কী হয়? না, সরকারি কাজ হয়। পঁয়ত্রিশ বছর আগে কাগজেকলমে কৃষিজমির দখল নিয়েও তা সরকার ফেলে রাখতে পারে। বিশেষত প্রতিরক্ষা দপ্তর, বিমান বাহিনী, বিমান পরিবহন এমনভাবে ফেলে রাখে। প্রয়োজনে ঘিরে নেয়। অথচ উপকূলের ওই জমির সবটা কিন্তু পঁয়ত্রিশ বছর আগে কৃষিযোগ্য ছিল না। ওই জমির ভিতর বালিয়াড়ি ছিল, কেয়াবন ছিল, বুনোগুল্মে ভরতি অকৃষি জমি ছিল। জমি তো একভাবে চিরকাল থাকে না। কোনো জমিই না। এই পঁয়ত্রিশ বছরে প্রতিরক্ষা দপ্তরের কাগুজে জমিতে পরিবর্তন হয়েছিল অনেক। বালিয়াড়ি ভেঙে, বালি সরিয়ে সেই জমি কৃষিযোগ্য করে তুলেছিল দখলিকার চাষা। কেয়াবন সাফ করে সেখানে চাষের ব্যবস্থা করেছিল চাষা। কোথাও ধান, কোথাও তরমুজ, কোথাও চিনা বাদাম। জমির রকমে ফসলও নানারকম। ফসল ফলাতে ওই জমিতে ঘরও বেঁধেছিল কেউ কেউ। ঘর বেঁধে সংসার পেতেছিল। নারকেলগাছ বড়ো করেছিল, পুকুর কেটেছিল। পঁয়ত্রিশ বছরে বেশ কয়েকটি নারকেলকুঞ্জ তৈরি হয়ে গিয়েছিল দে–পালের ওই অংশে। ওটি ছিল চাষাপাড়া। যারা কোনোদিন নিজস্ব জমির মুখ দ্যাখেনি তারা জমি পেয়েছিল ওখানে। খুব সরেস জমি। দে–পাল, কুসমাড়, মহাপাত্রপুর, ভীমাপুরের সবই পাল জমি। চর জমি। পয়স্তি হয়ে সমুদ্র থেকে ওঠা জমি। আরও পুবদিকে সুবর্ণরেখা থেকে ওঠা চর জমি। এই সমস্ত জমি কুমারী প্রায়। পেটে ফসল ধরল কবে যে জীর্ণ করে ফেলবে গর্ভাশয়? এই সমস্ত জমিতে যে ফসল হোক, ধান, পান, তরমুজ, চিনে বাদাম, যেখানে যেরকমে যা হোক, হয় অঢেল। অফুরন্ত। যেন বাতাসে বীজ উড়ে এলেই আপনা–আপনি ফসল হত। এসব জমির বয়স একশো থেকে দেড়শোর বেশি নয়। মাটির পৃথিবীর বয়সের পরিপ্রেক্ষিতে তা আর কতটুকু? শ–দেড়েক বছর আগের এক প্রবল সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস, বন্যা এই বালিমুন্ডা, বালিয়াপাল,বালেশ্বরে অনেক জমি তুলেছিল মোটা পলির আস্তরণ ফেলে। সেই জমিতে বানিগাছের জঙ্গল ছিল। সেই জঙ্গল সাফ করে এই সমস্ত এলাকায় অনেকটা কৃষিজমির উতপত্তি। সেইসব জমি পঁয়ত্রিশ বছর আগের নোটিশের সূত্র ধরে যখন দখল করতে এল সরকারি সার্ভেয়ারের দল, দে–পালের মানুষ সংঘাতে গেল। কেননা সংঘাতে যাওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না। সংঘাতে না গেলে তাদের ঘরবাড়ি, ধানজমি, তরমুজের ক্ষেত, চিনাবাদাম খেত, নারকেল বন, পানের বরজ, কাজু বাদামের সামান্য চাষ, কাজু বাদামের হালকা বন, সব রাতারাতি ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছিল। সরকারি আদেশ মানে পুলিশের নির্দেশ। কেমন ছিল তা। দিন কুড়ি সময় দিয়েছিল পুলিশ; মিলিটারির জন্য ছাড়তেই হবে। কে বলেছিল সরকারি জমিতে ঘর বাঁধতে, চাষবাস করতে? সরকার তো বলেনি। জমির কোনো কাগজ আছে কারোর কাছে? ছিল না। সবাই আশ্চর্য হয়ে তাকিয়েছিল পরস্পরের মুখের দিকে যে জমির কোনো কাগজ তাদের কাছে নেই বলে পুলিশ চোখ রাঙাচ্ছে। তারা জানত সরকারি জমি। তারা কানাঘুসো শুনেছিল জমিতে নোটিশ পড়েছিল পঁয়ত্রিশ বছর আগে। সে আমলের মানুষ এখন আর কোথায়? তারা এও জানত যে, ওই নোটিশের কোনো মানে ছিল না। ওই নোটিশ তামাদি হয়ে গেছে। পঁয়ত্রিশ বছর ধরে কোনো নোটিশ সক্রিয় থাকে?

তারা সবই ভুল জানত। এখন তা থানার মেজোকর্তার চোখ রাঙানিতে সব বুঝতে পারছিল। তারা অনেকবার গেছে বালেশ্বরে, ওই জমি যদি লিজ পায় তো বেঁচে যায়। সরকার লিজ দিক তাদের, তারাও সরকারকে খাজনা দিয়ে অধিকার পাকা করে নেবে। কিন্তু লিজ আদায় করতে পারেনি। এত বছরেও সরকার লিজ দেয়নি কারণ ওই জমিতে নোটিশ পড়েছিল। বালেশ্বরে ল্যান্ড রেভিনিউ অফিস তখনও বলেছিল লিজ না নিয়ে তো চলছে। কেউ তো কাউকে উচ্ছেদ করছে না বা সরকার তো উচ্ছেদ করছে না, যে লিজ দলিল নিয়ে অধিকার পাকা করতে হবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সরকারি লোকই তো এল উচ্ছেদ করতে। থানার পুলিশ চোখ রাঙিয়ে নারকেলের কাঁদি ভেঙে, তরমুজের খেত তছনছ করে, চিনেবাদাম খেত মাড়িয়ে দখল নিতে লাগল। জমি যখন সরকারের, তখন জমির ফসলে তো সরকারি লোকের অধিকার। গ্রামের মানুষ লাঠিসোটা নিয়ে তাড়া করল সার্ভেয়ারের দল আর পুলিশকে। পুলিশ সাময়িক পালালেও, রাত্তিরে সেজেগুজে এল গ্রামে। বন্দুক উঁচিয়ে ঘরে ঘরে টর্চ মারতে লাগল। পছন্দমতো মেয়েমানুষ খুঁজতে লাগল।

দে–পালের লোকের সংঘাতে যাওয়া ছাড়া পথ ছিল না। মিলিটারির হাতে চলে যাচ্ছিল বহু বছরের শিকড়। সেই সূত্রে পুলিশ রাতে গাঁয়ে ঢুকে টর্চ মারতে মারতে ঘর থেকে টেনে বের করছিল জোয়ান পুরুষ। জোয়ান পুরুষ এবং যুবতীকেও। দুপুরে সার্ভেয়ারের দলকে তাড়া করেছিল যারা, তাদের ভিতর মেয়েরাও তো ছিল। পুলিশ জানত, পুরুষগুলো ভয় পেতে পারে তাদের ঘরের মেয়েদের বেআবরু করে দিলে। কিন্তু বেআবরু সত্যিই পুলিশ করেছিল কি না, মেয়েদের ধর্ষণ করেছিল কি না পুলিশ এবং কাঁটাতার বসানোর ঠিকেদারের মাস্তান বাহিনী, সে–কথা বলার মতো তো কেউ ছিল না। কোন মেয়ে তার লাঞ্ছনার কথা বলে? বলে না, বলতে পারে না বলেই তো ধর্ষণ, লাঞ্ছনাই পুলিশের হাতের সবচেয়ে বড়ো অস্ত্র।

ঘরে ঘরে টর্চ মেরে মেয়েমানুষ টেনে বের করে পুলিশ আর ঠিকেদারের লোক ভয়তাড়িত করে দিয়েছিল চাষাদের। সেই রাতের পর কাঁদতে কাঁদতে তারা বহুদিনের বসবাস তুলে, ঘরবাড়ি, গাছগাছালি, জমিজমা ছেড়ে, সমুদ্রের মায়া ছেড়ে যাত্রা করে অন্যত্র। তাদের কেউ কেউ মহাপাত্রপুর, কুসমাড়, ভীমাপুরের দিকে গেল, কেউ কেউ গেল বালিমুন্ডার পথে। হাইরোডের গায়ে ঝুপড়ি তুলল। নিরাবরণ ঘরে ঢুকে কাঁদতে লাগল। আশ্চর্য! এসবের পরেও কেউ কেউ থেকে গেল। মহাপাত্রপুর, কুসমাড়, ভীমাপুরের মানুষ তাদের পিছনে দাঁড়াল। একসঙ্গে মিছিল করল। সেই রাতের কথা কানে কানে রটতে লাগল।

ভানু অবাক, ‘এত কাণ্ড, বাবু কিছু জানে না?’

‘জানে।’ রামচন্দ্র বলে।

‘বাবু কী বলেছিল?’

‘কহিছিলা ইসব নিয়া মাথা না ঘামাতে।’

ভানু বলল, ‘বাবু তো মোরেও কিছু কহেনি।’

‘কহিবে কেনে, বাবুর কী? ই জায়গায় বাবুর চাষবাড়ি, আর তো কুছু লয়, টঙ্কা মিলি গিলা তো হই গিলা, বাবুর ভিটাও ইখানে, মেয়্যাছেলাও নাই যে পুলিশ অসি বেইজ্জত কইরবে।’

সেটা ছিল ফাল্গুনের শেষ। রাতে শীত পড়ে, দিনে গরম। ধানমাঠ খাঁ–খাঁ। তরমুজ ফলেছিল বালিজমিতে। খুব বড়ো হয়নি তখনও। তবু খেত পাহারায় ছিল কিছু মানুষ। পুলিশ ঢুকল বড়ো বড়ো টর্চ হাতে। সঙ্গে লোক ছিল। তারা ধর্ষণের রকম জানে। পুলিশ নিজে ধর্ষণ করেনি। তারা করেছিল। তবে তাদের ভিতরে প্লেন ড্রেসের পুলিশ ছিল কি না কে জানে? সমস্ত রাত ধরে তছনছ করে পুলিশ সব কিছু। খুব সাজানো গ্রাম ছিল খাস দে–পাল! সমস্ত রাত মত্ত হাতির মতো তারা ভেঙেছিল সব কিছু। সব জানা গেল পরদিন। পুরুষরা এসে বলল, এসব কথা না বলতে। পুলিশ যখন ওসব করেছে তবে আর থাকা যাবে না। কথাগুলো উড়ছিল খুব চাপা হয়ে দু–চারদিন ধরে, কিন্তু কেউ বলেছিল না। প্রথমে বলেছিল সুভদ্রা। পাণ্ডবকুমারের বউ সুভদ্রা মুখ খুলল গাঁয়ের লোকের কাছে। সুভদ্রার খবর বালেশ্বর পৌঁছে গেল, ভুবনেশ্বর পৌঁছে গেল। খবরের কাগজের লোক ছুটে এল দশ দিক থেক। ‘কী সাহস মেয়্যামানুষটার!’ রামচন্দ্র বিড়বিড় করছে।

'ডাক দেখি সুভদরারে।'

'উ কহিবে না।'

'কেন?'

'ডরায় ইখন।'

ভানু বলল, 'আমি এখন বালিমুন্ডা যাব না, ওকে ডাক।'

বালিমুন্ডা যাওয়া হল না। দূরে দে–পাল, মহাপাত্রপুরের দিক থেকে মেঘ উঠল। সেই মেঘে আলো মরেই গেল প্রায়। মেঘ গর্জন করতে লাগল থেকে থেকে। বৃষ্টিও এল দশদিকে ভাসিয়ে। সেই বৃষ্টির দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে রামচন্দ্র, 'ই জায়গায় মায়া বসি গিইছে, সব যদি গরমিন লিয়ে লেয় কুনথে যাবু? বাবু যদি কহে ইবার তু যা রামচন্দর, কী কইরব? হুটেল মোর পোষাবেনি।'

সুভদ্রার সমস্ত দিন সময়ই হয় না। আসলে সে এড়িয়ে যাচ্ছিল। রান্নাবান্না করে বৃষ্টির ভিতর তাল–পেখ্যা মাথায় কোথায় যে উধাও হয়ে গেল, দুপুরে খেয়েছে কি খায়নি তাও বোঝা গেল না। ফিরল সন্ধ্যেয়। তখন চরাচরে অন্ধকার ঘন। কালো রঙের উপর রং পড়ছে আরও কালো। মাথা অনেকখানি ঘোমটাতে ঢেকে সুভদ্রা বলে, 'নায়েব সবু জানে, মোকে কেনে কহিতে কহ মশায়?'

রামচন্দ্র বলে, 'আপন কথা আপনিই কহা ভালো।'

মাথা নাড়ে সুভদ্রা, বলে, 'কহিতে ঘিন্না লাগে, ডর লাগে, মোর সোয়ামি যাহা কহিছিলা উ ঠিকই ছিলা, সি রাতির কথা লুকাই গিলে মোকে ই যন্তন্না সহিতে হতনি।'

ভানু বলল, 'তুমি যাও, তোমাকে বলতে হবে না!'

সুভদ্রা উঠে গেল। উঠে যেতে ভানু যেন নিশ্চিন্ত হল। সত্যি তো সুভদ্রার মুখে তার লাঞ্ছনার কথা শুনত কী করে ভানু? মেয়েমানুষ তার লজ্জার কথা বলতে পারে? সুতরাং উঠে গিয়ে বসে আছে ঢালা বারান্দার আর একদিকে। হাঁটুতে মুখ গুঁজে পাথর। ঝিরঝিরিয়ে বৃষ্টি পড়ছিল। জোলো হাওয়া বইছিল। ভানুর আচমকা মনে পড়ল বিষ্ণু পাতরের কথা। সে কোথায়? এল না সমস্ত দিন। রামচন্দ্র শুনে বলল, 'কামকাজ মিলে গেছে তাই আসেনি, রোয়া বুনার কাল, ইখন তো কাজ অনেক, কেউ বসে থাকেনি।'

'কিন্তু ও তো জমি বন্দোবস্ত নেওয়ার জন্য দীঘা পর্যন্ত দৌড়েছিল?'

'তা ঠিক, আবার আসিবেও, কিন্তু বেকার হউক, তখন আসিবে, তার ইখেনে বন্দোবস্ত লিয়া মানে পরে টঙ্কা মিলিবে গরমিন লিলে, সেইজন্য।' ভানু আবার সুভদ্রার প্রসঙ্গ তোলে, 'তার কথা কী কহিবে নায়েব?'

'হাঁ কহিব, কিন্তু কী যে কহি, উয়ার সোয়ামি ঘরে ছিলনি সি রাতে, ঘরে ফিরেনি, পাণ্ডবকুমার গিইছিলা বালেশ্বর, সি রাতে যে সি বালেশ্বর রহি যাবে ইমন কুনো কথাও ছিলনি, বালেশ্বরে কুনথে রহিবে পাণ্ডবকুমার? সি ছিল ফাগুন মাস, পুন্নিমের আটোদিন বাকি, জুছনা ছিল, বাতাসে বাস ছিলা নিম পুষ্পর, কী শেতলই না ছিলা রাতখানি, সুভদরা লুকাইতে পারে নাই, উয়ারে ঘর থিকে টানি বাহিরে নি এলা তাহারা, সি বড়ো যন্তন্নার কথা।'

'সোয়ামি কখন ফিরল?'

'সকালা, ভোর ভোর, তখনও কানছিলা সুভদরা, রাতভর কানছিলা, পাণ্ডবকুমার ঘুরতে উয়ার পরে ঝাঁপাই পড়িলা, ''মুর সব্বোনাশ হই গিলা, তুমি কুনথে ছিলা রাতভর।''

রাতজাগা পাণ্ডবকুমার তখন হাত চাপা দিল বউয়ের মুখে, 'চুপ যা, লকে যেন না জানে, মেয়্যামানুষের ইজ্জত গিইছে ইকথা লকে জানলে বড়ো বিপদ, লকে তুরে দোষ দিবে, ঘর থিকে বাহার যাবিনি।'

সুভদ্রা বলল, 'থানায় যাবু ত?'

'না, উয়াদের দলে পুলিশ ছিলা।'

'থাকুক, তবু থানায় যাবু ত?'

পাণ্ডবকুমার মাথা নাড়তে লাগল, বলল, 'ঠিকেদার আর পুলুশের লক ইসব করিছে, তুই চুপ কর, ভুলি যা, থানায় গিয়া পুলুশের নামে কী ডায়েরি দিব?

'কী হল তখন?'

'সুভদরা চুপ হই গিলা, মেয়্যামানুষ তো বটে, ইজ্জত লুটের কথা কহে কী করে, আর পাণ্ডবকুমার তো ঘরে থাকে, বাহারে যায় ঘরে ফিরে, মাথা নাড়ে, কুনো কথা কহা যাবেনি, পুলুশ হাজতে ভরি দিবে কহিছে।'

'কখন কহিলা?' সুভদ্রা কান্না থামিয়ে জিজ্ঞেস করে।

পাণ্ডবকুমার চুপ করে থাকে। কিছুই বলে না, তারপর একদিন দেখল তার স্বামী পাণ্ডবকুমারের সঙ্গে একটা লোক ভিটের উঠোনে দাঁড়িয়ে কথা বলছে। সুভদ্রা ভয়ে হিম হয়ে যায়। মুখটা পরিষ্কার চেনা যায়।

'সত্যি বলছ?' ভানু জিজ্ঞেস করে।

'হাঁ, সুভদরা ডরাই গিলা, লকটারে সি তো ভুলে নাই!'

সেই রাতের কথা কানাঘুসোয় উড়ছিল। বাতাসে ছড়িয়ে যাচ্ছিল। সুভদ্রা ধর্ষিতা হয়েছিল, আরও কয়েকজন চাষা বউ বেআবরু হয়েছিল সেই রাতে। তাদের কাউকে কাউকে দে–পাল ছেড়ে চলে যেতে হয়েছিল এক–দুদিনের মধ্যে। আত্মীয় ঘরে, আশপাশের গ্রামে, ভীমাপুর, মহাপাত্রপুর, কুসমাড়ে পাঠিয়ে দিয়েছিল চাষারা। পাণ্ডবকুমারও পাঠিয়ে দিতে চেয়েছিল সুভদ্রাকে তার বাপের ঘরে। সুভদ্রা যায়নি। কী খাবে সেখানে গিয়ে? আর সে ছাড়তে চাইছিল না পাণ্ডবকুমারকে। আরও আঁকড়ে ধরতে চাইছিল স্বামীকে। বাপ–মা না থাকলে বাপের ঘরও যে থাকে না তা বলছিল পাণ্ডবকুমারকে। তার ভয় হচ্ছিল বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিয়ে পাণ্ডবকুমার যদি তাকে না আনে। দে–পালের ভিটে তো যায় যায়। দে–পাল ছেড়ে চলে যায় যদি এর ভিতরে পাণ্ডবকুমার, যদি যেতে হয় তাকে, তবে সে কোথায় খুঁজবে তার স্বামীকে তখন? তার বাপের ঘর অনেক দূর, বালিমুন্ডা পেরিয়ে বালেশ্বরের পথে সেই গ্রাম। কী ভয় না পেয়েছিল সে? পাণ্ডবকুমার কি তাকে ত্যাগ করতে চাইছে বাপের ঘরে পাঠিয়ে দিয়ে?

সেই রাতে যে কিছু হয়েছিল সেই খবর মহাপাত্রপুর, ভীমাপুর, কুসমাড় হয়ে আবার ফিরে আসছিল দে–পালে। ওই সব গ্রামে যেসব চাষা বউরা পালিয়ে গিয়েছিল ভয়ে, আশ্রয় নিয়েছিল ভয়ে, তারা ওখানে গিয়ে বর্ণনা করছিল সেই রাতের কথা। চাপা, ফিসফিসে গলায় কাঁদতে কাঁদতে তারা বলছিল সেই ভয়ানক রাতের কথা। বলছিল ওই সব গ্রামের বধূ, কন্যাদের। লুকিয়ে বলেছিল। না বলে উপায় ছিল না। তারা স্বস্তি পাচ্ছিল না। তাদের কথা শুনে, তাদের কান্না শুনে মহাপাত্রপুর, কুসমাড়ের বধূরা কাঁদছিল। তারা কথাগুলো তাদের স্বামী–পুত্রদের বলেছিল। না বলে তারাও স্বস্তি পাচ্ছিল না। এইভাবে ওই সব গ্রামের পুরুষরা কথাগুলো জানলে তারা তা নিয়ে শোরগোল তুলছিল। চাপা শোরগোল ক্রমশ বড়ো হয়ে যেতে থাকে। জলের বৃত্তের মতো তা বাড়তে থাকে ক্রমশ। বালেশ্বরের একটি দৈনিক খবরটি ছেপে দিতেই, ভুবনেশ্বরের দৈনিক তা নিয়ে হইচই বাধিয়ে দেয়। এসব যখন হচ্ছিল, মহাপাত্রপুর, কুসমাড়ে গড়ে উঠেছিল দে–পাল রক্ষা সমিতি, তারা ধর্ষণ আর শ্লীলতাহানি নিয়ে যখন অভিযোগ পেশ করছে, সেই সময় পাণ্ডবকুমার বদলে যাচ্ছিল সুভদ্রার সামনে। পাণ্ডবকুমার তাকে বলছিল, একেবারে চুপ করে যেতে, যারা ওসব নিয়ে কথা তুলছে তাদের বিপদ আসন্ন। পুলিশ আর ঠিকেদারের লোকেদের সঙ্গে কথা হয়েছে তার। তারা বলছে পাণ্ডবকুমার যদি ওসব নিয়ে হইচই করে তাহলে পাণ্ডবকুমারকে ছেড়ে দেবে না তারা। পুলিশ কী না পারে। পাণ্ডবকুমার চুপ করে থাকলে তারই লাভ। ঠিকেদার বলেছে, পুলিশ বলেছে এখন নিশ্চিন্তে থাকতে পারে পাণ্ডবকুমার, তার ভিটে ভাঙবে না পুলিশ ঠিকেদার। কাজ হতে তো সময় লাগে।

পাণ্ডবকুমারের সঙ্গে তখন সেই রাতের রক্তপায়ী শৃগালদের একটিকে দেখে ভীতা হংসীর মতো গুটিয়ে গিয়েছিল সুভদ্রা, 'উ কে?'

'ঠিকেদার সরকারের লক।'

'উ লক সি রাতে আসছিলা।'

পাণ্ডবকুমার চমকে উঠেছিল। সুভদ্রা আঁকড়ে ধরেছিল স্বামীকে, 'সি লক, হা জগন্নাথ। উ লকই মুকে ঘর থিকে উঠানে লিয়ে যায়, টানি লিয়ে যায় উ লক।'

পাণ্ডবকুমার বলে, 'উ লকের নাম মহান্তিবাবু, মহান্তিবাবু খুউব ভালো লক, তু কীসব বলিস, তুর মাথা খারাপ হই গিছে।'

'না, উ সি লক।'

'তুরে কহিছি বিস্মরণ হ সব, উ লক সি লক লয়।' পরদিন ঘুরে এসে বলল পাণ্ডরকুমার, 'মহান্তিবাবু কত বড়ো লক, বালেশ্বর উয়ার কত বড়ো দালান!'

সুভদ্রা জিজ্ঞেস করে, 'কে কহিল উ সি লক লয়?'

'মহান্তিবাবু নিজই কহিলা।'

'তুমি উয়ারে কহিছিলা মুর কথা?'

'হাঁ।' পাণ্ডবকুমার বলল, 'সব বিস্মরণ হ, ইজ্জত তো ফিরা পাবিনি, উ লক কহিছে নোতন ভিটা দিবে বালিমুঁড়ায়, টঙ্কা দিবে জমির, গাছের দাম দিবে বেশি, ঠিকাদার, পুলুশ, গরমিনের সার্বিয়ার সবার সঙ্গে আলাপ হইছে মুর, উয়ারা কহিছে চুপ করি রহিতে।'

তখন কেঁদে উঠেছিল সুভদ্রা, 'কী কহ গো? উ মোর ছিঁড়া খাইছে, উ লক মোরে পেত্থম ধরে, মোর সব্বুনাশ করে উ লক।'

ধমকে উঠেছিল পাণ্ডবকুমার, 'তুর লাজ নাই ছিনাল মাগি, ইসব কী কহিস? কী না কী করিছিলি সি রাতে, মহান্তিবাবু লক ভালো।'

অবাক হয়ে পাণ্ডবকুমারকে দেখেছিল সুভদ্রা। তার মাথায় তখন আগুন। পাণ্ডবকুমার যে লোভে পড়ে গেছে তা বুঝতে পারছিল সুভদ্রা। পাণ্ডবকুমারকে চেনা যাচ্ছিল না। সুভদ্রা পাগলিনির মতো ঘরের মেটে দেওয়ালে মাথা ঠোকে।

পরদিন লোকটা আবার এল। এসে বসল উঠোনে পাতা খাটিয়ায়। পাণ্ডবকুমার উবু হয়ে তার সামনে, মাটিতে বসেছিল। লোকটা সিগারেট ধরাতে পাঁচটা কাঠি নষ্ট করেছিল। পোড়া কাঠি ধুলোয় ছ.ড়িয়ে গিয়েছিল। সুভদ্রা ঘরের ভিতরে লুকিয়ে দেখছিল লোকটাকে। লোকটা হ্যা–হ্যা করে হাসছিল, পাণ্ডবকুমার হাত কচলাচ্ছিল। পাণ্ডবকুমার আগের দিনই বলেছিল ঠিকেদারের কাছে কাজ পায় যদি, তবেই থাকতে পারবে নিজের ভিটেতে, এ ভিটে পরে ভাঙবে।

সেদিন রাতে পাণ্ডবকুমারকে আবার জিজ্ঞেস করেছিল সুভদ্রা, 'তুমি মোর কথা বিশ্বাস করছনি, উ লক যদি আসে ই ভিটায় মু গলায় রশি দিব।'

পাণ্ডবকুমার থাবা মেরেছিল তার ঘাড়ে, 'থাম, নিলাজ মাগি, মোর সাথে তুই কীসব কহিস, বিস্মরণ হ।

'না, মু বিস্মরণ হবনি।'

পরদিন লোকটা আবার এসেছিল। সুভদ্রার মনে হয়েছিল লোকটা বোধ হয় তার খোঁজ করতেই পাণ্ডবকুমারকে ধরেছে। কী সব্বোনাশ! তার স্বামী সব কেমন এড়িয়ে যাচ্ছে। মিথ্যে কথা বলছে। নাকি তার ভুল হচ্ছে। হয়তো ওই লোকটা নয়। ওর মতো অন্য কোনো লোক। কিন্তু গলার স্বর মিলে যাচ্ছে। সিগারেটের গন্ধটা পর্যন্ত মিলে যাচ্ছে। কী যে হচ্ছিল তার! তখন বাইরে থেকে পাণ্ডবকুমার ডাকে, 'পানিহ্ দিবে?'

জল! জল দিতে তো বেরোতে হয় তাকে। ওই লোকটার সামনে দাঁড়াতে হয়। কী করে যাবে সে? তার বুক হিম হয়ে যাচ্ছিল পাণ্ডবকুমারের পুনঃ পুনঃ ডাকে। শেষপর্যন্ত সে সাহস সঞ্চয় করে উঠতে পারে না। তার তো ইজ্জত গেছে। কিন্তু তার হয়ে বলার কেউ নেই। স্বামীও বিপক্ষে। লুটেরার সঙ্গে হাসছে। তাকে সাহসী হতেই হবে। সে মাথায় কাপড় টেনে বেরোল কাঁপতে কাঁপতে। পাণ্ডবকুমারের কণ্ঠস্বর ক্রমশ উঁচুতে উঠে যাচ্ছিল। একমাথা ঘোমটা টেনে মুখ লুকিয়ে সে বেরোয়। জলের ঘটি আর গেলাস রেখে সে স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছিল কয়েক দণ্ডের জন্য। ঘোমটার ভিতর থেকে লোকটাকে দ্যাখে। পরিষ্কার দ্যাখে। বাদামি চোখের মণি কি সে ভুলতে পারবে? লোকটা যেন কুঁকড়ে গেল এক পলকের জন্য, তারপর ঘাড় তুলল। ঘাড় তুলে তাকে দেখল। চোখে কি চোখ পড়ল? ঘোমটার নীচেই চোখ বন্ধ করে ফেলেছে সুভদ্রা। চেনায় কোনো ভুল নেই। সেই রাতের কথা কি ভুলে যাবে? যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন মনে থাকবে। ত্রাস্ত পায়ে সুভদ্রা ফিরে আসে ঘরে। ঘরে ঢুকে কাঁপতে থাকে, 'সেই লক!'

পাণ্ডবকুমার বলল, 'না সি লক না।'

'হাঁ, সি লক।'

পাণ্ডবকুমার আচমকা ক্রুদ্ধস্বরে বলে ওঠে, 'মু কহি সি লক না যখন সি লক না, আর যদি হয় সি লক, কী কইরব?'

'কী কইরবা, সি তুমার কত্তো বড়ো সব্বোনাশ—!' গলা বুজে যায় সুভদ্রার, 'তুমি কি চিনো নাই সত্য, হাঁ তুমি কী কহ, উ লক কেনে ই উঠানে আসে?'

'চুপ কর, লকে সন্দেহ কইরবে।'

'কী সন্দেহ?'

'তুই অশুদ্ধ হই গিছিস, মেয়্যামানুষ অশুদ্ধ হিলে এত কথা কহে?'

সুভদ্রা বলে, 'উ লক যেন ই ভিটায় না আসে।'

'কেনে ভিটা কি তুর?' পাণ্ডবকুমার তার হাত টেনে ধরে, চোখ বনবন করছে লোকটার, খুব রেগে গেছে, গর্জন করে ওঠে, 'উ ঠিকেদারের লক, কাজ দিবে, তুর যা হবার তো হইছে, ই লিয়ে কথা কহি যদি ভিটা ছাড়ি দিতে কহিবে, কামকাজও দিবে না, টঙ্কা মিলিবে না।'

বিনবিন করে কাঁদছিল সুভদ্রা। সেই প্রলয়ংকর রাতের পর সে ঘর থেকে বেরোয় না। ঘরের অন্ধকারে প্রায় লুকিয়ে থাকে। সে জানে যতই চাপুক পাণ্ডবকুমার, কথাটা রটে যাচ্ছে। মহাপাত্রপুরের লোক ক–জন খোঁজ করতে এসেছিল, পাণ্ডবকুমার তাদের রাস্তা থেকে বিদায় করেছে কিছু হয়নি বলে। কিন্তু মহাপাত্রপুরের লোকজন বিশ্বাস করেনি। শোরগোল উঠেছে। পাণ্ডবকুমার বদলে গেছে সেই রাতের পর। এ লোক সে লোক না যে তাকে সোহাগ করেছে ক–দিন আগেও। ধর্ষণের রাতের পর তাকে ছোঁয়নি পাণ্ডবকুমার, উপদেশ দিয়ে যাচ্ছে সবসময়। কথাটা রটলে বড়োই বিপদ। না রটলে সুবিধে। ঠিকেদারের লোক, পুলিশ বলছে এ নিয়ে শোরগোল না তুলে চুপ করে থাকলে আখেরে লাভই হবে। শোরগোল তুললে মেয়েমানুষের ইজ্জত কি বাড়বে? বরং আবার যাবে। মেয়েমানুষের ইজ্জত নেওয়া কি কঠিন? দরকারে পুলিশ থানা হাজতে ঢুকিয়ে দেবে পাণ্ডবকুমারকে, তারপর ইজ্জত লুট করাবে মেয়েমানুষের। কী হবে শোরগোল তুলে? যে ইজ্জত গেছে তা কি ফেরত আসবে শোরগোল করলে? ঠিকেদার, পুলিশ এসব করে। পুলিশ না করলে ঠিকেদারের লোক করে। পুলিশ কখনো ঠিকেদারের বিপক্ষে যায় না, ঠিকেদার পুলিশকে মাসোহারা দেয়।

সেই লোকটা এল আর একদিন। সেদিন পাণ্ডবকুমার ঘরে ছিল। লোকটা তাকে ডাকতে পাণ্ডবকুমার হাত জোর করে, 'আসুন সীতারাম বাবু' বলে বেরিয়ে গেল। খাটিয়া টেনে তাকে বসিয়ে সে ধুলোমাটিতে হাঁটু গেড়ে বসল। হেসে হেসে কথা বলতে লাগল। আবার তেষ্টা পেল লোকটার। পাণ্ডবকুমার ডাকল সুভদ্রাকে, 'পানিহ্ দিবে?'

সুভদ্রা চুপচাপ বসে থাকল। নড়েনি, পাণ্ডবকুমার ডাকল আরও দু–বার, তারপর নিজে ঢুকে এল ঘরের ভিতর। সুভদ্রাকে দেখল আগুন ভরা চোখে। নিজে ঘটি ভরা জল নিয়ে যেতে যেতে বলল, 'তুর তো ইজ্জতই নাই, কী ইজ্জতের ভড়ং করিস, মেয়্যামানুষ মেয়্যামানুষের মতো রহিবি, পানি দিতা কহিছি না, কহি নাই?'

পাণ্ডবকুমার লোকটাকে জল খাইয়ে তাকে নিয়েই বেরিয়ে গেল। ফিরতে সেই বেলা দুপুর। সুভদ্রার ভয় হচ্ছিল। সে বুঝতে পারছিল না বছর পাঁচের চেনা স্বামীকে। তাদের সন্তান হয়নি। কেন হয়নি বুঝতে পারছিল না, মানত করেছিল হেথা হোথা, লঙ্কেশ্বরী ঠাকুরানের কাছে, দূর চন্দনেশ্বরেও। কিন্তু সন্তানহীনতার জন্য পাণ্ডবকুমারের সোহাগ যে ছিল না তা নয়। আগের মতো না থাকলেও পাণ্ডবকুমার তার স্বামী হয়েই আছে তো। সে লোক বদলে গেল কবে? পাণ্ডবকুমারকে চেনা যাচ্ছিল না। মনে হচ্ছিল এ তার স্বামী নয়, অন্য কেউ। অন্য কেউ তার স্বামী হয়ে ঘুরঘুর করছে চারপাশে। হায়! সেই পাণ্ডবকুমার গেল কোথায় যাকে নিয়ে সে মানত করতে গিয়েছিল চন্দনেশ্বর মন্দিরে?

দুপুরে পাণ্ডবকুমারের অন্য মূর্তি। সে বলল, সুভদ্রার বড়ো ভুল হচ্ছে নিশ্চয়।

'না, মু ঠিক চিনিছি।'

পাণ্ডবকুমার বলে, 'উ লক তো জিজ্ঞেস করছিলা সি রাতে কী হইছিলা, তাহলে কি উয়ার স্মরণ নাই কী হইছিলা?'

সুভদ্রা চুপ করে শুনছিল পাণ্ডবকুমারের কথা।

পাণ্ডবকুমার বলছিল, 'উ লক, সীতারাম মহান্তি, কত ভালো লক, তুর প্রশংসা করছিলা।'

বুক হিম হয়ে যায় সুভদ্রার, 'কী কহ?'

'উ কহিছিলা গেরস্তর বউ, মেয়্যামানুষের মাথার উর'ম কাপড় থাকা দরকার, তাহিলে তাহার বিপদ হতনি।'

'কী কহ?'

'হাঁ, তুর শরম ছিলা কম।' পাণ্ডবকুমার নির্লিপ্ত মুখে বলল, 'ইখন শরম হইছে, ইটা আগে হিলে অমন হতনি।'

'কী কহ!' আর্তনাদ বেরিয়ে আসে সুভদ্রার মুখ দিয়ে।

'ঠিকই কহি, পানি যাচে লকে, পানি যে না দেয়, উয়ার পাপ হয়।'

'উ তো শয়তান!'

'তুর ভুল হইছে।'

'না, কুনো ভুল নাই।' সুভদ্রা ফুঁসে উঠেছে, 'তুমি টঙ্কা খাইছ, তুমি কি অমানুষ, তুমার মান নাই। তুমার পরিবারের সব্বুনাশ হিলা, তুমি কিনা—'

'চুপ কর।' তার মুখ চেপে ধরেছিল পাণ্ডবকুমার।

সুভদ্রা ছিটকে সরে গিয়েছিল। সে আর সহ্য করতে পারছিল না। বাদামি চোখের মণিটিকে সে ভুলতে পারছিল না। জোছনা রাতে খুব স্পষ্ট করে দেখেছিল সে লোকটাকে। তার কোনো ভুল হয়নি। গলার স্বর, কথা বলা সব মিলে গেছে। তার সব্বোনাশ করল যে লোক তাকে সে চিনতে পারবে না? কঠিন আঁধার থাকলেও চিনতে পারত। ঘোর অমাবস্যাতেও চিনতে পারত। তারার আলোতে চিনত। পৃথিবীর গায়ের আলোতেও চিনত। তাও যদি না থাকত নিজের চোখের আলোতে চিনত। নাক দিয়ে চিনত। গন্ধটা চিনে রাখত। সেই গন্ধই তাকে চিনিয়ে দিত। গন্ধ চিনিয়ে দিয়েছে। সুভদ্রা চিতকার করে উঠেছিল, 'মোর সব্বুনাশ করিছে, মুর ইজ্জত লিইছে, তুমি অরে ভিটায় লিয়ে আস কেনে?'

'চুপ কর।'

'না, চুপ করিবনি।' সুভদ্রা বেরিয়ে আসে ঘর থেকে। লাফ দিয়ে উঠোনে নামে, 'উ লক মোর ইজ্জত নিল, উ কিনা ই ভিটায় ফের আসে, উ লক ফের মোর ইজ্জত লিবে, তুমি কি পুরুষমানুষ, তুমি কি সেই লক, মোর সোয়ামি?'

'থাম সুভদরা, অসত্য কহিসনি।'

'অসত্য কহিব কেনে, হা–হা তুমি কি অন্ধা। মু মেয়্যামানুষ, কী কহিব তুমারে?'

'থাম।' গর্জন করে উঠেছিল পাণ্ডবকুমার, 'তুর শরম নাই মাগি, তুর ইজ্জত নাই, কীসব কহিস, পাঁচকান হিলে তুই সমাজে রহিতে পারিবি?'

'থোও তুমার সমাজ!' গরগর করে উঠেছিল সুভদ্রা, 'তুমি উ লকেরে ই ভিটায় লিয়া আস কেনে?'

'মোর ভিটা মোর ইচ্ছা।' পাণ্ডবকুমার তাকে ঠেলে ঘরের দিকে নিয়ে যাচ্ছিল।

সুভদ্রা চিতকার করে উঠেছিল, 'হা জগন্নাথ মুর কী হিবে?'

সুভদ্রার চিতকারে একটি–দুটি লোক দাঁড়িয়ে পড়েছিল ভিটের সামনে। উঠোনেও এসে দাঁড়িয়েছিল কারা যেন। সেই মহাপাত্রপুরের মানুষ, 'দে–পাল রক্ষা সমিতি'র লোক। তার খোঁজ নিয়ে বেড়াচ্ছিল কী হয়েছে সেই রাতে। তাদের একজন এগিয়ে এসেছিল, 'কী হইছে?'

'কিছু হয় নাই।' পাণ্ডবকুমার বলেছে।

'না হইছিলা।' চিতকার করে এগিয়ে এসেছিল সুভদ্রা, 'কী হইছে কহ।'

পাণ্ডবকুমার আর চাপা দিতে পারেনি। আর পাণ্ডবকুমারের বউ সুভদ্রা যখন কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগল, তার ক্রন্দনধ্বনি ছড়িয়ে পড়তে লাগল। সেই ধ্বনি তখন দে–পালে থাকা অন্য চাষা–বউদের সাহস ফেরাল। তারা ঘর থেকে বেরিয়ে বলতে লাগল লাঞ্ছনার কথা। ঠিকেদার না পুলিশ, জানে না, তারা মেয়েমানুষ খুঁজে বেড়াচ্ছিল। টর্চ ফেলে ফেলে দেখছিল। তারা কি তাহলে সুভদ্রাকে খুঁজছিল। তারা বলেছিল, এ মেয়েছেলে নয়। তার মানে তারা বিশেষ কোনো মেয়েমানুষ খুঁজছিল সেই রাতে। সেই মেয়েমানুষ কি তাহলে সুভদ্রা? চাষি বউরা বলছিল, তাদের গায়ে হাত দিয়েছিল তারা। লাথি মেরেছিল, অশ্রাব্য ভাষা বলেছিল। চাষি বউরা নিশ্চিন্ত হয়েছিল সে সম্ভ্রম যায়নি কারোর। তারা এসে ভিড় করল সুভদ্রার চারপাশে। তারা সুভদ্রার পাশে বসে কাঁদতে লাগল। একসঙ্গে কাঁদতে লাগল। সেই কান্নায় ভিটেজমি হারাতে হচ্ছে তার জন্য, নাকি ধর্ষিতা সুভদ্রার জন্য তো বোঝা না গেলেও তাদের কান্নায় শোক ছিল। গভীর শোক। বেদনা ছিল। গভীর বেদনা। তারা কাঁদতে কাঁদতে সুভদ্রার গায়ে মমতার হাত বোলাতে লাগল। তারা সুভদ্রার রুখু চুলে খোঁপা করতে করতে কাঁদতে লাগল। সুভদ্রার সিঁথিতে সিঁদুর পরাতে পরাতে কাঁদছিল সেই রাতের কথা স্মরণ করে। পুলিশ ছিল আর ছিল ক–টা মানুষ। তারা পুলিশ হতেও পারে, না হতেও পারে। তারা নেশাচ্ছন্ন হয়ে পুলিশের মোটা টর্চের আলোয় মেয়েমানুষ পছন্দ করছিল। হায়! সমস্ত পল্লিটা সেদিন যেন বারবনিতা পল্লির মতো ভেবে বসেছিল পুলিশ আর ঠিকেদারের লোক। শেষপর্যন্ত সুভদ্রাকে পছন্দ করেছিল। হায়! চাষি বউরা বিলাপ করতে লাগল। বিলাপ করতে করতে সুভদ্রাকে বলতে লাগল, 'ছাড়বিনি, লক যদি চিনে ফেলিস তো ছাড়বিনি সুভদরা, পাণ্ডবকুমার কী কহে?'

পাণ্ডবকুমার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আর পুলিশ সুপারের সামনে নির্লিপ্ত মুখে বলল, 'হুজুর কুছু দেখি নাই, বালেশ্বর গিইছিলাম, ফিরতে পারিনি।'

'কখন বাড়ি ফিরলে?'

'আজ্ঞা ভোরবেলা!'

'কী দেখলে।'

'কুছু না, পরিবার নিদ যাইছিলা, নিদ থিকে উঠি খিল খুলি দিলা।'

'তবে যে বউটি অভিযোগ জানিয়েছে?'

পাণ্ডবকুমার বলল, 'উ বড়ো লকের বেপার, উ সব মিছিলউয়ালারা অসত্য কথা কহিছে, মোর পরিবার কহে নাই।'

'কোথায় সে?' 'মানবাধিকার সংঘ', 'দে–পাল রক্ষা সমিতি'র লোক বলল।

'সে বাপ ঘরে।'

'ডাকো উহারে, বাপ ঘর থিকে লিয়া আস।'

'মোর পরিবার ইত লোকের সুমুখে আসিবেনি।'

'তুমি মিথ্যে বলছ।'

'না সত্য কহিছি, ইসব বানাইছেন আপুনারা, মিছিলউয়ালারা, মেয়্যাছেলের ইজ্জত লিয়ে ইসব কী কথা!'

প্রমাণ হল না। বারোদিন কেটে গিয়েছিল। ডাক্তারি পরিক্ষায় কিছুই মিলবে না। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে পুলিশকে জানানো হয়নি। আর ধর্ষিতার স্বামীই যখন না বলছে, ডায়েরি করছে না, তখন প্রমাণ তো হবেই না। ধর্ষিতা যে বয়ান দিয়েছিল 'মানবাধিকার সংঘ' আর 'দে–পাল রক্ষা সমিতি'র কাছে, তার সঙ্গে ধর্ষিতার স্বামীর বয়ান মিলছে না। না মিললে হবে কী করে? চাষি বউরা শুনে আবার কাঁদল যে যার ভিটের উঠোনে বসে।

এরপর কী হল? না, পাণ্ডবকুমার আবার গেল বালেশ্বর। সুভদ্রাকে রেখে গেল ভিটেয়। আর সুভদ্রা ঘর থেকে বেরিয়ে সমস্ত রাত জঙ্গলে লুকিয়ে থাকল। বুনো ঝোপঝাড়ের মধ্যে বসে থাকল। সে গন্ধ পেয়েছিল। তার মন সন্ধ্যে থেকে কু ডাকছিল। সে টের পাচ্ছিল পাণ্ডবকুমার তাকে ত্যাগ করেছে। ঘর থেকে বের করে দেয়নি বটে, কিন্তু পাণ্ডবকুমার তাকে মনে মনে সরিয়ে দিয়েছে মন থেকে।

সেই রাতে টর্চের আলো তার উঠোনে পড়েছিল। আলো তাকে ভিটের আনাচে কানাচে খুঁজেছিল। না পেয়ে চলে গিয়েছিল নিঃশব্দে। পরদিন সকালে পাণ্ডবকুমার ফিরলে সে শোরগোল তুলল, 'তুমি নাই, তারা আসছিল।'

পাণ্ডবকুমার বলেছিল, 'সুভদরা, মু ফির বিহা কইরব।'

আতঙ্কে হিম হয়ে গিয়েছিল সুভদ্রা, 'কী কহ?'

'হাঁ তু লষ্ট হইছিস, ইজ্জত নাই তা কহিছিস এক হাট লকের সুমুখে।'

'কী কহ তুমি?'

'ঠিকই কহি, মু বালেশ্বর যাই কেনে, যাই উয়ার নিকট।'

'সে কে?'

'তুর সতিন, তুই যা, যেখেনে পারিস যা, তুর শরম নাই।'

সুভদ্রা রোখ ছেড়ে কেঁদে উঠেছিল, 'কী কহ তুমি, মোর শরম লুটল যে শয়তান, তারে ভিটায় লিয়ে আস!'

পাণ্ডবকুমার দাঁত ঘষছিল, দাঁতে দাঁতে শান দিচ্ছিল, ধারালো করছিল দাঁত ক–টি, বলেছিল, 'তু মোর ইজ্জত নিকেশ করি দিলি, লকে মুরে দুষছে মু তুরে শাসন করি নাই, লকে তাই বইলছে, তুর ইজ্জত নিল কি নিল না, তু দশজনারে সি কথা কহি দিলি! কুন মেয়্যামানুষ পারে? তুই পারলি আর পারত বাজারের রেন্ডি মাগি।'

সুভদ্রা মাটিতে মাথা ঠুকেছিল, 'ইসব কী কহ, মু তুমার বিয়া করা মাগ লই?'

'বিয়া করা মাগ বলেই তো কহি, তু কী করে লটরপটর করলি অন্য পুরুষমানুষের সঙ্গে, সি কথা আবার শুনাস!'

সুভদ্রা বুঝতে পেরেছিল তার কপাল ভেঙেছে। আর সেই রাতেই তাকে ধরেছিল ঠিকেদারের লোক। ভিটের ভিতরেই। পাণ্ডবকুমার সন্ধ্যের আগে বেরিয়ে গিয়েছিল। সমস্ত রাত ফেরেনি। সুভদ্রা সেই রাতেই ছুটেছিল মহাপাত্রপুর। তারপর শোরগোল উঠল। পাণ্ডবকুমার বিপক্ষে বলেছিল আবার। কিন্তু তার কথা টেকেনি। ঠিকেদারের লোক ধরা পড়েছিল আবার ছাড়াও পেয়েছিল প্রমাণাভাবে।

রামচন্দ্র বলে, 'তিন তিনবার ধরিছিলা উহারে।'

'আবার?' ভানু কাঁপছিল রাগে।

'হাঁ, তবে শেষবার পুলুশে, থানায়।'

'তারপর?'

'পুলুশ কহিছিলা যদি ফের শোরগোল তুলে সুভদরা, আবার উহারে নষ্ট করিবে, তখুন সুভদরা চুপ করি রহিলা।'

'পার্টি, যারা লড়ছিলা?'

'তারা তো চেষ্টা করিলা, কিন্ত কী করিবে, পুলুশ উহার বিপক্ষে, কালেক্টর সাহাব দুইবার আসিলা, কিন্তু পাণ্ডবকুমার উহার বিয়া করা মেয়্যাছেলার বিপক্ষে কথা কহিলা।'

'আশ্চর্য!'

'শুনা যায় পাণ্ডবকুমার উহারে বিকে দিইছিলা।'

'কী বলিস!' ভানু আহত হয়।

'হাঁ, তাই–ই বটে।'

'এখন?'

'এখন আর কী, ইখানে রহিছে, অনাথিনী, আশরয় লিইছে কাছারিতে।'

'বাবু তো জানে না।'

'না, জানে না।'

'বাবু জানবে না?'

'কী কহ তুমি ভানুবাবু?'

ভানু জিজ্ঞেস করে, 'পাণ্ডবকুমার কোথায়?'

'বালেশ্বরে।'

'উহার জমিন?'

'জমিন থিকে খেদাই দিছে, টঙ্কা নাকি সবটা পায়নি।'

'কেনে, ঠিকেদার তো উহার পক্ষে ছিল।'

'উ সব মোর শুনা কথা, বালেশ্বরে এক দুকানে কাম করে।'

'সে আসে না?'

'না।'

'সে কি সুভদরাকে ভালোবাসত না?' কথাটা জিজ্ঞেস করে ভানু বুঝল কেমন কেমন হয়ে গেল। ভালোবাসত যদি বিক্রি করে দিত? ভালোবাসত কি না তা জানে সুভদ্রা। কে তাকে ও কথা জিজ্ঞেস করবে? লাভ কী?

ভানু অন্ধকারে তাকিয়ে ছিল। আজ সমস্তটা দিন বৃষ্টিতে বৃষ্টিতে কাটল দাওয়ায় বসে। এখনও ঝিরঝির জল ঝরেই যাচ্ছে। ভানুর কাছে পরামর্শ চায় রামচন্দ্র। যদি কাছারি উঠে যায় আবার আশ্রয় হারাবে সুভদ্রা। যতবার সে আঁকড়ে ধরতে চাইছে মাটি, মাটি তাকে ঠেলে দিচ্ছে। শিকড় উপড়ে দিচ্ছে!

ভানু বলল, 'মানুষে শিকড় কেটে দিইছে, কী করে থাকবে সুভদ্রা?'

রামচন্দ্র বলে, 'ভানুবাবু, মোর যে বড়ো মায়া পড়ি গিইছে।'

'বাবুকে বলি?'

'না, না, বাবু কহিছিলা বিয়াশাদি যা হোক ব্যবস্থা কইরবে বাবু, বাবু মোরে বার বার কহিছিলা কাছারিতে মেয়্যামানুষ না তুলতে।'

'বাবু তো নিয়ে আসে।'

'আসে।' বলল রামচন্দ্র, 'দু–বচ্ছর আগে হাসপাতালের নার্স দিদিমণিরে লিয়া আসিছিলা, ধান কাটাইয়ের টায়েমে।'

ভানু বলল, 'সুভদ্রাকে ডাক দেখি।'

সুভদ্রা হ্যারিকেন লণ্ঠন নিয়ে এল। বসল একটু তফাতে। ভানু তাকে দেখল। অন্ধকারের স্তূপ। ভানু তাকে ডাকল, কিন্তু কী কথা বলবে? সে তাকিয়ে আছে দূর অন্ধকার দিগন্তে। আকাশটা আলো হয়ে আছে। ভানু দেখল, আচমকা আকাশে আলোর পরিমাণ বেড়ে গিয়ে আগুন যেন ফেটে গেল। এত দূরে বসে শব্দ কানে আসে আবছা। আকাশ ঝলসে গেল, মেঘ পড়ে গেল।

সুভদ্রা চাপা গলায় ডাকে রামচন্দ্রকে, 'উ নায়েব।'

রামচন্দ্র ঘুরে তাকায়। সুভদ্রা বলে, 'ভানুবাবু যে কাজে এলা, তা হলনি?'

ভানু ফিরল, ‘কী কাজ?’

‘তুমার অশ্বটি খুঁজতে গেলেনি?’

‘যাব কী করে, তুমি তো আটকাই দিলে সুভদ্রা।’

সুভদ্রা বলল, ‘দে–পাল যাবা কহিছিলা তাই মু কহিলা না যাতি, দে–পাল, মহাপাতরপুর তো নি নিইছে গরমিন, বন্দুকঅলা ঘুরিছে সবু সময়।’

ভানু বলল, ‘অশ্বটি যদি উদিক গিয়া থাকে?’

‘খপর মিলছে?’

ভানু জবাব দেয় না। ভানু ভাবছিল তার কথাটা সত্য হলেও তো হতে পারে। চোদ্দোবেড়িয়া থেকে ঘুরতে ঘুরতে, সমুদ্র দেখতে দেখতে পক্ষীরাজ চলে আসতে পারে এদিকে। আসতেই পারে। অন্ধকার আকাশ আলো হয়ে গেছে। রাতটা আলো হয়ে থাকে এই দিগন্তে, আকাশে আগুনের ফুলকি ওড়ে। দূর থেকে দেখতে দেখতে আরও কাছে গিয়ে দেখার সাধ জাগতে পারে তো পক্ষীরাজের মনে। যে যেমন ভাবে দ্যাখে, যে যেমন ভাবে নেয়। এই যে রামচন্দ্র বলছে, দে–পাল, মহাপাত্রপুর রক্ষা সমিতি যেমন হয়েছিল, তেমন হয়েছিল তার বিপক্ষ দলও। তারা বলছিল সরকারের কাজে সবসময় সাহায্য করা উচিত। তার জন্য ত্যাগ করা উচিত। ত্যাগ করলে শেষ পর্যন্ত মানুষেরই ভালো হয়। সরকার ক্ষতিপূরণ দেন, বিনি মাগনায় তো দেন না। তারা এখনও বলে যাচ্ছে দে–পাল মহাপাত্রপুরের আকাশ দেখলে প্রাণ ভরে যায়, অন্ধকার আকাশটাকে আলো করে দিয়েছে প্রকল্প।

সুভদ্রা জিজ্ঞেস করল, ‘একটা কথা মনে জাগে ভানুবাবু।’

‘কী কথা?’

‘গরমেন কি মানুষের জন্যিই সবু করে?’

ভানু অবাক হয়, ‘ই কথা কেনে?’

‘ইত জমিন, চাষবাস, তরমুজ, পান, ধান, নারকেল সবু তো চলি গেলা, মানুষের কুছুই থাকলনি, গরমেন তো জানে সবু।’

‘জানে তো ঠিক।’

‘তবে কেনে নেয়?’

‘গরমেনের দরকার।’

‘ইহাতে কি মানুষের ভালো হবে?’ সুভদ্রা দূর আকাশের দিকে তর্জনী তোলে, ‘আকাশ–পুড়া অই যে আলো, উ আলো কি মানুষের ভালোর জন্যি?’

ভানু বলে, ‘এ কথা জিজ্ঞেস করো কেনে?’

‘মনে জাগে, রাতভর ঘুম আসে না ভানুবাবু, কী হিলা, কেনে হিলা, কুছুই মাথায় থাকেনি, আকাশ–পুড়ানো আগুন, অইজন্য কত সংসার ভাসি গিলা ভানুবাবু।’

ভানু বলল, ‘তুমি কি জানো উটা মোদের দেশের কাজ হইছে?’

‘কী দেশ?’

‘এই দেশ, ইন্ডিয়া কহে, ভারত।’ ভানুর পরিবর্তে রামচন্দ্র জবাব দেয়।

‘ভারত কী?’

‘ভারত মোদের দেশ।’ আবার জবাব দিল রামচন্দ্র, ‘তুমি ইটা কি জানো না সুভদরা, মোরা ভারত দেশে আছি?’

‘মোরা তো ভীমাপুরে অছি।’ সুভদ্রা বলে।

‘ভীমাপুর ভারতের মধ্যে।’ বলল ভানু।

'দে–পাল, মহাপাতরপুর?'

'ভারতের ভিতরে।' বলল নায়েব।

'ভারত কত বড়ো?'

'অনেক।' রামচন্দ্র দু–হাত বাড়িয়ে দেখাল। অন্ধকারের ভিতর তার দুই হাত মিশে গেল।

'সবু যদি ভারতের ভিতরে হয়, দে–পাল লিয়ে গরমেন মোদের সব্বুনাশ করলে কেনে?'

রামচন্দ্র বলে, 'গরমেনের পোকল্প তো ইহা।'

'পোকল্প কী?'

রামচন্দ্র বলে, 'আকাশে রকেট উড়ে, সেই রকেট ইখেন থেকে আকাশে উঠে।'

সুভদ্রা বলে, 'রকেট না উড়ালে কী হত?'

ভানু বলে, 'সরকার চায় তাই উড়ে।'

'কেনে উড়ে, কিছুই ধরা যায় না?'

ভানু বলল, 'সে বড়ো কঠিন ব্যাপার সুভদ্রা, শত্রুরে জব্দ করতে রকেট আকাশে উড়ে, উসব মিলিটারির বেপার।'

'মোদের সব গেল, মোরা তো ভারতের লক।'

'তা তো বটে।' ভানু সমর্থন করে।

'ভারতের লক, তবু মোদের ধান, পান, সব লিয়ে মোদের উচ্ছেদ করি দিলা।'

ভানু বলল, 'ইরকম হয়।'

'কী হয়?'

'মানষের জমি নেয় গরমেন।'

'কেনে নেয়?' সুভদ্রা আচমকা চিতকার করে ওঠে, 'কেনে নেয় কহ দেখি ভানুবাবু, আকাশ–পুড়ানোয় মোদের কী লাভ?'

ভানু আত্মরক্ষা করতে পারে না। সত্যি কেন নেয় সরকার? কী হয় এতে? ভানুর মনে হয় নিজে যেন সরকারের পক্ষে কথা বলছিল। পক্ষে তো কথা আছে। ওই রকেটে করে সরকার বোমা পাঠাবে শত্রুর দেশে। শত্রুর দেশ কোনটা? পাকিস্তান হবে। চীন হবে। ভারত ছাড়া সবই ভারতের শত্রু। তার মানে ভারতের লোক ছাড়া সবাই ভারতের লোকের শত্রু। তাই–বা কী করে হয়? ভারতের লোকের ভিতরেই কত শত্রুতা, কত শয়তানি! এই যে বসে আছে সুভদ্রা, একে নষ্ট করেছে কে? ধ্বংস করেছে কে? ঠিকেদারের লোক। সে কি অন্য দেশের লোক?

সুভদ্রা বলে, 'কহ ভানুবাবু, ভারতের লক মোরা, তবু কেনে মোদের সব্বুনাশ হয়, তার কুনো বিচার হিলানি!'

ভানু বলল, 'আমি কিছুই বুঝতে পারছিনে সুভদ্রা।'

'তবে যে তুমি কহ সরকারের দরকার তাই নিইছে?'

'দরকার তো বটে, নাহলে নেবে কেন?'

সুভদ্রা বলল, 'মোর মনে হয়, মোরে শেষ করিবার জন্যি জমিন নিল গরমেন, ঠিকেদারের লকের কুছুই হলনি।'

'কী কহ তুমি?' রামচন্দ্র বলে ওঠে।

'যা কহি ঠিকই কহি, মোর সবু শেষ করি দিইছে ভানুবাবু, মোর আর কুছুই নাই, হা ভগবান!'

ভানু বলল, 'কাঁদো কেনে, এতকাল বাদে কেঁদে কী হবে?'

'কান্না যে ফুরায় না ভানুবাবু!'

ভানু বিড়বিড় করে, 'যে কাঁদে তার কান্না ফুরায় না।'

'কী কহ, মু তো কান্দি নাই পেত্থমে।'

'তবে কান্নার কথা বলো কেনে?'

'ভানুবাবু, শুধু মনে হয় মোর সব্বুনাশ করার লেগ্যে গরমেন এত জমিন নিল।'

ভানু বলে, 'তা কেনে হিবে?'

'হিবে, তাই হিবে ভানুবাবু, উহারা রকেট উঠাবে তো মোর সংসার ভাসিবে, সংসার তো ভাসিলা মোর, মোর তো ইজ্জত গিলা, গিলা, বার বার গিলা, কেহ কুছুই করিবার পারেনি, মোর সব গিলা ভানুবাবু, কী আর কহিব?'

ভানু চুপ করে থাকে। সুভদ্রা বলে যায় কথা। ঝিরঝির বৃষ্টির মতো অন্ধকারে সুভদ্রার কথাগুলি ঝরে যায়, ঝরে পড়ে। সুভদ্রা বলে, 'কী দেখতে যাচ্ছিলে ভানুবাবু দে–পালে? দে–পাল, মহাপাতরপুর এখন ধু–ধু। সব গাছপালা, নারকেল সারি, সুপুরির বন, তালবন কেটে ফেলেছে সরকার। একটা গাছও নাই। এমনকি কতকালের বুড়ো একটা বটগাছ ছিল তাও কেটে ফেলেছে সরকার। তরমুজ খেত নাই, পান বরজ নাই, বুনো ঘাসের জঙ্গল নাই, পুকুর নাই, ডোবা নাই, গ্রামদেবতির থান নাই, শিবমন্দির নাই, কিছুই নাই। পায়ের তলায় মাটিও নেই।'

'নাই তো কী আছে?'

'আছে ছাই।'

'ছাই মানে?'

'ছাই হিলা ছাই, কয়লাপুড়া ছাই, কাঠপুড়া ছাই, বনপুড়া ছাই, গিহপুড়া ছাই, পানবরজ, তরমুজ খেত, ধানখেতপুড়া ছাই, মানুষপুড়া ছাই, সাগরপুড়া ছাই, বালি, সাগর, সব পুড়ে ছাই হই গিছে গো।'

'কী বলো?'

'ঠিকই কহি ভানুবাবু, কুছুই নাই, বাতাসও গরম, মাটি ছাই, আকাশে দিনভর, রাতভর আগুন উড়িছে, ইসব করার জন্যি যেন গরমেন মোর সব্বুনাশ করল।'

ভানু বলল, 'তুমি সত্যি কহিছ?'

'সত্যই কহিছি, তুমিই যাও ভানুবাবু, সাগর আর সাগর নাই, সাগরের নীল যেন পুড়ি গিইছে, পুড়িছে সবু সময়।'

ভানু জ্বলন্ত আকাশ দেখতে পাচ্ছিল দূর থেকে, বলল, 'কী করি আমি?'

'কী করিবে?'

'অশ্ব যদি যায়!'

মাথা নাড়ে সুভদ্রা, 'জানোয়ারে টের পায় সব, যাবেনি, শুধু মানুষই কুছু বুঝেনি, কত লকে কহিছে যা হইছে ভালোর তরে হইছে, দেশের কাজ হইছে বড়ো।'

ভানু বলল, 'তা ঠিক।'

দেশের কাজটা কী ভানুবাবু, 'মোরে নষ্ট করা?'

ভানু অন্ধকারের কণ্ঠস্বর শুনল। কণ্ঠস্বরটা তাকে ঘিরে ধরছিল। ভানু শুনছিল, 'শুধু ছাই আর ছাই। শুধু আগুন, আর আগুন। বাতাসও আগুন, চাঁদের আলোও আগুন, সাগরের জলও আগুন, জলে ছাই, ছাই–গোলা জল, ভানুবাবু হে, এই জন্যি দে–পাল, মহাপাতরপুর নিল?'

ভানু বিড়বিড় করে, 'আমি কী জানি।'

'তুমি যদি মেয়্যামানুষ হিতে সর্ব অঙ্গ দিখে নিতে ভানুবাবু, কী আমারে করিছে গরমেনে, নায়েব জানে, নায়েব ভালো জানে।'

ভানু দেখল আকাশ ঝলসে যাচ্ছে দিগন্তে।

ভানু জানে না কী হয়েছিল। কখনো মনে হয় সত্য, কখনো মনে হয় দুঃস্বপ্ন। এক দুঃস্বপ্নের ঘোরে সে দেখেছিল সুভদ্রাকে। সমস্ত দিন খেপে খেপে সুভদ্রার কাহিনি শুনে, ঠিকেদার, পুলিশ, সরকারি লোকের সমুদ্র উপকূল দখলের বৃত্তান্ত শুনে, মাথা ভার হয়েছিল সত্যি। তারপর যে কী হল!

দরজায় টোকা পড়েছিল মধ্যরাতে। ক–প্রহর কেটেছিল সে জানে না। ঘুমোলে সে শুধুই ঘুমায়। জাগে না। শিয়ালের ডাকেও ঘুম ভাঙে না, নৈঃশব্দ্য চিরে ভেসে আসা বিস্ফোরণের শব্দেও ঘুম ভাঙে না। আবার জাগলে সে সর্ব অঙ্গ নিয়েই জাগে। শুয়ে থাকে। ভানু আচমকা জেগে উঠে বসেছিল। দরজার ওপারে কেউ ছিল হয়তো, সে দরজা খুলে বাইরে এসেছিল। দেখেছিল বারান্দার অন্ধকারে সুভদ্রা। কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ উঠে এসেছে আকাশে!

সুভদ্রা ডাকে, ‘ভানুবাবু, চলি যাবু?’

‘যাব।’

‘ভানুবাবু, মোর কথা তুমি কহিবে?’

‘কারে কহিব?’

সুভদ্রা বলে, ‘ভানুবাবু, আমারে শেষ করি দিইছে, মোরে পুড়াচ্ছে, ভানুবাবু, তুমি কি মোর কথা কহিবেনি?

‘কী কহিব?’

‘মোরে কীভাবে....!’ সুভদ্রা বিড়বিড় করে, ‘ভানুবাবু, কেহ নাই, তুমি শুনিবা আরু কত কথা, নায়েব কত জানে, সবু জানেনি, আবার সবু জানা রহিলেও কহিতে পারেনি, পুরুষমানুষেরও শরম লাগে উ কহিতে।’

ভানু আতঙ্কিত হয়েছিল। সুভদ্রা উঠোনে নেমে গিয়েছিল। বৃষ্টি নেই। কৃষ্ণাষ্টমীর চাঁদ আলো ঢালছিল বৃষ্টি ধোয়া চরাচরে। কী সুন্দর আকাশ প্রকৃতি। তার ঘুমের ভিতরেই পৃথিবী এমন সুন্দর হয়ে উঠেছিল। সুভদ্রা তাকে হাতছানি দিয়েছিল। ভানু নেমে গিয়েছিল ভিজে মাটিতে।

‘নায়েব কোথায়?’ ভানু জিজ্ঞেস করেছিল।

‘ঘুমালে উর সাড় থাকেনি।’

‘তুমি ঘুমোওনি?’

মাথা নেড়েছিল সুভদ্রা, ‘নিদ আসিবেনি ভানুবাবু, নিদ মোর আঁখি হিতে চলি গিইছে, আস।’

‘কোথায়?’

‘ভিটার পিছনে।’

বালি মাটি। বৃষ্টিতে ভিজে সে মাটি ঠান্ডা। সে মাটির কোথাও কোথাও ছোপ ছোপ জল! স্থির হয়ে আছে জলখণ্ড। সেই জলে চাঁদের আলো পড়ে প্রতিফলিত হচ্ছিল যেন। ডিঙি নৌকোর মতো চাঁদখানি মাটিতে ধরা সেই সামান্য জলে ভাসছিল।

‘ভানুবাবু, তুমার সবু জানা দরকার।’

ভানু বলল, ‘জেনে কী করব আমি?’

‘তবু জানা দরকার।’

ভানু চুপ করে থাকল। কেমন হিমেল ভাব প্রকৃতিতে। ঘরের ভিতরে ঘেমে যাচ্ছিল। ভানু আকাশ দেখল। কালো মেঘের দল সমুদ্র থেকে আসছিল স্থলভূমিতে। চাঁদের কাছাকাছি নেই, কিন্তু চাঁদের আলোয় ভাসছে জলভরা ভারী মেঘ। গাভিন মহিষের মতো শ্লথ গতির মেঘ। আকাশের দিকে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়েছিল ভানু, সুভদ্রা তখন ডাকে, ‘ভানুবাবু, শুনো।’

ভানু চোখ নামায়, ‘ডাকল কেনে বউ?’

সুভদ্রা বলে, ‘তুমি তো দে–পাল, মহাপাতরপুর দিখতে যাচ্ছিলে?’

ভানু বলে, ‘সমুদ্দুরটা আমার ভালো লাগে।’

‘সমুদ্দুর তো সব এক।’

‘তাই কী হয় বউ? কোনো সাগরের সঙ্গে কোনো সাগরের মিল নাই।’

‘তাই কহ?’

‘হ্যাঁ, সমুদ্দুর তো শুধু জল নিয়ে হয় না, সমুদ্দুরের পাড়, পাড়ের মাটি, সমুদ্দুরের ধারের গাছগাছালি, মানুষ....।’

‘আশ্চর্য!’

ভানু বলে, ‘হ্যাঁ, কত জায়গায় সমুদ্দুর দেখেছি!’

বলতে বলতে ভানু দুটি হাত দুই দিকে প্রসারিত করে দেয়। প্রসারণে যেন সমুদ্র দর্শনের ব্যাপ্তি বোঝাতে চায়। চেনাতে চায় সমুদ্র, আকাশ, উপকূল। ফিসফিসিয়ে বলে ভানু, ‘আমি তো হাঘরে, চালচুলা নাই, বউ, সংসার ভাসি গিইছে, সেসব অনেক কথা, বলার কোনো মানে হয় না।’

‘তবে মোর কথা কেনে শুনতে চাহ?’

ভানু বলে, ‘তুমি যদি বলো শুনব, না বললে শুনব না।’

‘যদি কহি?’

‘শুনব, আসলে কথাটা তো শুধু তুমার নয় সুভদ্রা বউ, কথাটা এই সমুদ্দুরেরও বটে, দে–পাল, মহাপাত্রপুরেরও বটে।’

সুভদ্রা দাঁতে আঁচল চেপে আছে। মাথায় ঘোমটাটি থাকায় নরম চাঁদের আলোয় তাকে দেখাচ্ছে সুন্দর। তাকিয়ে থাকতে হয়। সুভদ্রা তার মাথার ঘোমটা ঈষৎ টেনে জিজ্ঞেস করে, ‘তুমি শুনিলে কী হিবে?’

‘আরও পাঁচজন শুনবে।’

‘তাতেই বা কী হিবে?’

ভানু বলে, ‘অনেক লোক জেনে যাবে, দেশের অনেক লোক জেনে যাবে।’

‘তাতেই বা কী হিবে, পোতিকার হিবে?’

ভানু বলে, ‘তা আমি কী করে বলি?’

‘তুমি কুছু করিতে পারবনি ভানুবাবু?’

ভানু বলে, ‘না, আমি কী করব, দশজনকে জানাতে পারি।

‘তাতে কী হিবে?’

‘কিছুই না, আবার অনেক, লোকে জানলে অনেকটা কাজ হবে, লোকে জানুক এইভাবে গ্রাম উচ্ছেদ হয়।’

সুভদ্রা বলল, ‘মোর কথাও কহি দিবে?’

‘দেব তো নিশ্চয়, তুমি কিছু লুকিয়োনা বউ।’

সুভদ্রা বলে, ‘ডর লাগে।’

‘কেনে?’

‘পুলুশ কহিছিলা কুছু না কহিতে।’

‘না বললে তো সবাই জানবে না।’

‘কুছু লকে তো জানে।’

‘সবটা জানে?’

‘যেটুকুন জানে তা নিয়েও কুছু তো কহিলনি।’

ভানু বলে, ‘কহিছে কি না তুমি বুঝছ কী করে?’

দুজনে চুপচাপ। ভানু আকাশে তাকায়। আকাশটা দেখতে ভালো লাগছে। অষ্টমীর চাঁদ, কিন্তু প্রকৃতি এত ধোয়া যে আলোয় ঢেকে গেছে চারপাশ। ঘুম না ভাঙলে এই আকাশ দেখা হত না।

সুভদ্রা ডাকে, ‘উপরে তাকায়ে তুমি কী বুঝিবা ভানুবাবু?’

ভানু উপরে তাকিয়েই বলে, ‘তুমি বলে যাও।’

‘শুনি কী বুঝিবা ভানুবাবু!’ কেঁদে উঠল যেন সুভদ্রা, ‘মোর ই অবস্থার কথা কেডা জানে, কেহ লয়, নায়েবটুকুন জানে, ভানুবাবু এই দ্যাখো।’

ভানু কৌতূহলে মাথা নামায় আকাশ থেকে। আকাশে অত নরম, স্নিগ্ধ ভাব, মাটির পৃথিবী সম্পূর্ণ বিপরিত। ভানুর দুটি চোখ যেন ঝলসে যায়। দৃষ্টি কুঁকড়ে যায়। হা ভগবান, অন্ধ করে দাও। মনে করলেই কি অন্ধ হওয়া যায়? ভানুকে যে দেখতেই হয়। আবরণহীন নারী দেখতে হয়। আবরণ খুলে ফেলছে ওই নারী; ওই প্রকৃতি। ক্রমশ সরিয়ে ফেলছে সব যা ঢেকে রেখেছিল তার বুক, পেট, তলপেট, ঊরু, কোমর, নিতম্ব, পিঠ। ঘুরছে নারী। ঘুরে ঘুরে দেখাচ্ছে তার পোড়া শরীর। পোড়া বুক, পোড়া পেট, পোড়া চামড়া, পোড়া ঊরু, কোমর, নিতম্ব, পিঠ। ঘুরছে সুভদ্রা, ডাকছে, ‘দিখো হে ভানুবাবু, তুমার গরমিনে কী করিছে।’

ভানু চোখ ঘুরিয়ে নেয়, ‘কে করল?’

‘কারে দোষ দিই, সবু লকে।’

ভানু অন্য দিকে ফেরে, ‘তুমি নিজেরে ঢাকো বউ।’

‘কেনে, মোরে বেলজ্জে, শরমহীন লাগে?’

‘না বউ লুকাও, আমার গা পুড়ে যাচ্ছে, কী তাপ!’ বলতে বলতে ভানু ঘুরে দাঁড়ায়। আকাশের দিকে চেয়ে শ্বাস নেয়। সে ভাবতে পারেনি এমন হতে পারে। অমন সুন্দর শরীরখানিতে অমন কলঙ্ক রেখা এঁকে দিতে পারে কেউ। আগুনের হলকা টের পাচ্ছিল ভানু। না দেখলে ভানু জানত কীভাবে? শুনে বুঝতে পারত না কতটা কী হয়েছে। ভানু মাথা নামায়, ডাকল সুভদ্রাকে, ‘ও বউ, কেউ জানে না তো এসব, লোকে তো শুধু জানে মানুষ উচ্ছেদ হয়েছে।’

নৈঃশব্দ ভারী হয়ে উঠেছে। ভানু দেখল সামনের জায়গাটি শূন্য। কেউ নেই। চাঁদ বোধ হয় উপরে ঢাকল মেঘে। জ্যোতস্না হারিয়ে গেল। ভানু চাপা গলায় ডাকল, ‘ও সুভদ্রাবউ, তুমি কই?’

জবাব পেল না ভানু। তার মনে হল কেউ নেই যেন আশেপাশে। কেউ ছিল কি? যা দেখেছে তা কি সত্যি? ভানুর চোখে ঘোর লাগে। কই সেই জ্যোতস্না, কৃষ্ণাষ্টমীর উজ্জ্বল চাঁদটি? ঘন মেঘ তাকে গিলে ফেলল কখন? নাকি ঘন মেঘেই আকাশ ঢেকে আছে সমস্ত দিন, সন্ধ্যাবেলা, প্রথম প্রহর। চাঁদের আলো যদি না ছিল তবে কোন আলোয় সে দেখল সুভদ্রা বউটিকে? সুভদ্রা বউকে দেখেছে, না কি—! ভানুর গা ছমছম করে ওঠে। সে টের পেল অনেকদূর এসে গেছে। কতদূর সেই কাছারিবাড়ি! সে এল কখন? কার ডাকে সে বেরিয়ে পড়েছে ঘর থেকে? চোখে এখনও ঘুম লেগে আছে। একটু আগে যা দেখেছে তা কি সত্য, না বিভ্রম? মনের ভুল! অথবা দুঃস্বপ্নের ঘোর! সে দেখল ঘোলাটে অন্ধকার তাকে ঘিরে ফেলেছে। না কোথাও নেই সুভদ্রা বউ। সে তবু চাপা গলায় ডাকল, সাড়া পায় না।

ভানু ধীর পায়ে কাছারিবাড়িতে ফিরতে লাগল। সে ঠিক ধরতে পারছে না কতটা সময় বাইরে রয়েছে। চাঁদের যে স্মৃতি রয়েছে, তাতে চাঁদ আকাশমণ্ডলে অনেকটা উঠেও এসেছে। ভানু টের পায় আবার বৃষ্টি এল। ফিসফিসে জলকণা উড়ছে। তার মাথা গা ভিজিয়ে দিচ্ছে।

সে কাছা.রিবাড়িতে ফিরে বসল বারান্দায়। কোথাও কোনো সাড়া নেই। কোনো মানুষের পায়ের শব্দ নেই, কণ্ঠস্বর নেই। অখণ্ড নীরবতায় ভ্যর হয়ে আছে পৃথিবী। ভানু মনে করতে চাইছিল সমস্তটা দিন কী শুনেছে এই বারান্দায় বসে, কখনো ঘরে বসে। তারপর কী দেখেছে সে? যা শুনেছে, যা দেখেছে তা আর যাচাই করবে না সে। ভোরবেলা বেরিয়ে পড়বে দীঘার দিকে।

ঘুমিয়ে পড়েছিল সে বারান্দায় বসেই। তাকে ডেকেছে রামচন্দ্র, 'ও ভানুবাবু, ইখানে বসি কেনে?'

ভানু উঠে দেখল সকাল হয়ে গেছে। দুর্যোগ আরও কঠিন হয়ে এসেছে। আকাশ আরও মেঘের ভারে ভার। সে উঠে বসে চোখ মুছতে লাগল, বলল, 'দেরি হয়ে গেল, আমি এখন যাব।'

'কুনথে যাবু?'

'দীঘা।'

রামচন্দ্র বলল, 'যে কামে এলা তা হলনি, চলি যাবু?'

'হয়েছে।'

'কী হয়েছে, অশ্ব তো খুঁজা হলনি।'

ভানু জবাব দিতে দিতে এদিক–ওদিক দেখছিল। কোথায় সুভদ্রা? রামচন্দ্র বলে, 'মু তো দেখছিনি উয়াকে, সকাল থিকে নাই।'

'নাই মানে?'

'কুনথে গিছে।'

'কোথায় গেল, কখন গেল?'

'তা তো মু জানিনি ভানুবাবু, কহি তো যায়নি।'

ভানু চুপ করে যায়। সমস্ত ঘটনা খুব ঘোলাটে লাগছে তার কাছে। সে বারান্দায় শুয়েছিল। কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল তা খেয়াল নেই। সুভদ্রা কি তখন ফিরে এসেছিল কাছারি ঘরে, নাকি ওই পথ থেকেই চলে গেছে? ভানু বলল, 'তুমিও টের পাওনি?'

'না, উ তো ভোর ভোর উঠে।'

'এমন যায়?'

'কেমন কহিছ?'

'যেমন গেছে?'

'গিছে পাড়ার দিকে হয়তো।'

'ফিরবে?'

'হাঁ, ফিরবে নিচ্চয়।' রামচন্দ্র বিড়বিড় করে, তারপর বলে, 'কিন্তু রান্নাশাল, উঠান সব পড়ি আছে, ঝাঁটপাট দেয় নাই, কী হল উয়ার?' শেষ কথাটা রামচন্দ্র যেন ভানুকেই জিজ্ঞেস করে।

ভানুর ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যে। যত ফিরেছে দীঘার কাছাকাছি, ততই বিষণ্নতা, বিষাদ, অবসাদ, তাকে গিলে খেয়েছে যেন। কাঁথিতে নেমে অনেক সময় পায়চারি করছিল। ভাবছিল চলে যায় মীরগোদা, খোঁজ নিয়ে আসে কোকিলা বধূ আর গৌরমোহনের। কতটা হল সেই মদরঞ্জি? দেখলে যেন প্রাণ ঠান্ডা হবে। কী সুন্দর আঁকে তারা! জীবন্ত ঘোড়াটিকে যেন এঁকে ফেলবে মদরঞ্জির উপরে, শুনো হে কোকিলা বধূ, আর একটা ব্যাপার বলতে পারি, যদি আঁকো মদরঞ্জির উপরে, তোমরা আঁকলে তো জেনে যাবে কত মানুষ।

কাঁথিতে কতক্ষণ এলোমেলো কাটাল সে। একবার ভাবল ঘুরে আসে সেই বুড়ির বাড়ি। সাতমহলা পুরীতে বুড়ি একা থাকে। ঘোড়াটাকে পাচার করে দিয়েছে কলকাতা শহরে। বুড়ি না শুনেছিল সমস্ত রাত ধরে ঘোড়াটা ঘরের ভিতর দাপাদাপি করছে। শেষ পর্যন্ত সে এল দীঘায়। তখন সন্ধ্যে হয়ে গেছে। দীঘায় নেমে মনে হল কতকাল বাদে ফিরল সে। তিনদিন ছিল ভীমাপুর–বালিমুন্ডায়, মনে হচ্ছে তিন বছর কাটিয়ে এসেছে। কতকালের চেনা জায়গা সব! কত জন্মের পরিচিত! কী ছিল ওই সব জায়গা তা ভানু কল্পনা করতে পারে। কী হয়েছে তা স্বচক্ষে দেখে এসেছে সে। চাঁদবালি, দে–পাল, কুসমাড়, মহাপাত্রপুর, ভীমাপুর!

বাস থেকে নেমে ভানু সমুদ্রতীরে চলে এসেছে। এখন অন্ধকার। বৃষ্টি নেই, কিন্তু আকাশ ভরতি মেঘ। এই সময়ে দীঘায় টুরিস্ট কম। হোটেল ব্যাবসায়ে মন্দা। আবার এই সময়টাই ভানুর সবচেয়ে ভালো লাগে। সমুদ্রের ধারে হাত–পা ছড়িয়ে বসা যায়। বিচে একা একা হাঁটা যায়। দিনমান এই সময়ে গভীর বিস্ময় ছড়ায়। দিগন্ত থেকে মেঘ ওঠে। সেই মেঘ ব্যাপ্ত হয়ে যায় সমুদ্রের উপরে, আকাশে। জল আর মেঘ একাকার হয়ে যায়। জলকে মেঘ মনে হয়। মেঘ দেখে মনে হয় সমুদ্রই উঠে এসেছে আকাশে।

সৈকত নিঝুম। এখন ভাটা চলছে। সমুদ্র সরে গেছে অনেকটা দূরে। কিন্তু শ্রাবণের ভরা সমুদ্রের গর্জন কি তাতে কমেছে? ঢেউ ভাঙছে অনেকটা দূরে। ঢেউয়ের মাথায় ফরফরাস জ্বলছে। ভানু প্রাণ ভরে নিশ্বাস নেয় ভিজে সমুদ্রসৈকতে দাঁড়িয়ে। নত হয়ে প্রণাম করে সমুদ্রকে। তখন তার কাঁধে হাত, ‘ভাননু টুমি?’

অন্ধকারে সাহেব ঠিক তাকে খুঁজে বের করেছে। সাহেবও একা হাঁটছে সমুদ্রতীরে। জিজ্ঞেস করল, ‘ভাননু, টুমি কুনথে গিয়াছিলাম?’

ভানু হাসে, বলে, ‘চান্দবালি, দে–পাল, কুসমাড়, বালিমুন্ডা।’

‘হোয়াট?’

ভানু আবার জায়গাগুলোর নাম বলে যায় গড়গড়িয়ে, তারপর অন্ধকারে পশ্চিমে তর্জনী তোলে, ‘দ্যাট সাইড সায়েব, অ্যানাদার সি–সাইড।’

‘দিজ বে–অব–বেঙ্গল?’

‘ইয়াস সায়েব, মাইতিবাবু’জ জমিনদারি, সি–সাইড, চান্দবালি।’

সাহেব কী বুঝল কে জানে, জিজ্ঞেস করে, ‘বিউটিফুল?’

‘নো সায়েব, নট বিউটিফুল, বিউটিফুল ছিল, নট নাউ!’

‘দেন? বেটিং চলিবে?’ সাহেব জুয়োর কথা বলল।

ভানু বলে, ‘ভেরি ব্যাড সায়েব, এসব নিয়ে জুয়ো হয় না।’

‘উসকা মতলব, হোয়াই ব্যাড?’

ভানু বিড়বিড় করে, ‘ও সায়েব, তোমারে আমি কী করে বুঝাই।’

‘গানজা হায় ভাননু?’

‘নেহি সায়েব।’

'আই ওয়ান্ট গানজা।' সায়েব বিড়বিড় করে।

ভানু জবাব দেয় না। সমুদ্রসৈকত ধরে পুবদিকে হেঁটে যায়। সায়েব তার কাঁধে হাত দেয়, 'টুমি কি ফিশারম্যান এরিয়া যাইছিলাম?'

'নো সায়েব, আমি এমনি হাঁটছি।'

'টুমি কি বেঙা ফিশারম্যান কাটেজ যাইছিলাম?'

'নো সায়েব, আমার হাঁটতে ভালো লাগছে।'

সাহেব বলে, 'বেঙা'জ ওয়াইফ, মাই রাঢিকা, উসকি সাথ বেঙা কোয়ার্ল করতা, ঝগড়া চলিয়াছে।'

'বাহ্‌, বেশ! ঝগড়া চলিয়াছে।'

'বেঙা ইজ আ ব্যাডম্যান।'

'কেন সায়েব, ওর বউয়ের সাথে ফস্টিনস্টি করতে দিচ্ছে না?'

সাহেব বলে, 'বেঙা কত রুপয়া নিবে হামার নিকট?'

'ওফ্‌ সায়েব, তুমি যাও দেখি।' ভানু বিরক্ত হয়ে বলে।

সাহেব তার কথাটা শোনেই না। অথবা শুনেছে, বোঝেনি। আবার এও হতে পারে বুঝেছে বলেই কথাটা কানে নিল না। ভানু ডাকল, 'এই ফ্রেদরিক।'

ফ্রেদরিক বলে, 'বেঙা'জ ওয়াইফ্‌ হামার সহিত বেনারস যাবে।'

'তার মানে?'

'হামি কৃষ্ণা, উ রাঢিকা, হামারা লীলা করবে।'

'ওই জন্যে বেঙা ঝগড়া করছে?'

'নো, বেঙা এভরিডে ঝগড়া চলিয়াছে।'

'কেন?'

'বেঙা সাসপেক্ট করে, লেকিন হামি তো রুপয়া দিবে বেঙাকে, রুপয়া নিবে, ফির ওয়াইফের সহিত ঝগড়া চলিয়াছে, দিস ইজ নট ফেয়ার।'

ভানু ঘুরে দাঁড়িয়ে সায়েবকে ধরল, 'তোমরা তো লীলা করছ?'

সায়েব হা–হা করে হাসে, তার কাঁধ থেকে ভানুর হাত সরিয়ে দেয়, 'হোয়াট আর ইউ টেলিং...?'

'লীলা তো চলিয়াছে।'

'গুড! সি ইজ ভেরি সেক্সি, আ নাইস ওম্যান।'

'ওরে সায়েব, তুই বেঙার বউটারে ধরলি কেন?'

সায়েব বলে, 'হেই ভাননু, টুমি কি বেঙাজ ওয়াইফ, রাঢাকে দেখিয়াছ, দ্যাট বিউটিফুল ওম্যান, শি ইজ ভোলাপচুয়াস।'

কথাটার ভাব বুঝেছে ভানু, সে সাহেবকে ঠেলে দেয়, 'এই সায়েব যা দেখি আমার কাছ থেকে, শালা কী করতে এয়েছিস?'

সায়েব হা–হা করে হাসে, 'এ ভাননু, ডু য়্যু ওয়ান্ট ওম্যান?'

ভানু বলে, 'সায়েব আমারে একা থাকতে দে।'

সায়েব বলে, 'বেঙা বহুত পাজি আছে, বেঙা হামাকে পেয়িং গেস্ট রাখিয়াছে, রাঢিকে লাভস মি, ভাননু সমঝতা?'

ভানু বলল, 'সায়েব তুই যা দেখি, আমার খুব খারাপ লাগছে।'

'খারাপ, ব্যাড?'

'হ্যাঁ রে সায়েব।' ভানু হনহন করে হাঁটতে থাকে। ভানু এবার পশ্চিমমুখো। অন্ধকারে তার পা ঠিক চিনে নিচ্ছে গন্তব্য। আসলে গন্তব্য তো অনির্দেশ্য। গন্তব্য এই সমুদ্রসৈকত। জলের ধার দিয়ে হাঁটছে ভানু। তাকে এসে আবার ধরেছে ফ্রেদরিক, 'এ ভাননু, হু ইজ ব্যাড, হামি ব্যাড?'

'নো সায়েব, আমাকে একা থাকতে দে।'

সায়েব বলল, 'বেঙা ব্যাড, হিজ ওয়াইফ গুড, ভাননু কাম, হুটেল মে চল ভাননু, গানজা মিলিবে।'

'যা না তুই।' ভানু খেপে ওঠে, 'হোটেলে তো বাবু আছে, মাইতিবাবু।'

'নো ভাননু, বাবু সিপটী নেহি, কুহাককিনে গিয়াছিলাম সিপটি।'

কী বলে সাহেব? কুহকিনী মানে কোকিলা বধূ? কোকিলা বধূর কাছে গেছে বাবু শ্রীপতি মাইতি? কী সব্বোনাশ! তাহলে বাবুর নার্স দিদিমণি! কী সব্বোনাশ, গৌরমোহন মদরঞ্জিওয়ালা! ভানু হাসল, বাবু গেলেই হবে? কোকিলা বধূ বাবুকে উঠোন থেকেই বিদায় করবে। কিন্তু পারবে কি সত্যি? মেঘ ছায়া ফেলে ভানুর মনে। বাবু তো হোটেলওয়ালা, পয়সাওয়ালা, আর কোকিলা তো মেয়েমানুষ। শুধু আঁকতে পারে ভালো, মনের মাধুরী ফুটিয়ে তুলতে পারে রঙে, সম্মোহন করতে পারে পক্ষীরাজকে। তা বাদে? তা বাদে তো সে মেয়েমানুষই। গৌরমোহনের বউ। মেয়েমানুষকে যদি কোনো বলবান পুরুষ চায়, ভীষণভাবে টানে, মেয়েমানুষের সাধ্য কি আটকায়? গৌরমোহনের জন্য প্রাণ কাঁদলেও পারবে না কোকিলা। পারেনি যেমন দে–পালের সুভদ্রা বউ। পুরুষমানুষ, তার স্বামীও ছিল। সে বেটা ঠেলে দিল তাকে বাঘের জঙ্গলে।

ভানু জিজ্ঞাসা করে, 'বাবু কবে গেল?'

'হামি জানে না।'

'তবে যে বললে বাবু গেছে মীরগোদা।'

'হোয়াট মীড়গোডা, হাম বোলা কুহাককিনে।'

'কুহাককিনে! তো সেখেনে গেল কবে?'

'আই ডোন্ট নো।'

'তুমি হোটেলে কবে গেলে খোঁজ করতে?'

'আই ডোন্ট নো।'

'ভাগ তো সাহেব, কীসব বলছিস।'

ফ্রেদরিক বলে, 'টুমার বাবুর কুহাককিনে হায়, হামার কুহাককিনে হায়, বেঙাজ ওয়াইফ, মাই রাটিকে কুহাককিনে।'

ভানু হাঁটতে থাকে। সাহেব একেবারে খালি মাথায় নেই। কিছুটা টেনেছে শুকনো নেশা। আরও চাইছে। ভানুকে ছাড়ছে না সাহেব। অথচ ভানু তো একা হবে। তার মন যে মেঘের ভারে ভারী হয়ে আছে। সুভদ্রা বউকে দেখলই না। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে সে চলে এসেছে নোটিশগুলো নিয়ে। বাবুকে দেখাতে হবে। রামচন্দ্র আসবে ক–দিন বাদে। সুভদ্রার খোঁজ না করে তো আসতে পারে না। ভানুর মন খুব খারাপ। চোখের সামনে গত রাতটি ছমছম করছে। দে–পাল, মহাপাত্রপুর, চাঁদবালির আকাশ, সমুদ্র, ঝাউবন—হা হা করছে বুক। সে হাতজোড় করল, 'ও সায়েব, মুঝে আকেলা হোনা চাহিয়ে।'

সায়েব বুঝল না হয়তো, আবার হাসল, বলল, 'চলো সিপটী, বেঙাজ কাটেজ চলো, টুমি দেখিলে উহারা ঝগড়া চলিবে না, বেটিং চলিবে, হিলসাহ উঠিবে কি উঠিবে না।'

ভানু হাঁটতে লাগল, সাহেব ছুটে এসে তার কাঁধ ধরল, 'হেই সিপটী।'

ভানু বলল, 'আমি ভানু, সিপটী নই, জুয়োয় নেই আমি।'

‘হেই ভাননু, হোয়াট আ ডার্কনেস! কী আন্ধার! ভাননু সমুদ্দরে যাইবে?’

ভানু বলল, ‘সায়েব তুমি তো ভালোই নেশা করেছ।’

‘নো সিপটী, আই ওয়ান্ট মোর গানজা, বেঙা আজ নাইটট্রিপ নেহি করেগা, কাটেজ মে রহেগা।’

‘তো কী হল?’

‘হাম কেয়া করেগা?’ সায়েব অন্ধকারে দু–হাতে ভানুকে জাপটে ধরতে চায়, ‘হেই সিপটী, তুমহার কুহাককিনে?’

‘আমি ভানু, শ্রীপতি নই।’

‘ইয়াস ভাননু ভাননু বেটিং কোরো, বেঙা আজ ফিশিং যাবে কি না।’

‘যা তো সায়েব, আমি জুয়োয় নেই।’ ভানু সায়েবকে ধাক্কা দেয়। অন্ধকারে সায়েব হা হা করে ওঠে, ‘হেই ভাননু, কী আন্ধার! লুক, লুক অ্যাট দ্য সি। সমুদ্দর দেখেছিলাম ভাননু উসকা ভিতর কেয়া হায়?’

ভানু ধীর পায়ে সরে দাঁড়ায়। অন্ধকার সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে আছে। দূর দিগন্তে, আঁধারের উৎসে মাঝে মধ্যে বিদ্যুৎ ঝলসে উঠছে। এমনই কি দেখা যাচ্ছিল দে–পাল, মহাপাত্রপুর, কুসমাড়ের আকাশ? ভানু স্তব্ধ হয়ে ঘন গভীর গহন অন্ধকারে চেয়ে থাকে। নিশ্চল হয়ে যায়। ওই দূরে সায়েব তাকে খুঁজছে। সায়েব ডাকছে, ‘হেই ভাননু, হেই সিপটী কাঁহা হায় তুম দোনো?’

ভানু অন্ধকারে উবু হয়ে বসে পড়েছে সমুদ্রসৈকতে। এই সমুদ্র, ঝাউবন, চাষ জমি, গ্রাম, বাতাস সব উধাও। চাঁদবালির সমুদ্রতীর, দে–পাল, কুসমাড়ের সমুদ্রতীর কেমন ছিল তা শুনেছে সুভদ্রা বউয়ের কাছে। তারপর? ভানু ধীরে ধীরে বসেই পড়েছে ভিজে বালিতে। সায়েব তাকে অন্ধকারে খুঁজছে, ‘হেই সিপটী, হামার কুহাককিনে বহুত সেক্সি হায়, লেকিন উ বেঙার সহিত ঝগড়া চালায়, উসি টায়েম হামি ডর লেগে যায়, হেই সিপটী, কাঁহা তু, আয়াম ফ্রেদরিক কলিং য়্যু, বেঙা ফিশিং যাবে?’

ভানু আসনপিঁড়ি হয়ে অন্ধকার পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে আছে। অন্ধকারেরও রূপ কম নয়। যা দিয়ে ভগবান পৃথিবী গড়েছেন, তারই রূপ কত! গাছগাছালি বলো, আবার মরুভূমি বলো, আলো বলো, আঁধারই বলো, সবারই তো নিজস্ব রূপ আছে। মোহিনী রূপ! দুটি চোখ মেলে দিয়েছে ভানু। সমুদ্র গর্জন কানে আসছে। সমুদ্র আরও সরে যাচ্ছে। ভানু সৈকতভূমিতে হাত দিল। অন্ধকারে নিজের নামটি লিখল। সে লেখা দেখতেও পেল না নিজে। তবু ও তো নিজের লেখা। যেমন লেখে ভগবান। কখন সে লেখা মোছে, ভগবান নিজেও কি জানে?

ফ্রেদরিক অন্ধকার ধরে হাঁটছে, ‘হেই সিপটী, টুমি তো ফ্রেন্ড আছে, টুম কাঁহা চলা গিয়া, টুমহারা কুহাককিনে কাঁহা, আই ওয়ান্ট টু সি হার, য়্যু ক্যান সি মাই রাটিকা, বেঙা’জ ওয়াইফ, শি ওয়ান্টস মি, শি নিডেড মি, আই লাভ হার, হেই সিপটী, গানজা হায়? টুমহারা ভাননু কাঁহা, হেই ভাননু, তুম কাঁহা গিয়া, আন্ধার মে হারা গিয়া?’

ধীরে ধীরে ফ্রেদরিক সাহেব দূরে সরে যায়। অন্ধকারে ভানু আর শ্রীপতিকে খুঁজতে খুঁজতে সাহেব অদৃশ্য হয়ে গেলে পড়ে থাকে এক প্রাচীন স্তব্ধতা। পড়ে থাকে ভানু। যে স্তব্ধতাকে ভেঙে চূর্ণ করেছিল ফ্রেদরিক সাহেব, এক ইউরোপীয় পুরুষ, থেঁতলে দিয়েছিল জেলেবউয়ের কথা বলতে বলতে, সেই স্তব্ধতা আবার ফিরে এল ভানুর কাছে। স্নিগ্ধ হয়ে অন্ধকারে ছড়িয়ে পড়তে লাগল।

ভানু তার পা দুটি ছড়িয় দিল ভিজে সৈকতভূমির গায়ে। কাত হল অন্ধকারের উপর। এই যে কৃষ্ণপক্ষীয় রাত্রি, মেঘে ঘন অন্ধকার, এ যেন এক অবয়ব নিয়ে ঘিরে আছে ভানুর ভিতর ও বাহির। ভানু একে আঁকড়ে ধরে সমুদ্রসৈকতে শরীর এলিয়ে দেয়। চোখ দুটি মেলে ধরল দক্ষিণ–পুবে, গহিন সামুদ্রিক অন্ধকারে। ধীরে ধীরে তার চোখও নিশ্চল হয়ে যায়। মুদে যায় চোখের পাতা। সে টেরও পায় না। চক্ষু মুদলে যে অন্ধকার, চক্ষু মেলে ধরলেও তাই, কোনো তফাত নেই। তার কান দুটিও নিথর হয়ে যায় ক্রমশ। সব শব্দ মুছে যায় শ্রবণ ইন্দ্রিয় থেকে। সমুদ্রের ঢেউ ভাঙার শব্দ ম্রিয়মাণ হয়ে এসেছে অনেক। যেটুকু রয়েছে তা যেন সমুদ্রের ঢেউ ভাঙা—এসব তো জন্মলগ্ন থেকেই পৃথিবীর সঙ্গী। এইসব শব্দ যেন শব্দহীনতাকেই গভীর করে আরও।

ভানু শুয়ে পড়েছে ভিজে সৈকতভূমিতে। ভানুর গা–হাত–পা নিশ্চল হয়ে সমুদ্র সৈকতের সঙ্গে একাকার হয়ে যায়। বহু রাত্রে পূর্বদিগন্তে চাঁদ ওঠে। সমুদ্র থেকে যেন আগুনের নৌকো ভেসে ওঠে ধীরে ধীরে। এত যে মেঘের ব্যাপ্তি, পূর্বদিগন্তখানি মেঘহীন হয়েছিল। চাঁদের আলো আসে। সে আলো আচমকা যেন ভানুর চোখের উপর ছড়িয়ে গেল। গাঢ়, আগুন বর্ণের হলুদ আলো ডেকে তুলল ভানুকে।

কী আশ্চর্য সমুদ্রতট! ভানুর সর্বাঙ্গ ভিজে গেছে। বালিতে মাখামাখি। ভানু দেখছিল সমুদ্রতটে কী বিস্ময়। ভাটা শেষ হয়ে জোয়ার শুরু হয়েছে আবার। সমুদ্র এগিয়ে আসছে। যতক্ষণ সমুদ্র ছেড়ে গিয়েছিল এই বেলাভূমি, ততক্ষণে জল শুকোয়নি। ভিজে, জলের প্রলেপ মাখা সমুদ্রতটে হলুদ চাঁদের আলো গড়িয়ে যাচ্ছিল। ভানু উঠে দাঁড়ায়। ভিজে পুটুলিটা কাঁধে নিয়ে সে জলের দিকে এগোয়। জলের গর্জন বাড়ছে আবার। যে নীরবতার ভিতর সে ডুবে গিয়েছিল এতটা সময়, সেই নীরবতা ভাঙছে যেন দূরের ডাকে। ভানু জলের ভিতর চাঁদের আলো দেখছিল। চাঁদ ধীরে ধীরে হলুদ বরণ হারাচ্ছে। উঠে আসছে উপরে। এবারই মেঘে ঢাকবে। ভানু চাপা গলায় নিজেকে শোনায়, ‘কী সুন্দর!’

‘ভানু!’ ডাক শুনল সে। হোটেলের ঠাকুরের গলা। কে খবর দিল? সাহেব? শুধু ঠাকুর নয়, মাইতিবাবুও আছে যেন। ভানু ছুটে গেল টর্চের আলো লক্ষ্য করে, ‘বাবু, মাইতিবাবু গো!’

‘তাহলে তো সায়েব ঠিক বলেছে।’ ঠাকুর বলে ওঠে।

ভানু হা–হা করে ওঠে, ‘বাবু গো, মাইতিবাবু, এমন আর নাই, আমার চাঁদবালি আপনার বালিমুন্ডা শেষ, শুধু ছাই, ছাইয়ে সব ঢাকা পড়ে গেছে বাবু, এখেনের মতন শোয়ার উপায় নাই, আকাশ মাটি সব শেষ, সব কাঁটাতারে আটকা পড়ে গেছে মাইতিবাবু, সে খোঁজ কি রাখেন আপনি? কী সব্বোনাশ না হয়েছে বাবু!’

শ্রীপতি মাইতি বলল, ‘কী বলছে কিছুই ধরা যাচ্ছে না, ব্যাটা পাগল হয়ে গেল নাকি?’

শ্রীপতি মাইতির সন্দেহ সাহেব আর ভানু নেশা করেছিল। নেশা করে ভানু অন্ধকারে হারিয়ে যায়, সাহেব হোটেলে আবার নেশা করতে আসে। ভানু যে ফিরেছে বালিমুন্ডা থেকে তা তো জানতই না শ্রীপতি।

পরদিন সন্ধ্যায় ভানুকে জিজ্ঞেস করে শ্রীপতি, 'ঘোড়ার কী হল?'

ভানু বলল, 'ওদিকে যায় নাই।'

'কে বলল?'

'সবাই বলল, যাবে কোথায় সব তো দখল করে নিচ্ছে গরমেন, এই নিন বাবু কাগজ, সরকারি লুটিশ, ভীমাপুরও গেল।'

আশ্চর্য! কাগজটা ভালো করে পড়েও দ্যাখে না শ্রীপতি, বুক পকেটে আরও অনেক কাগজের সঙ্গে রেখে দেয়। ভানু বলল, 'সত্যি বাবু, এই জায়গা শেষ হয়ে গেল, রাতভর আকাশে আগুন ছোটে, আকাশ থেকে শুধু ছাই ঝরে, এমন যে বর্ষাকাল, শাওন মাস, মেঘ জমতেই পারে না দে–পালের আকাশে।

'কে বলল?'

'আমি দেখেছি।'

'কবে দেখলি?'

ভানু বলল, 'পরশু রাতে বাবু, বেশ জোছনা ছিল।'

'কী দেখলি?'

'সব পুড়া পুড়া, আকাশ মাটি পুড়ে গেছে, অত যে ঝাউবন ছিল সমুদ্রের ধারে, কিছুই নাই, অত সুন্দর বিচ ছিল বাবু, তা নাই।'

'কে বলল এসব?'

'কেন, ছিল না ঝাউবন?'

'ছিল।'

'ছিল না বিচ?'

'ছিল।'

'ছিল না গাঁ–ঘর, চাষ জমিন?'

'ছিল, কিন্তু তুই কি দেখেছিলি?'

'না, আমি আর গেলাম কবে?'

'চাঁদবালি গিছিলি?'

'একবার অনেকদিন আগে, তো চাঁদবালিরও ওই দশা বাবু।'

'কী দশা?'

'মাটিতে হাঁটা যায় না, আগুন শুধু, শাওন মাসেও কী গরম!'

শ্রীপতি বলল, 'যাকগে গরমেন্ট যদি চায় তো জমি নেবে।'

'এরকম ভাবে নেবে?'

শ্রীপতি হা–হা করে হাসে, 'তুই এমন ভাবে কথা বলছিস যেন তোর জমি গেছে, তোকে কী কাজে পাঠানো হয়েছিল?'

ভানু বলে, 'ঘোড়া খুঁজতে, কিন্তু বাবু, ওই যে বললেন আমার জমিন গেছে কি না, গেছে বাবু, সমুদ্রের তীরটা কার বাবু?'

হকচকিয়ে যায় শ্রীপতি, 'কার বল দেখি?'

'সমুদ্রই বা কার?'

'কার তো জানি না।'

'তার উপরের নীল গগন?'

বুকটা ধক করে ওঠে শ্রীপতি মাইতির। কীসব বলছে ভানু? এমন কথা কি আগে বলত? বালিমুন্ডা ঘুরে এসে বদলে গেল। শুয়ে থাকল সি–বিচে, অন্ধকারে, ভিজে বালিতে একা একা। ভয় করল না একটুও? জোয়ারে যদি টেনে নিয়ে যেত?

শ্রীপতি বলল, 'এসব ভগবানের।'

ভানু বলে, 'পৃথিবীটাই তো ভগবানের বাবু।'

'তা তো ঠিক।'

'তবে ভগবানের পৃথিবীটা এমনভাবে নষ্ট করছে কেন?'

শ্রীপতি বলল, 'গরমেন্ট তোর আমার চেয়ে ভালো বোঝে।'

ভানু বলল, 'না বোঝে না বাবু।'

'বোঝে না?'

'না, গরমেনের কোনো দয়ামায়া নেই।'

শ্রীপতি বলে, 'গরমেন্টই ভগবান, সবের মালিক তো তারা।'

ভানু বলে, 'ওসব কথার কথা, আসলে যা ভগবানের তা আমার, আপনি যে বললেন আমার জমিন গেছে কি না, গেছে, সি–বিচ, ঝাউবন, নীল গগন, গাছগাছালি, ঠান্ডা বাতাস, সব আমার নিজের ছিল বাবু।'

শ্রীপতি হা–হা করে হেসে ওঠে, 'ভালো দেখেছিস দেখছি।'

ভানু বলল, 'বাবু, নোটিশটা নিয়ে ভুবনেশ্বর হাইকোর্টে গিয়ে কেস ঠুকে দেন, আপনার জমি যাতে না যায় তার জন্য আদেশ বের করেন।'

শ্রীপতি বলে, 'কী হবে?'

'কী হবে মানে, জমি বাঁচবে।'

'বাঁচবে না, ওখেনে আর বেশিদিন রাখা যাবে না জমি, চাষারা এরপর নিয়ে নেবে, অনেকদিন তো হল।'

'কতদিন হল বাবু?'

'ঠাকুরদার বাপের আমল থেকে, তেনার নাম ত্র্যম্বক মাইতি, এসব জমিন ত্র্যম্বক মাইতির করা ছিল, তারপর তাঁর ছেলে, নাতি মানে আমার বাবা সুরপতি মাইতি, ভানু তুই কলকেটা সাজাবি।'

ভানু কলকে সাজাতে সাজাতে কথা বলছিল। শ্রাবণ মাস, হোটেলের একটি ঘর বাদে সব খালি। একজোড়া টুরিস্ট বিকেলেই দিয়েছে মাইতিবাবুকে। নতুন বিয়ে বোধ হয়। বাস থেকে নেমে হকচকিয়ে গিয়েছিল। কত কম বয়স। মেয়েটা বড়ো জোর কুড়ি, ছেলেটা পঁচিশ। ভানুর মনে পড়ে গেল সুভদ্রাকে। রামচন্দ্র আর সুভদ্রার কথা বলবে নাকি বাবুকে? বাবু না বললে সুভদ্রাকে বিয়ে করতে পারবে না রামচন্দ্র। অথচ তারা এক ঘরে বাস করে। সাজানো কলকেটা বাবুর হাতে দেয় ভানু। শ্রীপতি তার নিজস্ব মুদ্রায় কলকেটি মুখের কাছে নেয়। ভানু দেশলাই ঠোকে কলকের মাথায়। শ্রীপতি দমভরে টান দেয়। ধোঁয়া উগরে দিল শ্রীপতি। ঘর ম–ম করতে লাগল আশ্চর্য এক সুরভিতে।

ভানু বলল, ‘চাষারা যদি নেয় ও জমি তো খরচ করবে না।’

‘তার মানে!’ ভানুর দিকে কলকে এগিয়ে দিতে দিতে জিজ্ঞেস করে শ্রীপতি, ‘জমি কি খরচ হয়?’

‘হয়।’

‘হয় মানে, জমি কি টাকাপয়সা?’

ভানু ধোঁয়া ছেড়ে বলল, ‘গরমেন জমি খরচ করে।’

‘কী করে করে?’

‘যেভাবে করেছে দে–পাল, কুসমাড়, মহাপাত্রপুর, চাঁদবালিতে।’

‘জমি তো আকাশে উঠে যায়নি।’

‘তা যায়নি, কিন্তু মাটিতেও আর নেই জমিন, বাবু কোথায় ঝাউবন, নারকেল বন, ঘর গেরস্থালি, তরমুজ খেত, পানবরজ, কাজু বাদামের বাগান? সব শেষ, অমন যে সি–বিচ ছিল, মোটা দানার বালি, কী শক্ত, আমি শুয়ে থেকেছি অন্ধকারে, চাঁদ আমারে ডেকে তুলেছে মাঝরাত্তিরে, নাই, কিছুই নাই।’

শ্রীপতি বলল, ‘থাকবে না তো, মিলিটারির দরকার।’

‘বাবু, অমন মিলিটারি আমার দরকার নেই।’

‘তুই কে রে?’ শ্রীপতি আচমকা রেগে ওঠে, ‘নেশা ভেঙে দিচ্ছিস।’

ভানু বলল, ‘তা’লে আমি যাই, তুমি একা নেশা করো।’

‘না, যাবি কেন?’ শ্রীপতি টেনে বসায় ভানুকে, ‘রামচন্দ্র কবে আসবে?’

‘আসবে, তার আগে আমারে বলো তুমি হাইকোর্টে যাবে কি না।’

‘গেলে কী হবে?’

‘জমি বাঁচবে।’

‘বাঁচবে না, ক–দিনের জন্য বাঁচবে, তারপর দিল্লির সুপ্রিম কোর্ট থেকে রায় নিয়ে আসবে গরমেন্ট।’

‘তাহলে কী হবে?’

‘জমি গেলে বহুত টাকা আসবে।’

‘কিন্তু চাষারা?’

‘চাষারা আমার কে?’

‘তারা যে জমি চষেছে এতকাল।’

শ্রীপতি বলে, ‘ওসব ফালতু কথা ভাবতে তোকে আমি বালিমুন্ডা পাঠালাম? তুই বহুত শয়তান আছিস।’

‘আছি।’

‘চাষাদের সঙ্গে সাট করে এসেছিস।’

ভানু বলল, ‘এসেছি।’

‘কী করবি?’

‘জমি নিতে দেব না গরমেনকে।’

হা–হা করে হাসে শ্রীপতি, ‘পুলিশের প্যাঁদানি খেলে এসব কথা বলা বের করে দেবে, তোকে তো যাবজ্জীবন দেবে।’

‘কোথায়?’

শ্রীপতি বলল, ‘ফাঁসি হবে তোর।’

ভানু বলল, ‘হোক, কিন্তু আমার নীল গগন, আমারই বাতাস তো বাবু নষ্ট হয়ে যাবে, আমি বসে দেখব?’

ভানু, ‘পাগলামি থামা।’

‘না বাবু, আমি অন্ধকারে একা একা কত সমুদ্দুরের ধারে শুয়ে থেকেছি, চাঁদবালি, দে–পাল, কুসমাড়, মহাপাত্রপুর, মেরিনা বিচ, কোভালোম বিচ, ওয়ালটেয়ারের সমুদ্দুর, মীরগোদার সমুদ্দুর, আপনি যদি বলেন, জাভা, বালিদ্বীপ, ওইসব দেশের সমুদ্দুরের ধারে শুয়ে থেকেছি অন্ধকারে, চাঁদ যখন আলো ফেলেছে মুখে, জেগে উঠেছি আমি ছন্দক, আবার পূর্ণিমার সমস্ত রাতে গড়াগড়ি খেয়েছি বালির উপর, শুনছ বাবু?’

বাবু শ্রীপতি মাইতি বলে, ‘পাগল!’

‘পাগল কেন, ওসব নাম তো তুমিই বলেছ।’

‘বলেছি, কিন্তু জাভা, বালিদ্বীপ গেলি কবে তুই?’

ভানু হাসতে হাসতে বলে, ‘আগের জন্মে।’

‘আর মীরগোদা, সে তো তোর আগের জন্মেই শুকিয়ে গেছে।’

ভানু বলে, ‘তারও আগের জন্মে বাবু, তখন আকাশে সোনালি মেঘ থাকত।’

‘কতবার জন্মেছিস তুই?’

‘অনেকবার, যতদিন পৃথিবী রয়েছে বাবু, ততদিন মরেছি আর জন্মেছি, যতবার মরেছি, ততবার জন্ম নিয়েছি, এক জন্মে ছিলাম তো ছন্দক, মনে নেই?’

‘আগের জন্মের কথা মনে পড়ে?’

‘পড়ে বাবু, সোনালি মেঘের নীচে কন্থক, আমি আর রাজপুত্র হাঁটতাম।’

‘আর কী মনে পড়ে?’

ভানু বলছে, ‘মীরগোদার সমুদ্রতীরে, জাহাজঘাটায় এক জাদুকরির সঙ্গে দেখা, লাল টকটকে পোশাক তার, রংখানি ঘোর কালো, অমাবস্যার রাতের মতো, মনে হয় সে আরব দেশের হবে।’

শ্রীপতি হেসে ফেলে, ‘আরব দেশের, কী করে বুঝলি?’

ভানু বলল, ‘ওই দেশেই তো জাদুকরির বাস।’

‘আমার ঘোড়াটা কি ও নিল?’

‘কী করে বলি বাবু, গৌরমোহনই হয়তো আপনার পক্ষীরাজ।’

হে–হে করে হাসতে হাসতে থাকে শ্রীপতি, ভানুর পিঠ চাপড়ে দেয়, ‘তুই পাগল হয়ে ফিরেছিস বালিমুন্ডা থেকে।’

ভানু বলে, ‘আপনি জমিন বাঁচান বাবু।’

‘না বাঁচাব না।’

‘অত চাষা মরে যাবে?’

যাক, এরপরে জমি তো ওদের ভোগে যাবে।

ভানু বলল, ‘তাহলে আর কী হবে, ক–টা টাকার জন্যে এসব করবেন?’

শ্রীপতি বলে, ‘তুই থাম দেখি, জাদুকরির কথা বল।’

ভানু বলল, ‘কাল আমি মীরগোদা যাব।’

‘কেন?’

‘ঘোড়াটার খোঁজ নিতে হবে না?’

শ্রীপতি বলে, ‘গৌরমোহন এসেছিল কাল সকালে।’

‘কেন বাবু?’

‘ও–ও চায় ঘোড়াটা খুঁজতে।’

‘তার মানে?’

‘তুই যেমন খুঁজিস পক্ষীরাজ অশ্বটিরে, ও–ও তেমন খুঁজে আনতে চায়, মদরঞ্জির বাজার নাই, দুঃখ করছিল।’

ভানু বলল, ‘ও খুঁজবে কোথায়, অশ্ব তো কোকিলা বধূর কুহকে ভুলেছে বাবু, আমি যেটা বলি তাই করো, আপনি কেস করো বাবু, ভীমাপুরটা বাঁচাও, তখন সোনালি মেঘ যদি ফোটে, কন্থক সেই মেঘ দেখে ফিরে আসবে বাবু।’

নেশা যত বাড়ে, কথাবার্তার শৃঙ্খলা তত ভাঙে। সব এলোমেলো হয়ে যেতে থাকে। ভানুর মাথার ভিতরের ঘুমন্ত কোষগুলি তখন যেন জেগে উঠতে থাকে গহিন সাগর উপকূলে। শ্রীপতি মাইতি ক্রমশ এলিয়ে পড়ে। সেই সময় দরজায় এসে দাঁড়ায় অনন্ত সার।

ভানু তাকে দেখতে পেল, ‘কী চাই?’

‘বাবু কি ঘুমালেন?’

‘হ্যাঁ, কেন?’

অনন্ত বলে, ‘অশ্ব তো মিলেনি, খুঁজি পাইছ ভানুবাবু?’

ভানু মাথা নাড়ায়। নাড়াতেই থাকে। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ায়, ঘর থেকে বেরিয়ে আসে ঘরের আলোটা নিভিয়ে। বাইরে বারান্দা অন্ধকার। তার বাইরে পৃথিবী অন্ধকারময়ী। ভানু দেওয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়ায়, ‘তুই অশ্ব খুঁজতে গিছিলি?’

‘না।’ মাথা নাড়ে অনন্ত, ‘বাবুকে কও–না, শাওন মাস, নুন তো নাই, মোর চাষও নাই।’

‘খুঁজতে যাবি অশ্বটিরে?’

‘হ্যাঁ, রাহা খরচ, খরচপাতি দিলে আমি একবার খুঁজি দেখি।’

‘কোন দিকে যাবি?’

অনন্ত বলে, ‘যিদিকে বলবে সিদিকে যাব।’

‘তুই বল না কোন দিকে যাবি।’

অনন্ত ঘাবড়ে যায়, ‘কোন দিকে পাওয়া যাবে কও দেখি?’

‘তুই বল।’

ভানু আর অনন্তর কথার মধ্যে অন্ধকারে হাজির হয় ঠাকুর। দপ করে বারান্দায় আলো জ্বালিয়ে দিয়ে ঠাকুর বলে, ‘পরামর্শ হচ্ছিল?’

‘হাঁ।’ ভানু বলে।

‘কী পরামর্শ রে অনন্ত?’

‘আজ্ঞা!’ অনন্ত ভয় পায়, ‘কামের খুঁজে আসছি, অশ্বটি যদি খুঁজতি যাই।’

‘অশ্ব খুঁজতি।’ খ্যা খ্যা করে হাসে ঠাকুর, ‘এবার আমিও যাব অশ্ব খুঁজতি, হুটেল বন্ধ হয়ে যাবে, যা ভাগ তো।’

‘আজ্ঞা, ইখন বড়ো অভাব।

‘মেয়্যা তো ডাগর হল?’ ঠাকুর জিজ্ঞেস করে।

‘হাঁ,’ অনন্ত ভয় পায়।

‘মেয়্যাটার কামে লাগা, ডাগর মেয়্যার কামের অভাব?’

অনন্ত বলে, ‘কচি ছানা।’

‘কচি ক–দিন থাকবে?’ ঠাকুর ধমকে ওঠে।

ভানুর সহ্য হচ্ছিল না বারান্দার আলো। সে ধীরে ধীরে নেমে আসে বারান্দা থেকে নীচে। ঠাকুর আর অনন্ত কথা বলছে। বলুক। ভানু আস্তে আস্তে বাবুর ঘরের জানালার দিকে যায়। ওখানে বালিয়াড়ির গায়ে ঘোড়াটা দাঁড়িয়ে থাকত। এখনও যেন বাতসে ঘোড়াটার গন্ধ পাওয়া যায়। কতদিন দেখেছে ভানু দাঁড়িয়ে আছে পক্ষীরাজ। গায়ে চাঁদের আলো। একেবারে জানালার গায়ে গিয়ে দাঁড়াত। কার্নিশের নীচে। এই তো সেই জানালা। ভানু চুপ করে জানালার দিকে চেয়ে থাকল। ধীরে ধীরে জানালার গ্রিলের ওপারে শ্রীপতি মাইতির মুখ ভেসে ওঠে। ভানু মাথা নাড়ল, গা ঝাড়া দিল, আকাশের অন্ধকারে ঝড় তুলল। নাকে বাতাস টানতে লাগল। ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলল। আবার গা ঝাড়া দিল। দেখল জানালার ওপারে চঞ্চল হয়ে উঠেছে শ্রীপতি। চঞ্চল হল ভানুও।

নেশায় এলিয়ে গিয়েছিল শ্রীপতি মাইতি। চোখ বুজে গিয়েছিল তার। সমস্ত শরীর নিথর হয়ে গিয়েছিল। আচমকা সব একসঙ্গে জেগে উঠল। ঘুম ভেঙে গেল। জেগে উঠে শ্রীপতি দেখল ঘোর অন্ধকার। তার ঘুমের ব্যবস্থা পাকা করে গেছে ভানু! যেন জানে তার শরীর কখন কী চায়? শ্রীপতি অন্ধকারে বসে হাসে, এই শরীরটা তার নিজের, না ভানু দাসের? হাসতে হাসতেই চমকে ওঠে সে জানালার দিকে তাকিয়ে। ওই যে তার ঘোড়া। ওই যে দাঁড়িয়ে আছে যেখানে দাঁড়িয়ে থাকত। কী আশ্চর্য! কখন এল? নিজে নিজে ফিরে এল? নাকি ভানু দাসই খুঁজে আনল বালিমুন্ডা থেকে? নাকি কুহকিনী কোকিলা মুক্ত করে দিয়েছে ওকে? আহা রে, কুহকিনী তোকে নিংড়ে নিয়েছে! কুহকিনীর মায়ায় যে পুরুষ ভোলে, সে পুরুষ কি আর পুরুষ থাকে? তার সব নিংড়ে ছিবড়ে করে ফেলে দেয় না! তবে হ্যাঁ, কোকিলা বড়ো সুন্দরী। কালোর ভেতরে অমন সুন্দর মেয়েমানুষ খুব বেশি দ্যাখেনি শ্রীপতি। কেমন বুনো বুনো ভাব! কাছে গেলেই মনে হয় জঙ্গলে বৃষ্টি হয়ে গেছে। গন্ধ উঠছে মাটি থেকে। সেই গন্ধ ছড়িয়ে যাচ্ছে বনময়। ঠিক তাই! ভারতী, মধুমিতারা কেউ না কোকিলার কাছে। পারলে কোকিলাকে আলাদা ঘর বানিয়ে দেয় শ্রীপতি। পর্ণকুটির বানিয়ে দেয়। সেখানে থাকুক কুহকিনী। তার কুহকে ভুলে শ্রীপতি ছুটে যাক। পারলে বালিমুন্ডার চাষবাড়িতে রেখে দেয় শ্রীপতি কিন্তু সেই চাষবাড়ির আয়ুও যে ঘনিয়ে এসেছে। সরকার নিয়ে নিলে কোকিলা যাবে কোথায়? তাহলে বনে ছেড়ে দেবে। বনের পাখিকে খাঁচায় পুরেছে গৌরমোহন মদরঞ্জিওয়ালা। কোকিলাকে বনে ছেড়ে দিলেই আবার ফিরে আসবে কপালকুণ্ডলা। শ্রীপতির দু–চোখ মায়ায় ভরে যায়। আহা রে, তোরে কিনা গৌরমোহন তার ঘরে তুলল, আর সেই রাগে তুই আমার পক্ষীরাজকে কুহকে বন্দি করলি। আর সেই পক্ষীরাজ খুঁজতে খুঁজতে ভানু কিনা দেখে আসে চাঁদবালি পুড়ছে।

যাক! নিশ্চিন্ত হয়েছে শ্রীপতি। ছাড়া পেয়েছে পক্ষীরাজ। আহা, কত রোগা হয়ে গেছে। কুহকিনী তাকে যেন গিলে খেয়েছিল। অমন রূপবান ঘোড়া, তাকে নেবে ছাড়া কাকে নেবে? শ্রীপতি চাপা গলায় ডাকে, ‘ফিরে এলি?’

‘এলাম।’ ঘোড়া জবাব দেয়।

‘কুহকিনীর পাল্লায় পড়েছিলি?’

ঘাড় কাত করে পক্ষীরাজ, ‘হ্যাঁ।’

‘ও আরব দেশের মেয়েমানুষ, সাবধান, আবার টানবে।’

পক্ষীরাজ গা ঝাড়া দেয়, বলে, ‘আমি কী করব?’

‘কেন?’

‘সবদিক খোলা, যেদিক দিয়ে পারে টানে।’

শ্রীপতি বলল, ‘কোথায় গিছিলি?’

‘চোদ্দোবেড়িয়া।’

‘সে কোথায়?’

‘যেখেনে সুবর্ণরেখা নদী মিশেছে সমুদ্রের সঙ্গে, চাঁদবালির কাছে, আশ্বিন মাসে সে জায়গা কী সুন্দর!’

‘আশ্বিন কই, এত শ্রাবণ।’

‘আমি বলছি আশ্বিনের কথা, মনে আছে?’

শ্রীপতি বলল, ‘আছে।’

‘খুব বর্ষার পর সেই বর্ষা যখন থামল, আকাশ পরিষ্কার, যত মেঘ উঠেছিল সমুদ্দুর থেকে, সব বৃষ্টি হয়ে ভাসিয়ে দিয়েছে পৃথিবী, মনে পড়ে?’

‘পড়ে মনে।’ নিঝুম হয় শ্রীপতি। কোন নাম বলল যেন, চোদ্দোবেড়িয়া? ভানু তো চোদ্দোবেড়িয়া থেকে উদ্ধার করে এনেছে পক্ষীরাজকে ক–বার। আশ্বিন মাস, বর্ষা শেষে পৃথিবী সেজে উঠেছে। ধুলোময়লা সব বৃষ্টির জলে ধুয়ে সাফ। বাতাস ঠান্ডা, নরম। ক–মাস বৃষ্টির জন্য মাটির ভিতর থেকে কী যেন বেরোয় তখন? কী বেরোয়? না, হাজার হাজার সাদা ঘোড়া, পক্ষীরাজ। কাশ ফুলে চোদ্দোবেড়িয়ার চরটা ছেয়ে যায়। আর সবুজ ঘাস! এত ঘাসের, এত সবুজের সমারোহ কেউ দ্যাখেনি।

শ্রীপতি বলল, ‘রোগা হয়ে গেছিস।’

পক্ষীরাজ হাসল যেন, অন্ধকার মুখে হাসিটা যেন আরও অন্ধকার।

শ্রীপতি বলল, ‘তোর খোঁজে ভানু কত দিক না যাচ্ছে।’

পক্ষীরাজ ঘাড় কাত করে, ‘জানি।’

‘আছে এক মদরঞ্জিওয়ালা, নাম তার গৌরমোহন, তার মদরঞ্জিতে যত খাটুনি তত আয় নেই, সেও গেল তোরে খুঁজতে।’

পক্ষীরাজ ঘাড় কাত করে, ‘জানি।’

‘ঘরে আছে কোকিলা বধূ একা।’

‘তাও জানি।’

‘একা বলে তোকে ছেড়ে দিল কুহকিনী?’

‘কী জানি!’

‘ছিলি কোথায়?’

‘কী জানি?’

‘ঘুমিয়ে ছিলি নাকি?’

‘হয়তো তাই, মনে হয় যেন তাই।’

‘কবে, সেই বৈশাখ মাসে গেলি, তারপর ঘুমিয়ে কাটালি?’

‘বোধ হয় তাই, কিছুই মনে নেই।’

‘সত্যি!’ শ্রীপতি মাইতি ফিসফিস করল।

‘সত্যি।’

‘কিছু মনে নেই?’

‘না।’

‘কোথায় ছিলি জানিসনে?’

‘না।’

শ্রীপতি বলল, ‘কুহকে অমন হয়।’

পক্ষীরাজ হাসে, ‘কী হয়?’

‘যেমন তোর হয়েছে।’

‘কী হয়েছে মাইতিবাবু?’

কী হয়েছে। শ্রীপতি মনে করতে চায় কী হয়েছে। মনে পড়ে তো অন্য কথা। সেই যে ভানু বলেছিল, সেই যে চোদ্দোবেড়িয়া গেল পক্ষীরাজ। ‘হেই, তোর কি মনে পড়ে চোদ্দোবেড়িয়ার কথা, সেই যেখানে সুবর্ণরেখা নদী....।’ পক্ষীরাজ হাসে। স্পষ্ট হাসির শব্দ শুনল শ্রীপতি মাইতি, ‘আমি ছাড়া কে চেনে চোদ্দোবেড়িয়া?’

শ্রীপতি বলল, ‘তোর মনে পড়ে?’

পক্ষীরাজ আবার হাসে, জিজ্ঞেস করে, 'তুমি জানো শ্রীপতিবাবু?'

শ্রীপতি মগ্ন হয়। জানে সে। মনে পড়ে। মনের ভিতর ছেয়ে যায় চোদ্দোবেড়িয়ার আকাশ। আকাশে বকের পালকের মতো মেঘ উড়ছে। চরের কাশফুল যেন হাজারটা ডানা মেলা বক। পাখা মেলে উড়ন্ত ভঙ্গি তাদের। আর পায়ের নীচে যে ঘাস...।

ঘাসের ভিতর গুটি গুটি লাল ভেলভেট রঙের লালবিবি পোকা ঘুরে বেড়ায়। সবুজে, সিঁদুরে ফোটায়, নীল ডোরায় ডোরায় চিত্রবিচিত্র গঙ্গাফড়িং লাফ দিয়ে ঘাসের উপরে খেলা করে। গুটি গুটি এগোয় সবুজ কাচপোকারা। তাদের সবাইয়ের কী ফুর্তি! লালবিবির, গঙ্গা ফড়িঙের, কাচপোকার, সবার সঙ্গে সবার খেলা।

একবার ঘুরতে ঘুরতে ঘোড়াটা গিয়ে পড়েছিল তার ভিতরে। শ্রীপতি গেছে বালিমুন্ডায় চাষবাড়িতে, ভানু ঘোড়ার পিঠে চেপে চলল চন্দনেশ্বর। ভানুর মাথায় নীল পাগড়ি, গায়ে সাদা জামা, নতুন ধুতি। ও যাচ্ছে চন্দনেশ্বর নয়, যেন জগৎ–সফরে বেরিয়েছে।

'ভানু গেল চন্দনেশ্বরে। শিবের পুজো দিল। মানতও ছিল ওর। তারপর চুল ফেলে ন্যাড়া হয়ে হত্যে দিল ভগবানের কাছে। আমি, পক্ষীরাজ, তখন দাঁড়িয়েছি হাটের কাছে একটা চালার ধারে। হাটের গন্ধ ভালো লাগছিল না।

'এই সময় ন্যাড়া মাথায় ভানু ফিরল। মাথায় পাগড়ি। উঠে বসল আমার পিঠে। কোথায় যাবে, কোথায়? বাংলায় না ওড়িশায়? আমার ভিতরে তখন অন্য এক আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠেছে।'

ঘোড়ার মুখে ফুটে উঠেছিল দুর্দমভাব। পৌরুষের চিহ্ন। ও গা ঝাড়া দিল। লেজ ঝাপটে নিল। ঘাড়টা ঘুরিয়ে নিল। হাঁ করে নিশ্বাস টানতে লাগল। কোথায় যেন যাবে? বৃষ্টির মেঘ উধাও হয়ে আকাশে কারা যেন ভেসেছে। সাদা পক্ষীরাজ। বাতাসে কেমন ঠান্ডা ঠান্ডা ভাব।

'ভানু ফিরতে চায় তখন। কোথায় ফিরবে? দীঘায়! আমি পক্ষীরাজ। আমি কন্থক। আমার দেহটা তখন ফুলছে। নাহ্, ওদিকে নয়। দৌড়োই পশ্চিমে। পশ্চিমে আর পশ্চিমে। নাকে টেনে নিচ্ছি পৃথিবীর ঘ্রাণ। চোখে যেন কী ভেসে উঠছে। মন কোনদিকে যেন লাফ দিয়ে ছুটছে। সমুদ্র থাকল বাঁয়ে দক্ষিণে। আমি যাই পশ্চিমে। কেয়াঝোপ, ঝাউবন, পিচরাস্তা, মেঠো রাস্তা, বালির স্তূপ, বালিয়াড়ি আর বালির দেশ পার হয়ে ঘণ্টা দেড়েকের ভিতর পৌঁছে গেছি স্বর্গে। স্বর্গ চোদ্দোবেড়িয়া।'

ভানু! না পিঠে নেই, উলটে পড়ে গেছে। কী বেগেই না ছুটেছিল পক্ষীরাজ! হাওয়ার মতো আছড়ে পড়েছে চোদ্দোবেড়িয়ায়।

'তারপর?' শ্রীপতি জিজ্ঞেস করল।

'সব তো জানো তুমি মাইতিবাবু।'

'কী হল তখন?' শ্রীপতি জিজ্ঞেস করে।

'আমি তো তখন চোদ্দোবেড়িয়ায় ঢুকে পড়েছি মাইতিবাবু। আহা, কী সে জায়গা, তুমি ভুলে গেলে সব!'

মাথা নাড়ে শ্রীপতি, 'না, তবে আবার বলো।'

পক্ষীরাজ ফিসফিস করে, 'কী আশ্চর্য! এখনও মনে পড়লে গা কাঁপে।'

'বলে যা।' চাপা গলায় বলে শ্রীপতি।

'হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে এ আমি কোথায় এলাম? একটা নয়, দুটো নয়, কত কত ঘোড়া। কত রকমের চেহারা। মাদি, মদ্দা, ওরা সব এল কোত্থেকে! আর এত সাদা কাশফুল! ওই তো দূরে সমুদ্র। নীল, কী নীল! গর্জন শোনা যায়। আর এই নদী! এর নাম সুবর্ণরেখা! কত কত বড়ো! ফুলেফেঁপে একাকার। টলমল করছে জল। নদী সমুদ্র মিশে নদীও নেই সমুদ্রও নেই, মহাসিন্ধু হয়ে গেছে। সবুজের মেলা এই চরে। ঘাস খেতে এসেছে আরও কত ঘোড়া। কে যেন এগিয়ে আসছে আমার দিকে। একটা ঘুড়ি, তাই না!'

‘ঘর কোথায়?’ পক্ষীরাজ জিজ্ঞেস করে।

‘হিনাড়ি, গিরিমশায়ের বাড়ি।’

‘কোত্থেকে আসা হল?’ পক্ষীরাজ জিজ্ঞেস করে।

‘ভোগরাই।’ আর একটা ঘোড়া জবাব দেয়।

‘আর তুমি?’

‘এলাম রানীশাহি থেকে।’

হাসতে হাসতে সব লুটোপুটি খাচ্ছে। ডিগবাজি, আনন্দ ফুর্তি! ঘাস মুখে নিয়ে দৌড়োচ্ছে। কাশের জঙ্গলে গিয়ে লাফ দিয়ে কাশফুল হয়ে যাচ্ছে। হামলে পড়ছে কেয়ার ঝোপে, সবুজ ঘাসে। এ ওর মুখে মুখে কথা বলছে, কানে কানে ফিসফাস। গান! আহা, বাতাসে লাফ দিয়ে উঠছে হিনাড়ির সেই রূপসি ঘুড়িটা। একেবারে সাদা। গায়ে কোথাও কোনো অন্যরকম ছিটে নেই। শুধু কপালে একটা, দুটো, তিনটে, বাদামি ফোটা।

হ্যাঁ, হিনাড়ির সেই ঘুড়িটাও পালিয়ে এসেছে। সব্বাই পালিয়ে এসেছে। তারা বছর বছর আসে এই চরে। এখানে পালিয়ে এসে ক–দিন খুব ফুর্তি করে। ফুর্তি করতে করতে দিন পার করে। আর এই আশ্বিনের দিন যে খুব ছোটো। কত তাড়াতাড়ি তার আয়ু ফুরিয়ে বেলা নেমে যায়। তখন ঘোড়ারা চরের ঘাসের উপর দাঁড়িয়ে সমুদ্রের দিকে চেয়ে থাকে। পালতোলা মাছের নৌকো, লঞ্চের আলো, শব্দ, সমুদ্রের ওই দূর কিনারায়। জাহাজের সার্চলাইটে সকলে চমকে চমকে ওঠে। আকাশের তুলতুলে মেঘে অবাক হয়ে যায়। তাতে আবার জ্যোতস্না। চাঁদের আলোয় সেই রূপসি কেমন মায়াবতী হয়ে ওঠে।

শ্রীপতি বলল, ‘তারা সব কুহকিনী।’

‘ওরা কী সুন্দর!’ গুনগুন করে পক্ষীরাজ।

‘রূপবতী?’

‘হ্যাঁ।’

‘ওই রূপই সব্বোনাশী।’

‘আহা, মনে পড়ে যে, খুউব মনে পড়ে। শুধু কি ওই রূপসি ঘুড়ি, আকাশে যে মেঘ ছিল!’

‘বলো, বলে যাও।’ শ্রীপতি ফিসফিস করে।

‘সেই যে মেঘেরা! সোনালি মেঘ, সাদা মেঘেরা আসলে আমাদের দোসর, নীল পক্ষীরাজের সাদা ডানা। ঝুপ করে নেমে পড়বে এখানে। আর নামতেই রাত ফুরিয়ে যাবে। তখন শুধু খেলা, আনন্দের ভিতরে চৌপাট হয়ে যাওয়া। এইরকম ভাবতে ভাবতে ঘোড়াদের চোখ জুড়িয়ে আসে। রাত বয়ে যায়।’

‘তারপর কী হল?’ শ্রীপতি জিজ্ঞেস করে।

‘সব তো তুমি জানো।’ পক্ষীরাজ বলে।

‘ভানু, ভানুকে জিজ্ঞেস করলে সব জানা যাবে, ভানু জানে।’ শ্রীপতি বলে।

‘ন্যাড়া মাথা ভানু যে কী করে খবর পেল আমি আছি চোদ্দোবেড়িয়া, কে যে ওকে খবর দিয়েছিল ঘোড়ারা পালিয়ে যায় ওখানে।’

‘কী অদ্ভুত!’ শ্রীপতি বলে।

‘হ্যাঁ, পালিয়ে যাওয়ার জায়গা, যারা পালায় তারা ওখানে যায়, ওখান থেকে কেউ পালায় না।’

‘কী হল বলো।’ শ্রীপতি ডাকে।

‘ভানু গিয়ে হাজির হল সেই চরে, আমাকে ঠিক চিনে ফেলল।’

'হিনাড়ির ঘুড়িটা জিজ্ঞেস করল, ''কে?'' '

'মালিকের লোক।'

'নিতে এসেছে?'

'সেই রূপসি দূর থেকে দেখতে থাকে ভানুকে। তারপর বিড়বিড় করে বলে, ''প্রথম প্রথম এইরকম হয়, আমাদেরও হয়েছিল, বড়ো দড়ির ফাঁস দিয়ে আটকে ফেলেছিল আমাকে। এখন আর পারে না, বুঝেও গেছে একেবারে পালাচ্ছি না, ফিরে তো যাব।'' '

ভানু কত ডাকল! ঘোড়াটা সাড়া দিল না। ভানু তখন ধরতে গেল। পারল না, আমি তখন পালিয়ে গেছি লাফ দিয়ে। এই মস্ত চরভূমিতে ভানু আমার সঙ্গে কতক্ষণ যুঝবে। পারে না। ফিরে যায়।

ভানু গেল দীঘায়। ততক্ষণে শ্রীপতি ফিরে এসেছে। শ্রীপতিকে নিয়ে আর একটা দশাসই লোক সঙ্গে ভানু চলল চোদ্দোবেড়িয়া। কিন্তু চোদ্দোবেড়িয়া যেতে হল না।

তখন উত্তরের হাওয়া আসতে আরম্ভ করেছে। শুকনো ঠান্ডা বাতাস। গায়ের জল, ঘাসের রস, পৃথিবীর রস শুষে নিয়ে সেই বাতাস চলে যায় অনন্ত নীলের দিকে। সেই সময় ঘোড়ারা দেখে কাশবনের রং মরে যাচ্ছে, ঘাস আর ফুলের গায়ে পড়ছে পোড়া পোড়া ছোপ। গাছের পাতারা নড়ছে না। কেয়াঝোপে পুরু করে ময়লা জমতে শুরু করেছে। সেই সময়ে ঘোড়ারা চর ছাড়তে আরম্ভ করে। তৃপ্ত হয়েছে সকলে। তৃপ্তির চিহ্ন চোখেমুখে, এবার আবার লোকালয়ে।

'তাহলে ও শুধু আশ্বিনের স্বর্গ?'

'হ্যাঁ।'

'পরে আর থাকা গেল না?'

'না।'

'আশ্বিনে ওখানে পালায়?'

'হ্যাঁ, তুমিও আসতে পারো মাইতিবাবু।'

'হিনাড়ির কুহকিনীর জন্য?' হা–হা করে হাসে শ্রীপতি, 'কোকিলা কি থাকবে ওখানে?'

'সে কে?'

'যে বন্দি করেছিল তোকে।'

পক্ষীরাজ বলে, 'তারে তো চিনিনে।'

'সে কি কোকিলার চেয়েও রূপসি?'

'কে?'

'হিনাড়ির ঘুড়ি।'

'কী জানি! কোকিলাকে তো দেখিনি।'

'বন্দি করেছিল তোরে?'

'মনে নেই।'

'কুহক করেছিল?'

'মনে নেই,' পক্ষীরাজ বলে, 'মনে আছে, ভানুবাবুর সঙ্গে ফাঁস নিয়ে আসছে একটা ষণ্ডামার্কা লোক, কী স্বাস্থ্য! দেখলে ভয় করে।'

ষণ্ডামতো লোকটা একটা শক্ত দড়ির ফাঁস নিয়ে যাচ্ছিল ভানু আর শ্রীপতির সঙ্গে, যেতে যেতে সে বলল, 'এ বড়ো বদ অভ্যেস, মাদি ঘোড়ার পাল্লায় পড়লে ও না ফিরতেও পারে।'

শ্রীপতি খেপে গিয়ে বলল, 'সামাল দিতে পারিসনি!'

ভানু তখন হেসে বলল, 'আমি জানি ওখানে এখন একটাও মাদি নেই, অশ্ব ঠিক ফিরবে, ফিরবে, নাহয় থাকবে।'

ঠিক এই সময়ে ওরা দেখল দূরের বালির পথ ধরে ঘোড়াটা আসছে। ঘাড় উঁচু করে দেখছে চারদিক।

ষণ্ডা লোকটা ফুঁসে উঠল, ফাঁসটা দুলিয়ে নিয়ে শ্রীপতিকে জিজ্ঞেস করল, 'ধরে ফেলব, আপনার অশ্ব তো বটে।'

শ্রীপতি দেখল লোকটার দুই ঊরু ফুলে উঠেছে। দুই চোখ ঠেলে বেরোচ্ছে।

লোকটা ছুটে যেতেই শ্রীপতি আটকাল, 'না, ও আসছে?'

হ্যাঁ, ঘোড়াটা ফিরছে তাদের দিকে। চিনেও তো অন্য পথে যাচ্ছে না। খুব আস্তে আস্তে হাঁটছে। চাকচিক্য ফিরেছে। আর সেই দুর্দম বেগ নেই। খ্যাপা স্বভাব নেই। তৃপ্তিতে শ্লথ।

খুব আস্তে আস্তে এসে ও ধরা দিল। কিন্তু পরের বছর ওই আশ্বিনের প্রথমেই আবার ছুটে গেল চোদ্দোবেড়িয়ার আকাশ নামানো চরে, ঘাসের ভিতর, কাশফুলের ভিতর।

শ্রীপতি হাসে, 'আবার গেলি!'

'আশ্বিনে যে হিনাড়ির মেয়েছেলেটা ডাকে বাবু, সারা বছর মনে পড়ে না, ওই সময়ে মনে পড়ে।'

'এবার তো আশ্বিন ছিল না।'

'ছিল না!' বিস্মিত হয় পক্ষীরাজ, 'তাহলে কী ছিল?'

'তুই জানিসনে?'

'না তো!' কেঁদে ওঠে শ্রীপতি মাইতির ঘোড়া।

'সে তো ছিল বৈশাখ মাস।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ বৈশাখ, ওইটাই তো ধন্দ বাবু, বৈশাখ মাসে কী করে পালায় সে!' এগিয়ে এল ভানু, 'আমার মাথায় কিছুতেই ঢোকে না।'

শ্রীপতি বলল, 'সে কই?'

'কে, কার কথা জিজ্ঞেস করছেন?'

'পক্ষীরাজ।'

'আমিও তো সেই কথা জিজ্ঞেস করি, গেল কোথায় আমার কন্থক?'

'এই তো ছিল।' বলল শ্রীপতি।

'এই না, অনেক আগে ছিল বলতে পারেন।'

'তুই সর দেখি জানালা থেকে।' শ্রীপতি ধমকে ওঠে।

ভানু বলল, 'একটা কথা বলতে এলাম।'

'কী কথা?'

ভানু বলল, 'আজ রাতে আপনি কি হোটেলে থাকবেন বাবু?'

'কেন?'

'থাকুন না, আজ রাতটায় খুব দুর্যোগ।' ভানু হাসতে থাকে।

শ্রীপতি মাথা নাড়ে, 'উঁহু, সরে যা জানালা থেকে।'

ভানু সরে যেতে শ্রীপতি মাইতি দেখল বালিস্তূপটা শূন্য। কেউ নেই। কে ছিল ওখানে? পক্ষীরাজ? শ্রীপতি দেখল আকাশ কালো হয়ে মেঘ নেমে এসেছে অনেক নীচে। অন্ধকার রাতটাই মেঘের মতন ছড়িয়ে আছে।

শ্রীপতি বলল, ‘তুই দেখিসনি?’

‘কী দেখব?’

‘অশ্ব, পক্ষীরাজ, ছিল যে এখানে।’

হা–হা করে হাসে ভানু, ‘আমারে দেখেছেন।’

‘চোওপ!’ গর্জন করে ওঠে শ্রীপতি। ভানুটা খুব শয়তান। ভানুটা হাসছে। হেসেই যাচ্ছে। ঘোড়াটার জন্য মন যে খারাপ করবে সে, তার উপায়ও নেই। ভানু তার চোখ ঢেকে দিয়ে হা–হা করছে।

শ্রীপতি গর্জন করতে চায়, ‘সরে যা সামনে থেকে।’

‘তখন তো কেউ থাকবে না, ঘোড়া না থাকুক ঘোড়া–পালক ছন্দক আছে এখন।’

‘চোওপ, ওসব কথা বলবিনে।’

ভানু বলল, ‘আমারে দেখে ঘোড়াটার কথা মনে পড়ে না বাবু?’

‘তুই কে?’

‘কন্থক আমার কাছেই তো রয়েছে এত যুগ।’

‘তোর সব মিথ্যে।’

‘তাহলে কন্থকও সত্যি নয়।’

গর্জন করতে চায় শ্রীপতি আবার, ‘সরে যা।’

ভানু বলল, ‘আমি ছাড়া তোমার ঘোড়া মিথ্যে বাবু, আমার ঘোড়া ছাড়া আমি মিথ্যে, কতকাল ধরে আছি, তখন আকাশে ফুটত সোনালি মেঘ, সে মেঘ আর তো ফুটতে দেখি না। আহা! কী দিন ছিল বাবু, নীল গগন, সোনালি মেঘ, রুপোলি রোদ, নরম বাতাস, দুধের মতো জোছনা। ও মশায়, তখন আকাশে বাতাসে ভগবান, রাজপুত্র মহামানব হয়ে গেছেন। তিনি ভালোবাসিতে কহিলেন, মোরা ভালোবাসিলাম, কন্থক আর ছন্দক, মনে পড়ে বাবু?’

বাবু শ্রীপতি মাইতি তার জানালায় নেই।

ফ্রেদরিক সাহেবকে থানা ডেকে পাঠিয়েছিল। ফ্রেদরিকের বাড়ি কোথায়? ফ্রেদরিক শুধু হেসেছে, বলেছে, 'হাম ইন্ডিয়াকা আদমি, ইন্ডিয়ান, হরে কৃষ্ণা হরে রাম!'

থানার অফিসার এতে ভোলেনি। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেরা করেছে। কবে এসেছে এই দেশে, কবে যাবে? দীঘায় বসে কী করছে? জেলেপাড়ায় থাকে কেন? ফ্রেদরিকের সব জবাবই 'হরে কৃষ্ণা....।' থানায় বসে নাম জপ করেছে সে। শেষে দামি জাপানি লাইটারটি থানায় দান করে আপাতত রেহাই। থানা তাকে ওয়াচে রেখেছে। দুপুরে পান্তা খেয়ে আরাম–ঘুম দিয়ে বিকেলে ঘুম থেকে উঠে বৃষ্টি পেল ফ্রেদরিক। বেঙাকে ডাকল বৃষ্টি দেখতে দেখতে। বেঙা তার ঘর থেকে বেরিয়ে একবার বৃষ্টিতে ভিজে ফ্রেদরিকের ঘরের দাওয়ায় উঠল। ফ্রেদরিক তখন ঘনকালো আকাশের দিকে তাকিয়ে নিঝুম।

ফ্রেদরিককে ডাকল বেঙা, 'ও সায়েব!'

'বেঙা, টুমার বিবি কাহা?'

'বিবিরে কী দরকার?'

ফ্রেদরিক বলল, 'হামার কুছু বলবে।'

'আমারে বললে হবে না?'

ফ্রেদরিক মাথা নাড়ে, 'নাহি বেঙা, পুলিশ হামাকে কী বলল শুনবে না?'

বেঙা বলল, 'তুই চলে যাবি নাকি সায়েব?'

ফ্রেদরিক দেখছিল ঝিরঝিরে বৃষ্টি কমে এল। বেঙার বউ ছাতা মাথায় থলে হাতে ফিরছে। থলের ভিতরে চাল, তেল, নুন। স্বামীর সঙ্গে সায়েবকে অন্তরঙ্গ হয়ে কথা বলতে দেখে পরি বলল, 'মরণ, এরপরে তো ঝগড়া লাগাবি দুটোয়।'

ফ্রেদরিক বলল, 'হামি যদি ইন্ডিয়ার সিটিজেন হই বেঙা?'

বেঙা বলল, 'তার মানে?'

'হামি যদি না চলে যাই?'

বেঙা বলল, 'সে তুমার বেপার, থাকো না কেনে, লেকিন রুপয়া তো বাড়াতে হবে সায়েব, দাম দেখেছ জিনিসপত্তরের।'

ফ্রেদরিক বলে, 'হামাকে ফিশিং নিয়া যাবে বেঙা?'

বেঙা হি–হি করে হাসে, 'সমুদ্দুরে যাবা?'

'হাঁ, কাম করিতে হোবে তো বেঙা।'

'কাম করবা?'

'হাঁ, হামি কুছু করিব বেঙা।'

'কী করবে, করছ তো হরেকেষ্ট নাম,' বেঙা হাত পাতল, 'ক–টা টঙ্কা ছাড় সায়েব, ফিশিং তুই পারবিনে।'

'কিঁউ, পারবে না কেন?'

বেঙা বলে, 'তোর কী ফশসা গা।'

'মতলব?'

বেঙার বউ এসে বসল দাওয়ার একপাশে, 'দুটোয় মিলে কী হচ্ছে?'

ফ্রেদরিক সায়েব বেঙার বউয়ের দিকে তাকিয়ে আছে। ঘন কালো রং, ব্ল্যাক বিউটি। মুখখানি ঢলো ঢলো, শরীরখানি কী সুন্দর। সাহেব বলে, 'রাঢিকে'। রাঢিকেকে টাচ করলেই কৃষ্ণ নাম বেজে ওঠে কানের কাছে।

সাহেব বলে, 'রাঢিকে হামি ফিশিং যাব।'

'মরণ, মরতে জলে যাবা কেনে?'

'ইনকাম তো হোবে।'

বেঙা বলে, 'তুমারে নেবে না সায়েব, তুমি ফশসা।'

'মতলব?'

বেঙা বলে, 'ধলা মানুষ, তায় সায়েব, তুমি কেনে ফিশিং যাবা?'

'তো হামি কী করবে?'

'হরে কৃষ্ণ করো', পরি বলল, 'তুমি বাড়ি যাবা না সায়েব?'

'হোম!' মাথা নাড়ে সাহেব, 'ইন্ডিয়া ইজ মাই কানট্রি।'

'তার মানে?'

সায়েব বলল, 'হামি যাবে না।'

'যাবে না মানে, চেরকাল থাকবে?' বেঙার বউ জিজ্ঞেস করে।

'হাঁ, থাকিব।' সাহেব হাসে। সাহেবের কোমরে একখানা আধময়লা গেরুয়া ধুতি, গায়ে গেরুয়া ফতুয়া, মাথায় রেশমের মতো বাবরি চুল, কাঁধ ছুয়ে দুলছে সবসময়। সাদা কেষ্ট ঠাকুর। কখনো মনে হয় যিশু বাবা। সায়েব চোখ বুজে যুক্তকরে বিনবিন করছে, 'হরে কৃষ্ণা, হরে রাম।'

পরি জিজ্ঞেস করে, 'সায়েব, তুমার বাড়ি তো সাগরের ওপারে?'

'ইয়াস সাগরের পারে।'

'অনেক দূর?'

সাহেব ঘাড় কাত করে, 'হাঁ, বহুত।'

'তারপর?' বেঙা জিজ্ঞেস করে।

সাহেব হাসে, 'বেঙা টুমি বহুত ইডিয়ট আছে, কুছু বোঝে না।'

বেঙা বলল, 'ইংরিজিতে গাল দিলি সায়েবের পো?'

'হোয়াট?'

'খিস্তি দিলি?' বেঙা বলে।

পরি বলল, 'তুমি থামো দেকি, ও কি কিছু বোঝে, কোনটা গালি কোনটা আদর সে বুঝার বুদ্ধি ওর আছে?'

বেঙা চুপ করে গেল। ফ্রেদরিক সাহেব আকাশে তাকিয়ে বলল, 'দেখো রাঢিকে, ব্ল্যাক মতলব কালা রং আচ্ছা হায়।'

পরি বলে ওঠে, 'আমারে রাঢিকে বলবা না তো।'

হি–হি করে হাসে ফ্রেদরিক, 'এ বেঙা তেরা বিবি কী বোলে?'

বেঙা বলে, 'কেন রাধিকে তো ভগবান, বললি কী হয়েচে?'

'তুমি থামো দেকি, যেমন তুমার মাথা, সায়েব তো ঠিকই বলেচে, তুমি হলে মাথামোটা, ও সায়েব কও কী বলছিলে।'

সাহেব আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। পুঞ্জীভূত ঘন মেঘ আকাশকে পরিপূর্ণ করে তুলেছে। কী কালো সেই মেঘ। সমুদ্রটিও কালো, গভীর কালো, জল খলখল করছে জোয়ারে। ঢেউ এসে ভাঙছে সৈকতভূমিতে। তরঙ্গমালা

আজ কী উত্তাল! সাহেব বিড়বিড় করে, ‘এই মেঘ তার নিজের দেশেও রয়েছে, সে দেশেও বর্ষার মেঘ কালো, ই বেঙা, হামার দেশ, ফ্রেঞ্চ কানট্রি, সেখেনেও ক্লাউড, মেঘ ব্ল্যাক, কালা।’

‘তা তো হবেই, বর্ষার মেঘ তো কালো হয় সায়েব।’

সাহেব দোলে আপনমনে, ‘এ বেঙা, ঝাউবন, ফরেস্ট ভি ব্ল্যাক দেখায়।’

বেঙা বলে, ‘হাঁ জঙ্গল তো কালোই দেখায়, তোর দেশে সাদা জঙ্গল?’

সাহেব চুপ করে আছে।

পরি বলে, ‘সাদা মানুষ, সাদা জঙ্গল।’

বেঙা মাথা দোলায়, ‘হবে তা, ও সায়েব তোর দেশে সাগর আছে?’

সায়েব বলে, ‘হাঁ।’

‘সাদা জল সেই সমুদ্দরে?’

ফ্রেদরিকের মুখে আশ্চর্য হাসি জেগে ওঠে।

‘তোর দেশের মেঘ সাদা রঙের, তাতে জল হয়?’

সাহেব আকাশে তাকিয়ে আছে। আজ খুব দুর্যোগ। আজ সমুদ্র পাগলা হবে। নৌকো নিয়ে বেড়ানো যাবে না। কী আলিস্যিই না লাগছে! গাঁজা সাজবে নাকি বেঙা? নাকি সাহেব মদ খাওয়াবে? সাহেবের কত টাকা! ফুরোল না। বেড়ানোর জন্য অঢেল টাকা নিয়ে বেরিয়েছে সাহেব। ব্যাঙ্কে গিয়ে চেক ভাঙায় আর টাকা আনে। সাহেবের কী কপাল!

পরি বলে, ‘ও সায়েব, তোর মনখারাপ?’

সাহেব বলে, ‘রাঢ়িকে, হামি কী করবে?’

‘কী করবে মানে?’

‘পোলিস বহুত ডাকবে, পোলিস ডেনজারাস আছে।’

পরি বলে, ‘দেখো বাবা মোদের না বিপদ হয়।’

সাহেব বলে, ‘হামি ইন্ডিয়ায় থেকে যাবে রাঢ়িকে।’

বেঙা বলে, ‘থাকিস, এখন টঙ্কা দে, পাঁইট আনি।’

পরি ধমকে ওঠে, ‘না, এখন না, মদ খেলিই দুটোর একটা মোর পরে ঝাঁপাবা, মু কী করি!’

বেঙা আচমকা খেপে ওঠে, গনগনে চোখে পরির দিকে তাকায়।

পরি কুঁকড়ে যায়, বিড়বিড় করে বলে, ‘তুমার খুব হাত চলে।’

‘সায়েবরে এখান থেকে তাড়ায়ে দেব।’ বেঙা গর্জে ওঠে।

‘তাড়াও না, কে রাখতি কয়েচে।’ পরি পাল্লা দিয়ে গলা তোলে।

সাহেব বলে, ‘চুপ করিবে, এ বেঙা, আজ ফিশিং হোবে?’

‘নেহি, দেখছ না সমুদ্র পাগলা হয়েচে।’

‘এ বেঙা, হামার খোঁজ করিতে পোলিস যদি আসে?’

বেঙা বলে, ‘পোষ্কার করে কও দেখি সায়েব কী হয়েচে?’

‘পোলিস হামাকে চলিয়া যাবে অর্ডার করিয়াছে।’

বেঙার মুখ অন্ধকার হয়ে যায়, ‘চলে যাবে?’

‘যাক না, যাক সায়েব, তালে তো তুমার হাড়ে বাতাস লাগে।’

বেঙা বলে, ‘সত্যি চলে যাবে?’

সাহেব বলে, ‘এ বেঙা, তুই ফিশিং–এ যাবে না?’

‘না বলছি তো, কোনো নৌকো বেরোবে না, দেখছ না কেমন হাওয়া উঠেচে, ঝড় হচ্চে।’

সাহেব বলে, ‘হামার যে বক্স হায়, ও বক্স লুকানে হোগা?’

‘কেয়া?’

‘বক্স হায় না, বক্স মে যে মাল হায়, এ বেঙা সমঝতা?’

‘কী মাল আছে?’

সাহেব বলে, ‘মেরা পাসপোর্ট হায়, পেপারস হায়।’

‘আর কী আছে?’

‘টেপ হায়, ক্যামেরা হায়।’

‘আউর কেয়া হায়?’

সায়েব বলে, ‘টুম রাখদো গুপ্ত ইস্থানে।’

‘এখন যাব কী করে, এই বিষ্টি!’

সাহেব বলল, ‘পোলিস যদি আসে?’

পরি এবার ভয় পায়। পরি কেন, বেঙাও। বার বার পুলিশের কথা বলছে সাহেব। কী বাধিয়ে এসেছে কে জানে? বেঙা সাহেবের মুখের দিকে তাকায়। মুখ দেখলে তো কিছু ধরা যায় না। একেবারে জলের মতন। জলের উপর দেখে কি ধরা যায় কত নীচে তার তল? সাহেবের গায়ের রং সাদা, সাহেবের দেশের সব সাদা, সাহেব তবু কালো কালো করে বেড়ায়। সাহেবের নিজের ঠাকুর যিশু বাবা সাদা, তবু সাহেব কালো ঠাকুর কৃষ্ণ কৃষ্ণ করে বেড়ায়। সাহেবের সঙ্গে মেম এসেছিল দীঘায়, তারা এখন নেই, কিন্তু সেই মেমসাহেবের গায়ের রংও খুব সাদা, ফ্যাকফেকে সাদা, তবু সাহেব কালো মেয়েমানুষের জন্য পাগল। বেঙা কি জানে না সায়েব কেন আছে তার ঘরে অতিথি হয়ে, কেন টাকা চাইলেই টাকা পায় তা কি জানে না বেঙা? সাহেব কীরকম হাঁ করে পরির দিকে তাকিয়ে থাকে। এক সময় বেঙার মাথা গরম হয়ে ওঠে, তখন সে পরিকে লাগায় দু–চার ঘা, খুব ঝগড়া লাগে দুজনের। সাহেব এসে বেঙার হাতে টাকা গুঁজে দিয়ে পাঁইট আনতে বললে, মাংস আনতে বললে তবে সে ঝগড়া থামে। আহা, সাহেবের কী কপাল! সাদা মেম থাকতেও কালো মেয়েমানুষ খুঁজে বেড়ায়, আবার তা পেয়েও যায়। কোথায়, কতদূর, কোন সাগরের ধারে সাহেবের দেশ, সেখানে বর্ষার মেঘ, গাছের রং, মাথার কেশ, সবই সাদা, অত সাদা ছেড়ে কালোর খোঁজে সাহেব এসে বসে আছে বেঙা জেলের ঘরে। বেঙা ডাকে, ‘এই পরি, সায়েবের সামনে থেকে সর।’

‘কেনে?’

‘সায়েব তোকে কেমন করে দ্যাখে জানিসনে?’

পরি বলে, ‘সাদা কেষ্ট ঠাকুর কী দ্যাখে আর!’

‘সায়েব কালো মেয়েমানুষ দ্যাখে।’

খিলখিল করে হাসে পরি, ‘এই নিয়ে মাথাখারাপ করো কেনে?’

‘ও বেটা খুব হারামি।’ বেঙা গর্জে ওঠে।

বেঙা বলে, ‘সাদা দেশের লোক, কালো দেশে কেনে আসে?’

‘তুমারে টাকা দিতে।’

‘তার মানে?’

‘তুমারে ও টঙ্কা দেয় কি না?’

‘দেয় তো, সে খাবার খরচা।’

‘খাবার খরচা!’ পরি বলে, ‘টঙ্কার লোভে না রেকেচ ওরে?’

বেঙা চুপ করে যায়। পরি ধরেছে ঠিক। সাদা মানুষটা এমন টাকা দেয় যে বেঙার কিছু বলার উপায় থাকে না। বেটাকে নিয়ে গেলে হয় ফিশিং–এ। মাঝসমুদ্রে নিয়ে গিয়ে ধাক্কা মেরে ফেলে দেবে বেঙা। তাতে বেঙার লাভ? সোনার হাঁসটা মরে যাবে। সাহেবের কত টাকা। পরের জন্মে বেঙা সায়েব হবে। একেবারে ধবধবে সাদা। সাদা হাঁসের মতো সাদা। আর সাহেব তো বলেছে কালো মানুষ হবে। জেলে হবে। জেলে হয়ে মাছ ধরতে যাবে সমুদ্রে। বেঙা তখন জেলের ঘরে বসে জেলে বউয়ের কাছে বসে সমুদ্দুরে মাছ ধরার গল্প শুনবে। পরি বলে, ‘সাহেব ওই কথাই নাকি জিজ্ঞেস করে।’

বেঙা বলল, ‘এই সায়েব, পরের জন্মে তুই জেলে হবি?’

‘পরের জম্মো মতলব?’

বেঙা বলল, ‘পরের জন্ম মানে পরের জন্ম, একবার মরলি, আবার জন্মালি সায়েব, একবার ম’লে কবরে গেলি তুই, ফের জন্মালি।’

সায়েব বলে, ‘রিবার্থ?’

‘পরের জন্ম।’

সায়েব বলে, ‘পরের জম্মে হামি ফিশারম্যান হবে।’

‘আমি সায়েব হব।’

পরি বলে, তালে আমি কেনে জেলেবউ থাকব, আমি মেম হব।

বেঙা বলল, ‘সায়েব, পালটাপালটি করবি?’

‘কেয়া?’

‘তুই জেলে হ, আমি সায়েব।’

‘হামি তো ইচ্ছা করে, হামি এদেশ থেকে যাবে না।’

বেঙা চিতকার করে বলে ওঠে, ‘আমি এদেশে থাকবই না, হি–হি–হি, আমি একবার সায়েব হতে পারলে বাপের জন্মে আর আসব না এদেশে, শালা সায়েবের বাচ্চা টাকা দিয়ে মুখ মেরে রাখে, ‘এই পরি, গাঁজা নিয়ে কলকে সাজ।’

পরি ওঠে। সাহেবের ঘরে ঢোকে। মাঝারি আকারের বাক্সটা তালা দেওয়া রয়েছে। সাহেব যে এত সোহাগ করে তাকে, সাহেব বাক্সটা কোনোদিন খুলে দেখায়নি। পরি বাক্সটা ধরে নাড়া দিল। কী আছে? কিছুই না যেন।

বাইরে থেকে বেঙা হাঁক মারে, ‘এলি?’

বৃষ্টি জোর আরম্ভ হয়েছে। পরি দেখল, সাহেবের ঘরের একধারটা আকাশের জলে কাদা থুকথুকে। হায় রে সাহেব! রাজার বেটা হয়ে মরতে এলি এই ঘরে! পরির চোখে জল এসে যায়। আজ সাহেবটাকে রাখবে কোথায় সমস্ত রাত যদি বৃষ্টি চলে? পরি ঘরের কোণ থেকে টিনের কৌটো নিয়ে বেরোয় চোখ মুছতে মুছতে।

‘কী হল রে?’ বেঙা অবাক।

‘কানচি।’

‘কেনে?’

‘ও মুখপোড়া সায়েব এল কেনে এই দেশে, ঘরখানি দ্যাখো।’

সাহেব হাসে। নিঃশব্দে হাসে ফ্রেদরিক সাহেব। পরি কৌটো খুলে কলকে বের করে। সাহেব বলল, ‘বিগ বক্সটা দেখা হল?’

হল।

‘কী আছে উহার ভিতরে?’

পরি বলল, ‘কী থাকবে, মনে হয় নিশা, নিশার বাতাস, সায়েব তুই কেনে এলি আমার গোবিন্দ, কেষ্ট ঠাকুর! নিশার বাতাস বাক্স ভরতি করে আনলি?’

পুরো পরিবারটিই কাজ খুঁজতে বেরিয়েছিল। অনন্ত, তার মেয়ে কুন্তি, অনন্তর বউ সরস্বতী। কাজ খুঁজতে বেরিয়ে এ হোটেল ও হোটেল করে ক্লান্ত পরিবার যখন বাসস্ট্যান্ডের শেডের নীচে বসে ঝিমোচ্ছে, অনন্ত শেষ চেষ্টায় বেরিয়ে পথে পেয়ে গেল ভানু দাসকে। অশ্ব খোঁজার টাকা ভানু আবার জোগাড় করে দিতে পারবে। তাহলে চাল তেল কিনে বাড়ি ফিরতে পারে অনন্ত। সে ভানুকে বলছিল, 'খুঁজা বন্ধ রাখা ঠিক লয়, না খুঁজলি সেও তো আর না ফিরতে পারে।'

ভানু মাথা দুলিয়ে সমর্থন করছিল অনন্তকে, আর মিটিমিটি হাসছিল। এর আগে পঞ্চাশ টাকা নিয়েছিল, কোথায় খুঁজল, কী খবর হল? অনন্ত না পেরে ভানু দাসের কাছেই হাত কচলাচ্ছিল, তখন হন্তদন্ত হয়ে ঠাকুর হেঁটে এল, 'এই যে অন্তা, তোর মেয়েডা কই?'

'মেয়ে কেনে?'

'কাজ করাবি, ভালো পাটি, জাহাজের মালিক, এয়েচে।'

'জাহাজের মালিক!' ভানু দাসের চোখও অনন্তর সঙ্গে স্ফীত হয়ে ওঠে।

'হ্যাঁ, নিউ দীঘায় উঠেছে, ওর ডেরাইভার এসে ডাকা করল মোকে।'

'বিত্তান্তটা কী?' ভানু মাথা গলায় দুজনের কথোপকথনে।

'তুই থাম দেখি ভানুবাবু, ই তুমার ফোরটুয়েন্টি ঘুড়ার কেস লয়, শুন অনন্ত, মদনানি সায়েব বর্ষায় আসে বর্ষা দিখতে, কী, বুঝলি কিছু?'

মাথা নাড়ে অনন্ত, 'না।'

'সেরেফ মেঘ দিখতে আসে, ভারি দিলদরিয়া লোক, ইবার কাজের মেয়েছেলে আনে নাই, দিন পনেরো থাকবে, মেয়েটারে লাগায়ে দে, নগদা দু–হাজার।

'দু–হাজার!' অনন্ত থই পায় না ঠাকুরের কথায়।

ঠাকুর বলে, 'হ্যাঁ দু–হাজার দিবে, কত টাকার মালিক জানিস? এই যে আমি গিয়ে দেখা করলাম, নগদ একশো টাকা বখশিস।'

ভানু দাস আবার মাথা গলায় দুজনের বাক্যালাপে, বলে, 'বউ করুক।'

ঠাকুর রেগে যায়, 'ফের কথা বলছিস ভানুবাবু!'

অনন্ত বলে, 'মু করি, মু তো সবই পারি।'

ঠাকুর মাথা নাড়ে, 'আমি তা'লে অন্য লোক দেখি।'

'কেনে?' অনন্ত ভয় পায়, 'তা কেনে, কাম তো করবই, বলছি বউ করুক।'

'তোর মেয়েডারে বাক্সর মধ্যে পুরি রেখি দে, বের করিসনে।' ঠাকুর রেগে যায়, 'ফালতু পাটি, যা, যা, ভিখ মাগগে যা।'

অনন্ত ঝপ করে ঠাকুরের হাত ধরে ফ্যালে, 'না, না রাগ করছ কেন, উনি কেডা, জাহাজের মালিক কীর'ম?'

'কীর'ম তা গিয়ে দেখবি।' ঠাকুর বিড়বিড় করে, 'মেয়েরে ডাক।'

অনন্ত ছুটতেই ভানু জিজ্ঞেস করে, 'কী ব্যাপার কহ দেখি।'

'তুমারে কহিব কেনে?'

'জাহাজের মালিক, সে জাহাজ চলে কুথায়?'

'জলে।' ঠাকুর গরগর করে।

'লোকটার নাম কী?'

ঠাকুর বলে, 'সব ব্যাপারে মাথা দিয়া ঠিক না ভানুবাবু, প্রেম মদনানিরে তুমি চেনো? সেরেফ মেঘ দিখতে এই সময় আসে।'

'না, অন্য টায়েমেও আসে।'

'আসে, তবে এই সময় থাকে অনেকদিন।'

'লঞ্চের মালিক?'

'না, জাহাজ।' ঠাকুর শক্ত হয়।

অনন্ত পুরো পরিবার নিয়ে চলে আসে। ভানু দ্যাখে বউটা তো চিমসে মেরে গেছে। মেয়ে কুন্তির গায়ে বর্ষার জল পড়েছে সবে। ভানু ঠাকুরের দিকে তাকায়, ঠাকুর অনন্তকে বলে, 'তুমি কথা বলে যাচাই করে লাও, বুড়া মানুষ, মাথার সব চুল সাদা, সিন্ধি লোক, সিন্ধি লোক কারা জানিস অন্তা? সিন্ধি'

অনন্ত মাথা নাড়ে।

ঠাকুর বলে, 'সিন্ধিদের জাহাজ ভরতি টাকা, আবার জাহাজের মতোই দিল, দিন পনেরো মন দিয়ে কাজ করুক কুন্তি, আখেরে লাভ হবে।'

মেয়েটা মায়ের গা ঘেঁষে ছিল। ঠাকুরের সঙ্গে দু–পা হেঁটেই ভ্যান রিকশায় উঠে পড়ে ওরা সবাই। ভানু রাস্তায় দাঁড়িয়েছিল, ছুটে গিয়ে সেও চেপে বসে বলল, 'বুড়ারে দেখে আসি।'

ঠাকুর গরগর করে ওঠে, 'তুমি কেনে ভানুবাবু?'

ভানু বলল, 'জাহাজের মালিক দেখি নাই।'

'জাহাজ দেখিছ?'

'হাঁ, বজবজের গঙ্গায় জাহাজ ঢুকত।'

'এখেনে দ্যাখো নাই?'

ভানু বলে, 'এখেনে জাহাজের মালিক আসে, জাহাজ না।'

আকাশে মেঘ ধীরগামিনী। বাতাসে ঠান্ডা ভাব। এখন বৃষ্টি নেই বটে, কিন্তু নেমে এল বলে সহস্র ধারা। ভ্যান রিকশা থেকে নেমে সমুদ্রমুখী দোতলা বাড়িটার দিকে এগিয়ে যায় সবাই। এখন বর্ষায় সমুদ্র ব্যতীত সব নিথর। লোকজন নেই। এই বাড়িটা কোনো এক কোম্পানির হলিডে হোম, সব ফাঁকা। ঠাকুরের সঙ্গে সবাই দেখল দোতলার ডেকচেয়ারে বসে আছে ফর্সা টুকটুকে একটা মানুষ। মাথার রেশমি চুল সাদা ধবধবে। দৃষ্টি সমুদ্রে। সমুদ্র গর্জন করছে। বর্ষায় কালো জল ফুলছে। ঝাউবনে অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে।

ঠাকুর বলে, 'দেখলে তো, ইবার পথে দাঁড়াও, আমি ওরে লিয়ে যাই।'

মেয়ের মা সরস্বতী বলে, 'আমি যাব না সাথে?'

'না, পথে দাঁড়াও।'

ভানু বলে, 'মা বাপ কথা বলবে না সায়েবের সাথে?'

'কথা তো আমি বলব।'

'কেনে, ওর বাপ বলুক।'

ঠাকুর চাপা গলায় গর্জে ওঠে, 'না তা'লে ফিরে চ, আমি অন্য লোক দেখি, আমারে বিশ্বাস হচ্ছে না?'

'টাকা?'

'আমি আগাম আনছি।'

'কী অদ্ভুত!' বিড়বিড় করে কুন্তি, 'আমি একা যেতি পারব মা।'

সরস্বতী বলে, 'ডর লাগবে না তো, ডরের কী আছে বুড়া মানুষ!'

কুন্তি মুখ টিপে টিপে হাসে, 'আহা, দ্যাখো মা, ওই যেন ছিপতিবাবুর অশ্ব।'

চমকে ওঠে ভানু, 'কী বলিস?'

'হাঁ, সাদা ঘুড়া।' ফিসফিস করে কুন্তি, 'ঘুড়াটার কথা খুব মনে পড়ে, তুমরা দশদিক খুঁজি মরছ, সে ইখেনে আসি বসে আছে।'

'কী কহিস?' অনন্ত মেয়ের পিঠে হাত দেয়।

'হাঁ বাপ, দ্যাখো, ঠিক যেন সেই ঘুড়া, ঘুড়াটা যেমন তাকায়ে থাকত সাগরে।'

সরস্বতী এবার হাসল, 'থাম দেখি, কী বলিস?'

কুন্তি খিলখিল করে হাসে, 'বাব্বা! জাহাজঅলা, জাহাজ বুড়া, মা, জাহাজের মতন লাগে না উয়ারে?'

'যাহ্! চুপ কর।'

'জাহাজ কেমন মা?'

বাতাসটা নরম হয়ে গেল। চারপাশের আগল খুলে গেল যেন। মেয়ে বুদ্ধিমতী। সবাই পথের ধারে উবু হয়ে বসে থাকল, ঠাকুর গেল কুন্তিকে নিয়ে। ভানু শুধু উশখুশ করছিল। ভানুর মনে হচ্ছিল উঠে যায়। ঠাকুর মোটা দাঁও মারবে। দু–হাজার যদি অনন্ত পায়, ঠাকুর তো পাঁচশো মারবেই। এত টাকা কেন? বুকটা ধক করে ওঠে ভানুর। এত টাকা বলেই মনের মেঘ সরছে না। ভানু ঘুরে তাকায়। অনন্ত আর তার বউ উদ্বেগ নিয়ে বসে আছে। একটু আগে নিরুদ্বিগ্ন হয়ে গিয়েছিল, এখন আবার তা ফিরে এসেছে। আকাশ তো। মন তো আকাশই বটে। কখন মেঘ এসে পড়ে কে জানে। আহা! মেয়েটা কত সুন্দর। ভানু জিজ্ঞেস করে, 'কত বয়স হল মেয়ের?'

'চোদ্দো।' সরস্বতী জবাব দেয়।

'কচিই বটে,' বিড়বিড় করে ভানু, 'মেয়েটা তুমার বেশ ভালো।'

'হাঁ, উয়ার আগে একটা ছিল, বাঁচে নাই, পরেও দুটা হল, বাঁচে নাই, পড়ে আছে উ।' বিড়বিড় করে সরস্বতী। গলাটা ভার।

অনন্ত সার বলে, 'তুমাদের ঘুড়াটা পলানোর পর কুন্তিই দেখেছিল।'

'সত্যি দেখেছিল?'

'হাঁ, লায়কানখাসে দেখেছিল।'

'শুনেচি, কথাটা কি সত্যি?'

'সত্যি, না হলে বলবে কেনে কুন্তি, ঘুড়াটা আস্তে আস্তে বাতাস হই গেল।'

'কী বলো!'

'অমনই তো বলেছিল কুন্তি।'

ভানু হাঁ করে দোতলা বাড়িটার দিকে তাকিয়ে থাকে। শীতের সময়, সিজিনে এই এলাকায় কত মানুষ। পথ গমগম করে, কোনো ঘর, কোনো বাড়ি ফাঁকা থাকে না। আর এখন? কী নিঝুম! বাড়িটায় কোনো মানুষ আছে কি না ধরা যায় না। কেউ নেই যেন। মেয়েটাকে নিয়ে ঠাকুর ঢুকে গেল শূন্য পুরীতে। ভানু উঠে পড়ে। হাঁটতে থাকে নির্জন পথ ধরে চন্দনেশ্বরের দিকে। পথের ধারে মানুষপ্রমাণ কেয়াবন। কেয়াফুলের ঝাড় ফুটেছে। লতানে গাছে নয়নতারা দুলছে। বাতাসে কেয়াফুলের গন্ধ আসছে। বাতাসে জলের গন্ধ! মেঘের গন্ধ! ভানু নাক টানতে টানতে

হাঁটে। এই পথেই পক্ষীরাজ যায়। প্রতি বছর আশ্বিনে এই পথেই খুর ঠুকতে ঠুকতে সে যায় চোদ্দোবেড়িয়ার দিকে। খুরে খুরে পিচরাস্তা দাপিয়ে, ভিজে বালিয়াড়ি ভেঙে, বালিতে খুরের চিহ্ন রেখে, চন্দনেশ্বর মন্দির ফেলে দূরে, আরও দূরে, চোদ্দোবেড়িয়ার চরে, সেখানে রয়েছে রূপবতী, গিরি মশায়ের ঘুড়ি। ভানু আকাশে তাকায়, ঘোর, আরও ঘোর করে আসছে মেঘ। ঘুরে তাকায় সে। বাড়িটা সাদা রঙের। মেঘের নীচে বাড়িটা স্তব্ধ। থমথম করছে সব। ওই বাড়ির ভিতরে মেয়েটাকে নিয়ে ঢুকল ঠাকুর। ভানুর বুকটা আবার কেঁপে ওঠে। সে হনহন করে হাঁটতে থাকে। কী যেন মনে হচ্ছিল তার। ক–দিনের জন্য দু–হাজার দেবে, তাঁর মানে আরও বেশিও দিতে পারে। দু–হাজার হলে চার হাজারও দিতে পারে। কেন দেবে? ভানু গিয়ে বসে সমুদ্রের ধারে, নারকেল বনের গোড়ায়! বাতাসে জল ভাসছে। আকাশ থেকে এক–দুই ফোঁটা ভানুর ঠোঁটের ডগায় পড়ল। জিভ দিয়ে জলবিন্দু টেনে নিতে নিতে ভানু নোনা স্বাদটি টের পেল।

সমুদ্র ফুঁসছে। জোয়ারের জল ক্রমে এগিয়ে আসছে। কালো জল আছড়ে পড়ছে সৈকতে। সমুদ্রের গর্জন শুনতে শুনতে ভানু চোখ বোজে। বুজে আসে চোখ। তারপরই দেখতে পায় ঘোড়াটিকে! জল থেকে মুখ তুলছে। তুলে আছে মুখ। কালো জল নিথর। ভানু স্পষ্ট দেখতে পায় পক্ষীরাজের চোখে জল। ঘোড়াটা কাঁদছে। কাঁদতে কাঁদতে ডুবে যায়। জলের ভিতরে ডুবেও কাঁদে। চোখের জল গড়িয়ে সাপের মতো হয়ে যায়। চোখের জল গড়িয়ে গড়িয়ে কতদূর চলে যায়।

আচমকা ঘুমের চটকা ভেঙে যেতে ভানু দেখল সমুদ্র সত্যিই স্থির। সমুদ্রের ধারে বসে সমুদ্রের স্বপ্ন মানে, স্বপ্ন নয় সত্যি। যা দেখেছ সে তা সত্যি। ওই অকূল গাঙে সে ভেসে গেছে! ভানু উঠে পড়ে। হাঁটতে থাকে। হাঁটতে হাঁটতে গিয়ে দ্যাখে বাড়িটার সামনে কেউ নেই। চলে গেছে অনন্ত আর তার বউ। ভানু ঢুকে পড়ে ভিতরে। দেখল বারান্দায় কেউ নেই। সদর দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। দরজা বন্ধ। দরজাটা ঠেলতে থাকে ভানু। খুলে যায়। নিঃশব্দে উপরে উঠে আসে সে। দেখল কেউ কোথাও নেই। কোথাও কোনো শব্দ নেই। মানুষের কণ্ঠস্বর নেই। ভানু চাপা গলায় ডাকে, ‘কুন্তি, ও কুন্তি!’ সাড়া পায় না। ভানু চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। বাঁ–দিকে ঘর। ঘরের দরজা ভেজানো। ডান দিকে মস্ত বড়ো ব্যালকনি। ব্যালকনির দরজাটিও ভেজানো।

ভানু ডাকল, ‘সায়েব আছেন নাকি?’

‘কে?’ হালকা স্বর উড়ে এল।

ভানু বলল, ‘সায়েব, আমি ভানু।’ নাক টানল ভানু। ধুনোর গন্ধ পেল।

নীল স্লিপিং গাউন পরা মানুষটি বেরিয়ে আসে দরজা ঠেলে। ভানুর চোখ ধাঁধিয়ে যায়। এত জ্বলজ্বলে নীল! লোকটার বয়স ঠাকুরের বর্ণনা মতো সত্তর, কিন্তু ভানুর মনে হয় আরও বেশি। আশি নব্বই, একশো, নাকি আরও আরও অনেক। মুখখানি, চোখের দৃষ্টি দেখে মনে হচ্ছে দুশো বছরের পুরাতন মানুষ, পাঁচশো, হাজার বছরের প্রাচীন কেউ। কেমন ভাবলেশহীন চোখ মুখ, ভানুর দিকে তাকিয়ে আছে কত যুগ আগে থেকে যেন।

ভানু বলল, ‘সায়েব, আমি ভানু।’

‘ভানু কৌন?’

‘ভানু ভানুই সায়েব, কামটাম কিছু হবে?’

‘কী কাম?’

‘জাহাজ হায় তো সাহেব।’

লোকটা বলে, ‘তোমাকে কে পাঠাল?’

ভানু বলে, ‘নিজে এলাম।’

বুড়ো ব্যালকনির দরজা খোলে। ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়ায়। খোলা বারান্দা। মেঘই যেন বারান্দার ছাদ। ডেক চেয়ারটি ভিজে ভিজে। বুড়ো তার উপর বসে ভানুকে বলে, 'জাহাজের কথা কে বলল?'

'ঠাকুর।'

'পঞ্চম ঠাকুর, পঞ্চম ঠাকুরের মেয়েটাকে চেনো?'

'কুন্তি!'

'ইয়াস, ডটার অব পঞ্চম?'

'নো স্যার, পঞ্চমের মেয়ে নয়।'

সায়েব বলল, 'কতদিন সে ঘুমোয়নি, শি ইজ স্লিপিং।'

'এই অবেলায়?'

'তুমি সিন্ধু চেনো, ডু য়্যু নো দি রিভার সিন্ধু?'

'না সায়েব।'

'সিন্ধু নদী, জিলা সকখের, ডিস্ট্রিক্ট সকখের?'

'নো স্যার।'

'মোন–জো–দারো, দ্য হিপ অব ডেড পার্সন, মৃতদের স্তূপ?'

'না সায়েব।'

'সিন্ধুদেশ চেনো?'

'না স্যার।'

'ঘোড়াটা, দ্য লস্ট হর্স, ওদিকে যেতে পারে।'

চমকে ওঠে ভানু, 'কে বলল ঘোড়ার কথা?'

'কুন্তি, নাইস গার্ল, ভারি সুন্দর, বালিকা নয় রমণী, বোঝো তা?'

ভানু চুপ করে যায়। বুড়ো বলছিল ঘোড়ার কথা বলতে বলতে ঘুমিয়ে পড়েছে কুন্তি। তারপর থেকে মদনানি সাহেব বসে আছে কখন ওর ঘুম ভাঙবে। 'কী সুন্দর মেয়েটি! আহা? ফ্রেশ ফ্রম দ্য হেভেন। স্বর্গ থেকে নেমে আসা বালিকা, রমণী!' ভানু বলল, 'ওরা খুব দুঃখী সায়েব।'

'হোয়াট?'

'খুব গরিব স্যার, পুয়োর ম্যান ওর বাবা।'

'আমি জানি, তুমি ঘোড়াটাকে দেখেছিলে?'

'হ্যাঁ সায়েব, সে তো আমার কন্থক, কপিলাবস্তু ওর দেশ ছিল।'

'ওর কোনো রং ছিল না, কালারলেস?'

'তার মানে?'

'মানে, জলের মতো ছিল, বর্ণহীন।'

'জল তো কালো সায়েব, কালো নীল!'

'নো, আমি যা বলছি জবাব দাও।'

ভানু মাথা নাড়তে থাকে সাহেবের পিছনে দাঁড়িয়ে, সায়েব চাপা গলায় বলছে, 'তুমি জানো না, মেয়েটা চেনে, দ্যাট নাইস গার্ল ফ্রম দ্য হেভেন।'

'কী স্যার, কী বলছেন?'

‘বলছি ঘোড়াটা বাতাস হয়ে গেল, মেয়েটা বলল।’

‘নো স্যার।’ ভানু যেন কেঁদে ওঠে। সামনে মস্ত দরজা। দরজাটা এমনভাবে বন্ধ যেন দেওয়াল। নিঝুম। ভানুর চারপাশ কেমন ঠান্ডা হয়ে আসছে। সে সরে আসে। আস্তে আস্তে ফিরে আসতে থাকে।

ভানু জানে সিন্ধি মানে সিন্ধু দেশের মানুষ। সিন্ধু দেশ হল সিন্ধু নদীর পারে। সেই দেশ এখন আর এদেশে নেই। সিন্ধিরা ওপার থেকে এপারে চলে এসেছে। সিন্ধু নদী পার হয়ে তারা ইন্ডিয়ায় ঢুকে পড়ে ছড়িয়ে গেছে উত্তর, দক্ষিণ, পুব, পশ্চিমে। রাজস্থানি, বিহারি, বাঙালি, পাঞ্জাবি, মারাঠি, গুজরাতি, মালয়ালি, তামিল, তেলেঙ্গি সব জাতির ভিতরে সিন্ধিরা মিশে গেছে। তার বজবজে পেরুমল বাজাজের ইটখোলা ছিল। পেরুমল সিন্ধি ছিল। পেরুমল বজবজে মস্ত দালান হাঁকিয়ে দই ভাত খায়। পেরুমল বলত, 'পার্টিশন হল, বাঙালির বাংলা আছে, পাঞ্জাবির পাঞ্জাব আছে, সিন্ধির দেশ নেই। সিন্ধুপারেই রয়ে গেছে তা। সিন্ধির দেশ এখন গোটা ভারত।'

অনন্ত বলল, 'হাজার টাকা আগাম দিল মদনানি সায়েব।'

ভানু চাপা গলায় বলে, 'কত বুড়ো!'

'খুব বুড়ো!' অনন্তর চোখ চকচক করে ওঠে।

'হ্যাঁ, পাঁচশো বছর, হাজার বছর।' ভানু বিড়বিড় করে।

অনন্ত বলল, 'তোমার নেশা হয়ে গেছে ভানুবাবু।'

ভানু বলল, 'মহেঞ্জোদরো থেকে উঠে এয়েচে লোকটা।'

'কী বলো?'

'ঠিক বলি, মহেঞ্জোদরো বুঝিস?'

'না!'

ভানু বলল, 'মড়া চাপা থাকা ঢিবি।'

'তার মানে?'

'ঢিবির নীচে কঙ্কাল।'

'তুমি কী বলো ভানুবাবু?'

'যা বলি ঠিক বলি,' ভানু উঠে দাঁড়ায়, 'মদনানি বুড়ো জানে ঠিক।'

'কী জানে?'

'অশ্বের খবর।'

'জানে!' অনন্তর দু–চোখ বিস্ফারিত, 'কী জানে?'

'মদনানি সায়েবের গায়ে ধুলোর গন্ধ।'

'আমি তো দেখিইনি লোকটাকে।'

ভানু বলে, 'গুমোট গন্ধ, মাটির তলায় ছিল তো।'

'কী জানি!'

ভানু বলে, 'জাহাজ আছে, কিন্তু কোন সাগরে?'

'তার মানে?'

'কোন সাগরে জাহাজ চলে?'

হি–হি করে হাসে অনন্ত, 'মীরগোদা, শালার বহুত টঙ্কা।'

ভানু বলে, 'তুই বস, আমি তোর মেয়েকে দেখে আসি।'

বলেই ভানু সি–বিচ ধরে হাঁটতে আরম্ভ করে। সেই কতদিন আগের কথা। পেরুমল বাজাজ কীরকম হা–হা করে হাসত। গঙ্গার পাশে ইটখোলা, গঙ্গার দিকে তাকিয়ে একদিন তার চোখে জল, 'হামি সিন্ধু দেখি নাই!'

সেই কতদিন আগের কথা এসব। হাজার, দু–হাজার বছর আগের। মহেঞ্জোদারো যখন বেঁচে ছিল, তখনকার কথা। প্রেম মদনানি এত বুড়ো যেন সেই মহেঞ্জোদরোর গন্ধ নিয়ে হাজির।

ভানু উঠে গেছে উপরে। নিঝুম অন্ধকারে ভানু নিজের পায়ের শব্দ শোনে। বারান্দায় নীল আলো। ভানু বারান্দায় পৌঁছে দ্যাখে বুড়ো মদনানি বসে আছে, 'তুম কৌন, কৌন হায়?'

'সায়েব আমি ভানু।'

'পঞ্চম ঠাকুর, কেয়া?'

'সায়েব মেয়েটা?'

'মেয়েটা, দ্যাট গার্ল, সিন্ধু?'

'সিন্ধু!'

অন্ধকারে ভানু শোনে, 'সিন্ধু রিভার মিল গিয়া, সমঝতা?'

ভানু চাপা গলায় বলে, 'মেয়েটা কই?'

'শি ইজ স্লিপিং।'

'ঘুমায় কেন সন্ধ্যেবেলা?'

বুড়ো বিড়বিড় করে, 'সন্ধ্যেবেলায় নদী ঘুমায়, হামার সিন্ধু, ফ্রেশ ফ্রম দ্য হেভেন, ঘুমায়, অন্ধকার তো! অন্ধকারে নদী ঘুমায়, রুপয়া মাঙ্গতা?'

'নেহি সাহেব।'

'মোন–জো–দারো মালুম?'

'মালুম।'

'হামি মোন–জো–দারোর আদমি আছে, ম্যান ফ্রম দ্য ওলডেস্ট সিভিলাইজেশন।'

'জানি সায়েব, কুন্তিরে দেখাও–না।'

'রুপয়া মাঙ্গতা?'

'নেহি সায়েব, লেড়কির বাবা পাঠাল।'

বুড়ো খিক খিক করে হাসে, 'হামি আরিয়া আছে, আরিয়া সমঝতা?'

'নেহি সায়েব।'

'আর্য, আরিয়া ফ্রম দ্য ভ্যালি অব ব্ল্যাক সি, কাস্পিয়ান লেক, টল অ্যান্ড স্টাউট, লাইক গড ফ্রম দ্য হেভেন!'

ভানু বলল, 'সায়েব কুন্তির সঙ্গে কথা বলব।'

'রুপয়া তো মিলা, আভি হোবে না, তুম কৌন হ্যায়? ম্যায় আরিয়া হু, মোন–জো–দারো সিভিলাইজেশনের আদমি আছে, সিন্ধু নদী হামার নদী আছে, হামি হামার নদী পেয়ে গেছি, আভি নিকলো, রুপয়া সকালে পাবে, কিতনা রুপয়া মাঙ্গতা, হামি এখন সিন্ধু নদীর ধারে বসে হামার অ্যানসেস্টরদের মনে করব, সমঝতা? তুম তো ইডিয়ট আছে ঠাকুর, তুমি সিন্ধু জানে না, আরিয়া জানে না, তুমি মোন–জো–দারো জানে না, সিন্ধু দেশ জানে না।'

'জানি সাহেব, কিন্তু মেয়েটারে একবার চোখে দেখব।'

'হাম কেয়া বোলা, এ সুগ্রীব, কাঁহা গিয়া?'

ভানু বসে পড়েছে, 'সায়েব আমি চলে যাচ্ছি।'

‘হাঁ, যাও, সানডাউনের পর আর আসবে না।’

ভানু বসে আছে। সাহেব ঝিমোচ্ছে। ভানুর মাথাটা ভার লাগছে। মাথার উপর ঘন মেঘে ঢাকা আকাশ। ভানু তাকিয়ে আছে বুড়ো সাহেবের দিকে। সাহেব বিড়বিড় করছে। কী যে বলছে ঝিমোতে ঝিমোতে তা ভানু বুঝতে পারে না।

একটু বাদে ভানুর চটকা ভাঙে, শুকনো নেশা আসলে সব ভুল করিয়ে দেয়। ভানুর মনে হয় সকাল থেকে বসে আছে যেন। মনে হয় যখন আঁধার নামল তখন থেকে বসে আছে। আর আঁধার নেমেছে যেন এক যুগ আগে। ভানুর মনে হয় অনন্তকাল ধরে বসে আছে সায়েবের পায়ের কাছে।

প্রেম মদনানি ডাকে, ‘এ পঞ্চম ঠাকুর।’

‘আমি ভানু।’

‘নেহি তুম পঞ্চম, তুমহারা লেড়কি আচ্ছি হ্যায়।’

ভানু বলে, ‘তুমি কেডা সায়েব, কহ দেখি।’

‘মতলব?’

‘তুমি মেঘ দেখতে আস?’

‘হাঁ, তুমার অবজেকশন আছে?’

‘নেহি সায়েব, সায়েব তুমি মোন–জো–দারো....কবে যেন বলছিলে?’

সায়েব বলে, ‘এ পঞ্চম ঠাকুর, তুম আভি নিকলো, রুপয়া তো লে লিয়া।’

ভানু বলল, ‘এ সায়েব, তুমার জাহাজখানা খুব বড়ো?’

‘হাঁ, তুমি জাহাজে চাপবে?’

‘না সায়েব, মেয়েটারে দেখাও।’

‘সি ইজ স্লিপিং।’

‘সকালে স্লিপিং, বিকেলে স্লিপিং, ও জাহাজবাবু, এত ঘুম ঘুমায় কেনে কুন্তি, তুমি উয়ারে দেখাও।’

তখন সাহেব বলল, ‘এ পঞ্চম ঠাকুর, এ লেড়কি হামি লিয়ে যাবে।’

‘কোথায়?’

‘হামার সিন্ধু রিভার যেখানে আছে।’

‘সায়েব, মা বাপ কাঁদবে।’

‘লেড়কি ভালো থাকবে, পাঁনশো রুপয়া সালারি পাবে, হামি আকেলা আদমি আছে, এক বেটা মুম্বই, এক বেটা চেন্নাই, হামার দেখভাল করবে তুমার লেড়কি।’

ভানু বলল, ‘ডর খাবে।’

‘মতলব?’

‘ডর লাগবে সায়েব।’

‘কিঁউ?’

‘তুমি হলে কবর থেকে উঠা মানুষ, ও লেড়কি ছোটো মেয়ে, চোদ্দো বছর, ওনলি ফরটিন, সায়েবরে ও ভয় পাবে।’

প্রেম মদনানি বলল, ‘পঞ্চম ঠাকুর, তুমি চুক্তি করেছ।’

‘কী চুক্তি?’

‘লেড়কি হামি লিয়ে যাবে।’

‘সায়েব আমি ভানু।’

এতক্ষণে সাহেবের যেন খেয়াল হয়, ঝুঁকে পড়ে ভানুর উপর, একশো পাওয়ারের বালবে আলো নেই তেমন, লো ভোল্টেজ। সায়েব তার প্রাচীন চক্ষু নিয়ে দেখতে দেখতে বলে, ‘কৌন ভানু?’

‘ঘোড়ার সহিস।’

‘কৌন ঘোড়া?’

‘শ্রীপতিবাবুর ঘোড়া, আমার ঘোড়া।’

‘কৌন শ্রীপতি?’

শ্রীপতি মাইতি।

‘উ কৌন হায়?’

‘হোটেলকা মালিক।’

‘কৌন হোটেল?’

‘সমুদ্রপাখি।’

‘কৌন সমুদ্র?’

‘বে–অব–বেঙ্গল।’

‘কৌন পাখি?’

ভানু হ্যা–হ্যা করে হাসে, ‘এ কেমন কথা, ব্যাঙের মাথা।’

‘কৌন ব্যাং?’

‘সোনা ব্যাং?’

‘কৌন সোনা?’

‘হলুদ সোনা।’

‘কৌন হলুদ?’

‘গায়ে হলুদ, জাহাজবাবু, কুন্তির মা কাঁদবে, কুন্তির বাপ কাঁদবে, মেয়ের গায়ে হলুদ হবে, সেই মেয়ে কিনা তোমার সঙ্গে যাবে?’

প্রেম মদনানি বলল, ‘শুন বেটা, পঞ্চম ঠাকুর তো বলেছে লিয়ে যেতে।’

‘টঙ্কা নিল পঞ্চম ঠাকুর?’ উঠে এসেছে অনন্ত সার। অন্ধকারে অন্ধকারে, ঘোরালো চোখে খুঁজে খুঁজে ঠিক উঠে এসেছে জাহাজবাবুর গেস্ট হাউসে।

প্রেম মদনানি বলে, ‘তুম কৌন?’

‘লেড়কির বাপ হুজুর।’

‘কৌন লেড়কি?’

‘কুন্তি লেড়কি।’ বলল ভানু।

‘লেড়কির ক–টা বাপ আছে?’ প্রেম মদনানি খ্যা খ্যা করে হেসে ওঠে, ‘পঞ্চম ঠাকুর বলে, সে লেড়কির বাপ, আবার এ ঘোড়েকা সহিস বলে লেড়কির বাপ, তুম ভি বোলো, হাম কেয়া করে?’

ভানু বলল, ‘হুজুর, মা বাপ, তুমি হুজুর জাহাজের মালিক, মেয়ের গায়ে হলুদ হবে, মেয়ের বিয়া হবে, তুমি কেন নিয়ে যাবে?’

‘কবে হবে?’ অনন্ত ঘুরে জিজ্ঞেস করে ভানুকে।

‘একদিন হবে।’

‘ধুস শালা, পেটে ভাত হয় না তো মেয়ের বিয়ে, হুজুর কি কাজে নেবেন?’

‘হাঁ।’

‘ঝি–গিরি করবে হুজুরের বাড়ি?’

‘হাঁ, হাঁ, সুখ পাবে।’

‘কত বেতন?’

‘পাঁনশো রুপয়া।’

‘বেশি হয় না হুজুর?’

‘আচ্ছা আটশো পাবি।’

‘হাজার হয় না হুজুর?’

‘লেড়কি দে, তবে হাজার পাবি।’

অনন্ত বলল, ‘দেব, তবে এ দু–হাজার কিন্তু আলাদা।’

‘কৌন দো–হাজার?’

‘সকালে যেটা নিলাম।’

‘তিন হাজার নিল পঞ্চম।’

অনন্ত বলল, ‘দিল তো দু–হাজার, বাকিটা মেরেছে, হুজুর মা বাপ, জাহাজে কাজ হবে হুজুর, মা বেটি দুজনায় খাটবে।’

‘মাস মাস হাজার পাবে, ফির কিঁউ?’

‘হুজুর তুমি আমার মেয়েটারে লাও, মুখে ভাত দিতে পারিনে।’

ভানু এত সময় চুপ করে ছিল, আচমকা খেপে ওঠে, ‘এই শুয়ার, তুই কী বলিস, তোর মেয়ে লিয়ে যাবে, মেয়ে দিয়ে দিবি?’

‘দেব তো কামে, কাজ করবে, পেটে ভাত জোটবে।’

‘না।’

‘না কেন রে?’ আচমকা অনন্ত ঝাঁপিয়ে পড়ে ভানুর উপর, ‘ঘোড়াটা তুমার ছেল, তুমি খুঁজতে যাও, আমারে একবার টঙ্কা দিলে, মেয়েটা আমার, মেয়েটা যাক, আমি খুঁজি আনব, তখন শালা তুই যেতি পারবিনি।’

ভানু বলল, ‘অনন্ত, তোর নেশা হয়ে গেছে।’

‘নেহি, ও জাহাজ বাপ, জাহাজ ভরতি টঙ্কা থাকে শুনেছি, মেয়ের বাপরে এখন কুছু দাও, এক হাজার দাও, দু–হাজার দাও, তিন চার…।’

‘মেয়েরে দেখবিনে অনন্ত?’ ভানু বলে।

‘না, সকালে দেখে যাব।’

‘মেয়ে তোর ঘুমায়।’

‘ঘুমাক, কত দিন ঘুমায়নি কচিটা।’

‘অনন্ত, তোর আর ছেলেমেয়ে নাই।’

‘চোপ!’ অনন্ত আবার ঝাঁপাতে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে ছাদের উপর। পড়েই থাকে। প্রেম মদনানি! কই সে তো নেই। দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। ব্যালকনি থেকে লম্বা প্যাসেজ, তারপর সব দরজা বন্ধ। নিথর নিস্তব্ধ। আচমকা বারান্দার আলোটাও নিভে গেল। অনন্ত ডাকল, ‘ভানুবাবু।’

ভানু সাড়া দেয়, ‘সে নেই।’

‘কে?’

‘মদনানি, কবরে গিয়ে ঢুকেছে, হত আমার পেরুমল বাজাজ, কীর’ম দয়ালু মানুষ, পঞ্চম ঠাকুর এ কারে দেখাল অনন্ত?’

অনন্ত বলে, ‘কুন্তিরে ডাক।’

‘ঘুমায়।’

‘তবু ডাক।’

‘কেন মেয়ে তো ওর হয়ে গেছে।’

‘না, মেয়ে আমার।’

ভানু বলল, ‘লোকটা ভালো না অনন্ত, কুন্তির খুব বিপদ।’

‘লোকটা খারাপ?’

‘মড়া! মড়া উঠে এয়েচে টের পাসনি নুনওয়ালা!’

ভোর ভোর পঞ্চম ঠাকুর অলংকারপুরে হাজির, ‘অন্তা হে।’

রোদ ওঠেনি। ভোরের আকাশের এখানে ওখানে কালো মেঘের পোঁচ, যেখানটায় মেঘ নেই, আকাশ ডিমের গায়ের মতো সাদা, পুব দিকটায় ঘন ঝাউবন ঢেকে রেখেছে ডিমের হলুদ কুসুম রং, উত্তর–পশ্চিমে ভেড়িবাঁধ, সেও তো প্রায় দশ মানুষ উঁচু। সমুদ্রপাখি হোটেল থেকে বেরিয়ে জেলে পাড়ার কাছ থেকে ভেড়িবাঁধে উঠে সাইকেলে বনবন করে এসেছে পঞ্চম ঠাকুর। অনন্তর বউ তাকে আসতে দেখেছে। বাঁধ থেকে সাইকেল গড়িয়ে কালো ফুটকির মতো মানুষটা বড়ো হয়ে গেল। বড়ো হতে হতে চেনা মানুষ হয়ে গেল। ‘ঠাকুর মশায়, ঠাকুর মশায়, কুন্তি ভালো আছে?’

পঞ্চম ঠাকুর ঘেমে গেছে খুব। পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখ মুছল, বলল, ‘ভালো তো আছে, ভালো থাকবে, অন্তা হে, অন্তা।’

সরস্বতী বলে, ‘শুয়ে আছে।’

‘এত বেলা, এখনও ঘুমায়, ঘুমাবে তো, দুটো হাজার টঙ্কা মারছে, ইখন আর চিন্তা কী, উয়ারে ডাক।’

‘কী হইছে?’

‘কথা আছে।’

‘কী কথা?’

পঞ্চম ঠাকুর বলে, ‘মোর সাথে যেতি হবে।’

কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই কুন্তির মা সরস্বতীর বুকটা ধক করে ওঠে। তিন দিন মেয়ের মুখ দ্যাখেনি। বাপ গিয়েছিল সেই দিন সন্ধ্যেয়, বলেছে মেয়ের সঙ্গে দেখা হয়নি, ঘুমাচ্ছিল। সব মরে গিয়ে ওই একটা বেঁচে আছে, কাজ করে রাতে ঘরে তো ফিরবে! বুড়ো সাহেবের কাছে আছে অবশ্য। জাহাজবাবু ওর ঠাকুরদার মতো, তবু তো সে পুরুষমানুষ। সরস্বতী মাথার কাপড় টেনে জিজ্ঞেস করে, ‘মেয়্যার ছাড় হবে কবে ঠাকুরমশায়?’

ঠাকুর বলল, ‘কেনে, কামে আবার ছাড় কী?’

‘ঘরে ফিরবা কবে?’

ঠাকুর বলল, ‘কহ তো মেয়্যাকে দিয়ে যাই, টঙ্কাও ঘুরাই দাও, তুমরা কী ভাবো কহ দেখি, ডাকো উয়ারে।’

ঠাকুরের চণ্ডমূর্তি দেখে সরস্বতী সিটিয়ে যায়। ভরা ভাদ্র মাস। কামকাজ নেই, অন্নসংস্থান নেই, পঞ্চম ঠাকুর যদি এই কাজটা না দিত, কী হত? মেয়ে তবু খেয়ে বাঁচছে, তারাও বাঁচছে। অবেলায় ঘুমোতে পারছে মেয়ে। কেন ঘুমায়? শরীর কি খারাপ হল? তার উদ্বেগে জল ঢেলে দিয়ে মেয়ের বাপ বলেছে, ‘তা কেনে, শান্তিতে ঘুমাচ্ছে, আরামে ঘুমাচ্ছে, কচিটা ঘুমাইছে ক–দিন কেনে কহ দেখি, জাহাজের মালিক, জাহাজ ভরতি টঙ্কা উয়াদের, বাণিজ্য করে টঙ্কা লিয়ে ফেরে।’

অনন্ত বেরিয়ে ঠাকুরকে দেখে চমকে ওঠে, ‘কী হইছে?’

‘কুছু না, মোর সাথে চ।’

‘কুথায়, কেনে?’

‘কাম আছে।’

অনন্ত অবাক হয়ে ঠাকুরের দিকে তাকিয়ে থাকে, পঞ্চম ঠাকুর কি ভগবান! বাড়ি বয়ে কাজের সন্ধান দিতে এসেছে? সে ইঙ্গিত করতে দাওয়া থেকে খাটিয়া টেনে নামাতে থাকে সরস্বতী। পঞ্চম মাথা ঝাঁকায়, ‘না না, বসবনি, অন্তা মোর সাথে চ।’

‘কাজটা কী ঠাকুর মশায়?’

‘গিয়ে জানবি।’

‘টুকুন খাড়াও, মাঠ সেরে হাতমুখ ধুয়ে আসি, চা করুক কুন্তির মা।’

অনন্ত চলে গেলে কুন্তির মা খাটিয়াটা নামিয়ে দিল উঠোনে। ভিজে বালি কী ঠান্ডা, নরম, মোলায়েম! পায়ের পাতা মেলে দাঁড়িয়ে থাকল সরস্বতী। পঞ্চম ঠাকুর অন্য দিকে চেয়ে আছে। পকেট থেকে বিড়ির কৌটো আর দেশলাই বের করে বিড়ি ধরিয়ে আকাশে তাকিয়ে উদাসীন হয়। পঞ্চমের সঙ্গে সঙ্গে সরস্বতীও আকাশে তাকায়। আকাশে কিছু খুঁজে না পেয়ে পঞ্চম ঠাকুরের দিকে চেয়ে থাকে। তার চোখের পাতা পড়ে না, দৃষ্টি টান টান। চোখ সরছে না সরস্বতীর, যেন চোখ সরালেই অদৃশ্য হয়ে যাবে পঞ্চম ঠাকুর। অথবা চোখ সরালেই সরস্বতীর বিপদ। বিপদ তো নিশ্চয়ই! পঞ্চমের কাছে তার মেয়ে। পঞ্চমের কাছেই যেন রেখেছে।

পঞ্চম ঠাকুরই গলাখাঁকারি দেয়, ‘চা করবানি?’

সরস্বতী জবাব দেয় না। সরস্বতীর বুক কাঁপছিল কেন যেন, বিড়বিড় করে, ‘মেয়্যাটারে আজ ঘুরাই দিবে রাত্তির করে?’

পঞ্চম মাথা ঘুরায়, ‘কেনে?’

‘একটাই তো ছা, আর নাই, মেয়্যা ছাড়া থাকি নাই।’

‘তবে টঙ্কা ঘুরাই দাও, মেয়্যারে তো তুমরা দিইছ, খালি মনেই তো দিইছ।’

‘কাল সকালা আবার যাবে।’

‘ওইরকম তো কথা ছিলনি!’

সরস্বতী চুপ করে যায়। দূরের মাঠের দিকে তাকায়। মেয়ের বাবা কি এল? শূন্য মাঠ, ধীর গমনা মেঘ, রৌদ্রবিহীন সকাল—সবদিক যেন ঝিমিয়ে আছে। সরস্বতী নিশ্চুপ তাকিয়েই থাকে মাঠের দিকে, শূন্য দৃষ্টি! পঞ্চম ঠাকুর ঘুরে বসেছে! তাকিয়ে আছে নুনমারা অনন্তর বউটার দিকে। বউটা টের পাচ্ছে না তাকে দেখছে আর একজন। আচমকা সরস্বতী ঘুরতে পঞ্চম ঠাকুর ধরা পড়ে গিয়ে হাসল, ‘কী দ্যাখো?’

সরস্বতী বলল, ‘টঙ্কা তো ধরাই আছে, তিন দিনের পয়সা দিয়া ছাড়ি দিক।’

চমকে ওঠে ঠাকুর, ‘কী কহ, টঙ্কা খরচ করো নাই?’

‘না, সবটা ধরা আছে।’

‘দিয়া দিবে?’

‘হাঁ।’

পঞ্চম ঠাকুর বলে, ‘তা তো হবেনি।’

‘কেনে?’

‘তিন হাজার দিতে হবে।’

‘তিন হাজারই তো আছে।’

‘দু–হাজার দিলাম না?’

‘পরে কুন্তির বাপ আর এক হাজার আনছে।’

‘কবে?’ ঠাকুর অবাক।

‘ওই দিন সাঁঝে।’

‘জানিনি তো।’

‘তুমি এক হাজার মারিছ?’

'কে কহে?'

'জাহাজবাবু, এত টঙ্কা দেয় কেনে গো?'

ঠাকুর বলল, 'আছে তাই।'

'কত আছে?'

'অনেক, সোনায় মুড়িয়ে দিতে পারে মেয়্যারে।'

'কেনে দিবে মেয়্যারে?'

'কাজ করছে তো, দিল আছে বাবুর।'

'কাজ তো ঝি–গিরি, উয়ার জন্যি এত দিল কেনে গো?'

'দেওয়াও দোষ!' বিরক্ত হয় ঠাকুর।

সরস্বতী বলে, 'ডর লাগে যে।'

'কেনে, ডর কীসের?'

'এত টঙ্কা, তুমি মেয়্যাটারে দিয়ে এলে তো হাজার টঙ্কা মারলে, তুমি কী কাম করলে যে অত টঙ্কা পাবে?'

পঞ্চম বলল, 'দিল ভালোবেসে।'

'কীসের ভালোবাসা?'

বিরক্ত হয় পঞ্চম ঠাকুর, 'জানিনে যা, এত যদি কথা তো মেয়েরে রাস্তায় রেখে দিতে পারতিস, পাঠালি কেনে?'

'তুমি যে পাঠালে।'

'মেয়্যা কি আমার যে আমি পাঠাব।' ঝপ করে উঠে দাঁড়ায় পঞ্চম ঠাকুর, 'আমি পাঠাইনি, মোর নামে ইসব কহিবেনি, মু কেনে পাঠাব, মোর কেডা কুন্তি?'

'তুমি যদি না পাঠাও তুমি হাজার টঙ্কা নিলে কেনে?'

'নিয়েছি কে কহিছে?'

'সায়েববাবু, কুন্তির বাবু।'

'ঝুটা সব, মু কুছু পাই নাই, মু যাই।'

'না, যাবেনি।' সরস্বতী আচমকা এগিয়ে এসে পঞ্চম ঠাকুরের সামনে দাঁড়ালে ঠাকুর বসে পড়ে আবার। সরস্বতী বলে, 'মেয়্যাটারে দেখা যাবেনি?'

'দু–তিন দিন হইছে মাত্তর।' ঢোক গেলে পঞ্চম ঠাকুর।

'তিন দিন, মেয়্যা নাকি ঘুমায় শুধু?'

'কী করে জানব?'

'তুমি জানো ঠাকুরমশায়, ওটা মোর পেটে ধরা, ওটাই বাঁচি আছে।'

ঠাকুর বলল, 'তুমি চুপ করো, অন্তা আসুক।'

'কী হইছে ঠাকুর কহ দেখি?'

'কী হবে?'

'সকালে কী কামে এলে ঠাকুর?'

ঠাকুর চুপ করে থাকে। সরস্বতী তার সামনে দাঁড়িয়ে। ঠাকুর মাথা নামিয়ে আবার একটা বিড়ি ধরায়। অনন্ত এল। অনন্ত আসতেই ঠাকুর ধড়ে প্রাণ পায়, উঠে বলে। 'চ, চ, তাড়াতাড়ি চ।'

'যাবে তো, কিন্তু মোর কথাটার জবাব কী হল?'

'কী কথা?' অনন্ত তার বউকে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে।

'অত টঙ্কা দিবে কেনে?'

'কে দিবে?' অনন্ত আরও অবাক।

'জাহাজবাবু, টঙ্কা থাকলেই দেয় নাকি?'

অনন্ত বলল, 'দেয়, এমনি দেয়।'

'না, এমনি দেয় না।' সরস্বতী আচমকা মাটিতে বসে ফুঁপিয়ে ওঠে, 'মেয়্যাটারে কতদিন দেখি নাই গো, তিনজনায় দীঘায় গেলাম, দুজন ঘুরি এলাম, মেয়্যাটা এলনি।'

'আহ্!' অনন্ত বিরক্ত হয়, 'কামে দিলি কেনে, তিন দিন গেছে, কানছিস কেনে?'

'ভালো খাচ্ছে, পরছে।' ঠাকুর বলতে বলতে থেমে যায়, বিড়বিড় করে, 'এমন তো দেখিনি, আগে বললে দিতাম না, টঙ্কা নিলে কেনে?'

অনন্ত ঘরে ঢুকে জামা এনে পিঠে ফেলে ঠাকুরকে তাড়া দেয়, 'চলো।'

সরস্বতী বলল, 'মু যাব।'

'কেনে?' অনন্তর দুই ভ্রূ কুঞ্চিত, মুখে বিরক্তির চিহ্ন।

'মেয়্যারে লিয়ে আসব।'

'কেনে?'

'মেয়্যারে লিয়ে ডর লাগে, কাম দরকার নি।'

'ভাত দিবে কে?' অনন্ত গর্জে ওঠে।

'মা–বেটি ভাত জুগাড় করে লিব।'

'থাম থাম, অনেক হয়েছে, লাটের বেটি, কোন মেয়্যাটা কাজ করে না, ভালো বাবু পেয়েছে ওর কপাল ভালো।'

'না আমি যাব।' সরস্বতী আটকাতে চায় দুজনকে।

অনন্ত বলল, 'কী করিস সরস্বতী, মেয়্যাটা ভালো আছে, মু দেখে এলাম, সাথে ভানুবাবু ছিল, তারে জিগাস।'

'তুমি যে বললে দেখা হয় নাই।'

'কে বলল?'

'তুমি তো কহিছ, সাঁঝবেলায় ঘুমাই ছিল।'

'ছিল, তাতে কী হল?' অনন্ত এগিয়ে যায় পঞ্চম ঠাকুরের সাইকেলের পিছনে পিছনে। সরস্বতী থমথমে পাথর। পঞ্চম ঠাকুরের সাইকেলের রডে অনন্ত। ঠাকুর সাইকেল চালিয়ে দিল। একটু গিয়ে নামল। এবার সাইকেল ঠেলে তুলছে ভেড়িবাঁধের উপর। ক্রমশ কালো ফুটকি হয়ে যাচ্ছে দুজনে। সরস্বতী শক্ত হয়ে যাচ্ছিল। ভয়টা যে কেন ধরল? কাল রাত কেন, আজ সকালেও তো সে নিরুদ্বেগেই ঘর থেকে বেরিয়ে উঠোনে দাঁড়িয়েছিল। আকাশ দেখছিল, ভেড়িবাঁধ দেখছিল, দূরের ঝাউবন দেখছিল। তারপর ভেড়িবাঁধ থেকে শয়তানের মতো নেমে এল পঞ্চম ঠাকুর। এত সকালে ঠাকুর কেন? হোটেলে গেলে দূর দূর করে যে লোক তাড়ায়, মুখে অশ্রাব্য ভাষা ছোটায়, সে লোক কোন ধান্ধায় আসে তা কি আন্দাজ করা যায় না? কেন এত মধুর হল পঞ্চম ঠাকুর? কেন পনেরো দিনের কাজের লোককে অত টাকা দেয়? কাজের মেয়ে সন্ধ্যেবেলায় ঘুমোয় কেন? তার বাপ তার মুখটিও দেখতে পায় না কেন? সব চিন্তা আজ একটু আগে এই উঠোনে পঞ্চম ঠাকুরকে দেখেই মনের ভিতরে ভেসে উঠেছে। আশঙ্কা হোক, চিন্তা, উদ্বেগ হোক তা ডুবে ছিল মাথার অন্ধকারে, আচমকা ভেসে উঠতে সরস্বতী দিশেহারা। পঞ্চম ঠাকুর না এলে এসব মনেই হত না। কী যে করে এখন সরস্বতী, চারটে গিয়ে একটা আছে, তাই বড়ো ভয়। যে চারটে গেছে তারা যদি টানে? কী সব্বোনাশ! সরস্বতী দীঘায় যাওয়া মনস্থ করে।

তখন দীঘার রাস্তায় ভেড়িবাঁধ থেকে নামল দুজন। পঞ্চম ঠাকুর বলল, 'মোর ছোটো শালিটো কলকাতায় কাজ করে মন্ত্রীর ঘরে।'

'তার মানে?'

'মন্ত্রীর কাজ পছন্দ হয়েছিল, যাওয়ার সময় লিগে গেল।'

অনন্ত চুপ করে আছে। তার ভিতরে কেমন যেন অন্ধকার ছায়া ফেলছে।

ঠাকুর বলল, 'রানির মতন রাখি দিইছে, তিন ভরি গয়না গড়াইছে শেলু; কাপড়চোপড় কত, কথা আছে বিয়ার আগে লিয়ে আসব, শেলুর বাবু কহিছে উকে ছাড়বেনি, উয়ার সোয়ামিকেও কাজ দিবে কলকাতায়। সেবার এল, পাঁচ হাজার টঙ্কা দিয়ে গেল ওর মার হাতে, মাসে মাসে তো সাতশো টঙ্কা মনিঅর্ডারে পাঠায়, তবে বোঝো।'

'হুঁ।' অনন্ত হাঁটছিল। ঠাকুরের পাশাপাশি। পুরোনো দীঘার বাজার এলাকায় ভিড় খুব! পর পর বাস এসে ঢুকছে। তেমন লোক না থাকলেও বাস তো ঢুকবেই। বাজারও বসে গেছে রাস্তায়। ঠাকুরের কথা শুনতে শুনতে অনন্তর ভিতরে উদ্বেগ জন্মাচ্ছে। কাফেটেরিয়া ছাড়িয়ে এসে ঠাকুর আবার তাকে সাইকেলে ডাকতে সে বলল, 'হুটেলে যাবানি, ও ঠাকুরমশায়?'

ঠাকুর হাসে, 'মদনানি সায়েবের কাছে যাব।'

'কেনে?'

'উনি তো ডাকছেন তোরে।'

'তুমি যে বললে কাম আছে নোতন।'

'তো কী বলব, তোর বউ যেরকম ছিন মারতি লাগল।'

'মদনানি সায়েবের নিকট কেনে, কুন্তির কুছু—!' কথা শেষ করতে পারে না অনন্ত, গলা বুজে যায়।

মাথা নাড়তে নাড়তে ঠাকুর তাকে টানে সাইকেলে, 'তা'লে কি আমি হাসতি পারতাম, কুছু না, সায়েব এমনিই ডাকে, কী যেন কহিবে তুরে।'

আরও একটু বাদে, নতুন দীঘার কাছে, সেই গেস্ট হাউসের কয়েক কদম আগে ঠাকুর সাইকেল থেকে নেমে অনন্তকে বলল, 'শুন, মেয়্যাটারে উনি লিয়ে যেতে চান, তোরা কীরকম কী চাস তা শুনতি চান।'

'তার মানে?' অনন্তর গা কেঁপে ওঠে।

'মানে এত বুঝাতি হবে কেনে, ওর কাজ সায়েবের পছন্দ হইছে, সায়েব তো শুধু ঘুরে বেড়ায়, মেয়্যাটারে সঙ্গে লিবে।'

'তার মানে মেয়্যা দীঘায় থাকবেনি?'

'কী করে থাকবে?'

'সায়েব লিয়ে যাবে?'

'যাবে।'

'জাহাজে?'

'হাঁ, তা কহিতে পারিস, জলের জাহাজ, উড়াজাহাজ, সব জাহাজেই লিবে।'

'মানে কি সাহেব ঘুম পাড়াই রাখবে?'

'কীসব কহিস?'

'মরি যাব রে ঠাকুরমশায়।'

হাসল ঠাকুর, 'নগদ পনেরো হাজার দিবে, আর মাসমাইনে যা জমবে তা এই সময় এসে দিয়ে যাবে, তোর আর তোর মেয়ের কপাল তো খুলে গেল।'

‘পনেরো হাজার!’

‘হাঁ।’

‘অত দিবে কেনে?’

‘মেয়্যাটারে পসন্দ হইছে, বুড়া সায়েব, মনে ধরিছে সায়েবের, দেখিস কীরকম বিয়া হয় উয়ার, হিল্লে হই গেল, শুন অনন্ত...।’ পঞ্চম ঠাকুর বোঝাতে থাকে নুনমারা অনন্ত সারকে।

বালিমুন্ডা থেকে ফেরার পর ভানু আর বেরোনোর কথা ভাবছিল না। আর শ্রীপতি মাইতিও ঘোড়ার কথা বিশেষ বলেনি। শ্রীপতি বিব্রত ছিল তার প্রেমিকা ভারতী আর মধুমিতার দ্বন্দ্ব নিরসনে। জীবন অমধুর হয়ে পড়েছিল। তিক্ত, কষায়। কিন্তু শ্রীপতির এমন দশা যে ভারতীকে জবাব দিয়ে মধুমিতাকে যে বলবে, আর কোনোদিন হবে না, তাও তো হয় না। ভারতীর উপর মায়া আছে, মমতা আছে, মধুমিতাকে মনে হয় নিদয়া। সে কি মধুমিতাকে ত্যাগ করে ভারতীর কাছে যাচ্ছে? ভারতী তাকে মনে মনে ভালোবেসে ফেলেছে, সে কি তার দোষ? ভারতী যে মনপ্রাণ সমর্পণ করেছে তার উপর, তার জন্য তার কতটা দায়? এসব কে বোঝে, মধুমিতা! সে তার সব সম্পত্তির মালিক, দলিল মোতাবেক সম্পত্তির অংশভাগী হয়েছে, তবুও তো নিশ্চিন্ত হয় না। এক এক সময় শ্রীপতির মনে হয় তার হাড় মাংসও রেজেস্ট্রি কোবলা করে দিয়ে দেয় মধুমিতাকে। মেয়েমানুষের ক্রোধ কমে না। ভারতীকে সমুদ্রতীর ছাড়া করবে এই হল মধুমিতার পণ।

এরই ভিতরে হারিয়ে যাচ্ছিল ঘোড়াটা। একদিন আচমকা মনে পড়ল মীরগোদার কুহকিনীর কথা। কোকিলার কথা। ওফ্। সে যদি কোনো কুহকিনীর মায়ায় পড়ত, পড়ে বন্দি হত, তাহলে বোধ হয় শিক্ষা হত মধুমিতার। শুধুই বা তার কেন, ভারতীরও। ভারতী নাকি জাদুকরি, ওই কথা বলে মধুমিতা, ভারতী নাকি ডাইনি, তুকতাক জানে, কুহক করেছে তাকে। কুহক! ভারতী যদি কুহকই করত, তবে কি মধুমিতা তাকে খুঁজে পেত? ভারতী তাকে উধাও করে দিত না কোকিলা সুন্দরীর মতো? মদরঞ্জিতে বন্দি করে ফেলত না! হায় রে কোকিলা! তুই যদি পক্ষীরাজকে না ডেকে সেই পূর্ণিমার রাতে, বৈশাখী চাঁদের আলোয় আমাকে টেনে নিতিস, তবে না আমি বাঁচতাম। কোথায় যে কার কুহকে ঘুরছে ঘোড়াটা। কোকিলা সুন্দরী তাকে কি হাওয়া করে দিল!

যেদিন মদনানির বাড়িতে সকাল সন্ধ্যেয় ঝাঁপাল ভানু, তার পরের দিন শ্রীপতি তাকে ডেকে বলল, 'ঘোড়াটা কি পথের কুকুর?'

'কেন?'

'ও কি অনাথ?'

'তা কেন হবে?'

'ওর কি কেউ নাই, পথের কুকুরের মতো হেথা–হোথা ঘোরে?'

'কী যে বলেন আপনি!'

'তবে কেন ওরে খুঁজা হচ্ছেনি?'

কথা শোনামাত্র ভানুর রক্ত চঞ্চল। তারও ক–দিনেই হাঁপ ধরে গিয়েছিল। টানছিল সেই গঙ্গাতীর। প্রেম মদনানিকে দেখে পেরুমল বাজাজ–সিন্ধির কথা, তার কথা থেকে জুট মিল, তার পরিবার, ফুলরানি, ফুলরানির বাপ–মা, ফুলরানির কোলেরটা! তার হাতে ঝুমঝুমি দিয়ে সেই যে ভোজপুরের ট্রেনে তুলে দিল, আর কি খবর জানে? জুট মিল খুলল হয়তো। হয়তো মিল বস্তিতে তার জন্য অপেক্ষা করছে ফুলরানি। দেশ থেকে ফিরে এসেছে বাপ মার সঙ্গে। গঙ্গাতীর! তার যেমন গঙ্গানদী, পেরুমলের তেমনই সিন্ধু! গঙ্গার কূলে ইটভাটার চিমনি, পর পর ইটের ভাটা। বাজাজের ভাটা, জলধর দাসের ভাটা, নগেন ঘোষের ইট খোলা, তারপর চীনে সাহেবের মন্দির, নিঝুম চীনেম্যানতলা, তারপর বাসে কিংবা ভ্যান রিকশায় চেপে চলে যাও জুট মিল, তাও তো গঙ্গার কূলে।

ভানু বলল, 'তাহলে যাই?'

'কোন দিকে যাবি?'

'পুবদিক।'

'পুবদিক মানে?'

'পুব মানে পুব, হিজলি মসলন্দি, রসুলপুরের ঘাট, চণ্ডীপুর, নরঘাট, তার আগে বাজকুল, হেঁড়িয়া, কালীনগর।'

'নরঘাটের নদী পেরুবিনে।'

'কেন?'

'ঘোড়া কি নদী পেরুবে, ওই খরস্রোতা নদীতে কি নামবে?'

হা–হা করে হেসেছে ভানু, 'বলবেন না বাবু, ঘোড়ায়ও হাসবে, ঘোড়া কি নদী সাঁতরে পার হবে?'

'তবে কী লঞ্চে পার হবে, না নৌকোয়?'

ভানু বলল, 'নরঘাটে কত বড়ো ব্রিজ, যেমন বাস পার হয়, তেমনি ঘোড়া পার হবে, নদী থাকবে তার ইয়ের নীচয়।'

'হ্যাঁ, তাই তো, এটা তো মাথায় আসে না, টাকা নিয়ে যা ঠাকুরের কাছ থেকে।'

ভানু গেল ঠাকুরের কাছে। ঠাকুর হোটেলের রাঁধুনি, তারপর ক্যাশিয়ার, তারপর বাজার সরকার, এ বাদে ঠাকুর মেয়েছেলে সাপ্লাই যে করে, তার প্রেম মদনানির ঘরে কুন্তিকে পাঠানোতে জানতে পেরেছে ভানু। ঠাকুরের কাছে তিনশো টাকা চেয়ে বসে ভানু, 'দাও দেখি।'

'তিনশো চায়, দেব?' পঞ্চম ঠাকুর হাঁক মেরেছিল।

'দেওনা, তোমার এক হাজার থেকে তো দেবে না।'

ঠাকুর সিটিয়ে গিয়ে আর কথা বলেনি। তিনটে একশো টাকার নোট গম্ভীর মুখে ভানুর হাতে তুলে দিয়েছে। সেই টাকা নিতে নিতে ভানু বলেছে, 'প্রেম মদনানির টঙ্কা দিলে না তো ঠাকুর মশায়?'

টাকা নিয়ে ভানু বেরোল। বেরোল মানে একেবারে বজবজ যাবে সেই মনে ব্যাগ কাঁধে নরঘাটের বাসে চাপল দীঘা থেকে। মনে মনে ডাকল পক্ষীরাজকে, তারপর ঘুমিয়ে পড়ল। এমন ঘুম ঘুমাল যে কখন হেঁড়িয়া, কখন বাজকুল যাওয়ার রাস্তা, কখন কালীনগর, চণ্ডীপুর পার হয়ে নরঘাটের ব্রিজ পর্যন্ত চলে গেল তা টেরও পেল না। ঘুম ভাঙল মেচেদায়। ট্রেনে উঠে বসল। নামল ফুলেশ্বরে। গঙ্গার ওপারে বজবজ, ল্যাডলো জুট মিল, দক্ষিণের দিকটায় সার সার ইট ভাটা। কতদিন বাদে যাচ্ছে সে।

কিন্তু নদীপারে এসে ওপারটা চেনা মনে হল না। আর নদী পার হয়ে ভানু অবাক হয়ে দেখল আকাশের গা ছুঁয়েছে মস্ত এক চিমনি, কিন্তু ছোটো ছোটো চিমনিগুলো উধাও। সব ক–টা চিমনি মাথায় মাথায় বসিয়েও বোধ হয় অত উঁচু, হবে না, ভানু জিজ্ঞেস করে, 'ও কী?'

'কী তা জানো না?' নৌকোর অন্য আরোহী অবাক।

'না আজ্ঞে, কত বছর বাদে এলাম, আচ্ছা বন্ধ ফ্রি ইন্ডিয়া জুট মিল খুলেছে কি না জানেন, পেরুমল বাজাজ আছে?'

নৌকা থেকে নেমে ভানু দেখল ইট ভাটা নেই। দশ মানুষ উঁচু প্রাচীর, এখেনে কি জেলখানা হল? আলিপুরের জেলখানা উঠে এল কি এখানে? ভানু নদীধারের বটতলায় চা–দোকানে বসে বলল, 'কী হয়েছে এসব, বাজাজের খোলা কই?'

দোকানি অবাক হয়ে ভানুকে দেখল, চিনতে তো পারে না। ভানু ভাবে চিনবে কী করে, কম লেবার ছিল তার মিলে! কতজন উধাও হয়ে গেছে। সব মুখ কি মনে রাখা সম্ভব? কম দিন হল না। চা–দোকানি বেশ বুড়ো হয়েছে। চোখে আবার চশমা নিয়েছে। তাকে জিজ্ঞেস করে, 'থাকা হয় কোথায়?'

'চাঁদবালি।' ভানু বলল।

'চাঁদবালি কোথায়?'

'ওড়িশা, সমুদ্র ধার, মিলিটারি জমি নে নেছে সব।'

লোকটা বলল, 'জমি তো নিবার জন্য, এখেনেও তাই।'

'তাই মানে?'

'গাঁটাই দখল হুঁই গিছে, আলো কুম্পানি এল।'

'ওই পাঁচিল?'

'হাঁ।'

'পাঁচিল কত বড়ো?'

'রাস্তা ধরে যাও, শেষই হবে না, উত্তরদিক সবটা গেছে কাঁঠালবেড়ের।'

ভানু তখন চাপা গলায় জিজ্ঞেস করে, 'মিলটা, ফ্রি ইন্ডিয়া জুট মিল?'

'সে কবে বন্ধ হয়ে গেছে, আপনি কেডা?'

ভানু বলল, 'ভানু দাস, জুট মিলে আমার আত্মীয় ছিল।'

'নাই।' দোকানদার গেলাসে চামচ ঠুনঠুন করতে করতে বলে, 'মিলের যন্ত্রপাতিই আছে কি না কে জানে।'

ভানু নিঝুম হয়ে বসে থাকে। পাঁচিলটা বজবজ–কলকাতা রাস্তার ধারে। পাঁচিলের ভিতরে কী আছে তা তো জানার উপায় নেই, কিন্তু ধানখেত ছিল, গাঁ ছিল। একটা বটবৃক্ষ ছিল, তার গায়ে ভারা বাঁধত সবাই। বটবৃক্ষ মনস্কামনা পূরণ করত। মনে পড়ে ভানুর। সেই বটগাছে ফুলরানি ভারা বেঁধেছিল, হে ঠাকুর, মিল খুলুক। গাছটা কি আছে? কী সুন্দর জায়গা ছিল এদিকটা! শুধু বাস দাঁড়াত, আর গঙ্গা পেরিয়ে লোক আসত ওপার থেকে। ওপারেও যে জুট মিল, এপারেও তা। এখেন থেকে বাসে চেপে পনেরো–বিশ মিনিট গিয়ে মিল। ভানু আসত পেরুমল বাজাজের স্কুটারের পিছনে বসে। ইটখোলাও তো ওই পাঁচিলের ভিতরে চলে গেছে মনে হয়। শুধু এই চা–দোকানটা যায়নি।

'পেরুমল বাজাজ!'

'খোলার মালিক পেরুমল?'

ভানু বলল, 'খোলা তো নেই?'

'না, সব আলো কুম্পানির ভিতর।'

'বাজাজকে কোথায় পাওয়া যাবে?'

'বজবজে দোকান দিয়েছে কাপড়ের।'

'ইটের ব্যাবসা করে না?'

লোকটা মাথা নাড়ে, 'খোলা নিয়েই নিল, আবার করবে কোথায়?'

ভানুর মনে পড়ল বাজাজের মুখখানি, 'হামার সিন্ধু এহি গঙ্গার ভিতরে আছে ভানু দাস, ভানু দাস, হামার খোলায় কাম করবে?'

'শ্বশুর কী করবে?'

'খোলায় হামি তোমাকে হিসাব দেখার কাম দিতে পারি, হিসাব জানো নিশ্চয়, খাতা লিখবে, সরকারি বাবুদের নজরানা দিবে, কাম এইটা, বেতন যা দিব তা মিলের মতন হোবে না, লেকিন হামি ঠকাব না।'

ভানু কী করেছিল তা তো ভানুই জানে। যাবে নাকি বাজাজের কাছে? 'এ বাজাজ সায়েব, গঙ্গাধার ছেড়ে কাপড় দুকান বসালে, কত লেবার, সব কাঁহা গেল বাজাজ সায়েব, তুমার সিন্ধু নদী আবার ছাড়লে তুমি বাজাজ সায়েব!'

ভানু বলল, 'বাজাজ আছে না এদিকে?'

'আপনি কেডা?'

'কেন?'

'বাজাজকেও চেনেন যে।'

ভানু বলল, ‘চাঁদবালি গিয়েছিল বাজাজ সাহেব, ওখেনে চিনা হল।’

‘ওহ্!’ বুড়োপ্রায় লোকটা মোটা কাচের ভিতর দিয়ে ভানুকে দ্যাখে, কিন্তু ঠাহর করতে পারছে বলে মনে হয় না। সে বিড়বিড় করে বলল, ‘আসবে বাজাজ।’

‘আসবে?’

‘হাঁ, তার দেখা যদি পেতে চান এখেনেই বসুন।’

‘কখন আসবে?’

‘এই আসবে, দুপুরে আসে, তখন তো ব্যাবসা ঝিমায়, মানে দোকান ফাঁকা থাকে, ওই সময় আসে।’

‘কেন আসে?’

‘এমনি আসে, গল্পটল্প করে চলে যায়, বলছে আবার খোলা করবে।’

‘কোথায় করবে?’

‘নদী ধারেই, চীনেম্যানতলার ওদিকে।’

ভানু সিগারেট ধরাল, আবার একটা সিগারেট দেয় দোকানিকে। ঠিক দুপুর তো এখন। এ দোকানে তার কোনো লোক নেই। দোকানদার ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলল, ‘যেমন ভেবেছিলাম তেমন হল না।’

‘কী হল না?’

‘ভেবেছিলাম আলো কুম্পানি এল, থাম্মাল পাওয়ার প্রকল্প, বিক্রি বাড়বে, বাড়ল না, ইন্ডিয়া জুট মিল কত দিন বন্ধ! তারপর ওরিয়েন্টাল জুট মিল বন্ধ হলো, মিলের লেবাররা আসত তো কিছু ওপার থেকে, তারা আর আসে না, আর ওই ওপারের কানোরিয়া মিলেরও তো সেই দশা, আবার বন্ধ হয়েচে, দশদিন খোলা থাকে তো পনেরো দিন বন্ধ হয়, লেবাররা এপার থেকে তো যেত, যায় না এখেন দিয়ে, ওই কাঁঠালবেড়ের কত জনা যেত, তারা সব উতখাত হয়ে রঘুনাথপুরে চলে গেছে, এদিকটা খাঁ–খাঁ করে, খদ্দের নেই, তারপর খোলা উঠে গেল ক–টা, আলো কুম্পানি নিয়ে নিল, কেউ আসে চা খেতে, আর লোকই নেই!’

ভানু বলল, ‘কত উঁচু চিমনি!’

‘হাঁ, কাঁঠালবেড়ে পুড়তেছে।’

‘আচ্ছা মশায়, সেই বটগাছটি, বটবৃক্ষ, ভারা বাঁধা হত?’

‘হত তো, আমিই বেঁধেছিলাম।’

‘কী জন্যে বেঁধেছিলেন?’

‘কানোরিয়া চলুক, ফ্রি ইন্ডিয়া জুট মিল চলুক, বেঙ্গল মিল, ওরেয়েন্টাল চলুক।’

‘কী হল সেই গাছ?’

‘ও তো ভিতরে, কেটে ফেলে দিয়েছে কুম্পানি, কুম্পানির কী!’

‘সে কী, ও তো ভগবান ছিল।’ ভানু উত্তেজনায় উঠে দাঁড়ায়।

‘কুম্পানির কাছে ওসব কিছু না, কত মানুষ কাঁথা মাদুর, থালাবাসন নিয়ে ভিটে ছেড়ে চলে গেল, জেলেপাড়া, কায়েতপাড়া কিছুই নেই।’

ভানু বলল, ‘ওই বটের কাছে যে এলাম।’

‘আপনি কেডা?’

‘কেন?’

‘বটগাছের কথা জানলেন কী করে?’

‘কেন, বাজাজ বলেছিল।’

‘কী মনেতে এলেন?’

‘অশ্ব! অশ্ব দেখেছেন?’

‘অশ্ব মানে কি ঘোড়া?’

‘হাঁ ঘোড়া, ঘোড়া হারিয়েছে, খুঁজতে খুঁজতে চলে এলাম।’

লোকটা বলল, ‘আপনি তো ওড়িশার লোক?’

‘হাঁ, চাঁদবালি, বালিমুন্ডা, দে–পাল, কুসমাড়, কোনো জায়গাটা নাই প্রায়, ভীমাপুরও থাকল না, সব মিলিটারির হাতে, আগুন ছুটছে, ছাই উড়ছে।’

ভানুর কথায় লোকটা চশমা খুলে তার দিকে তাকিয়ে স্তব্ধ হল। চশমার কাচ যখন অত মোটা, চোখ থেকে চশমা নামালে কি দেখতে পাবে? কিন্তু কী আশ্চর্য, ভাসা ভাসা ঘোলাটে চোখে যেন আলো ফোটে। ভানু টের পায় তার মিথ্যে ধরা পড়ে যাচ্ছে। লোকটার ঠোঁটের কোণে হাসি ফোটে, বলে, ‘ওদিকের ঘোড়া কি এদিকে আসার কথা, ঘোড়া কি তাই বলেছিল?’

‘না, মানে কোনদিকে যেতে পারে তার আর ঠিক কী!’

তখন বৃষ্টি নামল আচমকা। গঙ্গার উপরে যে ছোটো মেঘটি ভাসছিল, তা কখন যে বিস্তৃত হয়েছিল কে জানে। কড়কড় করে মেঘ ডেকে উঠল। ঝমঝম করে নামল বৃষ্টি। চকচকে লম্বা লম্বা বৃষ্টির ধারা, দানাগুলো কত বড়ো বড়ো। যেন মুক্তো ঝরছে আকাশ থেকে। ভানু গঙ্গার দিকে তাকিয়ে থাকল। এই বৃষ্টি, আলো, মেঘ, নদী, বাতাস, আধ–বুড়ো চা–দোকানি, এসব ছেড়ে সে গেল কোথায়? বুক ভার হয়ে গেল ভানুর, বলল, ‘বাজাজ আসবে তো?’

‘তুমি বাপু এখেনের মানুষ।’

‘কে বলল?’

‘বটের কথা যখন জানো, চিনা মনে হয় তুমারে।’

‘সত্যি মনে হয়?’

‘তাই–ই তো, চশমা খুলতে আরও চিনা মনে হচ্ছে।’

ভানু বলল, ‘এরকম হয়।’

‘কী হয়?’

‘চেনা মনে হয়, আগের জন্মের মতো লাগে।’

‘তার মানে?’

ভানু বলে, ‘কখনো কখনো কোনো মানুষকে চেনা মনে হয়, কোনো জায়গা দেখে মনে হয় বড়ো চেনা, তাই না?’

‘হ্যাঁ, তা তো হয়ই।’

‘সব আগের জন্মের চেনা, তা ঘোড়া কি দেখেছ এদিকে? সাদা ঘোড়া, সমুদ্র ছেড়ে পলাল বোশেখি পূর্ণিমার রাতে!’

‘যেদিন বোমা পড়ল?’ চা–দোকানি আচমকা জিজ্ঞেস করতেই ভানু শিহরিত হয়, ‘কী কহ তুমি?’

বৃষ্টি যেমন নামল আচমকা, থেমেও গেল ধীরে ধীরে। কেমন একটা মায়াবী আলো জেগে উঠল চারপাশে। চোখ দুটি সেই আলোয় আরাম পায় যেন। কী সুন্দর রং হল চারদিকের! নরম, যেন ছোঁয়া যায়, ছুঁয়ে ফেললে সে রং হাতে লেগে যায়, চোখের পাতায় লেগে যায় রঙের গুঁড়ো।

চা–দোকানি বলল, 'ওইদিন না আমরা বোমা ফাটিয়েছিলাম।'

'অ্যাটম বোমার কথা বলছ তো?'

'হ্যাঁ, ওইদিন মরুভূমির নীচে বোমা ফাটল না?'

'তাই তো, সেদিন বুদ্ধপূর্ণিমাই ছিল বটে। ভানু বলতে বলতে বিস্মিত হয়, 'আশ্চর্য! এই যোগসূত্রটা মনে রাখেনি সে!'

'ঠিক ওইদিনই পালিয়েছিল ঘোড়া?'

'তাই তো জানি।' ভানুর যেন ধন্ধ হয়, 'ওইদিনই তো!'

'তাহলে বলো দেখি কেন পলাল ঘোড়াটা?'

ভানু অবাক। রাজপুত্রের জন্মদিন, পূর্ণিমা, পোখরানের মরুভূমিতে বিস্ফোরণ, ঘোড়ার পালানো—এসবে কি যোগাযোগ আছে? একটার জন্য আর একটা হয়েছে? বোমা না ফাটলে কি থাকত? কিন্তু ঘোড়াকে খবরটা দিল কে? ভানু মাথা ঝাঁকায়, বাতাসে খবর এসেছে। তেজস্ক্রিয় বাতাস! সেই বাতাস কি এতদূর আসবে? মরুভূমির বাতাস! বাতাসে খবর পেয়ে পক্ষীরাজ কি পোখরানের দিকে ছুটে গেল? কী থেকে যে কী হয় তা কে বলতে পারে? তবে মিলে তো গেছে। অন্যদিন তো পালায়নি, পালাল সেই পূর্ণিমার রাতে। মরুভূমি কেমন? ভানু তো মরুভূমি দ্যাখেনি। তা কি মীরগোদার সমুদ্র? মরুভূমি কি আগে সমুদ্র ছিল? সমুদ্র মরে গিয়ে অত বালি! কে জানে? তবে এটা তো সত্য, যেদিন বোমা ফাটল সেদিন তার কন্থক উধাও, কী করে হয়?

ভানু বলল, 'বোমার সঙ্গে ঘোড়া পালাবে কেন?'

'বোমার খবরে ভয় পেয়ে উধাও হয়ে গেল।'

'কিন্তু উধাও হয়ে যাবে কোথায়?'

চা–দোকানি বিজ্ঞের মতো বলে, 'পোখরান, বুদ্ধপূর্ণিমায় বোমা ফাটল, তারপর পোখরানে যাবে না?

'সত্যি, সত্যি ঘোড়াটা পালিয়ে গেল কোথায়?'

'বলছি তো মরুভূমিতে, ওফ কী গরম সেই বালি!'

ভানু বিড়বিড় করে, 'কী করে গেল, সে যে অনেক অনেক দূর!'

আবার বৃষ্টি আসছিল। গঙ্গার উপর থেকে ডাকতে ডাকতে মেঘ আসছিল এদিকে। আবার মেঘ গর্জন শুরু হল। বৃষ্টি নামল প্রবল ধারায়। ভানুর পিঠে এসে নামল বৃষ্টির পারদ রেখা! পিঠ ভিজতে লাগল।

চা–দোকানি ডাকল, 'আমার পাশে এসে বসুন।'

'না, বেশ তো রয়েছি, একটু ভিজি।'

চা–দোকানি বলল, 'আর তো বোমা ফাটাচ্ছে না?'

'কী হবে ফাটিয়ে?'

'কিছু তো হবে, কিছুই যে হয় না।'

'কেন, বেশ তো রোদ উঠছে, মেঘ করছে, বৃষ্টি হচ্ছে, ঠান্ডা বাতাস...।'

চা–দোকানি খুকখুক করে হাসে, 'এসব কী হবে, সমস্ত দিন কত আয় জানেন ভানুবাবু, আচ্ছা মশায়, কী বলছিলেন যদি কাউকে চেনা মনে হয়, সে আগের জন্মের হতে পারে?'

'পারে।' ভানু বলল, 'বাজাজ তো এল না।'

'না আসতেও পারে।'

'কেন?'

'এমনি, সব কিছুর কি কেন হয়, হয়তো মনে হল এখেনে না এলেও চলবে।'

'চলবে না কেন?' ভানু পালটা জিজ্ঞেস করে।

কথাটা যেন শোনে না চা–দোকানি, বলল, 'একটা যুদ্ধ লাগুক, লাগছে না কেন?'

'কী হবে?'

'ভালো লাগে না, বিক্রিবাটা নেই, জিনিসপত্তর আগুন, তার উপর এই যে আলো কুম্পানি, থাম্মাল পাওয়ার কাঁঠালবেড়ে ধ্বংস করে দিল, শোনা যাচ্ছে রাস্তার এপারও নেবে, এই দোকানটাও তুলে দেবে।'

'তার মানে?'

'সবটা ওদের হয়ে যাবে, দু–পারে পাঁচিল, মধ্যিখানে পিচরাস্তা শুধু চলাচলের জন্য, পরে এ রাস্তাও বন্ধ করে দেবে।'

'কেন?'

'ইচ্ছে, এইজন্য আমি বলি যুদ্ধ হোক, হয় হোক।'

ভানুর কথা বলতে ইচ্ছে হচ্ছিল না, কিন্তু চা–দোকানি বকবক করছিল। তার একটা খদ্দেরও নেই। তার মানে ভানু না এলে দোকানটা ফাঁকা থাকত এতটা দীর্ঘ সময়। বৃষ্টি আবার কমে এল। আকাশের মেঘ এখনও গর্জে যাচ্ছে। কিন্তু কাছেপিঠে নেই সে। দূরে সরে যাচ্ছে। গঙ্গার উপরে ভেসে যাচ্ছে। আবার সেই আলো ফুটল। বৃষ্টি–ধোয়া শূন্য প্রকৃতিতে হলুদ একটা আলো জড়িয়ে সব কিছু সুন্দর করে তুলেছে। ভানু দাস ঘাড় উঁচু করে চিমনির মাথা দেখছিল। কত উঁচু। আকাশের ভিতর ঢুকে গেছে যেন থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্টের চিমনিটা। তার গায়েও হলুদ আলোটা জড়িয়ে গেছে। বাতাস মোলায়েম, খুব নরম, ঠান্ডা। এদিকটা আগে আরও সুন্দর ছিল। কত গাছ, কতরকম পাখি, সব গেল কোথায়?

শুনে দোকানি হাসে, 'যাবে কোথায়, নেই আর, উড়ে গেছে।'

'কোনদিকে উড়ে গেল?'

'দিনরাত ছাই উড়ছে, তারা নদী পার হয়ে চলে গেল, আচ্ছা, বাজাজ লোকটা কি পাগলা?'

'কেন?' ভানু ঝুঁকে পড়ে দোকানির দিকে।

'বলে এ জায়গাটায় না এলে তার ঘুম হয় না।'

'সাধু মানুষ!'

'বলে, নদী দেখে ওর তেষ্টা মেটে না।'

'হ্যাঁ, সাধুর মতোই কথা।'

'বলে, সে নাকি পাঁচ–সাতশো নদী দেখেছে, রিফ্যুজি তো, ভাসতে ভাসতে এসেছে।'

ভানু বলল, 'তুমি ক–টা দেখেছ সুরেনবাবু?'

লোকটা চমকে ওঠে, 'কী করে জানলেন আমার নাম?'

'বাজাজ বলেছিল।'

'কী বলেছিল?'

‘তোমার কাছে খোঁজ করতে, মনে পড়ে গেল নামটা, এতক্ষণ মনে করতে পারছিলাম না।’
‘নাকি, তুমি আমাকে চেনো?’ চা–দোকানি ঝুঁকে পড়ল, ‘তুমি করেই বলি।’
‘বলো, কিন্তু আমি কী করে চিনব তোমাকে?’
‘ওই যে বললে আগের জন্মের চেনা।’
‘আমি তো তোমাকে চিনতে পারছি না।’ ভানু বলে।
‘তবে নামটা মনে করলে কী করে ভানুবাবু?’ চো–দোকানি বলতে বলতে হাসে, ‘তোমাকে খুব চেনা মনে হয়, চশমা খুললেই স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।’
‘কী দেখছ?’
‘আলো।’
‘কী আলো?’
‘একরকম আলো, তোমার মুখখানাতে আলো মশায়, সত্যি কি তোমার ঘোড়া পালিয়েছে?’
‘হ্যাঁ।’
‘তারে খুঁজতে এলে এত দূরে?’
‘হ্যাঁ।
‘আচ্ছা, বাজাজ অত নদী দেখেছে, আমি একটা মাত্তর, এইটা, কিন্তু মনে হয় কত দেখেছি, আগের জন্মে!’
ভানু বলল, ‘হতে পারে, বাজাজ তাহলে আসবে না?’
‘না এলে ওর ঘুম হয় না, আচ্ছা এত যে আলো দেখি, মেঘ, রোদ, এত দেখেও আবার দেখতে ইচ্ছে হয় কেন?’
‘কী জানি।’
চা–দোকানি সুরেন কুণ্ডু বলল, ‘দিনভর একা, এই সমস্ত মনে হয়, বাজাজ এলেও তো এখেনে বসে না, নদীর পাড়ে চলে যায়, প্রত্যেকদিন দেখেও ওর আশ মেটে না, কেন?’
‘সে তো বাজাজই জানবে।’ ভানু উঠে পড়ে দোকান থেকে বেরিয়ে আসে।
চা–দোকানিও দোকান খালি রেখে ভানুর পিছনে পিছনে আসে। ভানু হাঁটতে হাঁটতে নদীর দিকে যায়। চা–দোকানি বলল, ‘পার হয়ে যাবে?’
‘না তো, কেন?’ ভানু ঘুরে তাকায়। চা–দোকানির মাথায় সাদায় কালোয় অবিন্যস্ত চুল, গাল ভরতি না কাটা দাড়ি, চশমার কাচে ঢাকা ঘোলাটে চোখ, শীর্ণ শরীর, একটু বাঁকা দেহ। লোকটাকে চিনত ভানু, কিন্তু ভুলেই গিয়েছিল। কম দিনের কথা তো নয়। লোকটা মানে সুরেন কুণ্ডু আর তার চায়ের দোকানের কথা ভুলেই গিয়েছিল সে। ভুলেই গিয়েছিল সুরেন কুণ্ডু বলে কোনো মানুষ আছে এ পৃথিবীতে। তার চায়ের দোকানটা দেখার পরও সুরেন কুণ্ডুর কথা মনে পড়েনি। দোকানটাকে মনে পড়েছিল। দোকানটা ছিল, দোকান থাকলে তার মালিকও থাকবে, ছিল মনে হয়েছিল, এই পর্যন্ত। তারপর তো পূর্বজন্মের কথা মনে পড়তে লাগল। এমন চেহারা তো ছিল না, ছিল তাগড়াই যুবক। ক–বছরে দুমড়ে মুচড়ে একাকার।
‘তোমার এমন চেহারা হল কেন?’ ভানু জিজ্ঞেস করে বুঝতে পারে ধরা পড়ে যাচ্ছে। মুখ ফসকে আসল কথাটি বের হয়ে গেছে।
দোকানি বলল, ‘আরও হবে।’
‘কী হবে?’
‘ভাঙবে।’
‘কেন?’

সুরেন কুণ্ডু দীর্ঘশ্বাস ফ্যালে। 'ক–বছরে কী হল যে, দ্যাখো–না ধোঁয়ায় শুধু ছাই, বুঝতে পারিনে দেহে ছাই পড়ে যায়, ঘরে যাও পুরু ছাই, আর বাতাস এক এক সময় এমন গরম! তুমি পার হবে কি না বললে না তো?'

ভানু বলে, 'পার হব কেন?'

'তাহলে কি এমনি উঠে এলে গঙ্গার ধারে?'

'হ্যাঁ, নদীটা দেখলে বুক জুড়ায়।'

'বাজাজ এমন বলে, কিন্তু কতবার আর দেখবে নদী?'

অবাক হয়ে ভানু বলে, 'যত ইচ্ছে।'

'শহরের চেয়ে নদী ভালো?'

'এ কীর'ম কথা?'

'থাম্মাল পাওয়ার প্রকল্পের চেয়ে নদী ভালো?'

ভানু বলল, 'এ–কথার মানে কী?'

'এই আলো কুম্পানি কে তৈরি করল?'

'মানুষ তৈরি করল!'

'কলকাতা শহর?'

'মানুষ করল।'

'বজবজ শহর?'

'মানুষ করল।' ভানু অবাক হয়ে যাচ্ছিল উত্তর দিতে দিতে।

'মানুষ যা করে তাতে কি মানুষ সুখে থাকে না?'

'কী বলো তুমি সুরেন কুণ্ডু?'

'থাম্মালের বড়ো বড়ো অফিসার আছে, সাঁই সায়েব, নিয়োগি সায়েব, তারা নদীর ধারে এসে দাঁড়ায়ে যায় কিছুক্ষণ, কেন দাঁড়ায়?'

'কী জানি!' ভানু দেখছিল ভরা গঙ্গা। পূর্ণ জোয়ার চলছে। মাঝনদীতে উড়ন্ত পাখির মতো ইলিশের নৌকো। হলুদ আলো ঘন হয়ে ঝরে পড়ছে জলের উপর। বুক আলগা করে শ্বাস নিল সে।

'কেন দাঁড়ায় তা তো জানো না ভানুবাবু, বাজাজ জানে, সে বলে মানুষ যা করেছে সবেরই বিপক্ষে হয়ে যায় মানুষ।'

'কীরকম?' কৌতূহলে ভানু জিজ্ঞেস করে।

'দ্যাখো–না ভানুবাবু, এত যে কলকারখানা গড়ে মানুষ, তা কেউ দেখতে যায়?'

'যায় না?'

'তুমি যাও, না তোমার ঘোড়া যায়?'

'যায় না?'

'না যায় না, যায় সেই সমুদ্দুর, পাহাড়, জঙ্গলে, মরুভূমিতে, যা ভগবানের দেয়া, নদী পর্যন্ত দেখতে আসে, কিন্তু কলকারখানা, শহর কিছুই দ্যাখে না, পালিয়ে আসে বিরক্ত হয়ে।'

'তুমি দেখছি জানো অনেক।' ভানু বলল।

'বাজাজ বলে, পরে আমি ভেবে দেখলাম সবই সত্যি।'

সত্যিই তো। ভানু গঙ্গার দিকে তাকিয়ে ভাবল, ভগবান কী দিয়ে গড়ে এইসব? কোন মায়া, কোন কুহক জড়িয়ে আছে এর সঙ্গে, যে বার বার মানুষ ছুটে যায়! নদী না দেখলে, সমুদ্র না দেখলে, পাহাড়, জঙ্গল না দেখলে

মানুষের চলে না। কেন চলে না? অথচ সেই নদী পাহাড়, সমুদ্র উপকূল নষ্ট করতে মানুষের কত উতসাহ। বাতাস, রোদ, মেঘ, ছায়া, গাছপালা, ফুল এসবের মায়ায় মানুষ ছুটে যায় কতদূর, অথচ এসব কী করে বাঁচাবে তা নিয়ে কোনো মাথাব্যথা নেই। ভানুর চোখের সামনে ভেসে উঠল চাঁদবালি, দে–পাল, কুসমাড়, দীর্ঘ সমুদ্রতীর। মোটা দানার বালি, শক্ত সৈকত, নীল জল আছড়ে পড়ছে সমস্ত দিন, সমস্ত রাত। যখন জ্যোতস্না পড়ে! ভানুর মনে পড়ে জ্যোতস্নায় গড়াগড়ি দিয়েছিল সে নেশা লাগা প্রাণীর মতো। আনন্দ প্রকাশের ওর চেয়ে বড়ো ভাষা ছিল না তার। আহা, কী আনন্দ! বালির দানা জ্যোতস্নার বিন্দু ধরে ঝলমল করে উঠেছিল যেন। এক বিন্দু জলে, বালির দানায় যখন জ্যোতস্নার এক বিন্দু পড়ে কীরকম হয়ে ওঠে সব! চাঁদবালির সমুদ্র! আহা সে কেমন সুন্দরী ছিল! এখন ছাই ঝরছে দে–পাল, কুসমাড়, মহাপাত্রপুরের সৈকতভূমিতে। ভীমাপুরের ভুবন বিস্তৃত ধান খেতও চলে যাবে। আর নায়েব রামচন্দ্র? তার কাজও শেষ হবে। সমস্ত রাত চাঁদবালি, বালিমুন্ডার আকাশে আগুন ঝরে যাবে। ভানু দুটি হাত জোড় করে বিস্তৃত গঙ্গার দিকে তাকিয়ে আছে, নদীর কি নিজেকে রক্ষা করার ক্ষমতা নেই, গাছের, পাহাড়ের, সমুদ্রের, সৈকতের? মানুষ এক জায়গার বন কেটে দূরে যায় বন দেখতে। সে নিজে ভাবে এক, তার আত্মা ভাবে আর এক।

‘বাজাজ বোধ হয় এল না।’ বলল সুরেন কুণ্ডু।

ভানু বলল, ‘কী ছিল এ জায়গা আর কী হল!’

‘করতে তো হবে, থাম্মাল না হলেই বা কী করে হবে?’

ভানু বসে পড়ল মাটিতে, ‘জানিনে, কিন্তু মানুষ দিন দিন অন্ধ হয়ে যাচ্ছে সুরেনবাবু, সাগর, মরুভূমি কিছুই রাখবে না।’

সুরেন কুণ্ডু বলল, ‘ভগবান কি শোধ নেবে না ভানুবাবু! মানুষ কি জানে না আকাশ, মাটি, সমুদ্র, নদী, জঙ্গল, মাঠ, ফসল সবই ভগবানের অংশ?’

‘বসে বসে এই ভাবো?’

‘কথাটা কি সত্যি নয়, পাহাড়, সমুদ্দুর, জঙ্গল, মরুভূমি, নদী, গাছপালা, মাঠ, আলো, বাতাস, এসব কি ভগবান না, যা দেখি তাই যেন ভগবান মনে হয়, সেই ভগবান চলে যাচ্ছে আমাদের সামনে থেকে, তা টের পাও?’

‘কী জানি, হয়তো।’ ভানু মগ্ন স্বরে বলল।

‘হয়তো মানে, তোমার ঘোড়াটা কি ভগবান ছিল না?’

‘কী করে বুঝলে!’ ভানু চমকে ওঠে সুরেনের কথায়।

‘বাহ্! তারে দেখে আহ্লাদ হত না?’

হত তো! ভানুর বুক ঝমঝম করতে থাকে ওই কথায়। আহা, কী সুন্দর ছিল রাজপুত্রের ঘোড়া কন্থক। সমুদ্রসৈকত দিয়ে ভাটার সময় যখন দৌড়োত কেশর ফুলিয়ে, লেজ তুলে, মনে হত সে–ই যেন সব। সে আর নীল সাগর। মনে হত নীল সাগর থেকে উঠে এসেছে সে, জীবন সাগরে মিলিয়ে যাবে। এই পৃথিবীতে সেই ঘোড়ার চেয়ে সুন্দর আর কে তখন? মনে পড়ে ভানুর, সেই চোদ্দোবেড়িয়া! চোদ্দোবেড়িয়া যত সুন্দর, কন্থক তত সুন্দর। চোদ্দোবেড়িয়া ভগবান, কন্থকও ভগবান। ভানুর দীর্ঘনিশ্বাস অন্ধকারে ছড়িয়ে যায়।

সুরেন কুণ্ডু বলল, ‘মনে হয় কি জানো ভানুবাবু, যা দেখে শান্তি হয়, তাইই ভগবান।’

‘হবে তাই, তবে ঘোড়াটারে পেলে মনে শান্তি হত, জন্মজন্মান্তর একসঙ্গে আছি।’

‘তার মানে ঘোড়াটা ভগবান, সে উধাও হয়ে গেল সেই দিন, যেদিন বোমা ফাটল পোখরানে, তাই তো? জন্মজন্মান্তর আছ মানে যেমন আছে নদী পাহাড় আর মানুষ তেমনি?’

‘ঠিকই বলেছ।’

‘যদি বলি সে টের পেয়েছিল বোমার খবর।’

‘হতে পারে, সেও তো জন্মজন্মান্তর আছে।’

‘শুনে যেন তাই মনে হল।’

‘তবে তারে কুহক করেছিল।’

‘কুহক, সে কী!’

মায়ায় ভুলাল।

‘কেডা করল তা, কোন মায়াবিনী?’

ভানু বলল, ‘তারেই তো খুঁজে বেড়াচ্ছি, আমি এবার যাব।’

‘থাকবা না?’

‘না।’

‘কেন?’

‘হোটেলওয়ালারে বলতে হবে কী জানলাম তা।’

‘কী জানলে?’

‘যেদিন বোমা, সেদিন ঘোড়াটা, তুমি যা বলেছ সুরেনবাবু, সব বলতে হবে, আমি যাই, মনে বড়ো কষ্ট হচ্ছে।’

‘কেন?’

‘যা ছিল এখেনে তার কিছুই নেই।’

‘বললাম তো ভগবান সরে যাচ্ছে জগৎ থেকে, তোমার ঘোড়াটা ভগবানই ছিল, ভগবান বুদ্ধর জন্মদিনে সে পালাল।’

ভানু নদীঘাটের দিকে এগোয়। কন্থক যে ভগবানের অংশ তা কে না জানে? আর সে তো সেই ভগবানেরই সাথি। ভানুর যেন মনে পড়তে থাকে কপিলাবস্তু, রাজপুত্র, কন্থক, ছন্দক। আকাশে সোনালি মেঘ! সেই মেঘের কী আশ্চর্য রূপ! তার বিভায় রাজপুত্রর মুখখানি করুণায় পরিপূর্ণ। ঘোড়াটির গায়ে কী স্নেহের হাত রাখেন রাজপুত্র! আর ঘোড়া যখন তাঁকে সওয়ার করে, রাজপুত্র যেন পালকের মতো হালকা হয়ে যান। রাজপুত্রকে নিয়ে ছুটছে কন্থক। হায়! ভোর হয়ে যখন এল, আকাশে ফুটল সোনালি মেঘ। রাজপুত্র গেছেন মানুষের মুক্তির পথ জেনে নিতে। আকাশ তাই মলিন হয়নি। সোনালি মেঘের ভোরে রাজপুত্র হেঁটেছেন পৃথিবীর পথে। তাঁর জন্য অপেক্ষা করে আছে সারথি ছন্দক আর তাঁর ঘোড়া কন্থক। ভানুর চোখে জল এল। এতকাল বাদে কন্থক যখন ছেড়েছে সাথিকে, পালককে, পৃথিবী কি আর আগের মতো আছে?

আগের রাতে ছিল বজবজে। সে ঘাটে গিয়ে নৌকোয় উঠতে যাবে তো চা–দোকানি সুরেন কুণ্ডু তাকে আটকে দিল, ‘রাতটা থেকে যাও ভানুবাবু, তোমারে আমি চিনেছি।’

‘কী চিনেছ?’

‘তুমি জুট মিলের লোক ছিলে, মনে পড়ে, বাজাজের ইটখোলায় আসতে, তোমার মিলের খোঁজ নিতে এয়েছিলে?’

‘হ্যাঁ,’ ভানুর চোখ ছলছল করে উঠেছিল ধরা পড়ে গিয়ে।

মিলের জমিই বিক্রি হয়ে যাওয়ার জোগাড়, ‘থাকো ভানুবাবু, আমি টের পাচ্ছি এ জীবনে আর কখনো আসবে না তুমি।’

‘না, কী করতে আসব?’

‘তবে থেকে যাও, আমি একা মানুষ, একেবারে একা, কেই নাই।’

‘সত্যি?’

‘হ্যাঁ, একা থাকি, স্বপাকে খাই, এই দোকানেই থাকি, থেকে যাও ভানুবাবু, অনেক রাত পর্যন্ত নদীধারে বসে কথা বলব।’

ভানু থেকে গিয়েছিল। এমন ডাকছিল সুরেন কুণ্ডু, সে না থেকে পারেনি। তারপর অন্ধকারে নদীর কূলে বসে কত রাত অবধি কথা বলেছিল তারা। সুরেনের কেউ নেই। বউ মরে গিয়েছিল যে কবে তা তার মনেই নেই যেন। ভুলেই গেছে বউকে। আর ছিল একটা মেয়ে। সেও একটা খারাপ লোকের হাতে পড়ে যে কোথায় চলে গেছে, তা জানে না সুরেন। থানায় যাতায়াত করেছিল, কিন্তু চা–দোকানি কতটা কী করতে পারে? ভানুর চোখে জল এসেছিল। কী সুন্দর কথা বলছিল লোকটা। বলছিল, মাঝে মধ্যে একে ওকে হাতে পায়ে ধরে আটকে দেয়। একসঙ্গে রাত্রি কাটায়। কী আর আছে এ জীবনে? এই নদী, আলো, অন্ধকার, বাতাস, মেঘ, বৃষ্টি সবই তো ভগবানের মতো। সেই ভগবানকে ধরে আছে সে। মানুষ যতই ত্যাগ করুক ভগবানকে, যতই ধ্বংস করুক ভগবানের অংশকে, এত বড়ো তিনি, কতটা কী করতে পারে মানুষ?

ভানু বলেছিল, ‘সুরেনবাবু, ঘোড়াটার কী হল?’

সুরেন বলেছিল, ‘খুঁজলে পেয়ে যাবে।’

সকালে নদী পার হয়ে ফুলেশ্বর থেকে ট্রেন ধরেছিল ভানু। তারপর মেচেদা থেকে বাস। বাসেই আর একটা লোকের সঙ্গে দেখা। চেনা মনে হচ্ছিল। দীঘায় দেখা হয়েছিল হয়তো। দীঘায় কে না যায়? সেই লোকটা তার পাশে এসে বসে যখন কুশল নিয়ে জিজ্ঞেস করল ঘোড়ার খবর, ভানু অবাক, ‘কী করে জানলে?’

‘যাই হোক,’ সে বলল, ‘ভানুবাবু কি দৌলতপুরের দিকে গেছেন?’

‘কেন?’

‘ওই দিকে একটা ঘোড়া…।’

‘ঠিক জানেন?’

‘জানি তো, আমার শ্বশুরঘর তো দৌলতপুরেই।’

ভানু জিজ্ঞেস করেছে, ‘আপনার নাম?’

‘অবনী মৃধা।’

‘ঘোড়া কি আপনি দেখেছেন?’

‘না, আমার শালা।’

কাঁথি নেমে দৌলতপুরে যাওয়ার ট্রেকার ধরেছিল ভানু। দৌলতপুর, দরিয়াপুর তো ছিল রসুলপুরের নদীর কাছে। ওখানেই বিসর্জিত হয়েছিল নবকুমার। ভানুর মনে হয় সব সত্যি। কী আশ্চর্য! সেই ট্রেকারেই কিনা বসে আছে গৌরমোহন মদরঞ্জিওয়ালা। কোথায় যাচ্ছে সে? না, ওই রসুলপুরেই। বোনাই ঘরে। মানুষের কত শিকড় যে কত দিকে ছড়ানো! খুঁজে বের করতে পারলে দেখা যাবে সব মানুষ যেন একই গাছের ফুল। মদরঞ্জিওয়ালা খবর দিল যে কোকিলা আঁকছে। আঁকা শেষ হলে তারা দুজনে মিলেই দীঘায় যাবে মাইতিবাবুর কাছে, ঘোড়াটার কী হল, শেষ পর্যন্ত মিলল কী?

ভানু যাচ্ছে ঘোড়াটার খোঁজ করতে, তা শুনে মদরঞ্জিওয়ালা গৌরমোহন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব জিজ্ঞেস করে ঘাড় দোলায়, 'হতেও পারে।'

'তার মানে?'

'ঘোড়া যে এদিকে আসবে না তার গ্যারান্টি নেই।'

'হ্যাঁ।' ভানু তাকে সমর্থন করে, 'খবর যখন পাওয়া গেছে—।'

কিন্তু তারা দুজনে যত বলুক, দৌলতপুরের কোনো মানুষই জানে না কোনো ঘোড়ার কথা। না, মদরঞ্জিওয়ালার বোনাইও জানে না। তারা তো অবাক, ঘোড়া! ঘোড়া আসবে কেন দৌলতপুরে, কী কারণে?

ভানু বলল, 'রসুলপুরের নদীতীরেই না নবকুমারকে ফেলে রেখে গিয়েছিল তার লোকেরা, এই দৌলতপুরের কাছে।'

'সে তো উপন্যাস!' বলছে গৌরমোহনের বোনাই।

'তাতে কী হল, ওরকম তো হয়েছিল বটে।' ভানু বলেছিল।

'কী করে বুঝলে হয়েছিল?'

'আহা, কপালকুণ্ডলা বনচারিণী!'

'তাতে কী হল?'

'ঘোড়াটা আসতে পারে।'

'ঘোড়া ওই জন্যে আসবে, হাসালে ভানুবাবু!' বলছে গৌরমোহন।

ভানু মাথা নাড়ল, 'না ওই দিন দুপুরে বোমা ফাটানো হল।'

'তার জন্য ঘোড়া এদিকে আসবে?'

'অবনী মৃধা যে বলল এয়েচে এদিকে।'

'কে অবনী মৃধা?'

'দৌলতপুরের জামাই।'

'মিথ্যে বলেছে।' গৌরমোহনের বোনাই শিবরাম বলল, 'আপনারে ঠকিয়েছে লোকটা।'

'ঠকাল কই?'

'মিথ্যে বলে এত হয়রানি করাল যে।'

'হয়রানি কী, ঘোড়াটা আসতেও তো পারে, হয়তো আপনার জানা নেই, অন্য লোকে জানে।'

'কে জানে?'

ভানু বলল, 'আমি জানি।'

হি–হি করে হাসল শিবরাম, 'এখেনের লোক সবাই ঘোড়াই দ্যাখেনি, এমন লোক আছে ঘোড়া কেমন তা বলতে পারবে না।'

'তাতে কি ঘোড়া আসবে না এদিকে?'

'আসতে পারে, তবে ও ঘোড়া আসেনি, ঘোড়া কেন, গাধা, খচ্চর কিছুই আসেনি এ গাঁয়ে।'

'কিন্তু অবনী মৃধা যেরকমভাবে বলল!'

শিবরাম বলল, 'পুরো ফলস দিয়েছে, ওই নামে এ গাঁয়ে কোনো জামাই নেই, আর ঘোড়া খামোকা কেন আসতে যাবে?'

বিকেল হয়েছিল। আকাশে বেশ মেঘ। ঠান্ডা বাতাস উঠছিল দক্ষিণ দিক থেকে। মাঝসাগরে বৃষ্টি হয়েছে হয়তো। ভানু বলল, 'রসুলপুরের গাং কোনদিকে?'

'যাবেন নাকি?' গৌরমোহন জিজ্ঞেস করে।

'এতদূর এলাম, যাব না? দেখে আসি।'

'ওদিকে ঘোড়া যাবে কী করে?' গৌরমোহনের বোনাই শিবরাম হাসে।

ভানু বলল, 'দেখে আসি কোন পথে নৌকো এসেছিল সাগর থেকে।'

'ও তো উপন্যাস।' গৌরমোহন প্রতিধ্বনি করল তার শ্যালকের কথায়।

ভানু বলল, 'হোক, কপালকুণ্ডলা কি ছিল না গৌরবাবু?'

গৌরমোহন চুপ করে থাকে। ভানু বিড়বিড় করে, 'বনে বনে ঘোরে অনাথিনী, কাপালিকের হাতে মানুষ, দেখে আসি চলেন।'

'এখেন থেকে তিন মাইল, মাঠে মাঠে যেতে হবে, অন্ধকার হয়ে যাবে।'

'আর কী হবে?' ভানু জিজ্ঞেস করে।

'কী হবে আবার?' গৌরমোহনের বোনাই শিবরাম অবাক এই ঘোড়াসন্ধানী মানুষটাকে দেখে। ঘোড়া যে হারাতে পারে সে বিষয়ে কোনো ধারণাই ছিল না তার। আর তা খুঁজতে আসতে পারে কেউ তাও ছিল ধারণার বাইরে। আর তার শ্যালক গৌরমোহন মদরঞ্জিওয়ালাই কিনা নিয়ে এল এমন একটা লোককে। গৌরমোহন যে মেয়েমানুষটা নিয়ে আছে সেইই তো প্রায় কপালকুণ্ডলা। শিবরামের বউ তাকে যেতেই দেয় না মীরগোদা। ভাই বউ যেন এ বাড়িতে না ঢোকে সে কথাও বলে দিয়েছে সে তার বড়ো ভাইকে। সংসার জ্বালাতে এসেছে নাকি কোকিলা? শিবরামের মনে পড়েছে কোকিলা বধূর কথা, সে জিজ্ঞেস করল, 'কেমন আছে কোকিলা?'

গৌরমোহন বলে, 'তোমারে যেতে বলেছে।'

'আমারে?' গৌরমোহনের কথায় ভানু এবং শিবরাম দুজনে বুকে হাত দিল। আর তা দেখে গৌরমোহন ঘাড় কাত করে, 'হ্যাঁ।'

'কপালকুণ্ডলা পড়েছেন?' নীরবতা ভেঙে একটু বাদে ভানু জিজ্ঞেস করে শিবরামকে।

মাথা নাড়ে শিবরাম, হাসে, 'সময় পেলাম কই?'

'গৌরবাবু?'

গৌরমোহনও মাথা নাড়ে, 'না তো!'

'তবে কী করে জানলেন কপালকুণ্ডলার কথা?'

শিবরাম বলে, 'ঠাকমা বলেছিল।'

'ঠাকমা পড়েছিল?'

'পড়তেই জানত না ঠাকমা।'

'তবে কী করে জেনেছিল?'

'কী জানি, বই না পড়লেও সব জানি ভানুবাবু, আমাদের গাঁয়ে দশটা ছেলের নাম নবকুমার।'

'আর মৃন্ময়ী।'

শিবরাম অস্ফুট গলায় বলে, 'সেও আছে!'

ভানু দীর্ঘশ্বাস ফেলল, 'তাহলে গাং দেখতে যাওয়া যাবে না?'

'না, অন্ধকার হয়ে এসেছে।'

অন্ধকার নামছিল ধীরে ধীরে। ভানু অনেকক্ষণ বাদে একা পেল গৌরমোহনকে। শিবরাম গেছে ভিতরে। ভানুকে এত সময় একা পেয়ে কোকিলার স্বামী বলল, 'কথা আছে ভানুবাবু, কোকিলার কী যেন হয়েচে।'

'কী হয়েছে?'

'আঁকতেই চায় না।'

'চায় না কেন?'

'কী জানি ভানুবাবু, অথচ তার আঁকার জন্যেই না আমার মদরঞ্জির এত কদর।'

ভানু চুপ করে আছে।

গৌরমোহন বলল, 'তুমি যাবা একবার?'

'কেন?'

'ঘুরে যাও–না কেনে ভানুবাবু।'

'সে কি আমারে যেতে বলেছিল?'

গৌরমোহন চুপ করে। ভানুর দম বন্ধ হয়ে আছে। কী জবাব দেয় মদরঞ্জিওয়ালা। ভানুর মনে পড়ে যাচ্ছিল সেই সন্ধ্যাটির কথা। মীরগোদার বালিয়াড়ির আকাশে ধ্রুবতারা। সমুদ্র সরে গেছে। ধ্রুবতারা রয়েছে। মদরঞ্জিওয়ালা ভরসন্ধ্যেতেই ঝিমোতে ঝিমোতে ঘুমিয়ে পড়েছে। সে আর কোকিলা মুখোমুখি।

ভানু বলল, 'আমি যাব?'

'যাও ভানুবাবু।'

'তুমি যাবে না সঙ্গে?'

'আমার দু–দিন লাগবে যেতে।'

'কেন?'

'বুন আমারে ছাড়বে না।'

'কোকিলা একা থাকবে?'

গৌরমোহন চুপ করে থাকে। ভানু আর কিছু বলে না। রসুলপুরের নদী দেখতে চলল অন্ধকারে। শিবরামই হঠাৎ তাকে বলল, 'দেখিয়ে আনি চলুন।'

'রাতে, এখন যাবেন?'

'হ্যাঁ, গৌরদাদার বোন বলল তাই, যেটা দেখতে এয়েচেন সেটা না দেখে যদি চলে যান, হয়তো এ জীবনে আর দেখাই হবে না, সুযোগ এয়েচে যখন ছাড়া ঠিক না।'

ভানু গেল না। ভানুকে নিয়েই বরং গেল শিবরাম। অন্ধকারে ছয় সেলের বড়ো টর্চ হাতে চলল শিবরাম। মাথার আকাশের ভিতরে পরিষ্কার আকাশের তারাগুলি ভানু আর শিবরামের মাথায় মাথায় ভেসে যেতে লাগল। দূর থেকে নদী–গর্জন শোনা যেতে লাগল। নদী–বাঁধে উঠতে উঠতে ভানুর মনে হল, আকাশে তারাদের কাছে উঠে যাচ্ছে সে। উঠতে উঠতে আচমকা দাঁড়ায় শিবরাম, 'ভানুবাবু, তুমি কবে থেকে চিনলে ওদের?'

'কাদের?'

'কোকিলারে, কোকিলা সুন্দরীরে?'

ভানু আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল, 'বহু কাল, বহু বছর।'

'কত বছর?'

'হাজার বছর।'

'এ কথার কোনো মানে হয় না, বলো–না সত্যি কথা।'

ভানু বলল, 'মনে হয় ওইরকম, পূর্বজন্মের চেনা।'

'কী বলো তুমি, আমি ওই কথা জানতে তোমারে নিয়ে এলাম এখানে?

ভানু বলল, 'নদীর মুখোমুখি গিয়ে বলি।'

নদী নয়তো সাগর। দূরে, মাঝনদীতে নয়, আরও এপাশে সার সার ইলিশের নৌকো। নদী ছলছল করে ধাক্কা মারছিল বেলাভূমিতে। নদী–বাঁধে দাঁড়িয়ে অন্ধকারের নদীর দিকে তাকিয়ে ভানু বলল, 'তুমি কত দিন চেনো?'

'আমারও তাই মনে হয় ভানুবাবু।'

'আগের জন্মের?'

'হ্যাঁ, মৃন্ময়ী বলে ডাকি আমি ওরে।'

'কারে?' শিহরিত হয়ে ওঠে ভানু, 'কী বলছ তুমি?'

'সত্যি কথা বলছি।'

'কোকিলারে মৃন্ময়ী বলো?'

'হ্যাঁ বলি, কেউ জানে না, শুধু সে আর আমি।'

'তুমি কপালকুণ্ডলা তো পড়োনি, জানো মৃন্ময়ী নামটা কে কারে দিয়েছিল?'

'জানি, আমি কাঁথি, দৌলতপুরের লোক, জানব না?'

ভানু অন্ধকারের নদীর দিকে চেয়ে থাকল। অন্ধকার থেকে চোখ আরও দূর, বহুদূর, সাগরে চলে যেতে লাগল। সাগরে গিয়ে মিলিয়ে যেতে লাগল দৃষ্টি। শিবরাম তার কানের কাছে ফিসফিস করছিল, 'আমি ওরে ভালোবাসি ভানুবাবু, কথাটা কতবার বলতে চেয়েছি, পারিনি, কারে বলি, আমি অন্ধকারে কথাটা তোমারে বললাম ভানুবাবু।'

ভানু বলল, 'গৌরমোহনের বোনের কী হবে?'

'কিছুই হবে না ভানুবাবু, আমি কোকিলারে ভালোবেসে ফেলেছি, উপায় নাই, কোনো উপায় নাই আমার, তা বলে গৌরদাদার বোনরে আমি কষ্ট দেব না, তুমি এটা জানলে।'

ভানু চূর্ণ হচ্ছিল, সে নিজেকে সামলে নেয় অন্ধকার আঁকড়ে ধরে, বলল, 'ঘরে চলো, আমারে কী করতে বলো?'

'কিছুই বলিনে।'

'আমি কি কোকিলারে গিয়ে বলব?'

শিবরাম বলে, 'না।'

'না কেন, তার তো জানা উচিত।'

শিবরাম বলে, 'না।'

'তবে আমারে বললে কেন?'

'তুমি যাতে জানো তাই।'

'আমি জানলে কী হবে, আমি কোকিলার কাছে যাব না?' ভানু হিসহিস করে ওঠে।

শিবরাম নুয়ে পড়ে, 'যতবার পড়ি ও জায়গাটা, শুনবে ভানুবাবু... ''সেই গম্ভীরনাদী বারিধি তীরে, সৈকতভূমে অস্পষ্ট সন্ধ্যালোকে দাঁড়াইয়া অপূর্ব রমণীমূর্তি! কেশভার অবেণী সম্বন্ধ, সংসর্পিত, রাশিকৃত আগুল্ফ লম্বিত কেশভার; তদগ্রে দেহরত্ন, যেন চিত্রপটের উপর চিত্র দেখা যাইতেছে...।'' মনে পড়ে ভানুবাবু?'

'তুমি বললে যে পড়োনি?' ভানু অন্ধকারের নদীর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে।

'না পড়লে কোকিলারে টের পাই কী করে বুকের ভিতরে?'

ভানু বলল, 'বাড়ি চলো।'

বারান্দায় মাদুরে বসেছিল ভাইবোন। গৌরমোহন আর ঊষা। ভানু আগে, তার পিছনে শিবরাম ঢুকল ভিতরের উঠোনে। ভানু দেখল ভাইবোনের মুখ ষাট পাওয়ারের আলোর নীচে রক্তহীন হয়ে গেল আচমকা। ভানুর মনে হল শিবরামের কথা যেন ওরা দুজনে বেশ ভালোভাবেই শুনেছে। কী যেন আলাপ করছিল ভাইবোনে, কথা বন্ধ হয়ে গেল। মাথা নীচু করে ভিতরে ঢুকে যায় শিবরাম। শিবরাম ভিতরে ঢুকতে ঊষাও ঢুকল। ভানু বসল গৌরমোহন মদরঞ্জিওয়ালার পাশে। চুপচাপ। বারান্দায় কোনো কথা নেই। কথা ভিতরেও নেই। নীরবতা থমথম করতে লাগল। এত স্তব্ধ চারপাশ যে দূরের নদীর ছলচ্ছল যেন টের পেতে লাগল ভানু। ঘাড় ত্যারছা করে আকাশে তাকিয়ে আছে সে। ধ্যানমগ্ন হয়েছে যেন গৌরমোহন। ভানু অনন্ত এক নৈঃশব্দ্যকে অনুভব করছিল যেন। আকাশ থেকে লম্বা করে পুব হতে দক্ষিণ–পশ্চিম দিকে একটি আলোর টুকরো ছুটে গেল যেন। ওদিকে, দূর অন্ধকারে সমুদ্র আছে কোথাও। সমুদ্রে পড়েছে উল্কা। ভানু যেন সেই পতনের শব্দ শুনতে পায়।

বহুক্ষণ বাদে গৌরমোহন বলে, ‘ঘোড়াটা মিলল না?’

ভানু চমকে ওঠে, ‘মিলবে না?’

‘কী জানি!’ গৌরমোহন বিড়ি ধরায়। ধোঁয়া উড়িয়ে দেয় বারান্দার বাইরের অন্ধকারে। উঠল। উঠে বারান্দার আলোটি নিভিয়ে দিয়ে এল। ঘন অন্ধকার ব্যাপ্ত হল সর্বত্র। কী অন্ধকার! ভানু বলল, ‘ওইদিন মরুভূমির নীচে অ্যাটম বোমা ফেটেছিল, জানো কি?’

‘তাই তো!’ গৌরমোহন বলল, ‘মনে তো ছিল না, তুমি সেই পূর্ণিমার কথা বলছ তো, কী আশ্চর্য! মিঠাই বিলি হল, পরদিন আবির মাখাল আমাকে।’

ভানু তখন সুরেন কুণ্ডুর কথাটি বলল। শুনে গৌরমোহন বলল, ‘তাহলে তো নতুন করে খুঁজতে হয় ভানুবাবু।’

‘হুঁ, আর একটা কথা কি জানো?’

‘কী?’

‘কথাটা বলেছিল সুভদ্রা বউ।’

‘কার বউ?’

ভানু বলল, ‘ও বলেছিল ওইদিন দুপুরে চাঁদবালির আকাশ পুড়িয়ে সমুদ্রে কী যেন ছুটে গিয়েছিল, আকাশ কালো হয়ে গেল, জ্বলে গেল যেন।’

‘কোনদিন?’

‘সেই বুদ্ধপূর্ণিমার দিন।’

‘কী ওটা?’

‘রকেট।’

‘সে কী?’

‘ক্ষেপণাস্ত্র বলে, কথাটা ভুলেই গিছলাম, তখন কিছু মনেই হয়নি, এমনকি সুরেন কুণ্ডু বলার পরও মনে পড়েনি, এখন মনে পড়ল।’

‘কেন মনে পড়ল?’

আকাশ দিয়ে তারা খসে যাচ্ছে দেখে মনে হল কথাটা।

‘এ সময় তারা খসে যায়, কিন্তু সুভদ্রা কে?’

‘সে অনেক বলতে হবে, পরে শুনো, কিন্তু ঘোড়াটা যদি না এসে থাকে এদিকে, অবনী মৃধা লোকটা বলল কেন?’

'কোনো কোনো লোক অমন থাকে।'

'কীরকম থাকে?' ভানু জিজ্ঞেস করে।

গৌরমোহন চুপ করে থাকে। ভানুর মনে হয় অবনী মৃধা লোকটি ইচ্ছে করেই তাকে ওই রসুলপুরের নদীর দিকে পাঠিয়েছে। লোকটা কে? লোকটা কী বলতে চায়? লোকটা কী বলতে চায় তার কন্থক এই শান্ত দৌলতপুর, দরিয়াপুর, রসুলপুরের নদী, খোলা আকাশ, নরম বাতাসে এসে ঘুমিয়ে পড়েছে। বিশ্রাম নিচ্ছে ক্লান্ত ঘোড়াটি? এই জায়গা তো বিশ্রামের উপযোগী। আহা, কী স্নিগ্ধতা জড়িয়ে রয়েছে এর অন্ধকারে, এর নীল জ্যোতস্নায়! জ্যোতস্নায় ভুঁইয়ের উপর পড়ে থাকা গাছের ছায়াটি কী সুন্দর! ভানু কিছুটা দ্যাখে, কিছুটা কল্পনা করে। সে বলে, 'মদরঞ্জিওয়ালা, কপালকুণ্ডলা বইটা কি আছে এ বাড়িতে?'

'কেন?'

'এখানে বসে পড়তাম, পড়ে শোনাতাম।'

'কে শুনত?'

ভানু বলল, 'অন্ধকার, আর অন্ধকারে সে।'

'সে কে?' গৌরমোহনের গলার স্বর কেঁপে যায়।

'তোমার কোকিলা।'

'তুমি যাও না তার নিকট, সে তোমারে খুব মানে, ঘোড়াওয়ালা বলে হি–হি করে হাসে।'

ভানু বলল, 'খুব গুণী তোমার কোকিলা, চাও–না কপালকুণ্ডলা বইটা।'

'তাহলে তো আলো জ্বালাতে হয় আবার।'

ভানু বুঝল তাও তো সত্যি। আলো ছাড়া পড়া হবে কী করে? আর আলো জ্বললে বারান্দার এই অন্ধকার, আকাশের এক কোণে ওঠা শীর্ণ চাঁদের আবছা হলুদ আলোর বিভা, সব মুছে যাবে। বারান্দা থেকে, উঠোন থেকে বেরিয়ে তারা নদীর দিকে চলে যাবে।

ভানু বলল, 'আমরা রাতে আলো জ্বালাই কেন?'

'আমরা মানে?' গৌরমোহন হকচকিয়ে যায়।

'মানুষ কেন সন্ধ্যে হলে পাখির মতো কথা বলতে বলতে ঘুমিয়ে পড়ে না, ও মদরঞ্জিওয়ালা?'

গৌরমোহন বলল, 'তা'লে কী হত?'

ভানু বলল, 'ঘোড়াটা পালাত না, ওকে হারিয়ে আমি যে কী করি!'

'কে বলল, এসব?'

'মনে হল তাই বললাম।' হাসল ভানু।

আলোটা জ্বলে ওঠে। ভানু ভাবছিল জ্বলবে। তার কথাটি কি ভেতরে যায়নি? ঊষা কিংবা শিবরাম শোনেনি? ঊষা দাঁড়িয়ে আছে হাতে একটি বাঁধানো বই নিয়ে। বইটি মাদুরে রেখে দূরে গিয়ে বসল মদরঞ্জিওয়ালার বোন।

ভানু বইটি হাতে নেয়। জীর্ণ হয়েছে, কত পুরোনো! বহুবার পাতা খোলা হয়েছে, বহুবার বহু হাতে ঘুরেছে বইটি। ভানু বইটি চোখের সামনে মেলে ধরল। শিবরাম দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে, এবার বলল, 'আমি পড়ি?'

ভানু বলল, 'পড়ো তাহলে আমি অন্ধকার পাই দু–চোখ বুজে।'

শিবরাম বইটি নিতে ঊষা উঠল। ভিতরে চলে গেল। গৌরমোহন দেখল তা, বলল, 'ও ভিতরে বসে শুনবে।'

শিবরাম আরম্ভ করল:

'প্রায় দুইশত পঞ্চাশ বতসর পূর্বে একদিন মাঘ মাসের রাত্রি শেষে একখানি যাত্রীর নৌকা গঙ্গাসাগর হইতে প্রত্যাগমন করিতেছিল...।'

ভানু চোখ বুজতে বুজতে দেখল গৌরমোহন তাকিয়ে আছে শিবরামের মুখের দিকে। শিবরাম মগ্ন স্বরে এক একটি বাক্য শোনাচ্ছে। গৌরমোহন কি শুনছে না? মনে হচ্ছে শিবরামের মুখের দিকে তাকিয়ে গৌরমোহন অন্য কথা ভাবছে। কার? কোকিলার? গৌরমোহন কি জানে শিবরাম মনে মনে কোকিলাকে শোনাচ্ছে। শিবরাম কি কল্পনায় কোকিলা বধূকে অনুভব করছে দূরের অন্ধকারে, বিজনে? শিবরামের কন্ঠস্বর শ্রুতিগোচর হয়। শুনতে শুনতে ভানু দাসের দুই চক্ষু মুদে আসে। তখন 'শিশিরাকাশে নক্ষত্রমণ্ডলী নীরবে ফুটিতে লাগিল, যেমন নবকুমারের স্বদেশে ফুটিতে থাকে, তেমনি ফুটিতে লাগিল। অন্ধকার সর্বত্র জনহীন;—আকাশ, প্রান্তর, সমুদ্র, সর্বত্র, সর্বত্র নীরব, কেবল অবিরল কল্লোলিত সমুদ্র–গর্জন আর কদাচিৎ বন্য পশুর রব। তথাপি নবকুমার সেই অন্ধকারে, হিমবর্ষী আকাশ, আকাশতলে বালুকা স্তূপের চতুপার্শ্বে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কখনো উপত্যকায়, কখনো অধিত্যকায়, কখনো স্তূপতলে, কখনো স্তূপ শিখরে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।...'

ভানু দাস যেন তন্দ্রার ঘোরে সব দেখতে পায়। কতদিন বাদে তারা ফোটার মতো করে তার সম্মুখে ফুটে উঠছিল সম্মোহনী শব্দের আলোকবিন্দু। কতকাল বাদে, যেন কত যুগ বাদে উচ্চারিত মন্ত্রের মতো শব্দরাজি তার কানের ভিতরে প্রবেশ করে সমস্ত শরীর স্তব্ধ করে দিচ্ছিল। ভানুর মাথা হেলে পড়ে। ভানু স্পষ্ট দ্যাখে সেই অরণ্যময়, সৈকতময়, সমুদ্র উপকূল। সূর্যাস্ত হয়ে এল প্রায়। বালিয়াড়ির ধবল শিখরমালায় ধীরে ধীরে ছায়া বিস্তৃত হচ্ছিল। একটু বাদে সব বিলীন হয়ে যাবে। সমুদ্র, জলরাশি, সৈকতভূমি, অরণ্য সব একই অন্ধকারে শূন্য হয়ে যাবে। শুধু রয়ে যাবে জলকল্লোল। রয়ে যাবে তরঙ্গভঙ্গ প্রক্ষিপ্ত ফেনার রেখা। শ্বেত পুষ্পে গ্রথিত মালার ন্যায় ধবল ফেনরেখা নীল অন্ধকারে নীল জলমণ্ডলে একমাত্র দৃশ্যমান হয়ে উঠবে। ভানু দেখতে পায় অস্তগামী দিনমণির সুবর্ণ আলোকরশ্মি নীল জলের একাংশে রক্তরাগ মণির বিভায় ফুটে উঠেছে। শ্রীপতি মাইতির ঘোড়াটি বেরিয়ে এল অরণ্য থেকে। বালিয়াড়ির গা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে সে। ভানু দেখতে পেল প্রদোষকাল সন্নিকটে। দিবাবসান আসন্ন। নীলাম্বুরাশি প্রবল হয়ে উঠছে ক্রমশ। সমুদ্র–গর্জন আর সমস্ত শব্দকে নিশ্চিহ্ন করে দিচ্ছিল। ভানু ঘাড় ঘুরিয়েছে কী এক দীর্ঘশ্বাসে। তারপর! 'ফিরিবামাত্র দেখিলেন অপূর্ব মূর্ত্তি! সেই গম্ভীরনাদী বারিধি তীরে সৈকতভূমে অস্পষ্ট সন্ধ্যালোকে দাঁড়াইয়া অপূর্ব রমণী মূর্ত্তি!'

'কে, কোকিলা বধূ ওই?'

কোকিলাই। আধো তন্দ্রার ঘোরে শিবরামের কপালকুণ্ডলা পাঠ কানে আসছিল। তন্দ্রাচ্ছন্নতায় সেই অপূর্ব রমণীকে দর্শন করে ভানু বলে, 'ঘোড়াটি কোথায় গেল কিছু খোঁজ হল না, সেদিন ছিল বুদ্ধ পূর্ণিমা, কুমারের জন্মদিন কন্থকের মনে ছিল!'

উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে আকাশ জ্বলে উঠল। সহস্র সূর্যের আলোয় আকাশ যেন ঝলসে পুড়ে গেল। দাউদাউ করে জ্বলতে লাগল আকাশ সমুদ্র। তেজস্ক্রিয় ধূম্ররাশি, নিকষকালো ধূম, জলতল, সৈকতভূমি থেকে মাথার আকাশ পর্যন্ত ব্যাপ্ত হয়ে গেল। আকাশের যত তারা নিবে গেল সব। বিস্ফোরণে ছুটতে আরম্ভ করল কন্থক। তার সর্বাঙ্গ গলে যাচ্ছে, পড়ে যাচ্ছে, পুচ্ছ কেশর রক্তাভ আগুনের গ্রাসে পড়ে মুছে যাচ্ছিল ক্রমশ। ভানু ডাকল, 'কোকিলা হে, আমার কন্থক?' ভানু কোকিলার দিকে চেয়ে আছে।

'অনন্তর সমুদ্রের জনহীন তীরে, এইরূপে বহুক্ষণ দুইজনে চাহিয়া রহিলেন। 'অনেকক্ষণ পরে তরুণীর কণ্ঠস্বর শুনা গেল। তিনি অতি মৃদু স্বরে কহিলেন,' "পথিক, তুমি পথ হারাইয়াছ?" '

ভানুর ঘাড় আরও কাত হয়ে গেল। গৌরমোহন অস্ফুট স্বরে বলল, 'ঘুমিয়ে পড়েছে।'

'তাহলে বন্ধ করি?' শিবরাম বইখানি কপালে ঠেকায়।

পরদিন সকালে গৌরমোহন ট্রেকারে তুলে দিল ভানুকে, বলল, 'মীরগোদা ঘুরে যেও।'

কাঁথি, রূপশ্রী সিনেমা হলের কাছে ঘুরঘুর করতে করতে ভানু ঠিক করতে পারছিল না মীরগোদা যাবে কি না। গৌরমোহন নেই, কোকিলা, যুবতী বধূ একা ঘরে রয়েছে ওই নির্জন, প্রাচীন মরুভূমিপ্রায় সাগরকূলে, তার যাওয়া কি ঠিক হবে? গৌরমোহন কেমন মানুষ, বউ ফেলে রেখে ভগ্নির ঘরে গিয়ে বসে আছে। কোনো দরকার আছে বলে মনে হয় না। হয়তো আছে, শিবরামের বউ, গৌরমোহনের ভগ্নির ডাকে গৌরমোহন গেছে। শিবরামের মনের

বাসনা কি ঊষা জানে? জানে হয়তো, তাই তাকে পাঠাল নাকি গৌরমোহন মীরগোদায়? নানারকম ভাবনাচিন্তায় ঘুরপাক খেতে খেতে ভানু কাঁথি থেকে বাস ধরে দীঘার পথে রামনগর নামল, তারপর সেখান থেকে ভ্যান রিকশায় উঠে চলল মীরগোদা হাটে। হাটবার নয়, তাই শূন্য চালা, ঘুমন্ত কুকুর আর তাসখেলার মগ্ন জনাকয় অলস ব্যাপারি ছিল। ভানুকে তারা দেখল, কোনো কৌতূহল প্রকাশ করল না। ভানুকে হয়তো চেনে। দীঘায় যাদের যাওয়া–আসা, তারা চিনবে না কেন। ভানু চলল মদরঞ্জিওয়ালার কুটিরে। ডান ধারে বালির স্তূপ, ঝাউ জঙ্গল, বালির ঢেউ রেখে, প্রাচীন সমুদ্রচিহ্ন রেখে দিয়ে পৌঁছোল গৌরমোহনের বাড়ি। 'আছ না কি কোকিলা বধূ, আছ, আমি ঘোড়াওয়ালা ভানু দাস এলাম।'

ঘুমোচ্ছিল কোকিলা। ঘরের আগল বন্ধ ছিল। দরজা খুলে ঘুম ভাঙা চোখ ডলতে ডলতে, গায়ের আঁচল তুলতে তুলতে বেরোল দাওয়ায়। ভানুকে দেখে সে ভাবলেশহীন, দাওয়ার কোণ থেকে মাদুর টেনে দিতে দিতে বলল, 'জানতাম, তোমারে পাঠাবে জানতাম, তা দেরি হল কেনে?'

'জানতে!' ভানু তো অবাক। বসল মাদুরে।

'মনে হচ্ছিল ক–দিন ধরে, তুমার আসার দিন হয়ে গেছে।'

'সে কী কথা, আমি তো নিজেই জানতাম না আসব।'

'খুব জানতে!' কোকিলা বলে, 'ঘোড়াটারে কি খুঁজে পেলে হে?'

'না, কিন্তু একজন খবর দিল...।' ভানুর মনে পড়ল অবনী মৃধার কথা। অবনী মৃধা খবর দিল তাই না সে দৌলতপুরের দিকে গেল। গেল বলেই না গৌরমোহনের সঙ্গে দেখা হল। দেখা হল বলে শিবরামকে চিনল সে। রসুলপুরের নদী, শিবরামের আত্মউন্মোচন, সব হল। কিন্তু অবনী মৃধা লোকটা কে? কেন তাকে মিথ্যে বলে দৌলতপুরে পাঠিয়েছিল? উদ্দেশ্যটা কী? চেনে নাকি তাকে কোকিলা? অমন নাম শুনেছে কখনো? গায়ে পড়ে আলাপ করল ভানুর সঙ্গে। বুদ্ধপূর্ণমার রাতে ঘোড়াটা উধাও হয়েছে শুনে, আর ওইদিনেই পোখরানের বালির নীচে...।

কোকিলা শুনে অবাক, 'কী বলছ ঘুড়াওয়ালা?'

ভানু বলল, 'এই সত্যটি জানা ছিল না, জানলাম তো বজবজে গিয়ে।'

কোকিলা বলে, 'কী আশ্চর্য! আমি তো জানি, মোর তো সব জানা ভানুদাদা, পরদিন হাট ছিল, কুনোদিন যে লক পেপার আনেনি, লিয়ে এল একখানা, আর তার মাথায় সবুজ রঙের আবির, মিঠাই লিয়ে এল গৌরদাদা।'

'বলল না তো আমারে।'

'স্মরণ করায়ে দিয়েছ বোমা ফাটানোর কথা?'

'হ্যাঁ, বলেছি তো।'

'কী বলল?'

'শুনল শুধু, কিছুই তো বলল না।'

'মনের দুঃখে আছে মদরঞ্জিওয়ালা।'

'দুঃখটা কী?' জিজ্ঞেস করে ভানু।

'তা সে জানে, তুমি যদি দেখতে, কী আনন্দ লকটার সেদিন, পেপারটা রয়েছে ভিতরে, আমি ছবি দেখলাম, ও কিছু কিছু পড়ে শুনাল।'

ভানু ঠোঁট কামড়ায়, 'তুমি পড়তে পারো না?'

'না।' বিষণ্ন মুখে জানায় কোকিলা।

'তুমি এত সুন্দর আঁকতে পারো, পড়তে জানো না?'

'আঁকা তো শিখিনি, দেখে হয়েছে।'

'কী করে?'

'বাহ্‌, এই যে আশমান, বনজঙ্গল, নদী, সুমুদ্দুর, মাঠ, গাছপালা ই–সব চিনতে তো লক লাগেনি ভানুদাদা, এই যে আলো, রোদ্দুর, মেঘ, বিষ্টি, সন্ধ্যে ই–সব চিনতে তো লক দরকার হয়নি ঘুড়াওয়ালা, এই যে লাল, নীল, হলদে, সবুজ, বেগুনি, কমলা, তুঁতে নীল রং, রামধনুকের সাত রং, ই–সব তো আপনা–আপনি চিনা হয় ভানুদাদা, কিন্তু ''ক'' বলতে গেলেও লক লাগে, জুছনা চিনি বটে, নীল জল চিনি, নীল জুছনা চিনি, কিন্তু ''ক'' কাগজে তা লিখা থাকলি চিনতা পারবনি, আর গৌরদাদা তো শিখাল না।'

'তুমি শিখবে বলেছিলে?'

'বলি নাই, কিন্তু সে তো জানে মু ''ক'' চিনিনি, ''খ'' চিনিনি।'

ভানু দীর্ঘশ্বাস ফেলল, তারপর হেসে কোকিলার বিমর্ষ ভাবটি উধাও করে দেয়, 'তুমি তো আসলটাই চেনো, রং চেনো, আমি রংকানা।'

'তুমি রংকানা, বিশ্বাস করি না।'

'তাই তো বটে, রঙের নাম জানি, রঙের চেহারাটি জানি, ভিতরটা অন্তরটা কি জানি? রঙের রূপ জানি না, রং কেমন কথা বলে তা জানি না।'

কোকিলা বধূ বলে, 'থাক উসব কথা, বলি সেই কার কথা যেন বলছিলে, অবনী মিরধা না কেডা, কী হল বলো।'

'সে কেন মিথ্যে বলে পাঠাল আমারে দৌলতপুর?'

'কথাটা তো সত্যিও হতে পারে।' বলল কোকিলা, 'সে হয়তো দেখেছিল তুমার ঘুড়াটারে, দিখতেও তো পারে।'

ভানু চুপ করে থাকে। ভানু দু–চোখ বন্ধ করে। 'কোকিলা বধূ, তুমি কী বুঝবে শূন্যপৃষ্ঠ অশ্ব কন্থককে নিয়ে আমি ফিরেছিলাম কপিলাবস্তু নগরে। অশ্বটির সব ছিল, ভূষণ ছিল, শ্রী ছিল না। যে পথ আমরা এক রাত্রে পার হয়েছিলাম কুমারকে নিয়ে, কপিলাবস্তুর রাজপুত্রকে নিয়ে, সেই পথে ফিরেছিলাম আট দিন ধরে। শ্রীহীন পৃথিবী, জীর্ণ, বলহীন হয়ে গিয়েছিল আমার ঘোড়া। তবু তো সেই ঘোড়াটি ভগবানের স্মৃতি। তাকে নিয়ে বাঁচতাম। কন্থক আমাকে ছেড়ে গেল তো আমি কী করে বাঁচি!'

'কী বলো তুমি ভানুদাদা?'

ভানু বিড়বিড় করে, 'কন্থকের হ্রেষারব শুনে তুমি তো ভাবলে রাজপুত্র ফিরে এসেছে, আসলে কেউ ফেরেনি।'

'কী বলো তুমি?'

ছন্দক মাথা নত করে দাঁড়াল, 'কন্থকও, রাজপুত্রের মহানিষ্ক্রমণ হয়েছে।'

'এসবের মানে কী?'

ভানু হাসল, তারপর আচমকা জিজ্ঞেস করে, 'শিবরাম কেন কোকিলার কথা জিজ্ঞেস করে বার বার?'

কোকিলা চমকে ওঠে, ভানু শোনে, সে যেন বলে, 'কী কহ তুমি ছন্দক?'

'ঠিকই কহি।'

কোকিলা বলে, 'তবে শুনে রাখো, মদরঞ্জিওয়ালা ব্যতীত মোর কেহ নাই, কেহ নাই।'

'তা আমি জানি।'

'তবে যে কহ লকটার কথা?'

'সে লোক যে কথা বলেছে আমারে তা যদি শুনতে!'

'কী কথা?'

ভানু বলল, 'থাক, সে যদি তোমারে না বলে, আমি কেন বলি?'

‘সে কি আসবে?’ গলার স্বরে বেদনা ও আর্তি ফুটে ওঠে।

‘তা তো আমি জানিনে।’

‘যদি দেখা হয়, না আসিতে কহি দিয়ো ভানুদাদা, আমার আঁকাটাঁকা সব নষ্ট করি দিবে অই শিবরাম।’

‘তুমি বলছ?’

‘হ্যাঁ, তুমি ঘুড়াটার কথা বলো, কী যেন বলছিলে, সিটাই কহ, ঘুড়াটা তুমার কী ছিল, ঘুড়ার মালিক তো হুটেলওয়ালা।’

‘আমি যে ওর সঙ্গী, সেই কতকাল আগে থেকে।’

‘কতকাল?’

ভানু বলে, ‘যেদিন আমাদের ত্যাগ করে রাজপুত্র জন্ম–মৃত্যু খুঁজতে বেরিয়ে গেল, সেদিন থেকে, মনে আছে তোমার কোকিলা বধূ?’

কোকিলার চোখে জল এল। কেন এই অশ্রুবিন্দু তা কি কোকিলা জানে? এখন সে মদরঞ্জিওয়ালার বউ, পেটে ভাত, গায়ে কাপড় জোটে না, কিন্তু এমন কী ছিল বহু বহু বর্ষ আগে, সেই রাজ–অন্তঃপুরে? রাজদাসী হলেও তো ছিল সেই কুমারের দাসী, ভগবানের পা ধুইয়ে দিত সে, মনে পড়ে তা?

কোকিলা কাঁদছিল। কিছুই বুঝতে পারছিল না ছন্দকই–বা কে, কাকেই–বা ফেলে রেখে এল ঘোড়াটা? শূন্যপৃষ্ঠ নিয়ে গেলই–বা কোথায়?

ভানু এবার বলছে পোখরানের কথা। দোরগোড়া থেকে মুখ বাড়িয়ে ঘরের অন্ধকারে পোখরানের কথা জানিয়ে দিচ্ছে কোকিলাকে। কোকিলা তার ঘরে আঁতিপাতি করে খুঁজছে পুরোনো খবরের কাগজটি। খবরের কাগজ তো কেনে না গৌরমোহন, ওই সময় কিনেছিল কয়েক দিন। তখন হাটে বাজারে কী হল্লা। যেন ভিটের উঠোনে অ্যাটম বোমা ফেটেছে। বলতে বলতে কোকিলা ঘরের অন্ধকারে হামাগুড়ি দিচ্ছে। চৌকির নীচে ঢুকে পড়েছে প্রায়।

ভানু বলে, 'তুমি জানো ওই বোমাটা কী?'

কোকিলা বলে, 'কুছুকুছু শুনেছি।'

'কে বলেছে?'

'কেনে তুমার দাদা, খবরের কাগজ পড়ে শুনাত, মরুভূমির তলে ফাটানো হইছিল, আচ্ছা, মরুভূমির সব তো বালি?'

'হ্যাঁ, জল নাই।'

'মরুভূমি কী করে হয়?'

'সাগর শুকায়ে।'

'তাহলে মরুভূমির তলে সাগর আছে?' কোকিলা অন্ধকারে বসে পুরোনো খবরের কাগজ ক–টি কোলের কাছে নিয়ে জিজ্ঞেস করল।

'ছিল।'

'ইখন নাই?'

'কী করে জানব?'

'সাগর কি একেবারে মরতে পারে?'

'কী জানি!'

অবাক লাগে, 'মোর মীরগোদাটা কি মরুভূমি?'

'তা কেন হবে, জল তো আছে মাটির নীচে।'

'আছে?'

'না থাকলে এত গাছপালা, এত বন, সবুজ!'

'মরুভূমির নীচে তাহলে সাগর নাই?'

'থাকতেও পারে।'

'যদি থাকে সেই সাগর মরি যাবে এই বোমায়?'

চমকে ওঠে ভানু দাস, 'তুমি জানো সব!'

'যা বলিছিল তুমার দাদা, সব মনে আছে।'

'তুমি জানো অই বোমায় কী হয়?'

অন্ধকার থেকে কোকিলা জবাব দেয়, 'মানুষ মরে, অনেক অনেক মানুষ।'

'আর?'

'গাছপালা মরে, জীবজন্তু মরে, পোকামাকড় মরে।'

‘আর কী মরে?’

‘মরণ, সবই মরণ, মাটি মরে যায়।’

‘মাটির মরণ কী করে হয়?’

‘সি মাটিতে নাকি আর ফসল হয় না।’

‘আর কী হয়?’

‘বাতাস মরে, বাতাসে মরণ ঘোরে।’

‘তুমি তো সব জানো।’

‘যেটুকুন কহিছিল তুমার দাদা, সে নাকি অনেক কাল ধরে মরে।’

‘হ্যাঁ, ঠিকই জানো।’

‘অনেক অনেক বছর ধরে মরণ ঘুরে বেড়ায়?’

‘তাইই তো।’

‘ধিকিধিকি মরে।’

‘ঠিকই শুনেছ!’ ভানু দাস বলে, ‘ওইদিন মোর ঘোড়াটা রাত্তিরে পালাল, ওই বোমার সঙ্গে তার কি যোগ আছে কোকিলা?’

কোকিলা বুকের কাছে কাগজ ধরে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। মাথার চুলে ঝুলকালি, ময়লা লেগেছে। কাগজে একপারত ময়লা। দাওয়ায় ফেলে দিয়ে দাঁড়িয়ে আঁচল ঝাড়তে লাগল। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, ‘কী কাণ্ড, তুমি এলে, না তুমারে খেতে বললাম, না দিলাম জল, ভানুদাদা ভাত খাও।’

‘না, খেয়ে এসেছি।’

‘খেয়ে এলে কেনে, সে লক কি তুমারে খেয়ে আসতে কহিছিল?’

‘তা কেন, খবর না দিয়ে তো আসা।’

কোকিলা দাওয়া থেকে উঠোনে নেমে গেছে। চক্কর মারছে ঘোলাটে মেঘে ঢাকা আকাশের নীচে। মাথার চুল খুলে দিয়েছে। ঘুরতে ঘুরতে দাওয়ার সামনে এসে বলে, ‘জল খাবে?’

‘দাও।’

‘সেই মর্কটটার খুব সাহস।’

‘শিবরামের কথা বলছ?’

‘হ্যাঁ, মোর মান রাখলনি তুমার নিকট।’

ভানু বলল, ‘এক এক সময় অমন হয়, মানুষ পারে না।’

‘অনেক দিন ধরে ও ঝুল দিচ্ছে, ও কেমন লক?’

‘আমি কী জানি?’

‘ও তুমার নিকট বলল, তুমি যদি মদরঞ্জিওয়ালারে কহি দাও?’

‘তা কেন বলব?’

‘তুমারে কি ভালো চিনত ও?’

‘না।’

‘হায়!’ কোকিলা উঠোনে বসে উবু হয়ে, ‘ও আর কারে কারে কহিছে কেডা জানে, যত বলি তুমি ই–সব ছাড়ো, শুনেনি কথা, সব্বোনাশ হুই যাবে ভানুদাদা।’

'কেনে?'

'ও লকের বুন, মোর ননদরে দিখলে?'

'দেখলাম।'

'কেমন দিখলে?'

'বুঝতে পারিনি।'

'ওই শিবরাম, ও লক নাকি ঘুমের ঘোরে কথা কয়।'

'সে কী।' আঁতকে ওঠে যেন ভানু দাস, 'তাহলে ওর বউ সব জানে?'

'জানে বুধ হয়, সে কি মদরঞ্জিওয়ালারে সব কহি দিবে?'

ভানু দ্যাখে চঞ্চল পাখি যেমন খাঁচার ভিতরে ঝটপট করে, সেইরকম উদ্বিগ্ন হয়ে এলোমেলো ঘুরছে কোকিলা বধূ। মন খুব চঞ্চল হয়েছে। দুই ডানা দিয়ে ঝাপটা মারছে খাঁচার গায়ে।

ভানু বলে, 'কে বলল শিবরাম ঘুমের ঘোরে কথা কয়?'

'ওর বউ, মোর ননদিনি ঊষা।'

'হঠাৎ ও–কথা বলেছিল কেন?'

'মোরে শুনাতে, সাবধান করে দিল যেন।' বলতে বলতে কোকিলা দ্রুত পায়ে রান্নাশালের দিকে যায়। শিকল খুলে ভিতরে ঢুকে যায়। এই সময়টুকুতে উঠোন শূন্য। ভানু দাসের চোখে কেমন ধাঁধা লাগে যেন। ভানু দু–চোখ বোজে। আরাম পায়। আবার খোলে চোখ দুটি। এখনও উঠোন শূন্য। কোকিলা কি রাঁধতে বসল? ভানু খবরের কাগজে চোখ মেলে। মাটি থেকে আকাশ পর্যন্ত ধোঁয়ার কুণ্ডলী। ভানুর চোখ অন্ধকার হয়ে যায়। ধোঁয়া উঠে আসছিল কাগজের উপর থেকে। এই ছবি কি হিরোশিমার? ভানুর দম আটকে আসছিল। পোখরানেও কি এমন কালো ধোঁয়া আকাশ ছেয়ে ফেলেছিল? মাটি উঠে গিয়েছিল আকাশে? নাকি এই ছবিই পোখরানের? ভানুকে ধোঁয়া গিলে ফেলছিল, তেজস্ক্রিয় বাতাস তার নাকের ভিতর দিয়ে ফুসফুসে প্রবেশ করছিল। তার চোখের মণিতে ছত্রাক জন্মাচ্ছিল। ভানুর দু–চোখ ঝাপসা হয়ে আসতে থাকে। ভানু আর দেখতে পাচ্ছিল না। ভানুর গলা শুকিয়ে এসেছিল। কত যুগ সে জল পায়নি! এত বছর শরীরে যে জল জমা হয়েছিল, সব বাষ্প হয়ে উঠে গেছে আকাশে। তৃষ্ণায় কণ্ঠনালি দুমড়ে যাচ্ছিল। ভানু দুটি হাত তুলে আকাশের কাছে জল চায় যেন। এই আকাশ তাকে জল দিলে সে জল পায়। সূর্য তাকে আলো দিলে সে আলো পায়, বাতাস তাকে বিশ্রাম দেয়। সব তেজস্ক্রিয় ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে। ভানু আকাশ দেখতে পায় না জল প্রার্থনার জন্য।

তখন কোকিলা বধূ এল। কাঁসার গ্লাস ভরতি জল আর হাতের মুঠিতে ক–টি বাতাসা এনে ভানুর সামনে হাঁটু মুড়ে বসেছে কোকিলা বধূ, 'ও ভানুদাদা, নাও, জল নাও, খুব তেষ্টা পেয়েছে তো?'

ভানু চোখ মেলল। দেখল শীতল, স্নিগ্ধ কোকিলার রূপ। সে হাত বাড়িয়ে বাতাসা দুটি গ্রহণ করতে করতে বলে, 'কীরকম যেন লাগছিল শরীর!'

'কী হল?' কোকিলা উদ্বিগ্ন হয়।

না। ভানু হাসে, বাতাসা মুখে নিয়ে দাঁতে ভাঙতে থাকে। চিবোয়। গুঁড়ো গুঁড়ো দানা গালের ভিতর ছড়িয়ে পড়ে। ঠান্ডা জল সেই মিঠে ভাবটি গাঢ় করে। বুক ঠান্ডা হয়ে যায়। শীতলতা সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। জল খেয়ে শ্বাস নিতে থাকে ভানু। আকাশ দ্যাখে। আকাশ পরিষ্কার হচ্ছে। চারদিকে নিঝুমতা, নিস্তব্ধতা, শান্ত সমাহিত ভাব। কোকিলা তার সামনে বসে আছে, বলল, 'তুমি কী করতে এলে কহ দেখি?'

'ঘোড়াটারে নিতে, ওরে ছাড়া দিন যায় না, ওর খাওয়া, ওর স্নান এসব না হলে আমার দিন কাটে না।'

'সে তো মরুভূমি চলি গিইছে।'

চমকে ওঠে ভানু, 'কে বলল?'

কোকিলা জবাব না দিয়ে বলে, 'শিবরাম যে কত জনারে কহিছে উ কথা, মোর সমুখে এসে কিন্তু কহিতে পারেনি, মোর মান ধুলায় লুটায়।'

'আর কাকে বলেছে?'

'হাটের এক ব্যাপারিরে পর্যন্ত।'

'তারা কি তোমাকে এসে বলেছে?'

'হ্যাঁ।' কোকিলা মাথা নামায়, 'কী জানি মদরঞ্জিওয়ালা জানে কি না, আর ঘুমের ঘোরে উয়ার বউরে শুনাইছে কি না তাই বা কে জানে।'

ভানু বলল, 'থাক।'

কোকিলা চুপ করে থাকে। অন্যদিকে ফিরে আছে। ঘন কালো মেঘের মতো রং এ মেয়ের। এ মেয়ে যেন বর্ষার সেই মেঘই, নাহলে এত তৃষ্ণার ভিতর জলটি এনে তার মুখের সামনে ধরে! ভানু দেখছিল রূপখানি। যে রূপে উগ্রতা দেখেছে আগে সেই রূপ কত শান্ত, নিঃশব্দ! ভানু অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। কী ভালোই না লাগছে মদরঞ্জিওয়ালার বউটাকে। একে কিনা কামনা করে শিবরাম, কেন শ্রীপতি মাইতিও। কামনা করে নিজে নিজেই পুড়ে মরছে শিবরাম।

ভানু বলে, 'তুমি খুব সুন্দর কোকিলা।'

'কেন?' কোকিলা ঘুরে তাকায়।

'মনে হল।'

'আর তো কেউ কহেনি।'

'কেউ না?'

'না।'

'শিবরামও না?'

'না, উ তো লুকায়ে দ্যাখে মোরে।'

'মদরঞ্জিওয়ালা?'

কোকিলা বলে, 'সে তো ইভাবে বলে না ভানুদাদা।'

কোকিলা দুই উরু পেতে পায়ের গোড়ালির উপর ভর দিয়ে ভানুর মুখোমুখি। ভানু খবরের কাগজ মেলে ধরতে থাকে। খবরের কাগজ জুড়ে উতকট উল্লাসের কথা। উল্লাসের বিবরণ দিয়েছে কাগজ। কোকিলা ঝুঁকে পড়েছে কাগজের অক্ষরের দিকে। পারমাণবিক বিস্ফোরণের তেজস্ক্রিয়তায় যেন অক্ষরগুলি জ্বলন্ত হয়ে উঠেছে। ভীষণ তপ্ত, ভীষণ দপদপে। সেদিকে তাকিয়ে কোকিলা বিড়বিড় করে, 'কখনো মনে হয় তার কপাল খারাপ, খাঁচা খুলে দিইছে, পাখি উড়ছেনি।'

'একথা বলছ কেন?'

'কখনো মনে হয় যে, কিন্তু পাখি যে ভুলে গিছে উড়তে, তা মদরঞ্জিওয়ালা জানেনি, জানলে মোরে ফেলে উখেনে গিয়ে পড়ি থাকে!'

'তোমার পরে তার মন নাই?'

'আছে, আবার নাই, আবার আছেও।'

ভানু চুপ করে থাকে। আর কী শুনবে সে? সে তো এসেছে ঘোড়ার খোঁজে। ঘোড়াটি যেন আছে এই কোকিলা বধূর কাছে। ভানু প্রসঙ্গ বদলায়, 'কই, এবার দেখাও দেখি, আঁকা কতটা হল।'

কোকিলার মুখখানি অন্ধকার, 'হয় নাই।'

‘কেন হয়নি?’

‘জানিনি ঘুড়াওয়ালা, আমি তারে বাইরে আনতে পারছিনি।’

‘তার মানে?’

‘মনে তাকে ধরতে পারছিনি সম্পূর্ণ করে।’

‘সে কী! তুমিই না এঁকেছিলে তারে বুদ্ধপূর্ণিমার দিনে?’

‘হ্যাঁ, তখন তো বন্দি করা হল ভানুদাদা, এখন তো তারে আবার ছেড়ে দিতে হবে, সেই মন্তরটাই ধরতি পারছিনে, আমি তারে বাইরে আনতি পারছিনে।’

ভানু ভাবে এ কীরকম কথা! একবার যে আঁকল পক্ষীরাজকে, আর একবারও তা আঁকবে। কিন্তু পারছে না। বলছে তখন তো জানত না পক্ষীরাজের কথা। তখন তো জানতই না সে যাকে আঁকছে, সেই ঘোড়াটা ওই দিনে ওই সময়ে চাঁদের আলোর ভিতরে ছুটে আসে খোলা পৃথিবীর এদিকে, মীরগোদার ফুরিয়ে যাওয়া সমুদ্রের বুকে, বালিতে বালিতে। সে জানত না সে নিজের অলক্ষে কী করে ফেলছিল তখন। জানত না কোকিলা বধূ, যে সে–ই ডেকে এনেছিল ঘোড়াটাকে। তার কুহকেই ছুটে এসেছিল ঘোড়াটা। জানল যখন, নিজের ক্ষমতা যেন নিজেই টের পেল। একটা ঘোড়ার কথা মনে মনে ভেবেছিল, সেই ঘোড়াটা যে জীবন্ত তা জেনে শিহরিত হল। নিজের অজান্তেই জীবন্ত ঘোড়াটাকে তার মনের ভিতরে বন্দি করে, তাকে এঁকে ফেলল মদরঞ্জির বুকে। এসব জানার পর এখন আঁকতে গিয়ে মনে হচ্ছে মনের গহনে বন্দি হয়ে থাকা ঘোড়াটাকে মুক্তি দিতে হবে। ঘোড়াটাকে মুক্তি দিতে পারলেই না তাকে আঁকতে পারবে আবার।

ভানু বলল, ‘চেষ্টা করো।’

‘করছি, আঁকি ফেলব ঘুড়াওয়ালা, তুমার ভাবনা নাই।’

‘কবে হবে?’

‘কী জানি, তুমি বরং আমারে সেই দিনটার কথা শুনাও।’

‘বুদ্ধপূর্ণিমার দিনের কথা?’

‘হ্যাঁ, তারও আগে কোনো এক দেশে মানুষ মারা হল, হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ মানুষ মরল, সেই মরণের কথাগুলো শুনাও।’

‘শুনতে পারবে?’

‘জানব, মদরঞ্জিওয়ালা একটু কহিছে, বাকিটা কহে নাই, মুখ আঁধার করে বসি থেকিছে, কহিছে ই–সব শুনায় মোর লাভ নাই।’

‘সে দেশের নাম জানো?’

‘জাপান কহিছিল।’

‘সেই শহর?’

‘কী জানি।’

ভানু দাস তখন হিরোশিমার কথা বলে। হিরোশিমায় শ্রাবণ ছিল, আমাদের এখেনে বুদ্ধপূর্ণিমা। হিরোশিমার কথা শুনবে, নাগাসাকির কথা শুনবে, না পোখরানের কথা শুনবে কোকিলা বধূ? হিরোশিমা মানে মরণের সেই কৃষ্ণগহ্বর, কালো বৃষ্টি নেমে আসছে মরণ হয়ে। সেই মরণ থামে না, বছরের পর বছর চলে। সে যেন ছিল মরণের কালো মেঘ, সেই মেঘ ছেয়ে যায় শুধু, ছেয়েই যায়। সেই মেঘ শেষ হয় না। তার আয়ু ফুরোয় না। পূর্ব দিগন্ত থেকে পশ্চিম দিগন্ত শুধু মৃত্যুর ছায়া দ্যাখে হিরোশিমা। সেই মরণ থেকে কেউ বেঁচে ফেরে না।

কোকিলা বধূ অস্ফূট আর্তনাদ করে ওঠে, ‘কী কহ ভানুদাদা?’

‘যা হয়েছিল তাই বলছি।’

ভানু বলে যায়। বলতে বলতে আচমকা থামে, থেমে যেতে তার কণ্ঠ হতে জেগে ওঠে অন্য আর এক স্বর। আসলে কন্থক তো জানত মৃত্যুকে জয় করতে বেরিয়েছেন কুমার, রাজপুত্র মৃত্যুকে নিঃশেষ করতে তাঁর অশ্বটিকে শূন্যপৃষ্ঠ করে রেখে গিয়েছিলেন, এখন মরণের ছায়া দেখে সে কি কুমারের সন্ধানে গেল, তা নাহলে গেল কোথায়, এ মরণে কি কুমারেরও নিস্তার নেই?

'কী কহ তুমি ভানুদাদা, ধরতে পারছিনি।'

'আমার কন্থককে তুমি আঁকো।'

'আঁকতে তো চাই।'

শূন্য হৃদয় ভানু দাস ঘাড় হেঁট করে বসে আছে। ঘোড়া ব্যতীত তার অস্তিত্ব কোথায়? 'কন্থক ছাড়া ছন্দককে কে চিনত বলো কোকিলা?'

কোকিলা মাথা নাড়ে, 'কুছুই বুঝিনি ভানুদাদা।'

ক–দিন আগে থেকে পোখরানের মরুপ্রান্তর, নিকটবর্তী খেতলাই–এর দখল নিয়ে নিয়েছিল আমাদের সেনাবাহিনী। জওয়ানরা কাঁটাতারে ঘিরে ফেলেছিল মরুদেশ। ওইদিন সকাল থেকে খেতলাই–এর মানুষ ঘরবন্দি হয়ে পড়েছিল। ঘর থেকে তাদের বেরোতে দেওয়া হচ্ছিল না। মানুষজন সন্দেহ করছিল। চব্বিশ বছর আগের স্মৃতি কি ফিরে আসছিল তখন? সেও তো ছিল এমনই এক দিন; বুদ্ধপূর্ণিমা। দুপুর গেল চিরাচরিত উষ্ণতায়। বেলা পড়তে শুরু করল। চারটে নাগাদ পোখরানের মরুভূমি দুলে ওঠে। খেতলাই গ্রাম দোলে। মাটির অনেক নীচে, তিন থেকে চারশো মিটার গভীর শিলাস্তরে ফেটেছে পর পর তিনটি পরমাণু বোমা। পোখরানের ধরিত্রীগর্ভ ফেটেফুটে, ছিন্নভিন্ন হয়ে আকাশে উঠে গেল বালির ঝড়, বালির ধোঁয়া।

কোকিলা জিজ্ঞেস করে, ‘ভুঁই দুলল?’

‘হ্যাঁ পাকা ঘর ফেটে গেল, আরও কী কী হল, রাত্রে খবরে জানা গেল বোমা ফেটেছে মাটির নীচে। বালি তারপর মাটি, তারপর পাথর, মরুভূমি ছিল সমুদ্র। সমুদ্রের নীচে পাহাড়, সেই পাহাড় গলে গেল মাটির নীচেই, এমন তাপ যে গলে পুড়ে ধোঁয়া হয়ে উড়ে যায় আকাশে, তারপর আকাশ থেকে ভস্ম নামে।’

‘তুমি এসব জানলে কী করে?’

‘এ তো কাগজে লিখেছে।’

‘থাক, আর না।’

‘কেন?’

‘ভয় লাগে ভানুদাদা, আচ্ছা সেদিন রাতে চাঁদ উঠল?’

‘উঠল।’

‘এখেনের মতো?’

‘হ্যাঁ, ভগবান বুদ্ধের মতো শান্ত, স্নিগ্ধ।’

‘তুমি মরুভূমি দেখেছ?’

‘না, সমুদ্র দেখেছি।’

‘সে তো আমিও দেখেছি।’

ভানু বলল, ‘চাঁদের আলোয় মরুভূমিকে সমুদ্রের মতো লাগে।’

‘কে বলল?’

‘মনে হয় তাই যেন, এই দ্যাখো মরুভূমির ছবি।’

কোকিলা দেখল। তাকিয়ে থাকল। তাকিয়ে থাকতে থাকতে বলল, ‘সেদিন জোছনায় কী যেন ছিল! কাজ করতে করতে এদিক তাকাই, ওদিক তাকাই, আকাশ দেখি, মাটি দেখি, অদ্ভুত রাত্তির ছিল সেটি!’ কোকিলা বিড়বিড় করে, ‘ওই বোমা ফাটলে বাতাসে মরণ ঘোরে, সেদিনের বাতাসে কি ছিল তাই?’

‘ছিল তো বটে, মাটি, আলো, বাতাসে বিষ ঢুকে যায়।’

‘এতদূরে, এদিকেও আসবে বিষ?’

‘কত আর দূর, তবে দূর তো বটে, কিন্তু আকাশে আকাশে কতটা আর, আর পোখরান যে দেশে, মীরগোদা সেই দেশে, ইন্ডিয়া, পোখরানে মাটির নীচে বোমা ফাটালে এখেনে তো আনন্দ হয়, আবির খেলা হয়, মিঠাই বিলি হয়, ইন্ডিয়ার শক্তি বাড়া মানে যেমন লোক বলে তারও শক্তি বাড়া।’

‘বুঝিনে।’

'আমিও বুঝিনে কী করে শক্তি বাড়ে, পেটে ভাত না থাকলেও কী করে শক্তি বাড়ে ধরতেই পারিনে।'

'আমি কিছুই জানিনে, লেখাপড়া শিখিনি, অবোধ, কিন্তু বিষটা এখেনে আছে কি না সেইটা বলো।'

'না হলে মিঠাই বিলি হবে কেন?'

'বিষের জন্য মিঠাই?'

'নাহলে কী জন্যে, সবাই তো জানে ওই বিষ জন্মজন্মান্তরেও মরে না, একবার দেহে ঢুকলে তিনপুরুষ চারপুরুষ বিষ থেকে যাবে।'

'কী কহ?' শিহরিত হয় কোকিলা।

'এই তো কাগজে লিখেছে, হিরোশিমার মানুষ এখনও ভুগছে, পঞ্চাশ বছর পার হয়ে গেছে।'

'এখেনে তা হবে?' কোকিলা ভয় পায়।

ভানু চুপ করে থাকে। তার আর কথা বাড়াতে ভালো লাগছিল না। সে ভাবছিল পক্ষীরাজ কি বিষের ভয়ে অন্য দিকে ছুটে গেল? তার কন্থক কি টের পেয়েছিল আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে যাচ্ছে তেজস্ক্রিয় ভস্ম? সে কি বুঝতে পেরেছিল বুদ্ধপূর্ণিমার জ্যোৎস্নায় বিষ আছে? একই চাঁদের আলো তো সেদিন পোখরানের মরুভূমিতে ছিল। মরুভূমির আকাশ তখন তেজস্ক্রিয়তায় ছেয়ে আছে, মরুভূমির বালিতে তেজস্ক্রিয় ভস্ম। চাঁদের আলোয় সেই তেজস্ক্রিয়তা মিশে গিয়েছিল হয়তো। সেই চাঁদের আলোই তো মীরগোদায়, দীঘায়, চাঁদবালিতে সেদিন সমস্ত রাত জেগে ছিল। চাঁদের আলো কি বয়ে এনেছিল পোখরানের মরুভূমির খবর? চাঁদের আলোতে কি ভেসে এসেছিল মরুভূমির তেজস্ক্রিয়তা? মানুষ যত না টের পায়, মনুষ্যেতর প্রাণীরা তো ধরতে পারে প্রকৃতিতে কোথায় কী হচ্ছে। ভূমিকম্পের খবর যেমন মাটির নীচের প্রাণী, পিঁপড়ে, ইঁদুর, সাপ, ব্যাং, জলের মাছেরা আগে টের পেয়ে যায়, তেমনই কি টের পেয়েছিল তার ঘোড়াটা? আগে নয়—পরে, তবে কেউ জানবার আগেই কি ঘোড়াটা জ্যোৎস্না দেখে বুঝতে পেরেছিল বাতাসে বিষ, চাঁদের আলোয় বিষ। আর সেই বিষ থেকে বাঁচতে সে পালাল দীঘা ছেড়ে। তাঁকে তো বাঁচতে হবে। কী আশ্চর্য, সেই সময় কিনা এই কোকিলা বধূর মনে কন্থকের রূপটিই ভেসে উঠল! কোকিলা বধূর সামনে এসে দু–পা দাপাতে লাগল শ্রীপতির ঘোড়া। ঘোড়াটা কি কোকিলাকে জানাতে চাইল দূর মরুভূমির আকাশে যে তেজস্ক্রিয় বিষ, সেই বিষ চাঁদের আলোয় আলোয় এসে পৌঁছেছে মীরগোদায়? তাই তো হল, না হলে পরদিন মিঠাই আনবে কেন গৌরমোহন? কোকিলা তখন ঘোড়াটাকে আঁকতে লাগল। ভানু যা ভেবেছে এতদিন, তা না হয়ে যদি উলটোটি হয়, কোকিলা কুহক করেনি, ঘোড়াটিই কুহক করেছিল কোকিলাকে। কোকিলা বধূকে আচ্ছন্ন করে ঘোড়াটি তাকে দিয়ে নিজেকে আঁকিয়ে নিয়েছে মদরঞ্জির উপর, নিজের বেগবান রূপটি প্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছে মদরঞ্জির উপর, যাতে তা দেখে কেউ–না–কেউ ধরতে পারে ঘোড়াটা পালাচ্ছে। সে পালাচ্ছে কেননা বিষ তাকে ছুঁয়ে ফেলতে চাইছে। হায় চাঁদের আলো, নরম ঘুম ঘুম বাতাস, হায় জল, মাটি—সব কিনা ছেয়ে যাবে তেজস্ক্রিয় ভস্মে! ওই যে অনন্ত আকাশ, আকাশের মেঘ, সব কিনা ভরে যাবে তেজস্ক্রিয় বিষকণিকায়। পৃথিবীর আকাশ, মাটি, নদী, সাগর, অন্ধকার, জ্যোৎস্না যা কিছু ভগবান দিয়েছিল ঘোড়াটির জন্য, বেগবান ঘোড়াটির জন্য, গেল বিষময় হয়ে! ঘোড়াটি তাই পালাচ্ছে। পালাচ্ছে কিন্তু তার সূত্রটি রেখে যাচ্ছে কোকিলা বধূর কাছে। হায় গৌরমোহন! তুমি কি দ্যাখোনি, তোমার গুণবতী বধূ কী এঁকেছিল বুদ্ধপূর্ণিমার রাতে? সে এক বেগবান অশ্ব। আদিকাল থেকে সে ছুটছে। কেশর ফুলে উঠছে, পুচ্ছ ফুলে উঠছে, চারটি পায়ের পেশি দপদপ করছে। সাদা ঘোড়া সেই পৃথিবীর জন্ম থেকে বেগবান। তার পিঠে চেপে মানুষ দেশের পর দেশে গেছে, নদী পার হয়েছে, অরণ্য পার হয়েছে, পাহাড় পার হয়েছে, মরুভূমির বালি উড়িয়ে চলে গেছে সেইখানে যেখানে চাঁদের আলো, বাতাস, জল, সবই ভালোবাসে মানুষকে। মানুষকে বাঁচায়, মানুষকে দেখায় দূর আরও দূরের পথ। একে একে পৃথিবীর সব কোণে পৌঁছে যায় মানুষ। বসতি গড়ে তোলে বিজন অরণ্যেও। সেখানে ঢুকে পড়ছে তেজস্ক্রিয় বাতাস।

'চাঁদের গায়ে নীল ছিল, জ্যোৎস্না নীল ছিল, কিন্তু এ নীল সেই নীল নয় যে নীলের ভিতরে এত লক্ষ, কোটি বছর মানুষ ঘুমিয়েছে নিশ্চিন্তে, জেগেছে নিশ্চিন্তে, ভালোবেসেছে, শোকে আনন্দে বিহ্বল হয়েছে, কিন্তু বিপন্ন হয়নি কোনোদিন। আমি দেখলাম নীলের রং বদলে যাচ্ছে। চাঁদ উঠল বটে, কিন্তু চাঁদের আলোটিতে যেন বিষের নীল, গাঢ়, গাঢ় থেকে গাঢ়তর। নীল ঘন হতে হতে কালো হয়ে গিয়েছিল প্রায়। নাক টানলাম, কীসের যেন গন্ধ! জ্যোৎস্নায় যেন মৃত্যুর গন্ধ ছিল। হায়! আমি তো কত মৃত্যুই না দেখেছি, কিন্তু তার তো এমন গন্ধ ছিল না। আমার তখন কী যেন মনে পড়ে যাচ্ছিল। চাঁদের আলোর দিকে তাকিয়ে আমি টের পাচ্ছিলাম যেদিন সেই দূর হিরোশিমার প্রতিটি বিন্দু দগ্ধ হয়ে গিয়েছিল, তারপর আকাশ থেকে কালো বৃষ্টি ঝরে পড়ছিল। মনে পড়ে গেল সব। কবে যেন শুনেছিলাম, দেখেছিলাম। বুঝতে পারছিলাম মারণ জ্যোৎস্নায় ঢেকে যাচ্ছে সমস্ত পৃথিবী। নীল জ্যোৎস্নায় বিষ ভেসে আসছে উত্তর–পশ্চিম থেকে। সেদিকে পাহাড় আছে, মরুভূমি আছে। মরুভূমির জ্যোৎস্না ছড়িয়ে যাচ্ছিল ক্রমশ। টের পেলাম সামনের ওই সাগর শুকিয়ে যাবে, গাছপালাও মরে যাবে, মাটি বালি হয়ে যাবে, আমি আর দৌড়োতে পারব না। আমি পঙ্গু হয়ে যাব। তখন আর দাঁড়ালাম না। দড়ি ছিঁড়ে দৌ.ড়েছি। দৌড়, দৌড়, দৌড়! নদী পার হয়ে, অরণ্য ভেদ করে, পাহাড় পার হয়ে আমি ছুটেছি, আমার পিছনে ধেয়ে আসছে মরণ। মানুষ যেন মরণের সখা হয়ে হাসছে। মাটি চৌচির করে দিচ্ছে। ওই যে পিছনে পুড়ছে নদী, মাটি, সাগর। আমি পিছনে ফিরছি না। ফিরছি না, ফিরছি না।'

কোকিলা ডাকল, 'তুমি কি ফিরবে ভানুদাদা?'

চমকে ওঠে ভানু, 'হ্যাঁ, ফিরতে তো হবে।'

'থাকো না কেনে?'

'উহুঁ, আমার মন বসে না আর, ঘোড়া ছাড়া আমি কে?'

'সেই জন্যই তো বলি, থাকা।'

'ভালো দেখায় না থাকো।'

কোকিলা হেসে ওঠে, 'কী ভালো দেখায়, মাটির তল ফাটায়ে সব নষ্ট করি দিয়া, ভানুদাদা পাঁচটা লোক যদি এসে আমারে শেষ করি যায়, তখন কি তা ভালো হবে?'

'মদরঞ্জিওয়ালা আসবে না?'

'কী জানি, কাল রাতে ডর লেগেছিল।'

'কেন?'

'কী জানি, ঘুড়াটারে আঁকতে বসেছিলাম।'

'হ্যারিকেনের আলোয়?'

'দিনভর চেষ্টা করলাম, হলনি।'

'রাতে কী হল?'

কোকিলা বলল, 'হলনি, কিন্তু মনে হচ্ছিল উঠানে আছে সে, নিশ্বাস ফেলছে, ঘুড়ারে তো নিশ্বাসে চিনা যায়, যায় কিনা?'

ভানু উঠল। কোকিলার ক্ষমতা আছে নিজেকে রক্ষা করার। যুবতী বধূ, তার থাকা ঠিক হবে না। মদরঞ্জিওয়ালা এসে গেলে কী হবে? তার মনে আর এক অন্ধকার ঢুকে যাবে। হায় মদরঞ্জিওয়ালা! মনে অন্ধকার নিতে তুমি যাও শিবরামের ঘরে? কেন যাও? না গেলে কী হয়? শিবরাম যা ভাবুক, তোমার কোকিলা তো কিছুই ভাবে না। তোমারেই ভালোবেসে বেঁচে আছে।

ভানু ফিরছিল, ক্লান্ত, অবসন্ন ঘোড়াওয়ালা ঘোড়াটি না খুঁজে পেয়ে ফিরছিল ঝুঁকে ঝুঁকে। সে আন্দাজ করছিল ঘোড়াটি কেন পালাল। তার বোধে সে নিশ্চিত। হাঁটতে হাঁটতে সে পৌঁছোয় জাহাজঘাটার ধু–ধু বালিয়াড়ি, বালির

ঢেউ, ঝাউবনে। ভানু ফিরছিল। ফিরতে ফিরতে আকাশে তাকিয়ে জগৎ দ্যাখে। কী মায়া এই পৃথিবীতে! যে অন্ধকার প্রতিদিনই নামে, সেই অন্ধকার দেখে সাধ মেটে না, যতবার জ্যোৎস্না দ্যাখো, ততবার বুক ভরে যাবে। সাধ মেটেনা আর মেটেনা। নদী, পাহাড় কেন মাঠঘাট, ঘাস, মাটি, পোকামাকড়, রাতের জোনাকি, রাতের তারা, চাঁদ, সূর্য, মেঘ, বৃষ্টি, রোদ্দুর, যা দ্যাখো প্রাণ ভরে যায়। ভরে যায় বলেই না মানুষ জন্মান্তর চায়। জন্মজন্মান্তরে ফিরে আসতে চায় এই জগতে। যত দ্যাখো, তত সাধ বাড়ে। সেই জগৎ থেকে কিনা পালিয়ে যাচ্ছে সাদা পক্ষীরাজটি। কোথায় আছে সেই দেশ, যেখানে ঘাসে ঘাসে বিষহীন শিশির বিন্দু, চেটে খেয়ে নেবে সে।

ভানু চলতে লাগল অন্ধকারে। হাঁটতে হাঁটতে হাটে এল। হাটের সবই তো নিঝুম। মানুষজন যেন পালিয়েছে। ভানু দেখছিল ছোটো কদম গাছটির পাতার আড়ালে জোনাকিরা দপ দপ করছে। ভানু দেখছিল জোনাকির দল উড়ছে। আলো দপ দপ করতে করতে অন্ধকারে পাড়ি দিচ্ছে। ভ্যান রিকশায় উঠে বসল সে। জোনাকির দল তার মাথায় মাথায় চলতে লাগল। মীরগোদার মরুভূমি ছেড়ে তারা চলে যাচ্ছে বোধ হয়। টের পেয়েছে কিছু। ভানুর পিছনে পড়ে থাকল সাগর শুকোনো মরুভূমি, বাঁ–দিকে ধ্রুবতারা জ্বলজ্বল করতে লাগল উত্তর আকাশে। পুবের দিকে ভেসে যেতে লাগল ভানু। যেতে যেতে ঘোড়াটির কথা ভেবে দু–চোখ সজল হয়ে ওঠে। মদরঞ্জিওয়ালার কথা ভেবে বুক ভরে গেল। মদরঞ্জিওয়ালা কি কোকিলা বধূকে ছেড়ে গেল? তা কেন হবে? এসব কী ভাবছে? তার মনে কি বিষ ঢুকেছে? হায় কোকিলা! ভানু টের পায় আলো জ্বলেনি ভিটেয়, কোকিলা একা অন্ধকারে বসে আছে দাওয়ায়। সন্ধ্যেবেলায় তার চুল খোলা। খোলা চুল বেয়ে ভরসন্ধ্যেয় যে পাপ বাসা বাঁধে মনে তা কি সে জানে না? মদরঞ্জিওয়ালা কখন ফিরবে? আশ্চর্য লোক তো গৌরমোহন!

অন্ধকার রাত্রিতে ভানু নামল পুরোনো দীঘায়। সমুদ্রতীরে। লোডশেডিং চলছিল। আলো এল এই মাত্তর। আলো জ্বলতেই একটা চাপা আনন্দ যেন ধ্বনিত হল চারদিকে। ভানু বাস থেকে নামতেই ছুটে এল অনন্ত আর তার বউ, ‘ভানুদাদা!’

‘কী হয়েছে?’ ভানু দেখল সরস্বতীর দু–চোখ জলে ছলছল। আঁচলে চোখ মুছছে কুন্তির মা। অনন্তর মুখখানি যেন পুড়ে গেছে তেজস্ক্রিয় আগুনে।

ভানু বলল, ‘মেয়েটারে দিয়ে দিলে নাকি?’

‘তুমি জানো তা?’

‘অনুমান, ভাবছিলাম তাই।’

‘তুমি থাকলি এটি হতনি ভানুদাদা!’ কেঁদে পড়ল সরস্বতী, ‘মেয়্যাটারে নিয়ে গেল!’

অনন্ত বিড়বিড় করে, ‘কাজে গিইছে, না গেলে খাবে কী ইখেনে?’

সরস্বতী মাথা ঝাঁকায়, ‘উপাস করত, পঞ্চম ঠাকুর উয়ারে বিচে দিল গো ভানুদাদা, কাজটাজ ছল।’

অনন্ত ধমকে ওঠে, ‘থাম!’

ভানু ভয় পেল। বুঝতে পারছিল সর্বনাশের বাকি নেই বোধ হয়। অনন্ত সার মাথা নামিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ভানু হাত ধরল অনন্তর, ‘চল।’

‘কোথায়?’

‘পঞ্চম ঠাকুরের নিকট।’

‘সে দেশে গিইছে।’

‘কবে গেল?’

‘সেদিন দুফরেই।’

‘থানায় চল, থানায় যাসনি?’

অনন্ত ঝুঁকে পড়ল, ‘টঙ্কা দি গিছে অনেক।’

কুন্তির মা কেঁদে পড়ল, 'কেনে অত টঙ্কা দিল? এ ভানুদাদা, মোর আর কেহ নাই, তুমার জন্যি পথে দাঁড়ায়ে আছি ক–দিন ধরে।'

ভানু চলতে লাগল হোটেলের দিকে। তার পিছনে পিছনে অনন্ত আর কুন্তির মা আসতে লাগল। হোটেল সমুদ্রপাখি নিস্তব্ধ। ঠাকুরানি বসে আছে বারান্দায়, কপালে হাত, 'মাইতিবাবু নেই।'

ঠাকুরানি বলল, 'ঠাকুর নাই, কয়েছি তো নাই উ লক, কেনে বার বার আসছ, যদি তেমন হয় তো যাও থানায়, পুলুশ সব টঙ্কা খেয়ে লিবে।'

ভানু তার কাঁধের ঝোলা রাখল বারান্দায় কোণে রাখা টেবিলে। তার দিকে চেয়ে হাসে ঠাকুরানি, 'ঘুড়া পাওয়া গেল?'

'কেন?'

'আছ ভালো, ঘুড়াটারে তুমি সরায়ে দিইছ কিনা কে জানে!'

'কী বলো?'

'ঠিকই বলি, ঘুড়া খুঁজতে কম টঙ্কা নিলে হুটেল থিকে?'

ভানু থামায় হাত তুলে, বলে, 'থাক, কথাটা আমাকে না বলে বাবুরে বলো, এদের মেয়ে পাচার হয়ে গেছে, পঞ্চম ঠাকুর পালাল কেন?'

'কে পলাইছে, উয়ার মা'র অসুখ।' উঠে পড়ল ঠাকুরানি, 'টঙ্কা দেয় নাই উয়াদের, এমনি মেয়্যাটারে নিয়ে গেল?'

ভানু বলল, 'পঞ্চম ঠাকুর জেল খাটবে।'

'কেনে?' ঠাকুরানির মুখ অন্ধকার।

'ওকে ডেকে আনো, কোথায় নিয়ে গেছে মেয়েটারে, ঠিকানা চাই, আমার সেদিনই সন্দেহ হয়েছিল, মেয়েরে ঘুম পাড়ায়ে রাখল কেন জাহাজওয়ালা?'

ঠাকুরানি মাথার কাপড় টেনে দ্রুত নেমে যায় বারান্দা থেকে। কিচেনে গিয়ে ঢোকে। ভানু বারান্দায় পা ছড়িয়ে বসে বলে, 'কী হল বলো?'

'ঠিকানা দিই গেছে মদনানি সায়েব।' বলল অনন্ত।

'এক টঙ্কা দিল কেনে!' কুন্তির মা অস্ফুট আর্তনাদ করে ওঠে।

'নিলে কেন?' ধমকে ওঠে ভানু, 'কান্না থামাও, কী হল বলো।'

'মেয়্যাটারে নি গেল।'

'এমনি নিয়ে গেল, তুমারে বলে নিয়ে যায়নি?'

'হ্যাঁ, টঙ্কা ধরাই দিল পঞ্চম ঠাকুর, কী যে হই গেল ভানুবাবু, কুন্তির মা আসার আগে ব্যাগ ভরে টঙ্কা দিল মোর হাতে।'

'মেয়েরে দেখেছিলে?'

'হ্যাঁ, তারে দু–দিনেই চিনা যায়নি।' হা–হা করে ওঠে অনন্ত সার।

অনন্ত অবাক হয়ে তার মেয়েকে দেখেছিল দোতলা বাংলোর উঠোন থেকে। চিনতেই পারেনি, কী আশ্চর্য! এক ঝলমলে সাতরঙা ঘাগরা চোলি পরে তার মেয়ে ব্যালকনিতে ঘুরছিল। ও যে তার মেয়ে তা সে বুঝবে কীভাবে? অত রং! মেয়ে কি অত সুন্দর! তার মনে তো কুন্তি, মানে তেলহীন রুক্ষ চুল, চুলের গোড়ায় কাপড়ের পাড় বাঁধা, মলিন মুখ, ময়লা শাড়ি জামা, হা–হুতাশে ভরা চেহারা। ব্যালকনিতে যে ঘুরছিল সে বড়ো সুন্দর! অত সুন্দর মেয়ে সমুদ্রতীরে দেখতে পাওয়া যায় সিজন টাইমে। চমতকার সব গাড়ির ভিতর থেকে নেমে আসে তারা। হাসতে হাসতে দৌড়োয়, ঘাগরা তুলে, রং ছড়িয়ে। অনন্তর চোখ সরছিল না, ওই কি তার কুন্তি? না অন্য কেউ? ঘুম পাড়িয়ে তাকে এত বদলে দিয়েছে প্রেম সাহেব?

তখন আকাশে মেঘের আস্তরণ ছিল। তা ভেঙে আচমকা সূর্যরশ্মি বেরিয়ে এসে পড়েছিল ঘাগরা চোলির সাত রঙের ভিতরে বসানো চুমকি, আয়নায়। ঝলমল করে উঠেছিল মেয়ে। ঝিলমিল করছিল রং। ঠাকুরের জন্যই যেন অপেক্ষা করছিল প্রেম সায়েব। নেমে এসে তাদের টেনে নিয়ে গিয়েছিল ঝাউবনের দিকে। সেখান থেকে দেখা যাচ্ছিল না আর খোলা ব্যালকনিটিকে। তবু অনন্ত আচমকা ডেকে উঠেছিল, ‘কুন্তি মা!’

কুন্তি কি শুনেছিল? মনে হয় শুনেছিল। অনন্ত সাড়া পায়নি কোনো, কিন্তু মনে হয়েছিল কুন্তি তাকিয়ে আছে ঝাউবনের দিকে। কী স্তব্ধ সেই দৃষ্টি! জাহাজওয়ালা প্রেম সাহেব ধমকে উঠেছিল তাকে, আগে ডিল শেষ হোক।

কিছুই বোঝেনি অনন্ত। তার ভিতরে ভয় জেগে উঠেছিল। কুঁকড়ে যাচ্ছিল সে। জাহাজওয়ালার অদ্ভুত চেহারা। মাথার ফুরফুরে সাদা চুল ঝাউবনের বাতাসে উড়ছিল, ভাসছিল। মুখখানিতে কত যে প্রাচীনতা তার থই পাওয়া যায় না। চোখের চাহনিতে ছিল বরফ কঠিন শীতলতা। স্লিপিং গাউনের পকেটে হাত, মুখে চুরুট। ধোঁয়া উড়ছিল। ঠাকুর তাকে প্রায় কুর্নিশ করতে করতে চলেছিল। জাহাজওয়ালা তার কাঁধে হাত দিয়েছিল। কী ঠান্ডা! ধীর গলায় বলছিল, বেবিকে সে কলকাতায় নিয়ে যাবে, সুইট বেবি, মেয়েটা খুব ভালো কাজ করে, তার এমন মেইডসার্ভেন্ট চাই, মেয়েটার সব ভার নিয়ে নিচ্ছে সে, মেয়ে নিয়ে চিন্তা করতে হবে না অনন্তকে, মেয়ে খুব সুখে থাকবে, মেয়ে যদি শান্ত হয়ে থাকে তবে সে তাকে রানি করে দেবে, টাকাপয়সা তার কম নেই, একা মানুষ, তার ছেলেরা সব দেশবিদেশে থাকে, তার সঙ্গে কেউ থাকে না, সবাই তাকে ভুলে গেছে, তার বউ বেঁচে নেই, অনন্ত কত টাকা নেবে?

কী বলেছিল তখন অনন্ত? কিছুই বলেনি। বলতে পারেনি। সে ধরতে পারছিল না কী হতে যাচ্ছে। সে ঘুরে ঘুরে পিছনে ফিরছিল। ঝাউবনের আড়াল থেকে বাংলোর এক এক বিন্দু ঝিলমিল করে ভেসে উঠছিল, রঙের চিহ্ন জেগে উঠছিল। মনে মনে ভাবছিল কত না সুন্দর তার মেয়েটি। অভাবী বাপ জানেই না তার মেয়ে কত রূপবতী! আহা! দেবীর মতো রূপ কুন্তির। কী ডাগর তার চোখ দুটি! কীভাবে দূরে তাকিয়েছিল!

ঠাকুর ডাকছিল তাকে, ‘শুনছিস, সায়েব পনেরো হাজার দিচ্ছে।’

‘কেন?’ হতবাক হয়ে গিয়েছিল সে।

কেন তা বুঝছে না কেন অনন্ত? মেয়েটাকে পছন্দ করেছে বুড়ো সাহেব, জাহাজে নিয়ে ঘুরবে। পঞ্চম ঠাকুর ভানুর কানের কাছে বিনবিন করছিল মশার ডাকের মতো। মেয়ের হিল্লে হয়ে যাবে সমস্ত জীবনের মতো। মেয়ে সৌভাগ্যবতী। এমন ভাগ্যবতী আর কখনো দ্যাখেনি পঞ্চম ঠাকুর, অনন্তর হাতে টাকার দুটি বান্ডিল, একটি একশো, অন্যটি পঞ্চাশের, তুলে দিতে দিতে ঠাকুর বলছিল, আরও পাবে অনন্ত, পরে পাবে, মেয়ে রাজকন্যার মতো থাকবে।

‘হাঁ হাঁ,’ মাথা দোলাচ্ছিল প্রেম মদনানি, ‘রুপয়া যত নিবে হামি দিব।’

অনন্তর লোভ বাড়ছিল টাকার বান্ডিল হাতে নিয়ে। টাকার বান্ডিল নিয়ে তার বিশ্বাস হচ্ছিল না ওই টাকা তার। টাকার লোভ হচ্ছিল যেমন, তেমনই মেয়েকে দেখতে ইচ্ছে হচ্ছিল। আহা, মেয়েটাকে বুকে আঁকড়ে ধরবে সে। কিন্তু মেয়েকে দেখলই না ফেরার সময়। ব্যালকনিতে সে ছিল না।

মেয়ের সঙ্গে কথা হল? হল। হয়েছিল তাই তো জানে কুন্তির মা। আসলে তো হয়নি। হয়নি যে সে–কথা বলে কী করে অনন্ত? মদনানি সাহেব বলেছিল, পরে কথা হবে, মেয়ে নাকি আবার ঘুমোতে গেছে। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে মেয়ে সুন্দর হয়ে উঠছে। মেয়েকে নিয়ে যাবার আগে কথা কইয়ে দেবে। কিন্তু সে–কথা মেয়ের মাকে বলেনি অনন্ত। টাকা দুই পকেটে নিয়ে সে ফিরছিল হাঁটতে হাঁটতে। তার কাছে আর কোনো টাকাই ছিল না যে ভ্যান রিকশায় উঠে ফিরবে। পঞ্চম ঠাকুর তো উলটো পথে কিয়াগেড়িয়ার দিকে চলে গেল।

মেয়ের মা, সরস্বতী বিনবিনিয়ে কাঁদছে ভানুর সামনে বসে। বলছে কী ভয় না পেয়েছিল সে সেই সকালে। যেন গন্ধ পেয়েছিল নাকে। খুব খারাপ গন্ধ! মায়ের মন! মা যেন কী আশঙ্কা করে বেরিয়ে পড়েছিল ঘরে তালা মেরে। তারপর অলংকারপুর থেকে কোনাকুনি হাঁটতে আরম্ভ করেছিল। সি–ডাইকে উঠে দৌড়োতে আরম্ভ করেছিল। আঁচল লুটোচ্ছিল, মাথার খোঁপা ভেঙে চুল উড়ছিল।কুন্তির মা বলে, 'কী তরাস না লেগেছিল ভানুদাদা, তরাসে ছুটছিলাম, টের পাচ্ছিলাম খারাপ কিছু হতে যাচ্ছে, পঞ্চম ঠাকুর সব্বোনাশ করতেই সক্কালে হাজির হইছে, ঠাকুর যেন যমদূত, উ যেন আন্ধার, মরণ, মরণের দিকে মোর ছা–টিরে ঠেলে দিল রে।' দীঘায় ঢুকতেই দেখি মেয়ের বাপ ফিরতেছে। সরস্বতী হামলে পড়েছিল স্বামীর উপর, 'মেয়্যা কোনঠে?'

'মেয়্যা ঘুমায়।'

'দ্যাখো নাই?'

তখন অনন্তর খেয়াল হয়েছিল, সে সিধে হয়ে বলতে চেষ্টা করেছিল, 'দেখা তো হয়েছে, কথাও হয়েছে, ভালো আছে কুন্তি, খুব হাসছিল, খুব আনন্দে আছে ঘুড়ার নিকট।'

'ঘুড়া মানে?'

অনন্ত বলেছিল, 'বুড়া জাহাজওয়ালাকে ঘুড়া মনে করেছিল তো কুন্তি, মাইতিবাবুর ঘোড়া।'

'কীসব কও, মেয়্যা কী বলল?'

অনন্ত চুপ করে গিয়েছিল। দুই পকেটে দুটি বান্ডিল, নতুন নোট, খুব চকচকে মসৃণ। অনন্ত নোটের গায়ে গোপনে হাত বোলাচ্ছিল। তার দুই পকেটেই ঝুলে পড়েছিল টাকার ভারে। অনন্ত তখন চাপা গলায় সরস্বতীকে বলেছিল তার পকেটে হাত দিয়ে দেখতে। একটা নয়, দুটো নয়, পনেরো হাজার। অনন্ত টাকার ভারে যেন বেঁকে গিয়েছিল, বউকে বলেছিল, 'টঙ্কা রাখি আগে, তারপর কথা বলব, রাখি কোথায় টঙ্কা, এত টঙ্কা দিল জাহাজওয়ালা!'

'অত টঙ্কা কেনে দিল ভানুদাদা?'

ভানু জিজ্ঞেস করে, 'টাকা রেখেছ কোথায়?'

'ঘরে, এমন থানে লুকাইছি, কেহ খুঁজ পাবেনি, জানেই–বা কেডা?'

ভানু চাপা গলায় বলল, 'পঞ্চম ঠাকুর?'

'সে তো পলাইছে।'

'ঠাকুরানি?'

'উ জানেনি, বেঙ্কে রাখলি কথা উঠবে, আর মোর তো পাশ বই নাই, পাশ বই খুলতে গেলে সবু লকে জানি যাবে।' বলল অনন্ত।

ভানু বলে, 'কী হল তারপর, বলে যাও।'

কী বলবে অনন্ত? অনন্তর বউ কপালে করাঘাত করে। সেই–বা কী বলবে? টাকাই হল সর্বনাশী। পকেটে হাত দিয়ে দুই বান্ডিল স্পর্শ করে শিহরিত হয়েছিল কুন্তির মা। অনন্ত তাকে পথ থেকেই ফিরিয়েছিল। ঘরে ফিরে টাকা লুকোনোর জায়গা খুঁজতে কত সময় গেল। তারপর মনে পড়ল মেয়ের কথা! দুপুর গড়ালে হাঁড়িতে টাকা রেখে সেই হাঁড়ির মুখ সরা দিয়ে বেঁধে মাটিতে গর্ত করে রেখে মাটি চাপা দিয়ে বেরোল দুজনে মেয়ের খোঁজে। যত যায় দীঘার দিকে, টাকা টানে অনন্তকে। মাঝপথে গিয়ে অনন্ত বলে, কুন্তির মাকে একা যেতে। ঘর ছেড়ে যাওয়া ঠিক হবে না। কুন্তির মা সরস্বতী ভেবেছিল ফিরবে। তাকেও তো টানছিল টাকা। কিন্তু শেষপর্যন্ত মেয়ের টান বেশি হল। টাকার টানে অনন্ত সি–ডাইক থেকে নেমে আবার গৃহাভিমুখী হল। আর মেয়ের টানে ছুটল তার মা দীঘার দিকে। কী সেই টান! চাঁদের যে টানে সমুদ্রের জল স্ফীত হয়, তেমনই টানল যেন অভাগী মেয়েটা। কপালে হাত রাখে সরস্বতী। সে ছুটেছিল বাংলো পর্যন্ত। গিয়ে দ্যাখে সব শূন্য!

'মেয়েরে দ্যাখোনি?'

দু–চোখ জলে ভিজে গেল, কুন্তির মা আঁচল দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে মাথা নাড়ে। চলে গেছে তারা। কালঘুম ধরেছিল মেয়েটারে। শুধুই নাকি ঘুমোচ্ছিল ক–দিন ধরে, ঘুমন্ত মেয়েকে নিয়ে জাহাজওয়ালা চলে গেছে। সরস্বতী দেখেছিল সব জানালা বন্ধ, ব্যালকনি শূন্য, নীচের দরজায় বাইরে থেকে তালা। নেপালি দারোয়ানটা খোঁড়াতে খোঁড়াতে ঝাউবনের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসেছিল, তাকে দেখে অবাক হয়েছিল, জিজ্ঞেস করেছিল, 'কেয়া?'

'জাহাজওয়ালা বাবু?'

চলে গেছে শুনে রোখ ছেড়ে কেঁদে উঠেছিল সরস্বতী। টের পেয়েছিল পনেরো হাজার টাকার রহস্যটি। তার কান্না শুনে দারোয়ান বিব্রত হয়ে বলেছিল, 'তুম রোতা কিউ, বাবুকা আড্রেস লাও, কলকাত্তা যাও।'

দারোয়ান একটা কার্ড দিয়েছিল। সেই কার্ডটি হাতে করে সন্ধ্যে পর্যন্ত বাংলোর সামনের রাস্তায় বসেছিল সরস্বতী। তারপর অন্ধকারে ফিরেছিল একা। কী ছিল সেই অন্ধকার! কী ঘন, কী গম্ভীর, অতলস্পর্শী! টলতে টলতে একা একা ফিরেছিল সে। কী একাই না হয়েছিল! কেউ কোথাও ছিল না। মস্ত সমুদ্রবাঁধটিতে একটিও মানুষ ছিল না। একটা সময়ে সে বসে পড়েছিল বাঁধের উপর। বুকফাটা কান্নায় ভেঙে পড়েছিল। মেয়েটাকে গর্ভের ভিতরে বাঁচিয়ে রাখার দিনগুলিকে মনে করছিল। আর তো কোনো সন্তানই বাঁচেনি, বেঁচে ছিল কুন্তি। হায় কুন্তি মা! বাঁধের মাটিতে মাথা ঠুকছিল সে একা একা। তারপর একসময় তার কান্না থেমেছিল। কত আর কাঁদতে পারে মানুষ! কান্নার শক্তিও তো চাই। নিঝুম অন্ধকারে একা বসে আকাশপানে চেয়েছিল। তাকিয়ে দেখেছিল উত্তর–পুব আকাশ থেকে তারা খসে যেতে। মধ্যগগন থেকে আলোকপিণ্ড আকাশ চিরে যেন নেমে গেল দিগন্তে, ঝাউয়ের গভীর অন্ধকারে, আরও অন্ধকারে। চোখ বন্ধ করে ফেলেছিল সরস্বতী। তারা–খসা শুভ নয়। অশুভ আশঙ্কায় কেঁপে উঠেছিল সে।

মেয়েটা নেই। নেইই তো। ঘরে গেলে দেখবে মেয়ে নেই। দীঘার বাজারে গিয়ে দেখবে মেয়ে নেই। নতুন দীঘার বাংলোয় গিয়ে দেখবে মেয়ে নেই। নুনের খালারিতে গিয়ে দেখবে নেই মেয়েটা। বুক হা–হা করছিল। চোখের ভিতরে শুধু অন্ধকার আর অন্ধকার। মুছে গিয়েছিল তারা–ভরা আকাশ, মুছে গিয়েছিল জগত, অন্ধকারে পৃথিবী। মেয়েটার সঙ্গে সবই যেন তার অস্তিত্ব থেকে মুছে যাচ্ছিল।

ভানু বলে, 'চোখের দেখাও দেখতে পেলে না?'

'না।' ক্রন্দন–ভরা গলায় ফুঁসে উঠল মেয়ের মা, 'বিচে দিইছে তো উয়ার বাপ।'

'উ কথা কহিসনি কুন্তির মা।'

'কেনে কহিবনি?' ফোঁস ফোঁস করে মেয়ের মা।

অনন্তর মাথা নেমে গেছে। সে কথা বলল না আর। টাকার লোভ কুন্তির মা'র হয়নি? হয়েছিল বলেই পনেরো হাজার টাকার সঙ্গে সে বাড়ি ফিরে গিয়েছিল। মেয়েকে তখন যদি দেখতে যেত, দেখা হত। আর দেখা হলে হয়তো মা ধরে রাখতে পারত মেয়েকে। মা তো পেটে ওই মেয়ের ভার বয়েছিল।

ভানু জিজ্ঞেস করে, 'কলকাতা যাবে?'

'যাব।' কুন্তির মা কেঁদে ওঠে, 'ঘুরায়ে লিয়ে আসব মোর কুন্তিরে।'

অনন্ত তার জামার বুক পকেট থেকে কার্ড বের করে। ভানুর হাতে দেয়। ভানু কার্ডটি উলটেপালটে দ্যাখে। আচমকা টেলিফোন নম্বরটা আবিষ্কার করে কার্ডের কোণে। দেখেই তার ভিতরে উত্তেজনা তৈরি হয়, ফোন নম্বর রয়েছে, 'কলকাতায় ফোন করি।'

'ফোন করা যাবে!' অনন্ত অবাক, 'মোরা তো ফোন করতি পারবনি।'

'বুথে গেলে ওরাই লাইন ধরে দেবে, আচ্ছা চলো আমি যাব।'

'তুমি তো যাবে ভানুবাবু, নাহলে কী করে হবে?' অনন্ত বলে।

'ফোনে কথা বলা যাবে?' জিজ্ঞেস করে মেয়ের মা।

'যাবে।'

'কুন্তি কথা বইলবে?'

'বলবে।'

'তাহলে চলো ভানুদাদা।' সরস্বতী উঠে দাঁড়ায়।

তিনজনে হাঁটতে হাঁটতে ফোন বুথে এল। সন্ধ্যের পর অনেকটা পার হয়ে গেছে। অফ–সিজন, ট্যুরিস্ট কম। বুথে কোনো লোক ছিল না। ভানু কার্ডটা এগিয়ে দিয়ে লাইনটা ধরে দিতে বলে। লাইন পেতে সময় লাগে অনেক। তারপর বাজল ওদিকের ফোন। ভানুর হাতে রিসিভার দিয়ে বুথের ছেলেটি বাইরে গিয়ে সিগারেট ধরায়। ভানুর কানে বেজে যাচ্ছিল ফোনের শব্দ। কেউ ধরছে না। ভানু অনন্তকে ইঙ্গিত করে। অনন্ত মাথা ঝাঁকায়। ভানু দ্যাখে অনন্তর মুখখানি ভয়ে ছোটো গেছে। মরা মাছের মতো চোখ নিয়ে তাকিয়ে আছে তার বউ সরস্বতী।

ধাতব শব্দ বেজে যাচ্ছিল বহু দূরে। ক–টা নদী পেরিয়ে, কালিনগরের নদী, নরঘাটের হলদি নদী, কোলাঘাটের রূপনারায়ণ নদী, তারপর দামোদর, তারপর হুগলি নদী, এর ভিতর কত গঞ্জ, কত জনপদ, মাঠ, পুকুর, শস্যক্ষেত্র, কালো পিচ ঢালা হাইওয়ে—সব পেরিয়ে কলকাতার শত কলরোলের ভিতর থেকেও নিজেকে আড়াল করে ভানুর ডাক গিয়ে পৌঁছেছে জাহাজওয়ালার ঘরে। জাহাজের মতো কোনো বাড়িতে হয়তো। নতুবা কোনো জাহাজেই বোধ হয়। এ কি খিদিরপুর ডকের জাহাজ, নাকি বজবজের গঙ্গায় ভাসা জাহাজ! একটাও মানুষ নেই! কেউ ধরবে না ফোন?

'কী হল?' অনন্ত দম আটকে জিজ্ঞেস করে।

'কেউ নাই।'

'ও–বাড়িতে ফোন গেছে?'

'গেছে, নাহলে বাজছে কেন?'

'ও–বাড়িতে কুন্তি রয়েছে?'

'তাই তো থাকার কথা।' বলতে বলতে ভানু টের পায় ফোনটি কেউ তুলল। ফোন তুলতেই, ভানু চাপা গলায় বলে ওঠে, 'হ্যালো, দীঘা থেকে বলছি, কুন্তি আছে, কুন্তিরে চাই, হ্যালো, হ্যালো...।'

ফোনটি কেটে গেল। লাইনটি কেউ রেখে দিল যেন একটি কথাও না বলে। লাইন যে কেউ তুলেছিল তা ধরা গেল ফোনের চার্জটি মুদ্রিত অক্ষরে আর একটি যন্ত্র থেকে বেরিয়ে আসায়।

'ধরল না কেউ?' অনন্ত জিজ্ঞেস করে।

বুথের ছেলেটি ভিতরে এসে বিলটি ছিঁড়ে ভানুর হাতে দিতে দিতে বলে, 'কল হয়েছে, ওদিকে রিসিভ করেছিল।'

'কথা বলল না তো!' টাকা মিটিয়ে বিড়বিড় করতে করতে ভানু বেরিয়ে আসে। তাহলে ফোনটা কি মদনানি সাহেব নিজে তুলেছিল? নাকি কুন্তি? ভানু দেখছিল স্বামী–স্ত্রী তার দিকে চেয়ে আছে অধীর আগ্রহে। ভানু বলল, 'কাল সকালে কলকাতা যাব।'

'যাবে?' অনন্ত ভানুর হাত ধরে ফেলে।

'হ্যাঁ যাব, তুমি যাবে সঙ্গে?'

মেয়ের মা বলে, 'মুও যাব।'

ভানু না করল না। ঠিক হল টাকা থাকবে ঘরে। মাটির নীচে যখন আছে, থাকুক। তারা কলকাতায় গিয়ে মেয়েকে নিয়ে এসে তারপর টাকা ফেরত দেবে। অত টাকা নিয়ে কলকাতা শহরে যাওয়া ঠিক হবে না। স্বামী–স্ত্রী আর অলংকারপুরে ফিরল না। শুয়ে থাকল মাইতিবাবুর হোটেলের বারান্দায়। মাইতিবাবু ফিরল না। ভানুর ঘুম এল না অনেক রাত্রি পর্যন্ত। ভানু কেন, কুন্তির মা–বাবাও ঘুমোল না। তারা বসে বসে কথা বলছিল। ঠাকুরানির কোনো সাড়া নেই। ভোররাতে তিনজন বেরিয়ে পড়ল। বাসে কলকাতা শহরের দরজায়। হাওড়া স্টেশনে বাস থেকে পৌঁছোল বেলা বারোটা নাগাদ। শেষ ভাদ্রর রোদে শহর ঝাঁ–ঝাঁ করছে। ট্যাক্সি নিল তিনজনে, 'নিউ আলিপুর চলো।'

ট্যাক্সি চলতে আরম্ভ করলে কাঁদতে লাগল কুন্তির মা, 'মেয়েটা বেঁচে আছে তো ও ভানুদাদা, হা ভগবান, পঞ্চম ঠাকুর কী সব্বুনাশ করল মোর! কী হবে, ও ভানুদাদা?'

ট্যাক্সি ধীরে ধীরে গড়িয়ে যাচ্ছিল। চোখের সামনে শহরটা ফুটে উঠছিল। ব্রিজের নীচের নদীকে প্রণাম করল ভানু। নদীটা টানছে তাই এতবার দেখা হয়ে যাচ্ছে।

কী নির্জন, নিঝুম জায়গা। প্রাচীরটা জেলখানার মতো উঁচু। সাদা প্রাচীরের গায়ে মস্ত লোহার ফটক। দেওয়ালে লেখা মদনানি হাউস। ভানু নম্বরটাও মিলিয়ে নেয় ট্যাক্সিতে বসে।

এখানে কোনো মানুষ পায়ে হাঁটে বলে মনে হয় না। প্রাচীরে গা ঘেঁষে, ভিতরে পর পর গাছের সারি। গাছের কুচি কুচি হলুদ পাতা ভিতরে না ঝরে বাইরের সরু ফুটপাতে ঝরে পড়েছে। অচেনা এক ফুলের পাপড়িও পড়ে আছে বাইরে। ভানু দেখছিল সেসব। হলুদ, লাল রং শুকিয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে বাতাসে, তাদের উপর কোনো মানুষের পা পড়েনি বাইরে। যে ফুল শুকিয়ে মরেছে ভিতরে, বাইরে তার সম্পর্কে কার আর কৌতূহল!

ট্যাক্সি চলে গেছে। তিনজন লোহার গেটের সামনে দাঁড়িয়ে। কুন্তির মা গেট দেখে ভয়ে কুঁকড়ে স্বামীর পিছনে তার জামার কোণ ধরে দাঁড়িয়েছে। ভানু বন্ধ গেটের ওপারে বন্দুক কাঁধে নেপালি দারোয়ানকে দেখে ডাকল, 'বাহাদুর ভাই, সায়েব কাঁহা, মদনানি সায়েব জাহাজওয়ালা?'

'কেয়া?' ভ্রূ কুঁচকে আবার শুনতে চায় বাহাদুর।

ভানু ফের বলতে বাহাদুর হেঁকে উঠল, 'ভাগো হিয়াসে।'

'কিউ, ভাগেগা কিউ?'

'সায়েব কা হুকুম।'

'মেরা লেড়কি হায়, সায়েব তাকে নিয়ে এসেছে দীঘা থেকে, এই তো মেয়ের মা–বাপ।'

'হুকুম নেহি, ভাগো।'

ভানু বুঝতে পারে দারোয়ান খুব টেঁটিয়া। সহজে গেট খুলবে না। না খুললে কুন্তির সন্ধান করবে কীভাবে? দারোয়ান ভাবলেশহীন মুখে আবার বন্দুক কাঁধে দাঁড়িয়ে গেছে নিজের জায়গায়। ভানু দু–হাতে লোহার ফটকের শিক ধরে ভিতরে তাকায়। ফটক থেকে গেরুয়া মোরাম রাস্তা অনেক দূরে হাঁসের মতো সাদা বাংলোটির সামনে গিয়ে থেমেছে। দু–পাশে বাগান, বাগানে ফুল আর গাছ। বাংলোটি দোতলা। কিছু ধরা যাচ্ছিল না দূর থেকে। কুন্তির মা আর বাবা বসে পড়েছে ফুটপাতের কোণে। তারা আকুল হয়ে তাকিয়ে আছে ভানুর দিকে।

ভানু আবার ডাকল, 'সায়েব কো বোলাও।'

'হুকুম নেহি।'

'ধ্যাত্তেরি নিকুচি করেছে হুকুমের, আমাদের মেয়ে নিয়ে এসেছে দীঘা থেকে, ও ভাই বাহাদুর, দরোয়াজা খুলো।'

বাহাদুর বলল, 'হুকুম নেহি, হট যাও, গোলি মার দেগা।'

'মার না গুলি।' ভানু খেপে ওঠে, 'মার গুলি, আমার পক্ষীরাজটারে...।' ভানু সামলায় নিজেকে, 'মেয়েটারে নিয়ে এল জাহাজওয়ালা, মার বেটা গুলি।'

বাহাদুর এবার বিব্রত বোধ করে। ভানু লোহার ফটকে করাঘাত করতে থাকে। কুন্তির মা বাপ একসঙ্গে কেঁদে ওঠে, 'মেয়্যাটারে ঘুরাই দাও গো বুড়াবাবু জাহাজওয়ালা।'

একসঙ্গে দুজনের কান্না শুরু হতেই আলিপুরের এই নির্জন পথ যেন সরব হয়ে ওঠে। রাস্তা দিয়ে হুসহাস করে যে লাল, হলুদ পাখির মতো গাড়িগুলো ছুটে যাচ্ছিল অনির্দেশ্য গন্তব্যে, তাদের গতি মন্থর হয়ে আসছিল। ভানু বলে ওঠে, 'আরও জোরে কাঁদো কুন্তির মা, মেয়ে আছে ভিতরে।'

দারোয়ান ঢুকে গেছে তার ঘরে। ভানু তার ঘাড় লম্বা করে দেখতে চেষ্টা করছিল দারোয়ানের ঘরটিকে। কুন্তির মা জোরে কাঁদতে পারছে না। কান্নার সাহসই হারিয়ে ফেলেছে বোধ হয়। হতচকিত হয়ে লোহার ফটকের ওপারের পৃথিবী দেখছে, বিনবিন করে কাঁদতে কাঁদতে, ঘাড় ছোটো করে ভিতরে চোখ মেলে দিচ্ছে। মদনানি হাউসের

ভিতরটা তার পরিচিত জগত থেকে আলাদা। এত শান্ত, নিস্তব্ধ যে কাঁদতে ভয় পাচ্ছে কুন্তির মা। অনন্ত উঠে দাঁড়িয়েছে। দেখছে ভিতরের গাছগাছালি, বাগান, সবুজ পাতা, দুধ সাদা বাংলোটিকে। বাংলোর গায়ে রোদ থই থই করছে। অনন্তর মনে হল জাহাজ। একেবারে জাহাজের মতো বাড়িটা। দারোয়ান ফিরে এল ঘর থেকে, জিজ্ঞেস করল, 'কতজন রয়েছে?'

'তিনজন, মেয়ের মা বাপ আর ঘোড়াওয়ালা।'

'ঘোড়াওয়ালা! দারোয়ান বিস্মিত হল।'

'হাঁ, ঘোড়া চোট হয়ে গেছে, এটা তো মদনানি সায়েবের বাড়ি?'

'হাঁ, সায়েব বলছে গোল করবে না, ফোনে কথা বলা হল।'

'সায়েব আছে?'

'আছে, হল্লা করবে না, চুপচাপ ঢুকে যাবে।' বলতে বলতে দারোয়ান আবার চলে যায় তার ঘরে। চাবি আনতে গেল বোধ হয়। কুন্তির মা উঠে দাঁড়িয়েছে। তিনজনে এখন লোহার ফটক ধরে দাঁড়িয়ে। দারোয়ান এল। এল কিন্তু ফটকটি খুলল না। ফটকের গায়ের ছোটো দরজাটি খুলে ডাকল ওদের। ভানু আর দুজনকে নিয়ে নীচু হয়ে ভিতরে ঢুকল। ঢুকতে গিয়ে ভানুর পিঠে ঠোকা লাগে। ভানু ভিতরে দাঁড়িয়ে দারোয়ানকে বলল, 'বাবু যে মেয়েটারে এনেছে, তার মা–বাপ।'

দারোয়ান নির্বিকার। ফটকে তালা দিয়ে ওদের আগে আগে হাঁটে। ভানুরা দারোয়ানকে অনুসরণ করে। দারোয়ান একটু এগিয়ে দাঁড়ায়, 'একদম চুপচাপ থাকবে, সায়েবের মেজাজ ঠিক নেই, লেকিন তুমাদের লেড়কি বহুত পসন্দ হয়েছে, সমুন্দরের ধার থেকে আনল তো?'

'হাঁ, হাঁ।' এতক্ষণে যেন নিশ্চিন্ত হল কুন্তির মা। তার বিশ্বাস হচ্ছিল না কুন্তি এখানে আছে। এই পৃথিবীর সঙ্গে তার কোনো পরিচয় নেই। চারধারে কত উঁচু পাঁচিল, কত গাছপালা, ওপাশে সাঁতারের পুকুর। সিনেমায় যেমন দেখেছে কুন্তির মা, ঠিক সেইরকম।

এই সময় নির্জনতা ভেঙে খুব গম্ভীর স্বর শোনা গেল একটি কুকুরের। একটি নয়, আরও গোটা দুয়েকের গর্জন শুনতে পায় তিনজন। ভয় জাগানো হিংস্র ডাক। তিনজনে পাশাপাশি এসে দাঁড়ায়। ভানুর গা ছমছম করে ওঠে, কোথায় এল? কুকুরগুলোকে দেখতে পাচ্ছে না, কিন্তু ডাক শুনে মনে হচ্ছে খুব কাছেই রয়েছে। গাছের আড়ালে আবডালে। দারোয়ান চাপা গলায় বলল, 'চুপচাপ থাকবে, সায়েব রেগে গেলে কুত্তা ছেড়ে দেয়।'

ভানু জিজ্ঞেস করে, 'বাঁধা আছে তো?'

'হাঁ, লেকিন সায়েব যা বলবে তাই করবে, সমঝতা?'

কুন্তির মা ঘাড় কাত করল। তার মুখখানি রক্তহীন, ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। অনন্তর হাত ধরে আছে সে। অনন্তও ঘাবড়ে গেছে, বিড়বিড় করেছে, 'এসব কুকুর খুব খারাপ হয়, বাঘের মতন, খুব রাগী।'

দারোয়ান বলে, 'একটা চোর ঢুকেছিল রাত্তিরে পাঁচিল টপকে, তিনটে কুত্তা তাকে ছিঁড়ে খেয়েছিল।'

'মানুষ খায়?' ভয়ার্ত কণ্ঠস্বর কুন্তির মা'র।

দারোয়ান গম্ভীর স্বরে বলল, 'হাঁ হাঁ, মাংস খায়, বেলাড খায়, বেলাড মতলব খুন, চেটে চেটে খেয়েছিল, তারপর ওদের লোভ হয়ে গেছে খুব, তবে চেনা আদমিকে কুছু করে না।'

'আমরা তো অচেনা।'

'সাবধান থাকো, হল্লা করবে না।'

'বাঁধা আছে তো?' এবার জিজ্ঞেস করল কুন্তির মা।

'হাঁ, মোটা চেনে বাঁধা আছে, লেকিন, চেন ছিঁড়ে দেয়, কুত্তা তো বাঘ আছে, ডেইলি ছ'কেজি মটন খায় তিনটায় মিলে।'

কুন্তির মা বলল, 'আমার মেয়েরে তো চেনে না।'

'একদিনেই চিনে গেছে, কুত্তা ঠিক ধরতে পারে সায়েব কিসকো প্যার করতা, সায়েব যাকে পসন্দ করবে, কুত্তাও পসন্দ করবে।'

কুন্তির মা বলল, 'কী করব বাপ বাহাদুর, মেয়্যাটারে যে পেটে ধরেছিলাম, তাই আসতি হল।'

'রোও মাত, তিন কুত্তা মিলে ঘিরে ধরে চোরটাকে, বাগানে তো ওই রাতে চাঁদনি ছিল কুছু করতে পারল না চোরটা, পালাতে পারল না, তিনটা নাকড়া খেয়ে নিল।

'নাকড়া!' অনন্তর গলা ভয়ে বুজে যায়।

'হাঁ, কুত্তা তিনটে নাকড়ার মতো।'

রোদ ঝলসে যাচ্ছে গায়ের উপর। কিন্তু তা টেরই পাচ্ছে না তিনজন। গা শিউরে উঠছিল কুকুরগুলির ক্রমাগত গর্জনে। বাহাদুর বলছে ভয়ংকর কথা। তার সাহেব একবার একটা লেড়কি এনেছিল পাহাড় থেকে। পাহাড়িয়া লেড়কি। বহুত খুবসুরত। সে লেড়কি পালাতে গিয়েছিল। বহুত বেগড়বাই করেছিল। সাহেব তার মা বাপকে বহুত দিয়ে তা খরিদ করেছিল। কিছুতেই যখন বশে আনতে পারল না সাহেব, তখন কুত্তার সামনে ছেড়ে দিল।

'এ কী বলো!' রোদের ভিতরে কুন্তির মা বসে পড়েছে।

'আরে রোও মাত, এ লেড়কি বাবুর বহুত পসন্দ, লেড়কি বহুত আচ্ছি হায়।'

তিনজনে পা ঘষটে পোর্টিকোর নীচে এসে দাঁড়িয়েছে। এখানটায় খুব ছায়া। ঘন, শীতল। ছায়ায় এসে তারা বুঝল রোদটা কী কঠিন না ছিল! দারোয়ান বারান্দায় উঠে মস্ত দরজা ঠেলে ধরল, 'অন্দর মে ঘুসো।'

'কুত্তা?' অনন্তর ভয় হয়ে গেছে।

'বাগানে বাঁধা আছে।'

ভিতরটা কেমন আলো–আঁধারি। তিনজনে ঢুকে দাঁড়িয়ে পড়ে। আস্তে আস্তে চোখে সইয়ে নেয় অন্ধকারটা। বুঝল তেমন অন্ধকার নয়, চড়া রোদে চোখ ধাঁধিয়ে গিয়েছিল। মস্ত ঘরটিতে বড়ো বড়ো সোফা সেট। আর যে কী কী আছে তা তারা কেউ চেনে না। নরম কার্পেটের উপর বসে পড়ে তিনজনে। বসে হাঁপাচ্ছিল সবাই।

আচমকা আলো জ্বলে ওঠে! ভানু অবাক হয়ে দেখল সেই লোকটা। তাদের দিকে তাকিয়ে আছে ওপাশের দরজার মুখে দাঁড়িয়ে। ভানুর মাথা নেমে গেল। সহ্য করতে পারছিল না হিম–চাহনি।

'রুপয়া মাংতা?' গর্জন শুনল কুন্তির মা। তরাসে স্বামীকে আঁকড়ে ধরে। ভানুও চমকে উঠেছিল। মনে হল একটা কুকুর যেন মদনানি সাহেবের পিছনে। ভানু তার ঘন নিশ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছে। ভানু ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল কুঁকড়ে আছে কুন্তির মা–বাবা।

'কিতনা রুপয়া মাংতা?'

'না সায়েব, মেয়ের মা–বাপ এয়েচে।'

'মালুম আছে, পন্দেরো হাজার রুপয়া হামে দিয়া।

'সায়েব, মেয়েটারে চায় ওরা।'

ভ্রূ কুঁচকে মদনানি সায়েব তাকিয়ে থাকে ভানুর চোখে। ভানু মাথা নামাতে পারে না। চোখের পলক ফেলে না। মনে হচ্ছিল চোখের পাতা ফেললেই নেকড়ের মতো একটা কুকুর দাঁত নখ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে তার উপর।

অনন্ত সাহস সঞ্চয় করল, বলে, 'টঙ্কা দিয়ে দেব সায়েব?'

'কেয়া?' সায়েব রেগে গেছে টের পায় ভানু।

কুন্তির মা বিনবিনিয়ে কাঁদছে, 'পেটে ধরা মেয়্যা, সায়েব গো!'

'রোও মাত, কিতনা রুপয়া চাহিয়ে?'

ভানু বলে, 'মেয়ে চায় সায়েব, মেয়েরে নিয়ে যাবে।'

'তুম চুপ রহ।' গর্জন করে ওঠে প্রেম মদনানি। গাঢ় নীল রঙের স্লিপিং গাউনের দড়িটাকে আলগা করে দেয় প্রৌঢ়। ভানু দেখল কালো শর্টস আর হলুদ টি–শার্ট। মুক্ত ঊরুতে চামড়া থলথল করছে। গায়ের সমস্ত চুল সাদা। স্লিপিং গাউনের পকেট থেকে সিগারেট বের করে ধরালে বুড়ো, বলল, 'একদম চুপ, হল্লা করবে তো কুত্তা ছেড়ে দেব।'

'আমার মেয়্যা?' কুন্তি ডাকল সায়েবকে, 'ও সায়েব।'

'লেড়কি আছে, ভালো আছে।'

'মেয়্যারে লিয়ে যাব সায়েব।'

সায়েব চলে গেল আচমকা। ঘরটা নিঝুম। শীততাপ নিয়ন্ত্রিত ঘরের তাপমাত্রা যেন আরও কমে যায়। ভানুর শীত করতে থাকে। ভানু দেখল কুন্তির মা–বাবাও কুঁকড়ে গেছে ঠান্ডায়। অনেকটা চুপচাপ। তারপর! ভানু দেখল ভারী নীল পর্দা নড়ল। ও কে? কুন্তি! দরজায় কুন্তি, তার পিছনে পর্দা, পর্দার পিছনে আর কেউ যে আছে তা যেন ধরা যায়।

কুন্তিকে দেখে চিতকার করবে কী, তার মা বোবা হয়ে গেছে। তিনজনের কেউ কোনো কথা বলতে পারছে না। এ কি সেই নুনমারার মেয়ে? এ তো অন্য দেশের কোনো মেয়ে। কত বড়ো নীল ঘাগরা, নীল রঙের চোলি, মাথায় নীল রঙের রিবন, হাতে মোটা বালা। মুখখানিও আগের মতো নেই, শুধু চোখ দুটি দেখে চেনা যাচ্ছে। আর চেনার কোনো উপায় নেই। ঝি–গিরি করাতে এনে এমনভাবে সাজিয়ে রেখেছে মেয়েটাকে!

ভানু ডাকল প্রথমে, 'কুন্তি মা, ও কুন্তি!'

কুন্তি ভাবলেশহীন চোখে তাকিয়ে আছে মানুষগুলোর দিকে।

উঠতে যায় কুন্তির মা, বিনবিনিয়ে কেঁদে ওঠে, 'ও মা, কথা বলিস নে কেনে?'

'বসো, উঠো না।' কুন্তি হাত তুলল।

'বাড়ি যাবি মা?' অনন্ত ডাকল।

'পরে যাব, তোমরা যাও, টাকা নিয়ে যাও।'

'ও কুন্তি।' কেঁদে ওঠে ভানু। কতদিন বাদে তার চোখে জল এল যে। মনে পড়ে যাচ্ছে ফুলরানির কোলের বাচ্চাটিকে। আহা রে, তারা কোথায় আছে, কী করছে! ভোজপুরের কোন গাঁয়ে ঘর? সব লেখা আছে ভানুর কাছে। কাগজটা কি থাকবে হোটেলে? মাইতিবাবুর কাছে রাখা ছিল সব। কুন্তি তাকে ডাকছে। কী বলছে নুনমারার মেয়েটা? ভানুকে জিজ্ঞেস করল, 'ঘোড়া মিলল, তুমার কন্থক?'

ভানু বলল, 'তুই বাড়ি যাবিনে?'

'পরে, তোমরা এসো না, ইচ্ছে হলে আমি যাব।'

'তোরে ফোন করেছিলাম।'

কুন্তি চুপ করে থাকে। কুন্তির মা'র চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে যাচ্ছে। চোখ মুছছে অনন্ত। ঘরে শীত বাড়ছে। কুন্তি ছুঁড়ে দিল একটা বান্ডিল, মুঠোর ভিতরে ছিল, বলল, 'পথে খেয়ে নিয়ো, হাজার টাকা আছে।'

'তারপর!' ভানুর মনে হয় সব যেন ভোজবাজি। অলৌকিক কিছু ঘটে গেল। আর কেউ নেই। পর্দার আড়ালে চলে গেছে কুন্তি। কুকুরের ডাক শোনা যাচ্ছে। এক বুড়ি ঢুকল, 'নিকলো, সায়েব রুপয়া দিল এই পাঁচ হাজার, লেড়কি এক হাজার দিল, খুশি মনে চলে যাও।'

'মেয়্যাটারে পাব না?' আচমকা সেই কঠিন নৈঃশব্দ্য ফালাফালা করে কেঁদে ওঠে কুন্তির মা, 'টঙ্কা চাইনে, মেয়্যাটারে দাও।'

অশীতিপর লোলচর্মধারিণী বুড়ি এসে একটা খাম দিল অনন্তর হাতে, বলল, ‘কুত্তা ছেড়ে দিবে বাবু, ভাগো, মেয়ে সুখে আছে, মেয়ে যাবে না।’

‘যাবে।’ কুন্তির মা ফুঁসে ওঠে।

‘নেহি যায়েগি, জাহাজ ছাড়বে বাবুর, লেড়কি বাবুর সঙ্গে যাবে জাহাজে।’

‘কোন জাহাজে?’ ভানু জিজ্ঞেস করল।

বুড়ি হাসে, ‘উড়াজাহাজ, ভাগো আভি।’

ওরা উঠল। অনন্ত তার বউকে ধরে। তিনজনে দরজা ঠেলে বেরিয়ে আসতেই অসহ্য উত্তাপ আর আলোয় দিকহারা হয়ে পড়ে যেন। তিনজনেই পোর্টিকোর পিলারে গিয়ে ধাক্কা খায়।

দারোয়ান ছিল, ভানুকে বলে, ‘চলে যাও, সায়েবের হুকুম।’

‘মেয়েটাকে নিয়ে নিল!’ ভানু আর্তনাদ করে ওঠে। যেন তারই মেয়ে গেল। ভানু বিলাপ করতে থাকে, ‘নুনমারার মেয়েটারে কুহক করেছে।’

পোর্টিকো থেকে লোহার ফটক পর্যন্ত হাঁটছিল তিনজনে। হাঁটতে হাঁটতে একবার ভানু ঘুরে তাকায়। ভানু কেন, তিনজনেই, যেন তারা কোনো ডাক শুনেছিল। ডেকে উঠেছিল কেউ। তারা অবাক হয়ে দেখল দোতলার সবুজ জানালার একটি পাল্লা খোলা। খোলাই রয়েছে। যাওয়ার সময় দেখেছিল সব বন্ধ। খোলা জানালায় কেউ ছিল যেন। ছিল তা ধরা যাচ্ছে, এখন কেউ নেই, হয়তো আছে, তারা দেখতে পাচ্ছে না। ঘর থেকে দেখছে তাদের।

কুন্তির মা বলল, ‘মেয়্যাটা দাঁড়াইছিল উখেনে।’

‘দেখেছ তুমি?’ জিজ্ঞেস করে অনন্ত।

‘না, কিন্তু ছিল।’

তিনজনে আবার ফিরতে থাকে। ফিরতে ফিরতে লোহার গেট, হাওড়া স্টেশন, বাস, দীঘা। কত রাত তখন! জেগে আছে ধ্রুবতারাটি উত্তরে মীরগোদার সমুদ্রের দিকে। সেই সমুদ্র ছাড়িয়ে আরও উত্তরে, কত দূরে! কত দূর! বুক হু–হু করে ওঠে ভানুর। তারাগুলোও যেন অনেক কাছে, যত দূরে গেল নুনমারা মেয়েটি, তার চেয়ে।

ভানু ঘুরছে। না ঘুরে করবে কী? প্রেম মদনানির কাছ থেকে ফিরে ভানু উধাও হয়ে গিয়েছিল আবার। ঘোড়ার খোঁজে, না অন্য কারণে তা ভানুই জানে, শ্রীপতি জানে না। শ্রীপতি মাইতি বিরক্ত হয়ে উঠেছে ক্রমশ। ঘোড়ার আশা ছেড়ে দিচ্ছে। সে যখন 'ঘোড়া যায় যাক,' বলে গাঁজার কলকেতে টান মারে, তখন বেঙা মাথা নেড়েছে, তা হতে পারে না, ঘোড়া যাবে কেন, অশ্বটি হল মাইতি বংশের সব, ওই অশ্বের বাপ ঠাকুরদার পিঠে চেপে মাইতিবাবুর বাপ নন্দকিশোর মাইতি কত পয়সা করেছিল দশ গাঁয়ের লোক তা জানে, ছেড়ে দেবে তাকে?

শ্রীপতি তখন একটু থমকেছে। ঠিক কথাই তো বলছে। নন্দকিশোর মাইতি তার যৌবনকালে অশ্বের উপর থেকে নামত না। তখন সমুদ্র তো এখানে নয়। আরও দূরে, সেই যেখানে আসল দীঘা মৌজাটা জলের ভিতর ডুবে আছে, সাহেব বাংলোটা ভাটার সময় সমুদ্রের ভিতরে যেখান থেকে মাথা তুলত। তা মাইল দেড়েক ভিতরে হবে।

দীঘা নামটি রয়ে গেছে। মৌজাটা সুমুদ্রের তলায়। এখন যাকে দীঘা বলে তা হল গোবিন্দবসান, নয়াবসান আরও সব মৌজা। তখন হোটেলই–বা কোথায়, টুরিস্টই–বা কোথায়? পৌষ সংক্রান্তি ছাড়া সমুদ্রে নামত কে? হ্যাঁ, চৈত্র সংক্রান্তিতে চন্দনেশ্বর যাবার পথে গা ঠান্ডা করে পুণ্য অর্জন করে যেত লোকে। ছিল শুধু ওই নাড়াজলের রাজার বাড়ি।

অনেককাল আগে শ্রীপতির বাবা নন্দকিশোর তার যৌবনকালে ঘোড়ার পিঠে চেপে কম উপার্জন করেছে! তার আগে নন্দকিশোরের বাবা কৃষ্ণকিশোর! এই ঝাউবন, বালিয়াড়ি, কেয়াঝোপ, খেজুরগাছ, তালবনের দেশে স্বাধীনতাই–বা কী, ব্রিটিশ আমলই–বা কী! পুলিশ! ব্রিটিশ আমলেও তো পুলিশ এদেশীয় চাষার ছেলে। নন্দকিশোর, কৃষ্ণকিশোর ঘোড়ায় চেপে হাটে হাটে ঘুরত। শ্রীপতি শুনেছে তার বাবা ঘোড়ার পিঠ থেকে নামত না। ঘোড়ার পিঠে বসেই হাটে পৌঁছে হাঁক মারত, 'ভীমাচরণ, লবীন, কাত্তিক হে!

তারা ছিল খাতক, নন্দকিশোর মহাজন। নন্দকিশোর ঘুষ আদায়ে হাটে যেত। লম্বা পাকানো গোফ, নীল পাগড়ি, চোগা চাপকান। তার বাবাকে দেখতে ছিল কী! ঘোড়ার পিঠে বসে হাঁক মারা, ঘোড়া থেকে না নামা, এই ধরনটা সে শিখেছিল সাহেবদিগের কাছ থেকে। কাঁথি থেকে প্রজা দমনে ম্যাজিস্ট্রেট সায়েব আসতেন ঘোড়ায় চেপে। কে কোথায় স্বদেশী করছে, নুন মারছে সেই খোঁজে। গরিব মানুষের ভাগ্য কী! যে মাটিতে তারা দাঁড়িয়ে আছে সে মাটিতে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব নেমে কথা বলেন কী করে? যতক্ষণ তিনি ঘোড়ায় ততক্ষণ তাঁর প্রতাপ। অশ্ব যেন মানুষকে অতিরিক্ত শক্তি দেয়। ঘোড়ার গুণই এই। পিঠে উঠলেই রাজার মেজাজ।

আর ঘোড়াবেচা মাঠ! সাঁতরাপুরের পনেরো বিঘে জমি তো এসেছিল একটা ঘোড়ার বিনিময়ে। শোনা কথা। শ্রীপতির তখন জন্ম হয়নি। তার ঠাকুরদা কৃষ্ণকিশোর একটা সাদা ঘোড়ায় চাপতেন। সেই ঘোড়া দেখে পাহাড়িবাবুদের পছন্দ হয়। ফলে সেই ঘোড়া ওঁদের দিয়ে বিনিময়ে পনেরো বিঘে ধানজমি ধান কৃষ্ণকিশোর। সেই মাঠ ঘোড়াবেচা মাঠ নামে চিহ্নিত। ঘোড়াবেচা মাঠের সবটাই প্রায় বেচা হয়ে গেছে, আছে একটুখানি। ওটা থাকুক। শ্রীপতি বেচবে না।

বেঙা বলে, 'মোকেও কুছু দেন ছিপতিবাবু, মু যাই অশ্ব খুঁজতা।'

'একা যাবি?'

'না, সায়েবকে লিয়ে যাব না হয়।'

'তোর বউ?'

'উকেও লিয়ে যাব না হয়।'

শ্রীপতি হাসে, 'মোকেও লিয়ে চ তাহলে, ঘোড়া খুঁজবে ভানু, ভানু দাস।'

'কেনে আমরা পারি না?' বেঙা বলে।

‘না পারিস না, ভানু হল যে ঘোড়াওয়ালা ছন্দক, কী বুঝলি? কিন্তু ভানু গেল কোথায়?’

‘কী জানি বাবু!’ বেঙা মাথা নাড়ে, ‘বাবু, সায়েব যে যাবে না বলে।’

‘যাবে না মানে?’

বলে, ‘এ জীবনের মতো ইখেনে থাকি যাবে।’

‘উসব এমনি বলে, ভানুটা গেল কোথায়?’

বেঙা বলে, ‘সায়েবের মায়া পড়ি গিইছে ই জায়গায়।’

‘পড়ুক, ভানু কোনদিকে গেল ঘোড়া খুঁজতে বল দেখি?’

বেঙা হাসে, ‘পুব দিকে, যেদিকে সূয্যি ওঠে।’

‘এই ঘরের কোন দিকটা পুব?’ মাথা ঝিমঝিমে শ্রীপতি জিজ্ঞেস করে।

বেঙা হাসে, ‘সকালে বলা যাবে।’

‘কেন?’

‘সূয্যি যেদিকে ওঠে ওইটা পুব হবে,’ ‘বলে বেঙা দোলে, ‘ইখন অন্ধকারে সায়েবও কহি পারবেনি।’

শ্রীপতি মাথা নাড়ে। কথাটা ঠিক। যেদিকে সূর্য ওঠে সেইটা পুব, রাতে তো সূর্য ওঠে না। তা হোক, ভানু গেছে নাকি পুবদিকে, অন্তত বেঙা তাই বলছে। পুবদিকে কী আছে? বেঙা কি জানে? জানে বেঙা। হিজলি, মসলন্দি, দৌলতপুর, দরিয়াপুর, রসুলপুর, বেগমশাহি। জানল কী করে বেঙা? ওদিক থেকেও নৌকো আসে মাছ ধরতে। তখন হাঁক মেরে মেরে জানা যায় কোন গাঁ থেকে কে এল।

বেঙা আবার বলে, ‘মাইতি মোশায় মোরে টঙ্কা দেন, অশ্বর খপর লিয়ে আসি।’

শ্রীপতি হাসে, ‘ওটা ভানু ছাড়া কেউ পারবে না।’

বেঙা বলে, ‘উটার খুঁজে যদি বাহির হই, মন শান্ত থাকে, সায়েব বোষ্টম মোর ঘর দখল করি নিইছে, মু কুথায় যাই?’

‘সত্যিই থেকে গেল সায়েব?’ শ্রীপতির মাথা ঝিমঝিম করে। কী সব্বোনাশ! কোথাকার সাহেব কোথায় এসে থেকে যাবে! তার পক্ষীরাজও কি এমনি কোথাও রয়ে গেছে? সাহেব এখানে আছে, নিজের দেশে নেই। সেখান থেকে উধাও হয়ে গেছে। তাকেও তো খুঁজে বেড়াচ্ছে কেউ–না–কেউ। শ্রীপতি উঠে দাঁড়ায়। ভালো লাগছে না। ভানু এসেছিল শোনা যাচ্ছে। কাল রাতে নেমেছে দীঘায়। সঙ্গে নুনমারা অনন্ত আর তার বউ ছিল। কথাটা শ্রীপতি বাজারের সিগারেটওয়ালার কাছে শুনেছে। সেই ভানু গেল কোথায়? শুধু ভানু কেন, নুনমারার মেয়ে কুন্তি! তার কথা তো বলেনি গুমটিওয়ালা। কুন্তি ছিল না তো গেল কোথায়? আহা, মেয়েটি বেশ! বলে বর্ণহীন ঘোড়া। বেশ মনে আছে শ্রীপতির। ভানু পাগল না কি? সারাদিন দেখা নাই। তাহলে কি পক্ষীরাজের খোঁজ পেল?

‘বেঙা তুই যা, আমি বেরোব।’

‘তুমার সাথে যাই মোশায়।’

‘না, তুই যা, ভানুকে খুঁজে আন।’

‘ভানু! ভানুদাদারে খুঁজতি হবে?’

‘হ্যাঁ।’

‘ঘোড়া খুঁজা হবেনি?’

‘ভানুদাদা ঘোড়া খুঁজছে, তুই ভানুদাদারে খোঁজ।’ শ্রীপতি ঘর থেকে বেরোয়। তার পিছনে পিছনে বেঙা আসে, ‘তাহলে ক–টা টঙ্কা দাও।’

‘টঙ্কা লাগবে?’

‘নাহলে খুঁজব কী করি কহ মোশায়।’

শ্রীপতি পকেট থেকে একটা নোট বের করে আনে অন্ধকারে। শুকনো নেশায় সব ভোলেভালে হয়ে যায়। দশ, না পঞ্চাশ, না একশো বোঝা যায় না। বেঙার হাতে নোটটা গছিয়ে শ্রীপতি হনহন করে বেরিয়ে পড়ে।

শ্রীপতি যায় কোথায়? না, সিগারেট গুমটিওয়ালার কাছে গিয়ে শুনবে ঠিক কারা নেমেছিল শেষ বাসে, সেই রাত বারোটা নাগাদ। ভানু, নুনমারা অনন্ত আর তার বউ। মেয়েটা কোথায়? শ্রীপতি এখন মেয়েটাকে খুঁজে বের করতে চায়। সেদিন গেল মীরগোদা। বাড়িটার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ফেরত এল। কোকিলা দাসী কোথায় গিয়েছিল কে জানে? অন্ধকারে হাঁটতে হাঁটতে শ্রীপতি যখন বাজারের প্রায় মুখে, তাকে ধরে ফেলেছে ভারতী, ‘তুমি কোথায় যাচ্ছ?’

‘কেন?’ শ্রীপতি দাঁড়িয়েছে।

ভারতীর মুখটা কালো হয়ে যায়। সে বিড়বিড় করে, ‘জিজ্ঞেস করব না?’ ‘না মানে’, শ্রীপতি অপ্রতিভ হয়। রাস্তায় লোক কম, কেউ দাঁড়াচ্ছে না।

‘তুমি এর একটা বিহিত করো।’

‘কীসের?’

‘তোমার মা–বউ..., তুমি জানো না?’

শ্রীপতি দমে যায়। আবার কী হল? সে জিজ্ঞেস করল, ‘কী হয়েছে?’

‘কী হয়েছে তুমি শোনোনি?’ বলতে বলতে ভারতী তার কোয়ার্টারের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। শ্রীপতি হতভম্ব হয়ে পিছনে পিছনে এগোয়। এখানে দাঁড়িয়ে এইরকম কথা বলা যায় না! কণ্ঠস্বর চড়ে গেলে লোকজন মজা দেখতে দাঁড়িয়ে পড়বে।

ঘরে ঢুকেই ভারতী শ্রীপতির জন্য অপেক্ষা করে, শ্রীপতি আসামাত্রই দরজাটা বন্ধ করে দেয়। তারপরে দুটো হাতে মুখ ঢেকে নিশ্চুপ তক্তাপোশের উপর বসে পড়ে।

‘কী হয়েছে?’

‘বলে কী হবে! তোমার মা–বউ আমাকে যে অপমানটা করে গেল, তুমি জানো না?’

‘কই না, আবার কী হল! ওদের সঙ্গে তোমার দেখা হল কবে?’

‘তুমি কিচ্ছু জানো না?’ ভারতী ফোঁপায়।

‘সত্যিই না, কীসের অপমান?’

‘আমি দাঁড়িয়েছিলাম কোয়ার্টারের সামনে, সেই সকালে...।’

শ্রীপতি বুকের উপর আড়াতাড়ি দু–হাত রেখে সব শুনতে থাকে। ভারতীর কথা ধীরে ধীরে শ্রীপতিকে অবসন্ন করে দেয়। সে নীচু হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। আজ সকালে ভারতী দাঁড়িয়েছিল রাস্তার মুখে। কয়েক দিন শ্রীপতিকে দ্যাখেনি। ওর ভয় হচ্ছিল, অসুখবিসুখ হল নাকি! তখন শ্রীপতির মা আর বউ যাচ্ছিল চন্দনেশ্বরের মন্দিরে বোধ হয়। হাতে পুজো দেওয়ার ডালা। ভারতী ওদের দেখে হেসেছে, এগিয়ে গেছে। জিজ্ঞেস করেছে, ‘মা কেমন আছেন? মিতা তুমি! মন্দিরে যাচ্ছ? আমার ডিউটি না থাকলে যেতাম, মানত আছে একটা।’

তখন খেপে উঠছে শ্রীপতির বউ। হঠাৎই খেপে উঠল, ‘তুমি গেলে তো পুণ্য হবে না, পাপ হবে।’

ভারতী হাঁ করে চেয়ে ছিল শ্রীপতির মায়ের দিকে। ঠিক বুঝতে পারেনি। সে আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করেছে, ‘মা তোমার ছেলে ভালো আছে?’

'সে খবর তুমি জানো, কী গুণতুক করেছ, শিকড়বাকড় খাইয়েছ, ভালো কি থাকার জো আছে!'

ভারতী কাঁপতে কাঁপতে জিজ্ঞেস করেছে, 'একথা কেন?'

'বলব না, লোকটাকে যে খেয়ে ফেলেছিস তুই!' চট করে শ্রীপতির বউ তুইতোকারিতে নেমে গেছে।

ভারতীর মুখটা কালো হয়ে গেছে, সে সেই অবস্থায় আবার বলেছে, 'কী বলছ তুমি মধুমিতা?'

ভারতী বিড়বিড় করছে, 'তোমার বউ শেষ অবধি আমায় ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়, আমার তো কোনো দোষ নেই, ভিড় জমে গেছে তখন রাস্তায়, সব্বাই দেখল, আমি কী করেছি বলো?'

ভারতী থেকে থেকে কেঁপে উঠছে। ওর গলার স্বর বসে গেছে। ফোঁপাচ্ছে। ভেঙে ভেঙে বলছে, 'তোমার বউ বেশ্যা বলে চিতকার করতে লাগল!'

'তুমি জিজ্ঞেস করতে গেলে কেন?'

'তুমি যে আসছ না, আমার ভয়ে করছিল, ভাবলাম অসুখবিসুখ হল কি না, তুমি এর একটা বিহিত করবে না?'

শ্রীপতি নিঝুম বসে থাকে। ভারতী নিজের মনে কথা বলে, চুপ করে যায়, আবার বলে। বিনবিন করতে থাকে। এইভাবে সময় যায়। শ্রীপতি মেঝেতে হাঁটু দুমড়ে বসে আছে।

নেশাটা গাঢ় থেকে গাঢ়তর হয়ে উঠেছে। ভারতীর কথা সে ধরতেই পারছে না যেন। কত সময়, কতকাল ধরে একই কথা বলে যাচ্ছে ভারতী। শ্রীপতির এখন আর ভারতীকে ভালো লাগে না। কোকিলা বধূ রয়েছে। আর নুনমারার মেয়েটা! আহা, কী সুন্দর! কিন্তু এসব কি ভারতীকে বলতে পারবে সে? পারবে না। ভারতীর কথাই তাকে শুনে যেতে হবে।

অনেকক্ষণ বাদে ভারতীর একটা কথা কানে যায়, 'তুমি কি থাকবে?'

শ্রীপতি ঘাড় হেলায়। ভারতী ভাত বাড়ে। শ্রীপতি মুখ নীচু করে ছড়িয়ে ছিটিয়ে খায়। ভারতী বার বার জল খেয়ে উঠে পড়ে। শ্রীপতি কিছু বলতে পারে না। কী বলবে? ভারতীও আর কথা বলে না ওই বিষয়ে। শ্রীপতির চোখ ভেঙে আসছিল। সে আস্তে আস্তে ঢলে পড়ে।

ভারতী তখনও জেগে, শ্রীপতির পাশে কুঁকড়ে মুকড়ে শুয়ে বিড়বিড় করছে, '...যদি এমন হয় তো দুজনের দেখা না হওয়া বোধ হয় ভালো।'

তন্দ্রাচ্ছন্ন ভারতীর মাথাটা ঝুলে গেছে একধারে। চোখ দুটো কোটরে। মুখময় বিষাদ, অপমানের কালি। বাইরে সেই সময় দুরন্ত বৃষ্টি ছুটে এল সমুদ্র থেকে। বৃষ্টির ভিতরে ঘুমের ঘোরে ভারতী যেন কথা বলে। বৃষ্টির ফোঁটার মতো ভারতীর কথা ঝরে পড়ে।

ভারতীর কথা শ্রীপতি শোনে। শ্রীপতিকে ভারতী বোঝে না। দুজনে দুজনের কাছে এই আধো জাগরণে কখনো অস্বচ্ছ, কখনো স্বচ্ছ হয়ে থাকে। শ্রীপতির কানে ভারতীর কথাগুলি প্রবেশ করছিল ধীরে ধীরে। তারপর সেই কথা ঘুমের মধ্যে ছড়িয়ে যাচ্ছিল। কথা উঠছে যেন মাটির গভীর থেকে। ভারতীর মুখের রেখায় বহুকালের বহু বতসরের শ্রম ঘাম অসম্মান জড়িয়ে। ঘুমন্ত মানুষের ঠোঁট থেকে কী এক শব্দ যেন উঠে আসছিল।

ভারতী : আমার মা–বাবা দুজনেই তো ছিলেন। আমি তাঁদের ভালোবাসার সন্তান নই বোধ হয়। কেউ কেউ আন্দাজে বলত আমার মা সুন্দর, কেউ বলত বাবা। আমার চেহারা দেখে বাবা–মার চেহারা আবিষ্কার করার চেষ্টা করত।

শ্রীপতি : আমার ঠাকুরদার বাবা লেঠেল ছিল। লেঠেল নয় জলদস্যু। সমুদ্র নদীতে সওদাগরি নৌকো ঘিরে ফেলত। সেই লেঠেল ধরে এনেছিল এক বাগদি মেয়েকে। সব্বাই তা জানে। খুব ঠান্ডা আর সুন্দরী মেয়েটা। সে আমার ঠাকুরদার বাবার রাখনি হল। আমার এককালে যা ইচ্ছে করতাম। যা ইচ্ছে.....যা ইচ্ছে। কেউ বলে আমি খুব ভালো। খুব দয়া। কেউ বলে আমি ঠাকুরদার বাবা, তার বাবার মতো। যা ইচ্ছে তাই করব। এক মেয়েমানুষ বেশিদিন পোষায় না।

ভারতী : তেরো বছর বয়সে একবার খারাপ কথা বলেছিলাম, শিখিয়ে দিয়েছিল উঁচু ক্লাসের মেয়ে, পুরুষলোকের সঙ্গে মেয়েলোকের সম্পর্ক নিয়ে। তারপর! সুপারিনটেনডেন্ট সুলতা দত্ত তাই শুনে আমাকে সব মেয়ের সামনে জামাকাপড় খুলিয়ে চাবুক...চাবুক। আহ্–আহ্, আমাকে বেশ্যা বলেছে, আমি তো শুধু তোমার সঙ্গে থাকতে চাই।

শ্রীপতি : আমাদের বাড়িতে একটা ছেলে আসত। তার নাম কেষ্ট। পুতুল বেচত। কুমারপাড়ার মেয়ে, কেষ্টর মা চঞ্চলা খুব সুন্দরী ছিল। কেষ্টকে আমার বাবার মতো দেখতে ছিল। তাতে কী হয়েছে? চঞ্চলা বাবার মেয়েমানুষ। কোকিলা বধূকে যদি নিজের মেয়েমানুষ করতে পারতাম! তোমাকে আমার ভালো লাগে না এখন।

ভারতী : আমি শুধু তোমার সঙ্গে থাকতে চাই।

শ্রীপতি : এমনি এমনি মানুষ থাকতে পারে? পরিচয় চাই, তুমি মধুমিতা হবে কী করে?

ভারতী : মানুষের কাছে মানুষ থাকবে, আমার বড়ো ভয় করে, পিছনটা অন্ধকার। বাবা অন্ধকার, মা অন্ধকার। আমি থাকব তোমার কাছে। একা একা থাকতে পারি না। ভয় করে, ভীষণ ভয়!

শ্রীপতি : পরিচয় ছাড়া মানুষকে কেউ থাকতে দেবে না জগতে।

দুজনে খুব স্পষ্ট কথা বলছিল। দুজনে দুজনের কথা ঘুমের ঘোরে শুনতে পাচ্ছিল। শ্রীপতি কামনা করছিল কোকিলা বধূকে। ভারতী আশ্রয় চাইছিল। শ্রীপতি বলছিল, ভারতী বরং বদলি নিয়ে যাক। ভারতী তার কাছে পুরোনো হয়ে গেছে! পুরোনো মেয়েমানুষ ভালো লাগবে কী করে?

ভারতী বলে, 'তোমার পক্ষীরাজ কি অন্য মালিক পেয়েছে?'

'কেন?'

'তবে সে পালাল কেন?'

'হারিয়ে গেছে ঘোড়াটা।'

'কেন হারাল?'

'জানিনে।'

'পুরোনো মালিক ভালো লাগে না তাই পালাল?'

'না।'

'হ্যাঁ, নতুন মেয়েমানুষের মতো নতুন মালিক খুঁজে নিয়েছে?'

'না।'

'তাহলে গেল কোথায়? চোদ্দোবেড়িয়ায় যায়নি, কোথাও যায়নি তো গেল কোথায়?'

'কোকিলার কাছে।'

'কোকিলা কে?'

শ্রীপতিকে এবার বলতে হবে কোকিলার কথা। সেই মেয়েমানুষটাকে যে করে হোক সে খুঁজে আনবে। নাহলে নুনমারার মেয়ে। ভারতী সব জানুক। না জানলে বদলি নেবে কেন?

ভারতী জিজ্ঞেস করে, 'তোমার ঘোড়াটাকে দেখত যে সে কেমন?'

'কেন?'

'তোমার কি সন্দেহ হয়?'

'হয় না, ও ঘোড়া অন্ত প্রাণ, ঘোড়া পাগলা, কীসব বলে, বোঝা যায় না।'

'কন্থক বলে তোমার পক্ষীরাজকে, কন্থক! কী অদ্ভুত না!'

'ভানুই অদ্ভুত, বলে কিনা ও ছন্দকের স্বপ্ন দ্যাখে।'

'সেটা কী?'

‘স্বপ্ন দেখেছিল ঘোড়ার পিঠে রাজপুত্র যাচ্ছে, পাশে ও হাঁটছে। ওই যেন সেই ছন্দক, কথাটা আমি জানতামই না, ও বলেছে, রাজপুত্রই হল গৌতম, সংসার ত্যাগ করে ঘোড়াটাকে ছেড়ে দিলেন।’

‘কী আশ্চর্য! ও কি সত্যি বলে?’

‘না বললে আমি কি বানাচ্ছি?’

‘কী যেন বলছিলে, কোকিলা না কী?’

আর বলতে ইচ্ছে হচ্ছে না শ্রীপতির। ভানুর কথা তুলে ভারতী পরিবেশটা বদল করে দিল। ‘আচ্ছা, পরজন্ম কি সত্যি? কী মনে হয়, সত্যি?’

‘আমি তো জানি না।’ বলল ভারতী।

‘ও কি অনেক জন্ম আগে সেই সারথি ছিল, কন্থককে দেখত তো ছন্দক।’

হাসে ভারতী, ‘পাগলার কথা তুমি দেখছি বিশ্বাস করে ফেলেছ।’

শ্রীপতি মাথা ঝাঁকায়। কিছুই বুঝতে পারছে না যে কেন পালাল ঘোড়াটা।

অনন্ত আর তার বউ ছাড়ছে না ভানুকে। সাতদিন হয়ে গেল, ভানুকে চোখের আড়ালে যেতে দিচ্ছে না। সেই রাতে শেষ বাসে নামার পর অনন্ত তাকে টেনে এনেছিল অলংকারপুরে। ভানুরও মনে হয়েছিল যায়। শোকে আকুল অনন্ত আর তার বউকে একা ছেড়ে দিতে পারেনি সে অন্ধকারে।

একা ছেড়ে দিলে যে কী হত! ওরা পৌঁছোতেই পারত না বাড়িতে। সি–ডাইক থেকে গড়িয়ে পড়ে যেত নীচে। মারামারি করতে করতে মরত মেয়ে পুরুষ দুজন। সমস্ত পথ কাঁদতে কাঁদতে চলেছিল কুন্তির মা! ভেড়িবাঁধে বসে কান্নায় ভেঙে পড়েছিল সে। মাটিতে আছাড়িপিছাড়ি খাচ্ছিল অন্ধকারে। বুক চাপড়ে কাঁদছিল সরস্বতী। যত কান্না ছিল তার বুকে তা শেষ করেও কাঁদছিল সে। কান্নার নদী বয়ে যাচ্ছিল অন্ধকারে। তাকে প্রায় টেনেই বাড়ি এনেছিল অনন্ত আর ভানু। কাঁদতে কাঁদতে পাগলিনী অভিশাপ দিচ্ছিল স্বামীকে, তার স্বামীই বেচে দিয়েছে মেয়েটাকে। বাড়ি পৌঁছে অনন্ত আর উদগত কান্না রুখতে পারে না। ভানু বসে বসে স্বামী–স্ত্রীর কান্নার সাক্ষী হয়েছিল। সমস্ত রাত ঘুমোতে পারেনি সে।

সমস্ত রাত সে সরস্বতীর মুখে শুনেছিল মেয়েকে পেটে ধরার বৃত্তান্ত। মেয়েকে বড়ো করার বৃত্তান্ত। কাঁদতে কাঁদতে বিনবিনিয়ে সেই কথাই বলে যাচ্ছিল কুন্তির মা। অনন্ত কপাল ঠুকছিল মাটিতে। কী অন্ধকার না ছিল ভাদ্রের সেই রাতটিতে। আকাশে মেঘ ছিল। মেঘে ঢেকেছিল সমস্ত তারা। কোথাও কোনো আলোর বিন্দু ছিল না।

ভোর ভোর পালাতে চেয়েছিল ভানু। তাকে আটকেছিল অনন্ত। রক্তবর্ণ দু–চোখ, সমস্ত গালে নোনা দাগ, কাঁদতে কাঁদতে শরীরের সমস্ত নুন যেন খরচ করে ফেলেছিল সে একরাতে। অবসন্ন, রিক্ত নুনমারা অনন্ত সার বলেছিল, ভানু চলে গেলে সে গলায় দড়ি দেবে, সে নিজ হাতে মেয়েটাকে বিক্রি করে দিয়েছে, বউয়ের মুখের দিকে তাকাতে পারছে না।

ভানুর কী খেয়াল হয়েছিল, অনন্তকে নিয়ে গিয়েছিল কাঁথি। চেনা এক উকিলবাবু ছিল। তাকে খুলে বলেছিল সব। উকিলবাবু বলেছিল থানায় না যেতে। থানায় গেলে অনন্ত বিপদে পড়বে। অত টাকা নিয়েছে মেয়েকে কাজ করতে পাঠিয়ে, তার মানে তো মেয়েকে বেচেই দিয়েছে। ভীষণ অপরাধ। ছাড়বে না পুলিশ। টাকাটাও যাবে। তারা বিমর্ষ হয়ে ফিরে এসেছিল। দেখেছিল ঘরের দুয়ারে মাটিতে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে মেয়ের মা। কাঁদতে কাঁদতে শিশু যেমন ঘুমোয়, তেমনই। অনন্ত ধরে ফেলেছিল ভানুর হাত, ‘দাদা যেওনি, পাগলি হয়ে যাচ্ছে বউ, মু কী করি ভানুদাদা।’

সেই থেকে ভানু আছে। ভানু আছে সান্ত্বনা দিতে। কুন্তির মা ভয় পাচ্ছে কুকুরে। কুকুরে ছিঁড়ে খাবে তার মেয়েকে। অনন্ত এরই ভিতরে বাজারে গেছে, বাজার এনেছে, নিজে রান্না করেছে, খেয়েছে, খাইয়েছে বউকে। ভানু বসে বসে দেখেছে। ভানুর অজ্ঞাতবাস শুরু হয়ে গেছে।

একদিন সকাল থেকে ঘন মেঘ। বৃষ্টি শুরু হল। বাতাস। অনন্ত বলল, ‘ভানুদাদা হে, মনটা পুড়ি যায়, মেয়্যা মোর কার হাতে পড়ল।’

হাওয়া উঠছিল। আকাশ দেখে ভানু বলল, ‘বিপদ।’

অনন্ত বলে, ‘আকাশ আর কত বিপদ আনবে, মোর যা হল!’

কিন্তু বিপদ তো। বেলা একটু বাড়তেই হাওয়ার তীব্রতা বাড়তে লাগল। বৃষ্টির জোর বাড়ছে। উঠোনে কাঠকুটো ভিজছিল, সরস্বতী এই প্রথম উঠোনে নামল কাঠকুটো তুলতে। চঞ্চল হয়ে উঠল অনেকদিন বাদে। মেঘ উঠেছে, দুর্যোগ নামবে বলে চিতকার করতে লাগল। বউয়ের সঙ্গে অনন্তও হাত লাগাল কাঠকুটো তুলতে। সব ভিটের দাওয়াতেই ছিল। অনন্তই রোদে নামিয়েছিল ক–দিন, ভাদ্রের রোদে জ্বালানি শুকিয়ে জ্বলনের উপযোগী হয়ে উঠেছিল। অনন্ত কাঠ পাঁজা করে তুলতে তুলতে বলল, ‘কুন্তি থাকলে ইসব দিখতে হতনি, কুন্তিরই জুগাড় করা ইসব।’

সরস্বতী স্বামীকে ডাকে, ‘চাল ডাল নেই যে।’

‘নাই তো, কী কইরে থাকবে?’

‘লিয়ে আসো, হাঁ শুনো, যদি পারো ইলিশ আনবা।’

‘সি তো দীঘায়।’

‘যাওয়া যাবেনি? ক–দিন ধরে ভানুদাদা রইছে।’

অনন্ত বলে, ‘তা’লে যাই।’

‘তেল, নুন পর্যন্ত নাই নুনমারার ঘরে।’

‘নাই, কী করে থাকবু, খরিদ করা হলনি।’

‘লঙ্কা আনবা, প্যাঁজ, রসুন, আলুর দাম কমল?’

‘কী জানি!’

‘টঙ্কা লিয়ে যাও, লিয়ে আসো, পাকা বড়ো ইলিশ আনবা, হাঁ শুনো, পারো যদি একখানা বড়ো পেলাসটিক আনবা তো, রান্নাশালে জল পড়ে, জল খুব হবে মনে লয়।’

‘হুঁ, খড় দিব আঘুন মাসে।’

‘তখনকার কথা তখন, ইখন তো ঘর বাঁচাতি হবে, কত দাম হবে একখানা পেলাসটিকের, ও ভানুদাদা, বড়ো পেলাসটিক?’

ভানু বলল, ‘চল্লিশ, পঞ্চাশ।’

‘যা লাগে দিয়ো, কী দুয্যোগ, ই আঘুনমাসেই ঘরের টালি বদলাতি হবে।’

হুঁ–হাঁ করে যাচ্ছিল অনন্ত। ভানু আকাশ দেখছিল। দক্ষিণ–পুব থেকে উঠে আসছে ঘন মেঘ। পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ। কী সেই মেঘের রূপ! অনেককাল বাদে এমন মেঘ এল আকাশে। এবার সব অদ্ভুত! বর্ষায় বৃষ্টি হল না ভালো করে, জলের অভাবে ধান মরছে, অথচ বর্ষার আগে পর্যন্ত এক নাগাড়ে বৃষ্টি হয়ে গেছে। এই এখন জল নামল যেন ভালো করে। আকাশ ভারী হতে হতে ভেড়িবাঁধের উপর নেমে এসেছে। ভিটেয় বসেই দূর সমুদ্রের গর্জন শোনা যেতে লাগল। বর্শার ফলার মতো বৃষ্টি বিদ্ধ করতে লাগল বহুদিন ধরে শুকিয়ে থাকা মাটি। বাতাসে দূরের ঝাউবন, নারকেলসারি দুলতে লেগেছে ভীষণ। বাতাস যেন সহস্র ঘোড়ায় চাপা সহস্র সৈনিক হয়ে তছনছ করতে আসছে মাটির পৃথিবী। দিনমানে শীত করতে লাগল। সকাল থেকেই হালকা শীতের আবরণে ছেয়ে গেছে প্রকৃতি। ভেড়িবাঁধের জন্য অনন্তর ভিটের রেহাই। বাতাস আটকে যাচ্ছে। বাতাসের গর্জন তো কানে আসছে ভানুর।

ভানু বলল, ‘এই দুর্যোগে বেরিয়ো না।’

‘না বেরোলে খাব কী?’

‘এখেনে মিলবে না, অলংকারপুরে?’

‘চাল মিলবে, তেল মিলবে, কিন্তু আর সব তো মিলবেনি, পেলাসটিক তো চাই, একখানা না দু–খানা, ঘরের টালিও গেছে একটা।’ অনন্ত বলে।

‘তাহলে বাসে যাও।’

‘বাসেই তো যাব।’

ভানু বলল, ‘আমিও যাই।’

‘তুমি যাবে কেনে, আমি ইলিশ আনব।’

ভানু বলল, ‘ঘুরে আসি।’

বৃষ্টির ভিতরে দুজন বেরোয় একটি আধভাঙা ছাতা মাথায় দিয়ে। অনন্তর ভিটে থেকে বাস রাস্তা অনেকটা দূর। বাস রাস্তায় পৌঁছোতেই ভিজে যায় ওরা। দীঘায় নেমে ভানু বলে, 'আমি আর যাব না।'

'যাবানি কেনে? ইলিশটা খাবে কে?'

ভানু হাসে, 'তুমরা খাও, আমি মাইতিবাবুর নিকট যাই, দুর্যোগ বাড়ছে, সাগর কেমন ফুলছে, গতিক সুবিধের নয়, তুমি তাড়াতাড়ি ঘুরে যাও।

অনন্তকে ছেড়ে ভানু নিশ্চিন্ত হল। হাঁপিয়ে উঠেছিল। অত শোকের ভিতরে থাকা যায় না! এই ক–দিন ধরে কান্নার ভিতরে ছিল যেন সে। কী বুক ফাটানো বিলাপ! ভানু হাঁটছে হাওয়া বৃষ্টি মাথায় নিয়ে। আকাশ ডাকছে। মেঘে মেঘে লড়াই লেগেছে। আকাশ ভেঙে বাজ পড়ল কোথায়। ভানুর মাথায় মেঘ বৃষ্টির আকাশ, পৃথিবী। রাস্তা শূন্য। সে ভিজতে ভিজতে এগোয়! বাঁ–দিকে সমুদ্রের বাঁধানো পাড় ধরে এগোতে থাকে। সমুদ্র পাগল হয়ে বোল্ডারে ধাক্কা মারছিল। বাতাসে ঘূর্ণি। সেই ঘূর্ণিতে জল ফুলছে। ভানুর ভয় করতে লাগল। সমুদ্রের এই চেহারা সে তেমন দ্যাখেনি। বছর তিন আগে যখন সমুদ্র উঠে পড়েছিল উপরে, তখন ভানু, ঠিক সেই সময়ে, ছিল না এখানে। পরে এসে দেখেছিল সমুদ্র দূরে স্তব্ধ হয়ে আছে। শাসিত হয়েছে যেন বুনো ঘোড়া। শান্ত হয়ে চরছে। আর দীঘা নগর ভেঙেচুরে একাকার। সমুদ্র খেয়ে ফেলেছিল অনেকটা। ভানুর মনে হচ্ছে সেইরকম খেপেছে সমুদ্র। বুনো ঘোড়ার রোষ জেগে উঠেছে তার ভিতরে। জল পাকিয়ে পাকিয়ে, ফেনায়িত হয়ে, ঘন মেঘপুঞ্জের মতো উপরে উঠে, ভীষণ শব্দে ফেটে যাচ্ছে। মস্ত বড়ো বড়ো ঢেউ এসে ঘা মারছে বোল্ডারে বাঁধানো পাড়ে। বৃষ্টির ভিতরে চিতকার শোনা যাচ্ছে। ভয়ার্ত কণ্ঠস্বর জেগে উঠছে কোথাও। ভানু ছুটতে আরম্ভ করল। দিনের আলো এই সকালেই নিভে এসেছে। মেঘ অন্ধকার ব্যাপ্ত হয়ে যাচ্ছে ক্রমশ। আলো ক্রমশ শুষে নিচ্ছে মেঘ। মেঘ উঠেছে সমুদ্রের দিগন্ত থেকে। জল আর মেঘ একাকার হয়ে সমুদ্র এক বিপুল অন্ধকারের স্তূপ হয়ে উঠছে। ভানুর মনে হল সমুদ্রের জল মেঘে ভর দিয়ে উঠে পড়েছে আকাশে। আকাশ থেকে জলরাশি নেমে এখনই ভাসিয়ে দেবে সব।

ছুটতে ছুটতে সে পৌঁছোল সমুদ্রপাখি হোটেলে। হোটেলের সামনে কিচেনের বেঞ্চে বসে আছে ঠাকুর–ঠাকুরানি। ডিমভাজা দিয়ে চা খাচ্ছে। ভানুকে দেখেই ঠাকুর লাফ দিয়ে ওঠে, 'ছিলা কোনঠে, বাবু যে থানায় যাবে কইছিলা।'

ভানু স্নান করে এসেছে। জামা খুলে নিংড়োতে লাগল, 'চা দাও দেখি।'

ঠাকুরানি শুকনো গামছা এনে দেয়, 'কুথা থেকে আসা হচ্ছে?'

'মাইতিবাবু আছে?'

'কেনে, ঘুড়ার খবর এল?' ঠাকুরানি হাসে।

ভানু বলে, 'শুকনো কাপড় দাও।'

ঠাকুরানি ছুটে গিয়ে ঠাকুরের একটা লুঙ্গি নিয়ে আসে। ভানু কিচেনের ভিতর ঢুকে উনুনের আগুনে গা সেঁকে নেয়।

অনেকক্ষণ বাদে হোটেলের ঘরে বসে ভানু আর ঠাকুর কথা বলছিল। ঠাকুর ভালোমানুষটি হয়ে বসে আছে, বলল, সে কিছুই জানে না।

ভানু বলে, 'মদনানি সায়েবের সঙ্গে আলাপ করাল কে?'

ঠাকুর হেসে বলে, আলাপ সেই করিয়েছিল, কিন্তু তাতে কী?

সমস্ত দুপুর ধরে ভানু ঘুমোয়। আহা! কতদিন বাদে সে নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারল। এ ঘুমের ভিতরে কোনো কান্না ছিল না, শোক ছিল না। অবিশ্রান্ত বৃষ্টির শব্দ আর ঝড়ের শোঁ শোঁ তার ঘুমের ভিতরে প্রবেশ করে ঘুম গভীর করে তোলে। সেই ঘুমের ভিতরে হাজির হয় পক্ষীরাজ! এমন স্বপ্ন তো দ্যাখেনি কোনোদিন! ভানু দেখছিল বালির সমুদ্রে ছুটছে তার ঘোড়াটি। ছুটেই চলেছে সে। খুরের দাপানিতে বালি উড়ছে। উড়ছে শুধু। বালির ঝড়ে অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে সমস্ত দিক। ভানু ডাক শুনছিল। বালির অন্তস্তল থেকে যেন ডাক উঠে আসছিল! ভানু হে!

ঘুম ভাঙতে সে দেখল মাইতিবাবু ডাকছে। শশব্যস্ত হয়ে উঠে পড়ে ভানু, 'বাবু কখন এলেন?'

'তুই এলি কখন?'

'এই তো সকালা, বাবু, আছেন কেমন?'

শ্রীপতি মাইতি বলল, 'আছি তো আছি, খোঁজ পেলি?'

ভানু বাইরে গিয়ে চোখে জল দিল। বৃষ্টি একটু কমেছে কিন্তু বাতাস যেন বাড়ছে। আলো মরে এসেছে প্রায়। ভানু ঘরে এসে মেঝেতে বসে দেওয়ালে পিঠ দিয়ে বলে, 'বাবু যেদিন অশ্বটি পলায়, ওদিন বুদ্ধপূর্ণিমা ছিল মনে আছে?'

'আছে, কেন মনে থাকবে না?'

ভানু বলল পোখরানের কথা। শুনে শ্রীপতির কোনো ভাবান্তর হয় না। বলল, 'ওসব ভেবে লাভ কী, ঘোড়া কত দূর গেল?'

'বাবু, একট কথা জিজ্ঞেস করি।'

'কী কথা?' শ্রীপতি সিগারেট ধরিয়ে সুখটান দেয়।

'এই যে মরুভূমি, সেখানে অত বালি কেন?'

শ্রীপতি বলে, 'বালি না হলে মরুভূমিই তো হয় না।'

'তা জানি, কিন্তু মরুভূমি হল কী করে?'

'জানিনে তো, সাগর শুকিয়ে হয়েছে নাকি!'

ভানু বলল, 'ঠিক বলেছেন, মীরগোদার সমুদ্র, জাহাজঘাটা তো দেখেছেন, বালি আর বালি, মরুভূমি তো।'

শ্রীপতি বলল, 'না জল আছে, মরূদ্যান বুঝিস?'

'বুঝি, মরুভূমির যেখেনে জল আর গাছ থাকে।'

'ঠিক, মীরগোদার মরুভূমিতে তা আছে।'

ভানু টের পায় কী বলতে চায় শ্রীপতি মাইতি। সে প্রসঙ্গ ঘুরোতে চায়, থর মরুভূমিতে সমুদ্র ছিল কি না তা জিজ্ঞেস করে, তো শ্রীপতি বলে উঠল, 'কোকিলা বধূ, কুহকিনী।'

ভানু চুপ করে থাকে। শ্রীপতি মাইতি তার মীরগোদা যাত্রার কথা বলে। ভানুর তো সব জানা। কিন্তু জানা ছিল না শ্রীপতি সেইজন্য তার আর এক প্রেমিকা, অনুরাগিণী ভারতী চৌধুরির স্বত্ব ত্যাগ করার কথা বলবে। ভারতীর জন্য পরিবারে অশান্তি বাড়ছে, পরিবারে অশান্তি থাকলে কোনো কাজই ঠিকমতো করা যায় না। ভারতীকে সে বদলি করাবে এখান থেকে। উত্তর বাংলায় পাঠিয়ে দেবে। সাগর থেকে পাহাড়ে। সবই করবে, কিন্তু মদরঞ্জিওয়ালার বউটাকে যে মনে ধরেছে। অমন কুহকিনী, মায়াবিনী কেন মদরঞ্জিওয়ালার মায়ায় থাকবে? ভানুকে ব্যবস্থা করতে হবে।

ভানু খোলা দরজার বাইরে ঘনায়মান অন্ধকার দ্যাখে। বাতাসের উন্মত্ততা অনুভব করে। ভানুর মনে পড়ে মীরগোদা জাহাজঘাটায় বালিয়াড়ির আড়াল থেকে বেরিয়ে আসা মায়াবিনীর কথা। শ্রীপতি ঈষৎ পান করে এসেছে। শ্রীপতির চোখের মণির ঘূর্ণন দ্যাখে ভানু। সে কথা বদলায়, বলে, 'বাবু, সত্যি কি থর মরুভূমি সমুদ্র ছিল?'

'কী দরকার, জেনে কী হবে?'

'সাহারা মরুভূমি?'

'ওসবে কী দরকার?'

'কালাহারি কোথায়, আফ্রিকায়?'

'এত মরুভূমি দিয়ে কী করবি?'

'সব কি সমুদ্রের ফেলে যাওয়া বালি?'

‘হবে তা, মীরগোদাও তো তাই।’

ভানু বলল, ‘এই পৃথিবী সমুদ্রের তলায় ছিল?’

‘ছিল বোধ হয়।’

‘আপনি জানেন আপনার ঘোড়া কারে ফেলে রেখে শূন্যপৃষ্ঠ নিয়ে ফিরে এসেছিল?’

‘এক কথা কতবার বলবি?’

ভানু বলল, ‘তার সঙ্গে আর কে ছিল?’

‘ওফ্, চুপ করবি!’ বিরক্ত হয়ে ওঠে শ্রীপতি মাইতি, বলল, ‘কোকিলারে আমার চাই, তুই ঘোড়া না আনতে পারিস এইটে করবি।’

‘কী করব?’

‘কোকিলার কাছে নিয়ে যাবি আমাকে?’

ভানু বলল, ‘ঘোড়া আঁকছে সে।’

‘চাইনে, আমি মেয়েমানুষটারে চাই, হোটেলে ঘর দেব ওর জন্যে।’

ভানু বলল, ‘বাবু থামেন, আপনার নেশা হয়ে গেছে, আপনি টের পাচ্ছেন না, আপনাকে সে কুহক করেছে, তার মায়ায় ভুলেছেন।’

‘তার মানে?’

‘মানে, এরপর আপনারে বন্দি করে রেখে দেবে।’

‘কী হবে তাতে?’

‘আপনাকে গাছ করে রেখে দেবে বনে, কেউ জানতেও পারবে না, ওই কোকিলার দিদিমা ছিল ‘আরবি জাদুকরির মেয়ে, কী বুঝলেন?’

শ্রীপতি চোখ ডলে, ‘এসব সত্যি?’

‘সত্যি তো নিশ্চয়।’

শ্রীপতি বিড়বিড় করে, ‘আরবি জাদুকরি! কিন্তু মেয়েটা যে বড়ো টানছেরে ভানু, গাছ হই হব, কিন্তু আমি যে চাই তারে।’

কাল সারারাত বৃষ্টির দাপট ছিল। সমুদ্রের গর্জন ছিল, পাহাড়ের মতো ঢেউ ছিল, সেই সঙ্গে ছিল বাতাসও। সকাল হতে–না–হতেই খবরটা বিদ্যুৎ বেগে চারদিকে ছুটে যায়। রাতেই খবরটা ছিল, কিন্তু খুব গোপন, কান্না ভয় আর্তনাদের ভিতর জড়িয়ে ছিল। সারারাত বৃষ্টির ভিতরে ছায়ার মতো মানুষ সমুদ্রে ছুটে গেছে। তীরভূমি ধরে চিতকার করতে করতে দৌড়েছে। নিষ্ফল আর্তনাদে ছটফট করেছে।

এখন আলো ফোটায়, সকাল হওয়ায় খবরটা পৌঁছে যাচ্ছে সর্বত্র। পৌঁছে দিচ্ছে জেলেপাড়ার সকলে! পৌঁছে দিচ্ছে নিষ্কর্মা জেলের দল, যারা কাল সমুদ্রে যায়নি। আকাশটা এখনও থম মেরে আছে। ঘন ধোঁয়ার মতো মেঘ উড়ে আসছে সমুদ্র থেকে মাটিতে।

শ্রীপতিকে খবরটা দিয়েছে কে যেন, লঞ্চডুবি হয়েছে।

সি–ভিউ হোটেল ছাড়িয়ে ঝাউবন ধরে ব্যারিস্টার কলোনির পাশ দিয়ে শ্রীপতি তখন ছুটে গেছে। জেলেবস্তিতে পৌঁছোতে শোরগোল কানে গেল। দেখল বেঙার বউ জ্ঞান হারিয়ে পড়ে আছে মাটিতে। তাকে ঘিরে আছে কালো–কালো মানুষগুলি। জেলেবস্তির লোক এখানে ওখানে ঝাঁক বেঁধে। হাত–পা নেড়ে কথা বলছে সবাই। ভয়, উত্তেজনা দুইই মিশে আছে কথার ভিতরে।

দুটো লোক সেই ডুবন্ত লঞ্চ থেকে বেঁচে ফিরেছে উত্তাল সমুদ্রের সঙ্গে যুদ্ধ করে। বেঙাও লাফ দিয়েছিল জলে, সাঁতরাচ্ছিল। তারপর একটা মস্ত উঁচু ঢেউ ওকে আড়াল করে দেয়।

সরকারবাবু কলকাতা গেছেন। তাঁর কাছে খবর নিয়ে গেছে একজন। শুনে লোকটা বেঁচে থাকবে কি না সন্দেহ আছে। লাখ সাতেক টাকা দামের লঞ্চের ইনসিওরেন্স আছে। কিন্তু কাল তো সমুদ্রে যাওয়া বারণ ছিল। জেলেবস্তিতে কার ঘরে ট্রানজিস্টার নেই? ট্রানজিস্টার বার বার সতর্কবাণী প্রচার করেছে। বীমা কোম্পানি কি ধরবে না এসব?

একজন বলল, ‘লঞ্চ তো বেরিয়েছিল পরশু।’

‘পরশুও তো আকাশ খারাপ ছিল।’

‘তোর কী রে, তুই কি বীমা কোম্পানির দালাল?’ একটি লোক রুখে গেল আর একজনের দিকে।

যারা বেঁচে ফিরেছে তাদের কাছে পুলিশ এসেছে। দুজনে হাঁ করে বসে আছে। এখনও ভীতিটা কাটেনি।

কেউ কেউ বলছে লঞ্চের গিয়ার বক্স খারাপ হয়ে গিয়েছিল। আর সমুদ্রও ছিল বুনো ঘোড়ার মতো ক্ষিপ্ত, তেজীয়ান। বেশি দূর যেতে পারেনি।

শ্রীপতি সাহেবকে কোথাও দ্যাখে না। জিজ্ঞেসও করতে পারে না। শুধু আস্তে আস্তে বলল, ‘বেঙা কোথাও গিয়ে উঠেছে নিশ্চয়, বেলা হোক ফিরে আসবে, ডুবে যাবে কেন?’

কে একজন বলল, ‘ভোররাতে নাকি একজন উঠে এসেছিল পাড়ে, তারপর তীর ধরে পুবদিকে পালিয়ে গেছে, বেঙাই বোধ হয়, মরেনি ঠিক।

‘কিন্তু পালাবে কেন?’ জবাব দিতে পারে না কেউ।

শ্রীপতি সাহেবকে খুঁজছিল। সাহেবের খোঁজেই সে ছুটে এসেছে। কাকে জিজ্ঞেস করবে? সবাই যে খুব উত্তেজিত হয়ে গেছে। ক্ষিপ্ত হয়ে আছে। কী করবে, উত্তেজনা প্রকাশ করবে কোথায়? কিছু লোক গরগর করছে রাগে, কিন্তু সূত্র খুঁজে পাচ্ছে না, বীমা কোম্পানি নিয়ে আলোচনায় যেমন একজন আর একজনের দিকে রুখে গেল—এমনি সবাই ফোঁস ফোঁস করছে।

ভানুকে দেখতে পায় শ্রীপতি। এক জায়গায় কিছু লোক চাক বেঁধেছিল, তাদের ভিতরে ভানু বসে আছে উঁচু হয়ে। শ্রীপতিকে দেখে উঠে দাঁড়ায় ভানু, ‘বাবু কী হবে?’

'কী হবে?' শ্রীপতি অবাক।

ভানু বলল, 'বেঙার খোঁজ নেই, লঞ্চ নাকি কালাপানিতে গিয়ে পড়েছিল।'

'কে বলল?'

'জেলেরা।'

'এরা জানল কী করে?'

'শোনা যাচ্ছে বাবু।'

'কী করে শোনা যাচ্ছে?'

'জানিনে বাবু, আমিও তো শুনলুম, কথাটা এইরকম রটেছে।'

ভানুকে নিয়ে সরে আসে শ্রীপতি। চাপা গলায় জিজ্ঞেস করে, 'সায়েব কই?'

'দেখিনি তো!' চমকে ওঠে ভানু।

'সায়েবের কথা কেউ বলছে না?'

'না তো।'

নিশ্চিন্ত হয় শ্রীপতি। তার ভয় হয়েছিল রোষটা সাহেবের উপর না পড়ে। এই সময় লোক খুব খেপে থাকে। যাদের সংসারের লোক যায় তারা তো খেপেই থাকে, তাদের প্রতিবেশীরাও। কী আশ্চর্য! সাহেবের কথা সবাই ভুলে গেল, ভানু ডাকল এক বুড়ো জেলেকে, চাপা গলায় জিজ্ঞেস করে, 'সায়েব?'

শ্রীপতি বুঝতে পারে ভানু গোলমাল পাকিয়ে দিল। সাহেব! সত্যি তো সাহেব কই? কোথায় গেল লোকটা! বেঙা ডুবেছে, না বেঁচেছে তার খবরও নিল না লোকটা! গুঞ্জন উঠতে লাগল। গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়তে লাগল পুরো জেলেবস্তিতে। এক বুড়ো এসে শ্রীপতিকেই ধরল, 'সায়েব কুথায় মাইতিবাবু?'

শ্রীপতি বলল, 'তোমরা জানবে।'

'তারে তো দেখিনি।'

'সায়েবরে কালাপানিতে নিয়ে গেল নাকি?'

'না, না, সায়েব কাল সন্ধ্যেতেও ছিল।'

'ছিল তো গেল কুথায়, বেঙার ঘরে থাকে, তার বেপদে সায়েব গেল কুথায়?'

'সায়েব তাহলে কালাপানিতে গিইছে।'

'না, সায়েব যায় নাই।'

'যায় নাই তো গেল কুথায়?'

একজন আচমকা বলল, 'পালিয়েছে।'

'পালিয়েছে, পালিয়েছে! সায়েব পালিয়েছে।' কথাটা ছড়িয়ে পড়তে লাগল। জেলেবস্তির যেসব মানুষজন, মেয়ে পুরুষ কুঁকড়ে, দুমড়ে বসে ছিল, কান্নায় ঝিমঝিমে হয়ে দুলছিল, তারা সবাই চাঙ্গা হয়ে ওঠে যেন। সায়েব পালিয়েছে! কথাটা কে বলল? না, শ্রীপতি মাইতি হোটেলওয়ালা। একজন বলল, 'সায়েব বাসে উঠে দীঘা ছেড়ে চলে গেছে খুব ভোরে।' কথা গুনগুন করে আকাশে উঠতে লাগল।

'সায়েব ভোরের বাসে উঠে গেছে।'

'কলকাতার বাস?'

'না, মেদিনীপুরের বাস।'

'না, কলকাতার বাস।'

'না, বালিমুন্ডার বাস ধরবে বলে কাঁথিতে গিয়েছিল সায়েব।'

'বালিমুন্ডা কেনে যাবে?'

'পুরী যাবে সায়েব।'

'না, না সায়েব আছে, যায় নাই।'

'কে বলল?'

'এই তো সকালেও ছিল!'

'কে বলল?'

কে যেন বলল, 'সাগরের ধার ধরে হাঁটছিল।'

'কোনদিকে হাঁটছিল?'

'পুবদিকে।'

'না, না পচ্চিমে।'

'সায়েব কি তাহলে ওই দিকে পালাল?'

'কোন দিকে?'

'ওই পুবদিকে, বা পচ্চিমে?'

'দু–দিকেই গেল না কি?'

'কেউ বলছে পুবে, কেউ বলছে পচ্চিমে।'

'একা গেল?'

'না, আর একজন ছিল।'

কে ছিল আর একজন তা নিয়ে গুঞ্জন ওঠে। শ্রীপতি বসেছিল একটি দড়ির খাটিয়ায়। খাটিয়াটি একটি ঝাউগাছের গায়ে লাগানো ছিল। ঝাউপাতা কাঁপছিল আলাপে আলাপে। শ্রীপতি শুনছিল সেই আলাপ। ভানু এসে খাটিয়ার আর এক প্রান্তে বসে।

ভানু বলে, 'আর একজন ছিল নাকি মাইতিবাবু?'

'কী করে জানব?'

'বলছে বেঙা ছিল।'

'বেঙা উঠে এসেছিল জল থেকে?'

'তাই তো শুনা যাচ্ছে।'

ভানু উঠে গেছে। শ্রীপতিও। ভানু ঘুরছে লোকজনের ভিতরে, জেলেদের ভিতরে। শ্রীপতিও মিশে গেছে তাদের ভিতরে। বেঙা বেঁচে আছে এই কথাটা কানে আসতে শ্রীপতি চঞ্চল হয়ে উঠেছে। বেঙা তার নেওটা। বেঙার উপর তার মায়া আছে। বেঙা তার নেশারও সঙ্গী। বেঙাই লঞ্চ নিয়ে কালাপানি চলে গিয়েছিল। আবার বেঙাই কিনা সমুদ্র থেকে উঠে এসেছে। উঠে সায়েবকে নিয়ে উধাও। বেঁচে উধাও হবে কেন বেঙা?

'ঝড়জলে লঞ্চ নিয়ে বেরিয়েছিল কেন, তাই।'

'সে তো একা বেরোয়নি।'

'সে তো লঞ্চের ডেরাইভার না; তার ইচ্ছে–অনিচ্ছেয় ফিশিং হয়?'

'বেঙা তাহলে মরেনি?'

‘মরবে কেনে, আহা রে বেঙাটা কত ভালো! সায়েব উয়ার ঘর দখল করে নিয়েছিল, বেঙা পথে পথে, গাঙের ধারে ঘুরি বেড়াত।’

বেঙার সঙ্গে দেখা হইছিল পরশু দুফরে।

‘বেঙা কহিছিলা উ লঞ্চ কালাপানিতে নিয়ে ফেইলবে।’

‘কবে কহিছিলা?’

‘একদিন সাঁঝের সময়, মনে নাই কবে।’

‘কেনে কহিলা?’

‘সায়েব উয়ারে লিশা ধরাইছিল, শুকনা লিশা।’

‘শুকনো লিশা কে না করে!’

‘তা বটে কিন্তু বেঙার কিছু একটা হইছিলা।’

‘কী হইছিলা?’

‘জানা নাই, কিন্তু বেঙা মরে নাই, সায়েবের সঙ্গে পলাইছে।’

কোনদিকে পলাল?’

‘হয় পুব, নাহয় পচ্চিম।’

‘উত্তরও হতি পারে।’

আহা রে বেঙার বউ পরি জ্ঞানহারা হই গেছে, মুচ্ছো যাচ্ছে বেঙাটা ডুবে মরল, না মরল তো পলাল কেনে?

শ্রীপতি আর ভানু ধীরে ধীরে জেলেবস্তি থেকে ঝাউবন, ঝাউবন থেকে সমুদ্রের ধারে চলে আসে। রোদ নেই, আকাশে এখনও মেঘের আবরণ। তার নীচে শান্ত সমুদ্র। একেবারে নিশ্চল, নিঝুম, মগ্ন সমুদ্র। একে দেখে চেনাই যায় না কাল খেপা জন্তুর মতো তছনছ করেছিল চারপাশ। ভয় দেখিয়েছিল ভীষণ। এখন কী শান্ত! ধীর স্থির, শান্ত ঘোড়া দাঁড়িয়ে আছে যেন তৃণভূমিতে। ঘাড় তুলে তাকাচ্ছেও না। শান্ত সমুদ্রের দিকে চেয়ে ভানু আর শ্রীপতি দুজনেরই মনে পড়ল পক্ষীরাজের কথা। ঘোড়াটি কতদিন চলে গেছে। ভাদ্র শেষ হয়ে এল। আশ্বিন এল প্রায়। এখন দূরে চোদ্দোবেড়িয়ার চর সবুজ ঘাসে ভরতি হয়ে গেছে, কাশফুল ভরতি হয়ে গেছে জমির ধার, নদীর ধার, সে–নদী, সে–জমি যেখানেই থাকুক। চোদ্দোবেড়িয়ার চরে এইবার আসবে হিনাড়ি, চাঁদবালির ঘুড়ি। সে অপেক্ষা করবে দীঘার পক্ষীরাজের জন্য। আসবে আরও কত ঘোড়া, ঘুড়ির দল। এখন চাঁদ ছোটো হচ্ছে। এরপর সেই চাঁদ মিলিয়ে গিয়ে আবার ফুটে উঠতে থাকবে। একটু একটু করে, কলায় কলায় বড়ো হবে। সমুদ্র শান্ত হয়ে লুটিয়ে পড়বে সৈকতভূমিতে। আহা! কী সুন্দর তা! ভানু স্তব্ধ হয়ে সমুদ্রকে দেখছিল।

শ্রীপতি বলে, ‘মীরগোদা যাবি?’

‘কেন?’

‘মদরঞ্জিটা হল কি না দেখতে।’

‘হয়ে গেলে ওরা নিয়ে আসবে।’

‘কোকিলা বধূরে দেখে আসতাম!’ শ্রীপতি শ্বাস নিতে নিতে বলে।

‘বাবু, কোকিলা বধূর মায়া ত্যাগ করুন।’

‘কেন?’

ভানু বলল, ‘কেন তা জানিনে, তবে কোকিলার কথা না ভাবা ভালো।

শ্রীপতি দেখছিল পশ্চিম দিক থেকে একটি লোক ছুটতে ছুটতে সি–বিচ ধরে আসছে। ভানু ডাকল, ‘কী হল রে দুখে, হে–হই দুখে, কী হল?’

দুখে দাঁড়াল, জবাব দিল, ‘ভোলা, ভোলারে পাওয়া গেল।’

‘কোথায়?’

‘হু–ই–ই পচ্ছিমে, নোতন দীঘার বাঁক যেখেনে, বোল্ডারে বডি আটকে আছে, বডির কী অবস্থা বাবু, বডি খুবলে খেই নিইছে, আমি যাই, খপর দিই।’ লোকটা উঠে এসে ঝাউবনের ভিতরে ঢুকে গেল।

শ্রীপতি বলল, ‘মদরঞ্জিওয়ালার কাছে থাকবে কেন?’

‘কার কথা বলছেন?’

‘কোকিলা।’

ভানু বলে, ‘বাবু ভোলারে চিনতেন?’

‘বেটা ভ্যান টানত না?’

‘হ্যাঁ, সে গিয়েছিল লঞ্চে?’

‘যখন যেমন কাজ পায়, বলছি কোকিলা বশ করতে পারবিনে?’

‘ও কি বশ হবার মতন, আপনার তো একটা মেয়েমানুষ আছে একস্ট্রা।’

‘ওরে বদলি করে দেব এখেন থেকে।’

‘পারবেন?’

শ্রীপতি বলল, ‘পারব না কেন, ট্রান্সফার ডিউ হয়ে গেছে ওর, ওর নামে ফলস পিটিশন পাঠালেই হয়ে যাবে, মেয়েমানুষ, কতরকম অ্যালিগেশন আনা যায়।

ভানু চুপ করে আছে। ভানুর মাথায় ভোলা ভাসছিল। কে ভোলা ঠিক শনাক্ত করতে পারছে না ভানু। সে বলল, ‘বাবু, আপনি যান, আমি লাশটা দেখতে যাব।’

‘আমিও যাই, তোকে কিন্তু করতেই হবে ওটা।’

‘সে যদি না রাজি হয়?’

‘রাজি করাবি, লোভ দেখাবি, মদরঞ্জিওয়ালার বউ তো, কীরকম গরিব তো দেখেই এলাম, মদরঞ্জিওয়ালার কাছে কোন সুখে থাকবে?’

ভানু বলল, ‘মদরঞ্জিওয়ালা ওরে আঁকা শিখিয়েছে।’

‘আঁকা কেউ শিখাতে পারে?’

‘মদরঞ্জিওয়ালা ওর গুরু।’

‘রাখ ওসব, পারবিনে তুই কাজটা করতে?’

ভানু বলল, ‘ঠিক আছে যাব, কিন্তু কন্থক যদি না ফেরে যাই কী করে?’

‘পাগলামি করিসনে ভানুবাবু।’

‘ঘোড়াটা ফিরুক, তখন সব হবে।’

শ্রীপতি বলল, ‘ক–দিন ধরে কোকিলা আমারে স্বপ্ন দেখাচ্ছে, ঘুমোতে দিচ্ছে না, আমি শুধু তোর জন্য বসেছিলাম।’

কথা বলতে বলতে দুজনে এগিয়ে যাচ্ছিল পশ্চিমে, যেদিকে হাঙ্গরে, মাছে খুবলে খাওয়া একটি লাশ এসে আটকে আছে বোল্ডারের খাঁজে। ভানুরা ভিড় দেখতে পায়। তাদের পাশ দিয়ে দুটো লোক ছুটে যায় সামনে।

শ্রীপতি বলল, ‘আজ যাবি?’

‘আজই?’

‘হ্যাঁ, খেয়েদেয়ে রওনা হ, টাকা নিয়ে যা।’

‘আজ কেন, ছ’টা লোক নিখোঁজ হয়েছে।’

শ্রীপতি বলল, ‘বডি ফিরে আসবে, সমুদ্র নেয় না।’

‘বেঙাটার জন্য মনখারাপ হচ্ছে বাবু।’

‘সমুদ্র অনেকদিন নেয়নি, নিয়েছে।’

‘বেঙা যদি বেঁচে থাকে?’

‘কী করে বাঁচবে, হাঙ্গরে খেয়ে নেবে ওকে।’

‘না, না যেকথা বলছিল সবাই।’

‘গাঁজাড্ডুদের কথা রাখ, তুই যা কোকিলার কাছে।’

‘মনটা খারাপ, সেই ফিরলাম, সে আর আমি, ও মাইতি মশায় মনে পড়ে?’

‘ওখেনে গেলে মন ভালো হয়ে যাবে।’

ভানু বলল, ‘ও কিন্তু কুহকিনী বাবু।’

খ্যাঁ খ্যাঁ করে হাসে শ্রীপতি, ‘জব্বর মেয়েমানুষ, ওকে নিয়ে গিয়ে ভীমাপুরের চাষবাড়িতে রেখে দেব।’

‘সে জমি তো গরমেন্ট নিয়ে নেবে।’

‘গরমেন্টের আঠারো মাসে বছর, আগে তো কোকিলারে রাখি।’

‘আজ বাদ দিন বাবু, কী কাণ্ডটা হল, ভোলারে আমি চিনতে পারছি এবার, ফশসা মতো ছেলেটা তো, শুধু গান গেয়ে ভ্যান টানত।’

শ্রীপতি জবাব দেয় না। দুজনে লাশকে ঘিরে থাকা ভিড়ের গায়ে এসে দাঁড়ায়। ভানু উঁকি মারছিল। উপুড় হয়ে পড়ে আছে। মুখ দেখা যাচ্ছে না। পিঠের কতখানি মাংস খেয়ে নিয়েছে জলের জন্তুতে।

বেঙা বেঁচে আছে না মরে গেছে, সাহেব পুবে গেছে না পশ্চিমে, এইসব গুঞ্জনে গুঞ্জনে, আরও ক–জন নিরুদ্দিষ্টের শোকে শোকে দিন কাবার হয়ে যায়। দিন যত ফুরিয়ে আসে মানুষ ক্লান্ত হয় শোকে। কাঁদতে কাঁদতে মুখ থুবড়ে পড়ে। সমস্ত জেলেপাড়ার এখানে ওখানে দু–দশজন করে মানুষ চাক বেঁধে আছে। তারা নিজেদের ভিতরে নানারকম আলাপে শোক এবং উত্তেজনা জিইয়ে রাখছে। দু–দফা পুলিশ এসে ঘুরে গেছে। পুলিশকে কে না ভয় পায়! যে লোক সমুদ্রে ডুবে মাছের খাদ্য হতে হতে তীরে ফেরত এসেছে, সেই মরা ভোলা পর্যন্ত পুলিশের নামে কুঁকড়ে যায় তো জ্যান্ত মানুষ। ডাঙায় পুলিশ, আর জলে? জলে কালাপানি, সমুদ্রে কালাপানি—দুইই ভয়ংকর। পুলিশ টেনে তুলেছিল বেঙার বউকে। তাকে জেরা করে গেছে বড়োবাবু নিজে। গেল কোথায় সাদা কেষ্ট ঠাকুর? কী করে জানবে বেঙার বউ, সে তো শেষরাত থেকে মূর্ছা যাচ্ছে, যখন ক–টা লোক অন্য ট্রলারে ফিরল ঝড়জলের ভিতরে, যখন লঞ্চডুবির খবর হল।

জেলেপাড়ায় আজ অরন্ধন গেছে। সকাল থেকে কোনো ঘরে চুলো জ্বলেনি। এখন সন্ধ্যে নামছে। শোকের উপর কালো ছায়া পড়ছে। অন্ধকার আবৃত করছে শোকাকুল মানুষজনকে। ভানু দাস সমস্তদিন জেলেপাড়া, থানা, আবার জেলেপাড়া, আবার সমুদ্রতীর—এই করে বেড়িয়েছে। ভানু ভাবছিল এবার ফেরে। কিন্তু ফিরতে হবে তো হোটেলে। ফেরা মানে শ্রীপতি মাইতির মুখে আবার সেই কথা শোনা। ভানু বসেই আছে জেলেদের ভিতরে। বসে পুলিশের কথা, পুলিশের কথা থেকে কালাপানির কথা শুনছে। কালাপানিতে না পড়লে লঞ্চ ডুবতে পারে না। কালাপানি কী? কালাপানিতে জাহাজ, নৌকো, লঞ্চ একবার গিয়ে পড়লে রক্ষা নেই। জোড় ভেঙে ভেঙে মস্ত জাহাজও টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। লোহার পেরেকও আটকাতে পারবে না এক কাঠের সঙ্গে আর এক কাঠের জোড়, গলে যাবে লোহা কালপানিতে পড়লে।

জল কি সত্যিই কালো? কালো তো বটে, ঘোর কালো। আসলে হল গিয়ে কালাপানিতে মরাজাহাজি, নাবিক, মাছমারা জেলে, নৌকোর মাঝিদের প্রেত থাকে। প্রেত শরীর তো কালো অন্ধকারে গড়া। সেই অন্ধকার নিয়ে তারা নাকি জলে ভেসে থাকে, তাই জল হল কালো। এ একটা কথা বটে, কিন্তু আসল কথা হল সমুদ্রের রংই ওখানে গিয়ে বদলে গেছে। বুড়ো জেলে বলছিল কালাপানির কথা। তাকে কালাপানি চিনিয়েছিল তার বাবা সাধুরাম। সাধুরামের ছেলে কুঁড়োরাম বলে তার জলজীবনের কথা। বলছিল তার দীর্ঘ এক জলযাত্রার কথা। বাবা ছিল সঙ্গে। বাবা দেখাতে লাগল সমুদ্রের অথই নীলকে কখনো কালো মনে হয় কীভাবে। জলের রং ঘন হতে লাগল, নীল সমুদ্র ঘন হতে হতে, নীল রং গাঢ় হতে কালো হয়ে যেতে লাগল। বুড়ো বলে, সমুদ্র তো নীলই। আকাশ নীল হলে সমুদ্র নীল। আকাশটাকে সম্পূর্ণ ধরে তো সমুদ্র তার বুকে। নীল সমুদ্রের রং যদি ক্রমশ আরও নীল হয়ে যেতে থাকে তবে কিন্তু সম্ভাবনা জেগে উঠে কালো জল এগিয়ে আসছে। কালো জলের দিকে চলেছে নাবিক। তবে কিনা চোখে তো মায়া লাগে। ভুল হয়। নীলকে কখনো কখনো কালো বলে মনে হয়, আবার কালোকেও নীল। কালো যদি নীল হয়ে ডাকে, তখন কে ধরতে পারবে সর্বনাশী ডেকে নিচ্ছে তাকে। কালো জল সিসার মতো ভারী, সে জল জল নয়, অন্য কিছু। হয়তো তা ছায়াই শুধু। কালো ছায়া। সেই ছায়াই জমে আছে সেখানে। অনেক অনেক বছরের পুরোনো ছায়া তো। আবার এও তো হয়, কালো জল দেখে ভয়ে কুঁকড়ে গেছে যখন মাছমারা, তখন দেখেছে, রং বদলে যাচ্ছে। নীল হয়ে যাচ্ছে জল। নীলকে সে কালো দেখেছিল।

কুঁড়োরাম বলে, 'জল, আকাশ আর রোদ, তিনে মিলে সমস্ত দিন সমস্ত রাত সমুদ্রে খেলা চলে। জলের রং ক্ষণে ক্ষণে বদলায়। এই দেখলে নীল, পরক্ষণেই দেখলে তা ঘোলাটে হয়ে গেছে। আবার নীলটা কোথাও সবুজ ভাব নিয়ে পড়ে আছে জলের উপর। তা দেখতে চোখে ঘোর এল, দেখলে নীলের উপর বাদামি আবরণ ছেয়ে গেছে। আবার দেখলে নীলটাই নেই, জল একেবারে জলের মতো, বর্ণহীন। জল একেবারে কাচের মতো, চকচকে, সমুদ্রের অতল তল পর্যন্ত দেখা যায়। এইসব দেখতে যদি চোখে পড়ে নীল আলো উঠে আসছে অতল থেকে, তা ছড়িয়ে পড়ছে জলে, জলের ওপারে জলে, আরও দূর জলে, সমুদ্রের অন্দরে, শ্যাওলা, নুড়ি পাথর, বালি,

প্রবালের ভিতরে, অতল থেকে অতলে, তারপর সেই আলো উঠে এসে জলে ছড়িয়ে গেল, জল নীল হয়ে গেল, ঘন নীল, এত গাঢ় নীল যে কালো বলে ভুল হতে পারে, তারপর সেই নীল জল ছেড়ে উঠে গেল, চরাচর ঢাকতে লাগল, তা হতেই পারে। সব ঢেকে নিল তার রঙে। তখন কোনটা সমুদ্র, কোনটা আকাশ, কোনটা শূন্য জগত কিছুই ধরা যাবে না।'

'তুমি দেখেছ এমন?'

বুড়ো বলতে থাকে, দেখেছে, আবার দ্যাখেওনি। দেখেছে মনে হয় যেমন, তেমনই মনে হয় এসব তার দেখা নয়, তার বাবা সাধুরামের দেখা। সাধুরাম তাকে সমুদ্র চিনিয়েছিল। সাধুরাম বলেছিল, 'যখন নীল মায়া লাগবে চোখে, শরীর সিধে করে, কান খাড়া করে, পা ঘষতে হবে নৌকোর পাটাতনে। নীল ঘন হতেই কালো হয়ে যায়। কখন যে কালো হবে তা কেউ টেরই পাবে না। কালো হল মরণ। মরণকে কে চেনে? কোন রূপে কখন এসে দাঁড়াবে চোখের সামনে ধরতেই পারবে না। যখন তাকে চেনা যাবে তখন আর ফেরার উপায় নেই। সমুদ্র হল মস্ত কুহকিনী। রঙে রঙে ভোলায়। নীল মায়াই কালো জলে নিয়ে ফেলবে জাহাজ, নৌকো, লঞ্চগুলোকে।' বাবা সাধুরাম ছিল সমুদ্রের মাছের মতো। সমুদ্র চিনত খুব ভালো। জলের সব চেহারা তার জানা ছিল। নিজের নখে সে সমুদ্র দেখত। সমুদ্র দেখা মানে তো জল দেখা নয়, বাতাস দেখা, রোদ দেখা, মেঘ দেখা, অন্ধকার দেখা, আকাশের তারা দেখা—সব। বাবা সাধুরাম দিনের ঝলমলে আলোয় দাঁড়িয়ে টের পেত বিকেলবেলায় কী হতে পারে, কোনদিক থেকে মেঘ উঠতে পারে। আকাশের কোন বিন্দুতে মেঘ ওঠার চিহ্ন রয়েছে তা আকাশ পর্যবেক্ষণ করেই ধরতে পারত সাধুরাম। গায়ে কতটা ঘাম, ঘাম কতটা ঝরে যাচ্ছে নৌকোর উপর, তা দেখে সে বুঝত আকাশের ঈশেনকোণ কী বলতে চায়, বায়ুকোণ, অগ্নিকোণের ভাবটি কীরকম! বাবা সাধুরাম নাকি ছিল সমুদ্র–পাখির মতো। পাখিদের মতোই সে সব চিনত, বরং বেশি চিনত আরও।

'কিন্তু কালো জলের কী হল?'

বুড়ো জেলে বলে কালো জল না হোক, সমুদ্রকে কালো হতে দেখেছিল সে প্রথম যাত্রায়। বাবা সাধুরাম দুপুরেই বলেছিল, লক্ষণ ভালো নয়, বিকেলে সমুদ্র কালো হবে। কেন কালো হবে, না আকাশ কালো হবে। আকাশও এক সমুদ্র, বায়ু সমুদ্র, এ হল জল–সমুদ্র। দুই সমুদ্র প্রকৃতিতে আলাদা হলে কী হবে, একটি কালো হলে অন্যটি নীল থাকে না।'

'সে তো ঝড়ের কথা বলছ, ঝড়ের সময় সমুদ্র অন্ধকার হয়।'

'সেই অন্ধকারে বাতাস খুব ছোটে। তখন শক্ত করে হাল না ধরলে উপায় নেই, কালো জলে গিয়ে পড়বে নৌকো, লঞ্চ, বেঙার নৌকোর তাই হয়েছিল হয়তো।'

'ঝড়ে ডুবেছে তাহলে?'

'ঝড়ে ডোবে আবার ভেসেও ওঠে। কিন্তু নৌকো যদি কালো জলে গিয়ে পড়ে, তবে তো খণ্ড খণ্ড হয়ে গেল। আর মেঘের রং জলে গুলে গেলে তাইই হয়। বাবা সাধুরাম কত ঝড়জলে নৌকো সোজা রেখেছে। প্রথম জল–যাত্রায় জলের নীল চিনতে চিনতে কতদূর চলে গিয়েছিল তারা! নৌকোর মাথায় যে সাদা হাঁসেরা উড়তে উড়তে আসছিল, তারাও আর এল না, ভাবল বুঝি সাধুরাম অন্য দেশে যাচ্ছে। নিরুদ্দেশে যাচ্ছে। হাঁসেরা, সমুদ্র–পাখিরা নেই তাদের মাথার উপর, চারদিকটা গোল। চারদিকটা যখন একরকম, কোনো দিকে যখন কোনো ব্যত্যয় নেই, তখন সাধুরাম বলল, ''এখন কোনদিকে যাব তা ভেবে দেখতে হবে, জলের রং দেখে চিনতে হবে।'' '

'কালাপানিতে গিয়ে পড়লে?'

'না পড়লাম না, কিন্তু কালাপানি যেন দেখা গেল।'

'দেখা গেল, কোথায়?'

'কেনে উত্তর–পশ্চিমে, বাবা সাধুরাম দেখাল, হুই দ্যাখ বেটা...।'

'কী দেখলে?' না জলের রং ধূমাবতী। জল যেন মেঘ ধরে আছে। জলের রং থেকেই আকাশের রং বদলে যেত লাগল। নাকি আকাশের রং থেকে জলের তা ধরা যাচ্ছিল না। আকাশ সমুদ্র একাকার। কী আশ্চর্য! একটা জেলে–নৌকো দেখতে পেয়েছিল তারা, আকাশে উঠে গেছে। কালো জল কি তাহলে আকাশ পর্যন্ত ধেয়ে গিয়েছিল! আকাশে উঠেই নৌকোটা মিলিয়ে গেল!

কুঁড়োরাম একই কথা বলতে থাকে। একই কথা শুনতে থাকে তাকে ঘিরে থাকা লোকজন। 'কালাপানির উপরে যদি উড়ে যায় সাদা পাখি, সিগাল—সমুদ্র–পাখি, তবে তা মুহূর্তেই কালো হয়ে যায়, তার ডানার প্রতিটি পালক হয়ে যায় ধোঁয়ার মতো কালো, তারপর সে পাখি টুপ করে আকাশ থেকে খসে পড়ে। ভারী কালো জলে পড়ে হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে মরে যায়। কালাপানি টের পাওয়া যায় যদি দেখা যায় মরা সমুদ্র–পাখি ভাসতে ভাসতে আসছে, মরা হাঙর, মরা মাছ ভাসতে ভাসতে আসছে।

'তোমরা দেখেছিলে?'

কুঁড়োরাম বলে, 'দেখেছিলাম, তবে আমি একা, বাবা নেই, বিশ–পঁচিশ বছর আগে, কত পাখি, যেন পুড়ে ভস্ম হয়ে গেছে, ভাসতে ভাসতে এল নীল জলে, তা দেখে মনে পড়ে গেল বাবা সাধুরামের কথা।'

'কত বছর?' ভানু জিজ্ঞেস করে।

'হিসাব মনে নাই।'

ভানু বলল, 'সেদিন কি পূর্ণিমা ছিল?'

চমকে ওঠে বুড়ো, 'ঠিকই তো কহিছ।'

'মনে পড়ে তুমার?' ভানু নিবিড়তা আনে তার কণ্ঠস্বরে!

'হাঁ, পুন্নিমাই বটে, চান্দ উঠা দেখলাম বসে, কতখানি বড়ো, সুনার থালার মতো চান্দ, আগুনের মতো রং সে চান্দের, যতবার দেখি ততবার চোখ ফিরাতে পারি না, কেনে ইমন হয়?'

ভানু বলে, 'মায়া জাগে, দিনটা কেমন ছিল, কুয়াশা ছিল সে রাত্তিরে?'

'কুয়াশা হবে কেন, বোশেখ মাস।'

ভানুর দম আটকে আসে প্রায়, 'বোশেখি পূর্ণিমা?'

'তাই হবে হয়তো। চান্দ আকাশে উঠতে লাগল, চান্দের আলো সোনালি থেকে রূপোলি হয়ে যেতে লাগল। আহা! বোশেখ মাসের পুন্নিমের রাতে জলে, গাঙে, সাগরে যে না গিইছে সে কুথাও যায় নাই, এ জগতের কুছুই দ্যাখে নাই সে, জগৎ, সমুদ্দুর, আকাশ যে কত মধুর তা তার জানা হলনি।'

ভানু বলল, 'হাঁ ঠিকই, তবে এমনটি মাটির উপরেও হয়।'

'হয়! কীরকম হয়?'

ভানু বলল, 'মাঠের ভিতরে দাঁড়াও পুন্নিমা রাতে, নদীর ধারে দাঁড়াও।'

বুড়ো কুঁড়োরাম বলে, 'আমি অমন দেখি নাই, কিন্তু যা দেখিছি তা যে কী! কী করে বলি তুমাদের, দেখি নীল জল জোছনায় সাদা হুই গেল, চান্দ এক্কেবারে মাথায় মাথায়, জল তখন রূপোলি, আবার নীলও বলা যায়, আবার তা বলাও যায় না, জল অন্ধকার, তার শুধু শব্দ আছে, রং নাই, তার শুধু টান আছে আর কুছু নাই, জলের উপর চান্দের আলো দুলছে, খেলা করছে আলো, জলে তাকালে দেখা যাবে কত শত চান্দ ঢেউয়ের উপর দুলছে, মোর তখন মনে পড়ি গেল মঙ্গলা বউটির কথা।'

'সে কে?'

'সে ইখন নাই, তখন সে ভরা পুয়াতি, মু যদি গাঙে যেতাম, সে গাং ধারে গিয়া বসি থাকত, তাকায়ে থাকত জলের দিকে, সোয়ামি গেছে জলে, জলকে সে সন্তুষ্ট করত, জেগে জলের দেবতার নিকট মাথা ঠুকত, ইসব তো মোর জানা, প্রাণ আনচান করতি লাগল মঙ্গলা বউটির জন্য, জলের উপর জোছনা, জোছনায় মু তাহারে দেখি,

ভরা পুয়াতি মেয়্যামানুষ, কুনো সন্তানই তার বাঁচেনি, মরা সন্তান বিয়োয় বছর বছর, তার হয়ে ভগবানের নিকট পারথনা করব ভাবি, ভগবানকে বলি ইবারেরটায় পরাণ রাখো, অতবড়ো গাং, সাগর, যাহার কুনো দিকে কূল নাই, শুধু পানি আর আকাশ, আর জোছনা, জোছনা রাতে সমুদ্দুরকে ভগবান ছাড়া আর কুছুই মনে হয় না, তো সেই সময় জলে ভেসে এল পুড়া ভস্মর মতো ক–টি পাখি, পস্ট দেখলাম, সে পাখি নেশ্চয় কালাপানির উপর দিয়া উড়ার সময় জলের ভিতরে পড়ি গিইছিল।'

ভানু অবাক হয়ে শুনছে। যত শুনছে তত অবাক হচ্ছে। যে পূর্ণিমার রাতের কথা বলছে, সেই রাতটি কি চব্বিশ বছর আগের? সেই বিস্ফোরণের পর ওই সাগর শুকোনো পোখরান, খেতলাই মরুদেশে কত মানুষ রোগে পড়েছে, মরেছে একটু একটু করে মারণ বাতাসে, পাখিগুলো কি তেজস্ক্রিয় বাতাসে মরেছিল? মরুভূমির পাখিই পালাতে পালাতে ডানা ভেঙে পড়ল সাগরের উপর? তেজস্ক্রিয়তায় তার রঙিন পালক, সাদা পালক ছাই বর্ণ ধরেছিল নাকি?

শুনে বুড়ো বলল, 'মরুভূমি কী?'

'সাগর শুকায়ে যা হয়, শুধু বালি, জল নাই, গাছ নাই, বিষ্টি নাই।'

একজনের মনে পড়ল, বলল, 'যেখেনে শত্রুরে ভয় দিখাতে বোমা ফাটানো হল, সেই জায়গাই হল গে মরুভূমি।'

'সেখেনে পাখি থাকে?'

'মানুষ থাকে, পাখি থাকবে না?'

কুঁড়োরাম বলে, 'পাখিগুলান ছিল অচেনা, অমন পাখি দেখি নাই ইদিকে।'

'তাহলে মরুভূমির পাখিই হবে।'

'কেনে হবে?'

'পালায়ে আসছিল মরুভূমি থেকে।'

'কেনে পালাচ্ছিল?'

'নিশ্চয় ভয় পেয়েছিল?'

'সেদিন ছিল বুদ্ধপূর্ণিমা, বোশেখ মাসের পূর্ণিমা।'

'তো কী হল, পূর্ণিমার চাঁদের আলোয় ভয় পেয়েছিল?'

ভানু চুপ করে থাকে। ভাবে কী বলবে? চব্বিশ বছর আগে যে বোমা ফেটেছিল মরুভূমিতে তার কথা কি মনে রেখেছে কেউ? ভানু তখন বলে, 'বুদ্ধপূর্ণিমায় আমাদের মরুভূমি খুব ভয়ের, এ বছর দ্যাখো না।'

'কী দেখব?' অন্ধকার থেকে প্রশ্ন উড়ে এল।

ভানু বলল, 'মরুভূমিতে ওইদিন বাতাসে মরণ ঢুকে গেল।'

'কীসব বলছ তুমি, মরুভূমি দেখেছ কোনোদিন?'

ভানু মাথা নাড়ে, তবে বোঝাতে চেষ্টা করে, 'শুধু বালি আর পাথর, গাছপালা নাই, ধু–ধু করে আগুনে বাতাস।'

'গাছপালা নাই তো পাখি কোথায় থাকে?'

'যেখেনে গাছ আছে সেখেনে থাকে।' ভানু জবাব দেয়।

'মরুভূমির জাহাজ জানো?' কে একজন জিজ্ঞেস করল।

'জানি,' মাথা কাত করে ভানু, কুঁড়োরামকে বলে, 'মরুভূমির পাখিই তো?'

কুঁড়োরাম বলে, 'আমি তো বলেছি, না ওটা গাঙের পাখি।'

'গাঙের পাখি তবু অচেনা লাগল?'

'কত বড়ো গাং, কত সব দেশ উহার ধারে ধারে, সব কি চিনি আমি, একবার একটা মাছ ধরার লঞ্চ ধরা পড়ল, তার জেলেরা সব কীর'ম যেন, ভিন দেশের জেলে মোদের সমুদ্দুরে মাছ মারতে এয়েছিল, তো সেই জেলেদের থানায় নিল পুলিশ, তাদের কথা কিছুই ধরা যায় না, কীর'ম সব ভাষা, বলে ''শ্যামদেশ'', সে দেশ কুথায় কে জানে, এইর'ম কত দেশ আছে!'

'আচ্ছা ওটা যে জলের পাখি তা বুঝলে কী করে?'

'জলের পাখি তো চিনা যায়, হাঁসের মতো পা ছিল জোড়া জোড়া, হাঁ, আর একটা কথা ওটা ছিল চৈতি পুন্নিমা, বোশাখি পুন্নিমা লয়।'

'তাহলে তো মিটে গেল, এখন যা হচ্ছে সব ওই বোশাখি পুন্নিমার ঘাড়ে, মরুভূমির উপর চাপাচ্ছে কিছু লোক।' অন্ধকারে এক বৃদ্ধ গরগর করে ওঠে, 'তারা সব দেশদ্রোহী, মানে দেশের বিপক্ষে, অন্য দেশের চর।'

ভানু থমকে যায়। চেষ্টা করে কে কথাটা বলেছে তার মুখ দেখতে। কিন্তু সব মুখই যে একরকম। ভাবলেশহীন, চোখ ঘোলাটে। ভানু দমে না, বলে, 'তুমি বোশাখি পুন্নিমাটা চৈতি পুন্নিমা করে দিলে?'

'কহিতে ভুল হ'ই গিছিল।' বুড়ো কুঁড়োরাম বলে লজ্জিত স্বরে, তারপর অন্ধকারে যেন ঘোষণা করে, 'সে–পাখি কালো জলেই মরেছিল।'

ভানু বলে, 'যদি মরুভূমির বাতাস দূষিত বলে মরে থাকে?'

'এত দূরে আসবে কেন?'

ভানু তখন বোঝাতে থাকে। 'বাতাসে বিষ। শ্বাসপ্রশ্বাসে বিষবাতাস। সে বাতাস এমন যে মানুষের গায়ে ঘা হয়ে যায়, হাড়ে ঘুণ ধরে যায়, চোখ অন্ধ হয়ে যায়, রক্তবমি হয়, বহু দূরে, ওই পুবদিকে জাপান দেশে কী হয়েছিল জানো?'

'অত শুনব না, কোনো কথাই শুনব না, পাখিটা কালো জলে মরেছে।'

ভানু মাথা নাড়ে, 'পালিয়ে আসছিল মরুভূমি থেকে, বিষ লেগেছিল তাই উড়তে উড়তে তার চোখ অন্ধ, অন্ধ পাখির ওড়ার কোনো দিক নেই, তাই সমুদ্রে এসে পড়েছিল একা, সমুদ্র দিয়ে উড়তে উড়তে, বসার কোনো জায়গা নেই, ডানা ভেঙে পড়ল জলে, এইরকম হতে পারে।'

'তুমি থামবা।' অন্ধকারে একটা জোয়ানমতো ছেলে চিতকার করে ওঠে, 'অলক্ষুণে কথা বলছ কেনে, পাখির মরণ আমাদের পক্ষে ভালোনি।'

'তা আমি জানি।'

'পাখি মোদের মাঝসমুদ্দুর থিকে মাটি দেখায়ে নিয়ে আসে কূলপানে, সেই পাখি যদি অন্ধ হয়, তরে নৌকো কোনদিকে লিয়ে যাবে ঠিক নাই।'

ভানু বলল, 'জানি।'

'জানি তো বলছ কেন?'

'পাখিগুলো যে অন্ধ হয়ে গিছিল বাতাসের বিষে।'

বুড়ো কুঁড়োরাম বলে, 'তার কোনো প্রমাণ নেই ভানুবাবু।'

'মানুষ যদি অন্ধ হয়, পাখি হবে না?'

'তা হবে,' কে যেন বলল অন্ধকারে, 'ঝড়েই কত পাখি মরে তো বাতাস বিষিয়ে গেলে মরবে না? মরবে নিশ্চয়, অন্ধও হবে।'

বুড়ো কুঁড়োরাম বলে, 'বলছ অন্ধ ছিল পাখিরা?'

'হাঁ, অন্ধ ছিল, অন্ধ বলে জলের উপর দিয়ে উড়তে উড়তে দিক খুঁজে পেল না।' বলতে থাকে ভানু।

তখন জেলেবস্তির চার–পাঁচজন, নাকি পাঁচ, সাত, দশ–বারোজন কেঁদে ওঠে অন্ধকারে। কেউ ভাবল পাখি অন্ধ হয়ে গেছে এই খবরে কাঁদল তারা আবার কেউ ভাবল জলে ডুবে মরা কোনো দেহ সমুদ্র ফিরিয়ে দিয়েছে আধখানা খেয়ে, সেই খবর পেয়ে কাঁদল তারা। অন্ধকারে শোক বাড়তে লাগল। সেই শোক আরও বাড়ল যখন ভানুর মনে হল একটা জেলে–নৌকো একা ফিরে এসেছে ঢেউয়ে দুলতে দুলতে। কেউ নেই তার ভিতরে। শূন্য নৌকো, আরোহী যেন জল দিয়ে হেঁটে চলে গেছে দূর দক্ষিণে, যেমন গিয়েছিল কন্থকের প্রভু। যেমন ফিরেছিল কন্থক। ভানুর বুক ভার হয়ে গেল, সে আর্ত গলায় কন্থককে ডাকতে ডাকতে উঠে দাঁড়াল। বুড়ো জেলে জিজ্ঞেস করে, ‘সে আবার কে? সেও কি জলে ডুবে গেল?’

ভানু বলল, ‘হ্যাঁ, তার নৌকোটা একা ফিরছে ঢেউয়ে দুলে দুলে।’

বেঙা ফেরেনি। সশরীরে ফেরেনি, লাশ হয়েও ফেরেনি। চারদিনেও না। না মানে বেঙার বেঁচে থাকার সম্ভাবনা তৈরি হয়ে যাচ্ছে একটু একটু করে। কিন্তু এই সম্ভাবনা খুব ঝুঁকির। বেঙা যদি না ফেরে, তখন? তখন তো বেঙার মৃত্যুর একটি সম্ভাবনাও তৈরি হয়ে যায়। বেঙা মরেছে হয়তো, কিন্তু তার লাশ ফেরত দেয়নি সমুদ্র। এমন তো হতে পারে। অথচ সমুদ্র যা নেয় তা তো ফেরত দেয়ই, তাহলে বেঙাকে কেন ফেরত দেবে না? দিয়েছে হয়তো, কোনো দূর সমুদ্রতীরে। সমুদ্র তো কম বড়ো নয়। সমুদ্র যে কতবড়ো তার কোনো আন্দাজই নেই জেলেপাড়ার কোনো মানুষের। তারা সমুদ্রের গভীরে গিয়ে, গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে গিয়েও সমুদ্রের কোনো পরিমাপ করতে পারে না। সমুদ্রের অকূল বিস্তার তাদের কাছে অসীম, অনন্ত, মাথার উপরের আকাশের মতো। তার চেয়েও বেশি। এমন সমুদ্রের ভিতরে কত কত দ্বীপ, দীর্ঘ উপকূল জুড়ে কত বসতি! কোথায় গিয়ে বেঙার লাশ আটকেছে তারই–বা ঠিক কী। সুতরাং লাশ না ফেরা, লাশ না উদ্ধার মানে বেঙার মৃত্যু যে নয়, তা নয়। আবার তা যে বেঙার মৃত্যুর ইঙ্গিত, তাও তো নয়। ছ'টা নিখোঁজ মানুষের পাঁচটা লাশ পাওয়া গেলে, ষষ্ঠ দেহটি নিয়ে নানা রহস্য তৈরি হয়। সে জীবিত অথবা মৃত তা জানা যায় না। কেউ তাকে জীবিত কল্পনা করে, কেউ মৃত। আবার নিখোঁজ যদি হয়ে থাকে ধীবর, তবে তাকে নিয়ে নানা কল্পনা বাসা বাঁধে।

বেঙার বউ পরির কখনো মনে হচ্ছে লোকটা বেঁচে নেই। সমুদ্রে লঞ্চডুবির পর যে ক–জন বেঁচেছিল, দু–জন না তিনজন তারা ফিরে এসেছে। যারা ফেরেনি তারা মরেছে। মরাটাই স্বাভাবিক, তাই বেঙা মরেছেই, বাঁচেনি। কিন্তু মরলে তো বেঙার বডি পাওয়া যেত, যে বডি—লাশ দিয়ে প্রমাণ হত যে সে মরেছে এবং তার জন্য দুর্ঘটনা বিমার যাবতীয় পাওনা পরির হাতে এসে পড়ত। দুর্ঘটনা বিমা আছে, বিডিও অফিসের অনুদান আছে, সেসব পাওয়া যেত লাশ দেখিয়ে। বেঙা মরে যদি না ফেরে তবে পরির কপাল আরও ভাঙবে। সে কী দিয়ে প্রমাণ করে তার স্বামী বেঁচে নেই? সে মৃত বেঙা ধীবরের স্ত্রী, দুর্ঘটনা—লঞ্চ ডুবিতে মরেছে বেঙা, বিমার টাকাটা তার হাতে আসুক—এইসব কথা সে দরখাস্তে বর্ণনা করাবে কী করে মুহুরিকে দিয়ে, তারপর কীভাবে সেই দরখাস্তে টিপ ছাপ দেবে বাঁ–হাতের বুড়ো আঙুলে? তখন তো তাকে নিজের কাছেই জিজ্ঞেস করতে হবে বেঙা যদি ফিরে আসে নদীরামের মতো? নদীরাম ধীবর পাঁচ বছর বাদে ফিরেছিল। আশ্চর্য! নদীরামের বউ এই পাঁচ বছর প্রতিটি দিন সিঁথিতে সিঁদুর দিয়েছে, শাঁখাতে সিঁদুর ছুঁইয়েছে, বি ডি ও, পঞ্চায়েত যায়নি দুর্ঘটনা–মৃত্যু বিমার টাকার জন্য। কোনো দরখাস্ত করেনি। সে যেন খুব ভালো করেই জানত নদীরাম ফিরবে। নদীরাম যে দূর সমুদ্রের পারে চট্টগ্রামে ভাসতে ভাসতে পৌঁছে গিয়ে বাংলাদেশের জেলখানায় আটক ছিল অনেকজন এদেশি ধীবরের সঙ্গে তা যেন টের পেয়েছিল নদীরামের বউ। সে বলেছিল সে নাকি স্বপ্নের ভিতরে জেনেছিল নিখোঁজ স্বামী বেঁচে আছে। নদীরামের নিখোঁজ হয়ে পাঁচ বছর পরে ফিরে আসা এবং এই পাঁচ বছরে তার বউ, সরলার শাঁখা সিঁদুরে সধবা হয়ে থাকা—সব কেমন গল্পের মতো হয়ে গেছে জেলেপাড়ার মানুষের কাছে। সে কাহিনি কে না জানে, পরিও জানে। নদীরাম এখন বেঁচে নেই। বছর চারেক আগে বরফ কল বন্ধ হয়ে গেল দু–দিন বিদ্যুৎ না থাকায়, সেই গাঙে ইলিশ পড়ল প্রচুর। সেই ইলিশ বরফ না পেয়ে চকচকে রূপালি বরন থেকে লালচে হয়ে শেষে পচতে আরম্ভ করল। পচন ধরা ইলিশ ঝাউবনে পুতে ফেলা হয়েছিল অনেক। আর সেই পচন থেকে জেলেপাড়ায় আন্ত্রিক রোগ ঢোকে গাধার পিঠে চেপে, রক্তমাখা ঠোঁট নিয়ে। মা শীতলা কত বাঁচাবে? নদীরাম আর তার বউ পর পর মরেছিল। নদীরামের ছেলে চাঁদভূষণ বেঁচে গিয়েছিল মরতে মরতে। এখন নদীরাম, সরলা বেঁচে থাকলে পরি আবার তাদের কথা শুনতে পেত। তারা বলতই বেঙা বেঁচে আছে। তারা, নদীরাম, সরলা বললে পরির বিশ্বাস হত। সে সরলার মতো স্বপ্ন দেখত বেঙাকে নিয়ে।

নদীরামের বউ নাকি পাহাড় ঘেরা সমুদ্রকে স্বপ্নে দেখেছিল। নদীরামের বউ স্বপ্নের ভিতরে তার স্বামীকে কখনো পাহাড়–সমুদ্রের গায়ে দেখত, সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাসের সঙ্গে লড়তে দেখত, কখনো দেখত জেলখানায়। জেনেছিল, সব দেখেছিল নাকি সে, দেখেছিল বলেই বুক চেপে বসেছিল স্বামীর জন্য। যতদিন নদীরাম না ফিরছে, সে

বলেওনি কাউকে স্বপ্নের কথা। এমনকি তার ছেলে চাঁদভূষণও জানত না। চাঁদভূষণ অবশ্য তখন ছোটো ছিল, বছর পাঁচেক। সে জানত তার বাবা সমুদ্রেই গেছে, ফিরবে মস্ত এক মাছ ধরে সেই মাছের পিঠে চেপে। বেঙার বউয়ের এইসব কথা জানা। সে স্বপ্নে দেখতে চাইছে বেঙাকে। বেঙা স্বপ্নের ভিতরে আসছে না। আসছে নানা অদ্ভুত দৃশ্য, যার সঙ্গে বেঙার অজ্ঞাতবাসের কোনো সম্পর্ক আছে বলে জানে না পরি।

পরি সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত অপেক্ষা করছে খবরের জন্য। জেলেপাড়ার কেউ এসে খবর দেবে যে বেঙার বডি পাওয়া গেছে। শেষরাতের জোয়ারে বডি ফিরে এসেছে। জল সরে যাওয়ার পর বোল্ডারে আটকে রয়েছে আগের পাঁচজনের মতো। সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত অপেক্ষা করে পরি অন্ধকারে নিজে বেরোচ্ছে ঘর থেকে। তার হাতে একটা ছয় সেলের টর্চ। টর্চটি সাহেবকে দিয়ে কেনানো হয়েছিল। বিকেলের জোয়ার কেটে যাবে সন্ধ্যের পর, তখন যদি লাশ এসে যায়? সেই লাশকে খুঁজে না বের করতে পারলে পরের জোয়ার তাকে আবার ভাসিয়ে নিয়ে যাবে অন্ধকারে। একবার এসে ফিরে গেলে বেঙার বডি আর ফিরবে না। আর না ফেরা মানে বেঙার মৃত্যু অপ্রমাণিত থাকা। বেঙার মৃত্যু অপ্রমাণিত থাকা মানে পরির কপাল সত্যি অর্থে ভাঙা। কোনো টাকাই মিলবে না। নিরুদ্দিষ্ট মানুষকে কে ঘোষণা করবে মৃত? উদাহরণ তো সামনে রয়েছেই, নদীরাম পাঁচ বছর বাদে ফিরেছিল।

বেঙার জন্য পরি বসে আছে সমুদ্রসৈকতের গায়ে, ঝাউবনের সীমানায়। জোয়ার সরছে। আর একটু বাদে সে নেমে যাবে অন্ধকার সৈকতে। খুঁজতে থাকবে বেঙাকে। বেঙার লাশ না ফিরলে বৈধব্য নেওয়ার কোনো উপায় নেই পরির। বৈধব্য নিয়ে মলিন মুখে বিডিও পঞ্চায়েতে দাঁড়ালেই নানারকম টাকা জুটবে। এখন অনিশ্চিত অবস্থায় কোনো কিছুই করার উপায় নেই পরির। রোখ ছেড়ে কাঁদতেও পারছে না। বেঙা যদি বেঁচে থাকে, তবে সেই কান্না তার অমঙ্গল করবে, অথচ বুক ফাটিয়ে যদি না কাঁদে সে তবে কীভাবে প্রমাণ হবে সে স্বামীহারা হয়েছে। বেঙার বডি যদি ফেরে, সে কাঁদতে কাঁদতে মাথা ফাটিয়ে ফেলবে। বেঙার লাশ ফিরলে সে এই সমুদ্রসৈকতে অনেক লোকের সমুখে শাঁখা ভাঙত, বালিতে ঘষে ঘষে পায়ের আলতা তুলত, কপালে বালি ঘষে ঘষে সিঁদুর তুলে কপাল রক্তাক্ত করে ফেলত। বেঙা হয় ফিরুক সশরীরে, নতুবা তার লাশ ফিরুক। নিরুদ্দিষ্ট জেলের বউ হয়ে থাকতে পারবে না পরি। পেটে খাবে কী? একটা সাহেব জুটেছিল বলে আর একটা জুটবে এমন কোনো কথা নেই। আর একটা জুটলেও তাকে নিয়ে থাকতে পারবে না পরি। কাউকে নিয়েই থাকতে পারবে না সে। সেটা অন্যায্য হবে। জেলেপাড়ার লোক তাকে পাড়াছাড়া করবে। কিছু না থাক বেঙার ভিটেখানি তো আছে। আর সম্ভাবনা আছে অনেক টাকা পাওয়ার। সেই টাকা পেতে হলে পঞ্চায়েত দিয়ে প্রমাণ করাতে হবে, ঘোষণা করতে হবে বেঙা মরে গেছে, বেঙা বেঁচে নেই। পরি অন্য কারোর রাখনি হয়ে গেলে ওই টাকা পাওয়ার সম্ভাবনাই থাকবে না। বেঙা থাকতে সাহেব ছিল, কেন ছিল? না তাকে রেখেছিল বেঙা, তাই ছিল। বেঙা না থাকলে পরির সঙ্গে কেউ থাকতে পারবে না। সাহেব যদি ফিরে আসে জেলেপাড়ার লোক তাকে মেরে তাড়াবে। পরির দু–চোখ দিয়ে হু–হু করে জল নেমে এল। বেঙা তাকে কম ভালোবাসত না। বেঙা তাকে কম বিশ্বাস করত না, মরে গেলেও বেঙার অনুপস্থিতিতে পরি আর কারোর দিকে মুখ তুলে চাইতে পারবে না। সে তাহলে মহাপাতকী হবে, নরকেও তার স্থান হবে না।

বেঙার না ফেরা মানে নিরুদ্দিষ্ট হয়ে থাকার সম্ভাবনা যেমন তৈরি হচ্ছে, তেমনি বেঙার মৃত্যু সম্ভাবনাও ক্রমশ বাড়ছে। বেঙার না ফেরা মানে সে নদীরামের মতো অন্য কোনো দেশে চলে গেছে যে এমন কোনো কথা নেই। জেলেপাড়ার মধ্যে একমাত্র নদীরামই ভাসতে ভাসতে গিয়ে উঠেছিল বাংলাদেশি ট্রলারে। তারা তাকে নিয়ে গিয়েছিল চট্টগ্রামে। সে কোনদিকে, কত দূরে তা জানে না পরি। নদীরামের ভাগ্য যে বেঙার হবে সে–কথা কে বলবে জোর দিয়ে? বেঙার লাশ এখানে ফেরেনি, অন্য কোথাও, সমুদ্রের অচেনা কোনো তীরে তো ফিরতে পারে। ওড়িশার উপকূলে ফিরতে পারে। তালসারি, চাঁদবালি, চাঁদিপুরের দিকে ফিরতে পারে, জুনপুট, খেজুরির দিকে ফিরতে পারে। আবার না ফিরতেও পারে। সমুদ্রের মাছেরা, হাঙরেরা হয়তো সবটাই খেয়ে নিয়েছে তার। ভাবতেই পরির বুক ভেঙে কান্না বেরিয়ে আসতে চাইছে। রোখ ছেড়ে, চিতকার করে কেঁদে উঠতে ইচ্ছে হচ্ছে। কিন্তু তাতে যদি জীবিত বেঙা ধীবরের অমঙ্গল হয়? মৃত স্বামীর জন্য শোক যদি জীবিত স্বামীর ক্ষতি করে? বেঙা

একসঙ্গে জীবিত ও মৃত হয়ে আছে। যে লোকের মৃত্যুর জন্য শোক করবে তার বউ, সেই লোক জীবিতও তো রয়েছে। পরির মাথাখারাপ হয়ে যাচ্ছে ভাবতে ভাবতে।

এমন হতে পারে বেঙার লাশ ওড়িশার কোনো জায়গায় গিয়ে আটকেছে। সেখানকার লোক পচা লাশের গন্ধ সহ্য না করতে পেরে আবার জলে ঠেলে দিতে পারে। আবার পুলিশকে খবরও দিতে পারে। পুলিশ বেওয়ারিশ লাশের দায়িত্ব নিতে চায় না। এখানেও তো দেখেছে পরি তা। লাশ তুললে পুলিশের আঠারো সমস্যা। পুলিশই তখন জোয়ারের অপেক্ষায় থাকে। লাশ পাহারা দেয় কুকুরের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য। মাছ খেয়ে খেয়ে এ জায়গার কুকুরগুলো রীতিমতো মাংসাশী, আমিষ লোভী। জোয়ারে লাশ ঠেলে দেওয়ার পর পুলিশ নিশ্চিন্ত হয়ে ফিরে যায়। বেঙার ভাগ্য এমন হতে পারে। ঘাটে ঘাটে তার লাশ হয়তো ঘুরছে।

আর বেঁচে থেকে নদীরামের মতো অন্যদেশে না গিয়েও বেঙা না ফিরতে পারে হয়তো। নদীরাম ফিরেছিল। নদীরামের বউ ছিল, ছেলে চাঁদভূষণ ছিল, ভিটে ছাড়াও বিঘেটাক জমি ছিল, সেই জমিতে তরমুজ হত। জমি, ভিটে, সংসারের টানে পাঁচ বছর বাদেও ছাড়া পেয়ে ফিরেছিল নদীরাম, কিন্তু বেঙা কীসের মায়ায় ফিরবে? বেঙা তো জানে ঘরে সাহেব আছে। সাহেব তার বউয়ের সঙ্গে লীলা করে, যেমন লীলা ছিল কৃষ্ণ–রাধিকায়। ভগবান আর মানুষের লীলা কি এক হতে পারে? বেঙা তার মনকে প্রবোধ দিত, কিন্তু ভিতরে ভিতরে কষ্ট পায়নি কে বলবে? বেঙা যে কোনো গোপন মুহূর্তে তাদের দেখে ফেলেনি তাই–বা কে জানে? সাহেব টাকা দিয়ে বশ করেছিল তাদের। অভাবী সংসারে কুগ্রহের মতো এসে ঢুকেছিল। সাহেব নিজেই গেছে না বেঁচেছে পরি। এখন বেঙা ফিরলে তারা মন দিয়ে সংসার করবে। পেটে না খেয়েও সংসার করবে। আর বেঙা যদি না ফেরে, তার লাশ ফিরলে যে টাকা পাবে পরি তা নিয়ে পুরী চলে যাবে। জগন্নাথদেবের মন্দিরে পড়ে থাকবে সমস্ত জীবন।

বেঙা না ফিরলে বেঙার মৃত্যু একশো ভাগ সত্যি হবে না। তার বেঁচে থাকাও একশোভাগ নিশ্চিত হবে না। বেঙা যদি বেঁচে থাকে, বেঁচে থেকে ভাসতে ভাসতে চাটগাঁ না গিয়ে সাহেবের দেশেও তো চলে যেতে পারে। সব সমুদ্রের সঙ্গে সব সমুদ্রের তো যোগ আছে। বেঙা তো বলত পরের জন্মে সাহেব হবে। ধলা রং হবে গায়ের, সোনালি চুল হবে তার, চোখের মণি নীল হবে, আর সেই সঙ্গে অনেক টাকা হবে। ইচ্ছে হলেই সে হরেকৃষ্ণ হরেরাম গেয়ে নাচবে, না ইচ্ছে হলে মেয়েমানুষ নিয়ে শুয়ে থাকবে। বেঙা নেশার ঘোরে এইসব বলত। তারও একটা রাধিকা হবে। 'রাধিকা'! হায়! 'রাধিকা' এখন সমুদ্রের ধারে বসে কাঁদছে নিঃশব্দে। ক–দিন ধরে নিঃশব্দেই কাঁদছে পরি। এমন ভাবে কাঁদছে যে কেউ টেরই পাচ্ছে না কাঁদছে সে। লঞ্চডুবির পরদিন সকালে যত বউ মেয়ে ছিল তাকে ঘিরে, তারা এখন কেউ নেই। তার শোকের অংশীদারি কতদিন নেবে প্রতিবেশীরা? তাও যদি নিরুদ্দিষ্টের জন্য সে গলা তুলে কাঁদত তার মঙ্গলামঙ্গলের কথা না ভেবে, তখন প্রতিবেশীরা তার পাশে এসে কান্না থামাতে চাইত। কান্না থামাতে এসে তার সহমর্মী হয়ে তারাও চোখ মুছত। জেলেপাড়ার মেয়েমানুষ, যাদের স্বামীরা লঞ্চডুবিতে নিখোঁজ হয়, মরে যায়, তারা কান্না চাপে না। নদীরামের বউ চুপ করেছিল। আর এই পরি। নদীরামের বউ তো গোপনে স্বপ্ন দেখে সব সত্য জেনে গিয়েছিল, পরি কি তা জেনেছে? যদি জেনে থাকে তবে সে সমুদ্রের ধারে গিয়ে বসে আছে কেন? সে কেন অন্ধকারে টর্চ হাতে সমুদ্রসৈকত ধরে হাঁটে বেঙার লাশ ফিরে পাওয়ার জন্য? নদীরামের বউ কী করত তা কারোর মনে নেই। তবে কিনা সেও তো কাঁদত, কাঁদত না কি? হ্যাঁ কাঁদত। পরে বলেছিল উদ্বেগে কাঁদত। জেলখানা থেকে কবে বেরোতে পারবে তার স্বামী সেই দূর দেশে, তা ভেবে কাঁদত। পরি তেমন কান্না কাঁদছে না। এভাবে কাঁদে না। যার স্বামী হারিয়েছে সে বুক চাপড়ে কাঁদুক। জেলেপাড়ার পথচলতি লোক, ঘরে বসা লোক যে যার জায়গা থেকে সেই কান্না শুনুক। ঠিক দুপুরে চিলের মতো কেঁদে কেঁদে নিঃস্ব হোক বেঙার বউ। লোকে তাদের কথা থামিয়ে শুনুক তার কান্না, বিলাপ। সেই বিলাপে পরি নিজের পাপগুলি জনসমক্ষে প্রকাশ করে দিক। তার আর সাহেবের পাপে যে বেঙা হারিয়ে গেল সমুদ্রের ভিতরে তা বলুক। জেলেপাড়ার লোকের যদি মাঝরাতে স্বামী হারানো বউয়ের বিলাপ শুনে ঘুম না ভাঙে তাহলে পরির শোকের মাত্রা টের পাবে কী করে তারা? পরির কান্নার সঙ্গে মধ্যরাতের সমুদ্রের কান্না মিশে গেলে না শোক ছড়িয়ে যাবে ঝাউবনে, বাতাসে, বালিতে।

পরি এখন অন্ধকার সৈকত ধরে টর্চ জ্বালাতে জ্বালাতে চলেছে পুবদিকে। টর্চের আলো বোল্ডারের খাঁজগুলি ছুঁয়ে যাচ্ছে। চাপা গলায় ডাকছে পরি, 'এলে নাকি, ওগো তুমি এলে, আস যদি কহি দাও।'

পরি ভাবছে মৃতদেহটি তাকে ডাকবে। না ডাকলে অন্ধকারে সে না খুঁজেও পেতে পারে। পরি জানে আজকালের ভিতরে দেহটি ফিরে না এলে আর আসবে না। এখনই আসার সম্ভাবনা কমে গেছে অনেক। চারদিন ধরে মাছেরা কি খেয়ে ফেলেনি বেঙা ধীরবের দেহখানি? হাঙরে যদি টের পায়, কত সময় লাগবে খেয়ে ফেলতে? পরি কাঁদতে লাগল। পরি কাঁদতে কাঁদতে হাঁটতে লাগল, যদি বেঙার দেহ হাঙরেরা সব খেয়ে নেয়, স্বামীহারা হয়েও স্বামীর অপেক্ষায় বসে থাকতে হবে তাকে। বিধবা হয়ে সধবার মতো পথের দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে। যদি লোকটা নদীরামের মতো ফেরে? সমুদ্রে গেল, কিন্তু পথে পথে ফিরল। যে লোক সমুদ্রে নিখোঁজ হয়, সে আবার সমুদ্র পথেই ফেরে না। ক–বছর আগে লঞ্চডুবির জেলেরা উঠেছিল সাগরদ্বীপে। তারপর ফিরেছিল পথে পথে। বেঙা সেভাবে ফিরতে পারে ভেবে অভুক্ত থাকতে হবে পরিকে। কিন্তু বেঙা ফিরছে না। দু–বছর, পাঁচ বছর কেন, দশ বছর বারো বছরেও ফিরবে না। বারো বছর কাটালে তবে না প্রমাণ হবে বেঙা মরেছে। তার শ্রাদ্ধ হবে তখন, পরি বিধবা হবে তখন। কিন্তু বেঙার পাওনাগণ্ডা তখন আর মিলবে না। কে হিসেব করে দেখবে তখন? লোকে তো ভুলেই যাবে লঞ্চডুবির কথা। বেঙা ধীবরের কথা। এই বারো বছরে আরও কত লঞ্চডুবি হবে, কতজন নিরুদ্দেশ যাবে তার ঠিক নেই। সেই হিসেবে বেঙার হিসেব মিশে যাবে। পার্টি, পঞ্চায়েত কিছুতেই বেঙাকে মৃত ঘোষণা করবে না তার লাশ না পেলে। তাদের সামনে নদীরাম ধীবর যে রয়েছে। না থেকেও রয়েছে। সে যদি পাঁচ বছর বাদে ফিরতে পারে, বেঙাও পারবে। হায়! পরি কাঁদতে কাঁদতে অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছে। তার আঁচল লুটোচ্ছে ভিজে বালিতে, খোলা চুল অন্ধকারে উড়ছে নরম হয়ে আসা সমুদ্র–বাতাসে। বাতাস এখন একটু একটু একটু করে ফিরে যেতে আরম্ভ করেছে। দখিন থেকে যে বাতাসের স্রোত আসে তা প্রায় মিলিয়ে যাওয়ার মুখে! পরি পুবদিকে মোহনার পথে হাঁটছে। ওদিকে রামনগরের খাল এসে সমুদ্রে পড়েছে। ওই খাল দিয়েও বেঙার লাশ উত্তর দিকে চলে যেতে পারে জোয়ারের সময়, তারপর চড়ায় পড়ে থাকবে কোনো এক নির্জন জায়গায়। আকাশের শকুন ছাড়া কারও নজরে পড়বে না। এরকম তো হয়েছিল। পরিরা দেখতে গিয়েছিল সেই অজ্ঞাতপরিচয় মৃতের দেহ। তারপর তা আবার খালের জলেই ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তেমন যদি হয়ে থাকে? পরিকে এখন খালপাড় ধরে টর্চ জ্বেলে উত্তরে রামনগরের পথে হাঁটতে হবে। কিন্তু সে তো হবে এক অনির্দিষ্ট যাত্রা। সমুদ্রের বিপরিতে, স্থলভূমির দিকে।

ভানুদাস এসেছিল খোঁজ নিতে। খোঁজ নিতে আসার সময় সে দেখেছিল অন্ধকারে টর্চ জ্বালিয়ে হেঁটে যাচ্ছে কেউ। সে যে বেঙার বউ তা জেলেপাড়ায় এসে শুনল ভানু। বেঙার লাশ খুঁজছে মেয়েমানুষটা। যদি মরে গিয়ে থাকে তো খুঁজতে হবেই। কিন্তু না মরে থাকলে? পরি কি ভালোভাবে জানে যে বেঙা মরেছে। বেঙা যদি না মরে থাকে তাহলে ও তো মরবে এবার পরির খোঁজাখুঁজিতে।

বুড়ো কুঁড়োরাম অন্ধকারে পাঁচজনকে নিয়ে বসেছিল, ভানুকে সে বলল, 'কালো জল অনেক সময় খেয়ে নেয়, খেয়েই নিয়েছে বেঙারে।'

ভানু বলল, 'সেই মরুভূমির পাখির কিছু হল?'

'ওটা পাহাড়ের পাখিও হতে পারে।' বুড়ো বলল।

'কেন?'

'আমি পাহাড় দেখি নাই, মরুভূমিও না, পাখিটা অচেনা ছিল বটে।'

ভানু বলল, 'এখনও সেই কথা হচ্ছে?'

'হবে তো, বেঙারে সমুদ্দুরে নিল, ও ছিল চাষা, হল ধীবর।' বিড়বিড় করে কুঁড়োরাম, 'শুনো ভানুবাবু, তুমার কথাটা কি ঠিক?'

'কী কথা?'

‘মরুভূমির নীচে বোশাখি পুন্নিমায় বোমা ফাটল, তারপর ঘুড়াটা পলাল?’

‘হ্যাঁ, তা তো সত্যি।’

‘বেঙাও কি তাই পলাল?’

ভানু বলল, ‘কী জানি, আচমকা ঝড়বিষ্টি তো হয়েই যাচ্ছে, একটা লোক এসেছিল, দাঁতনে ঘর, এক দুপুরে ঝড় এসে সব উড়ায়ে নিয়ে গেল, আগুনের গোলার মতো ঝড়।’

‘হাঁ, শুনিছিলাম বটে সি কথা।’

ভানু বলল, ‘সুবর্ণরেখা নদী পর্যন্ত আকাশে উঠে গিয়েছিল।’

‘কী সব্বোনাশ!’

‘বেঙা যদি না ফেরে!’ ভানু বিড়বিড় করতে থাকে। আর তখন অন্ধকারে একজন গর্জন করে ওঠে, ‘তুমি কী বলতে এলে কহ দেখি ভানুবাবু?’

ভানু বলে, ‘পৃথিবীর কোথায় যে কী করছে মানুষ, কিছুই ধরা যাচ্ছে না, কীর’ম রোদ হচ্ছে বলো, কী তাপ, এসবের সঙ্গে বেঙার মরণের যোগ থাকতে পারে, নাও পারে, তবে কিনা মরণটা বড়ো বেদনার, তাকে আমরা চিনতাম কিনা।’

‘হাঁ, হাঁ!’ অন্ধকারে বেদনা ঝরে পড়তে থাকে।

এবার আশ্বিনের আরম্ভে পুজো। পুজোর মুখে আকাশ আবার গম্ভীর। যে আকাশে পুজোর কথাটি মনে পড়ে সেই আকাশই ছিল না। তবু তো পুজো। ঢাক বাজল। ঢাকের শব্দ উড়ে এল শূন্য প্রান্তর বেয়ে, উড়ে গেল লায়কানখাস পার হয়ে দূরে, শূন্য পৃথিবীর দিকে। উঠোনে দাঁড়িয়ে ঢাকের শব্দ শুনে মেয়েটির কথা মনে পড়ল সরস্বতীর। অনন্ত তার জন্য রঙিন শাড়ি এনেছিল। সেই শাড়ি বুকে চেপে সে কাঁদল খানিক। কত আর কাঁদবে? কেঁদেই চলেছে সে। অনন্ত বোঝাচ্ছে মেয়েটা সুখেই আছে। থানাপুলিশ করা যায়, কিন্তু তাতে মেয়ের কি ভালো হবে? হয়তো কুকুর দিয়ে...। শেষের কথাটা অনন্ত বলতে পারে না, কিন্তু মনে তো ঘোরেফেরে! সে না বললেও বোঝে না কি সরস্বতী? বোঝে।

পুজোর পর আকাশের আসল রূপটি ফুটল। ঘন নীল আস্তরণ, তার ভিতরে সাদা মেঘের ঢেউ। ঢেউ চলেছে সমুদ্রের দিকে। ওই আকাশে তাকিয়ে আবার মেয়েটির কথা মনে পড়ল। কাঁদল সরস্বতী। চোখে আঁচল চাপা দিয়ে বসে রইল উঠোনে। কিন্তু পারল না বেশি সময়। রোদের কী তেজ! আগুন নামছে যেন আকাশের থেকে। খাঁটি মেঘলাভাঙা ভাদ্র মাসের রোদের মতো। সরস্বতী ঘরে ঢুকে মস্ত একটা পলিথিন টেনে বের করে। নুনের জিনিস। এতে লায়কানখাসে মারা নুন শুকোয়। পলিথিনটা উঠোনে বিছিয়ে দিয়ে ঘরের ভিতর থেকে লেপ কাঁথা বের করতে লাগল কুন্তির মা। তিনটে কাঁথা, একটিতে লাল পাড়ের সুতোয় নকশা করা। একটি তোষকও বের করে, একটি কম্বল। অনন্ত কম্বলটি পেয়েছিল রামনগরে। কোনো বড়োলোক তার নাতি হতে দান করেছিল অনেক। তোষক, কম্বল, কাঁথা ডাঁই করে পলিথিনে ফেলল সরস্বতী। উবু হয়ে বসল আবার রোদের ভিতরে। নাক টানতে লাগল। সবগুলিতে মেয়ের গন্ধ রয়েছে।

লাল সুতোর নকশি কাঁথাটি টেনে বুকে চেপে ধরে সরস্বতী। ঠিক যেন শিশু কুন্তিকে বুকে ধরেছে সে। কাঁথার প্রতিটি সুতোয় কুন্তির গন্ধ, তার চুলের গন্ধ, মুখের গন্ধ, গায়ের গন্ধ। কাঁথা ফেলে চোখে আঁচল চাপা দিয়ে আবার কাঁদল সে। কাঁদতে কাঁদতে টের পেল রোদ সহ্য করা যাচ্ছে না। উঠে গিয়ে বসে থাকল দাওয়ার ছায়ায়। কয়েক হাত দূরে রোদে গরম হতে লাগল কাঁথা, কম্বল, তোষক। নিঝুম হয়ে বসে বসে ঝিমোতে লাগল সরস্বতী। ঘুমিয়েই পড়ল। ঘুমিয়ে দেখল কুন্তি এসে দাঁড়িয়েছে উঠোনে, গায়ে নকশি কাঁথাটি। কাঁথার ফুলগুলো কী সুন্দর লাগছে! নীল সাগরের জলে ভেসে আছে তার মেয়েটা। তা হলেও জায়গাটা উঠোন নয়, সাগর। সে কোথায় আছে, নৌকোয় না লঞ্চে? কুন্তি হাসছিল। কুন্তির দিকে চেয়ে সে কাঁদছিল। কিন্তু কাঁদতে পারল না বেশি সময়। মেয়েটা হেসেই যাচ্ছে। কী সুন্দর হাসি। ঠোঁটের দু–কোণ থেকে হাসির বিন্দু সাদা মেঘ হয়ে সাগরের উপর ছড়িয়ে পড়ছে। হাসতে আরম্ভ করল সরস্বতীও। মা–মেয়ে পরস্পরের দিকে চেয়ে হাসছে। হেসে যাচ্ছে। তন্দ্রার ঘোরে হাসছিল অনন্তর বউ। অনন্ত বাড়ি ফিরল, ডাকল বউকে, 'কী হল তোর, এই সরস্বতী?'

চোখ খুলল সরস্বতী, দেখল লাল নকশি কাঁথাটি তার দিকে তাকিয়ে। ওটি গায়ে দিয়ে শুইয়ে ছিল যেন কেউ, ফেলে রেখে উঠে গেছে এখনই।

অনন্ত বলল, 'কালীপুজোর আগের দিন দোকান বসাবে।'

সরস্বতী এদিক ওদিক তাকাতে থাকে বিভ্রান্ত হয়ে। দাওয়ার একধারে মাটির কলসি গোটাকয়, ঝাঁটা, আরও দুটো পলিথিন। এসব নুনের কাজের। রোদ যা হয়েছে, এমন চললে নুনের কাজ এখনই আরম্ভ করা যায়। কিন্তু কষ্টটা হবে, হাতে ধরা কেউ নেই। মেয়েটা কম কাজ তো করত না।

'হাসিছিলি চোখ বুজে?' জিজ্ঞেস করল অনন্ত।

'চোখ বুজলিই মেয়্যাটারে দেখি।'

অনন্তর মুখ অন্ধকার। সে দীঘা রামনগর রাস্তার ধারে, অলংকারপুর বাসস্টপে, একটা গুমটি করছে। টাকা তো রয়েছে। টাকাটা কাজে না লাগিয়ে ভেঙে খেলে ফুরিয়ে যাবে। সরস্বতী উঠোনে নেমে লাল সুতোয় নকশিকাটা কাঁথাটা তুলে বুকে চাপল, হু–হু করে কেঁদে ফেলল, বলল, 'ইবার নুনের কাজ কে করবে, তুমার মেয়্যাই তো নাই, কী যে হবে?'

'কী হবে?'

'খালারিতে বসে থাকবে কে দিনভর?'

অনন্ত বলল, 'নুনের কাজ আর করবনি।'

'করবানি তো ভাত ফুটবে কী করে?'

'গুমটিটা বানাতে দিলাম।'

'ওই টঙ্কা ভাঙছ?'

'হাঁ, টঙ্কা রেখে দিয়ে কী লাভ?'

'উটা মোর কুন্তিরে ফিরাতে লাগবে।' কাঁথাটা ফেলে দিয়ে আবার দাওয়ায় এসে ওঠে সরস্বতী, রোদে দাঁড়ানো যাচ্ছে না। কুন্তির গায়ের গন্ধ নিয়েও রোদে শরীর দাঁড়াচ্ছে না। হাঁটু মুড়ে আবার বসে সে দাওয়ায়। অনন্ত গায়ের জামাটি খুলে হাওয়া খায়, বলল, 'কুন্তিরে ফিরাতি টঙ্কা লাগবেনি, মেয়্যাটা কাম করছে, উয়ার বেতন নাই?'

কুন্তি বলল, 'কালীপুজোর পর ভানুদাদাকে নিয়ে যাবে?'

'যাব, অঘ্রান মাসেই নিয়ে আসব।'

'অঘ্রান তো দেরি আছে, কার্তিক মাসেই আনবা?'

'যাব, বলছি কি পান, বিড়ি, লজেন্স, বিস্কুট, পাউরুটি, বড়ো একখান গুমটি করব, কথা পাকা, দীঘায় গিয়ে মহাজনের সঙ্গে কথা বলে এয়েছি।'

'মেয়্যাটা নাই, ইসবে কী হবে?'

অনন্ত বিরক্ত হল, 'মেয়্যারে তো বিয়াও দেয়, মেয়্যা চিরকাল ঘরে থাকে? মনে কর না বিয়া দিইছি, রামনগরের যোগেন কুণ্ডুর মেয়্যার বিয়া হল দিল্লি, পাঁচ বছর দিল্লি গেল, খুঁজো নাই, তুই তো মেয়্যা কুথায় রহিছে তা জানিস, যাবি, বাড়িটা আবার দেখে আসি না হয়।'

'মেয়্যারে দেখা হবেনি?'

'যদি দারোয়ান ঢুকতি দেয়, হবে।'

মোর মেয়্যা, দারোয়ান ঢুকতি দিবেনি কেনে?

অনন্ত বিরক্ত হয়, 'সে কি তুই জানিসনে?'

কপালে আঘাত করে সরস্বতী। কাঁদল না, থমথমে মুখে বসে থাকল। অনন্ত আবার তার সম্ভাব্য দোকানের কথা বলতে থাকে। মহাজন বলেছে অলংকারপুরে বড়ো হোটেল হচ্ছে। অলংকারপুর পর্যন্ত এগিয়ে আসবে দীঘা। তা যদি হয়, দোকান করে লাল হয়ে যাবে অনন্ত। এখনই তো সিজিন। অলংকারপুরে লোকে ঘর ভাড়া দেয় টুরিস্টদের কাছে। ছোটো করে আরম্ভ করবে অনন্ত, তারপর বড়োতে যাবে, সঙ্গে যদি চায়ের পাট রাখে, টাকায় টাকা লাভ। তবে হ্যাঁ, দীঘাতেও খুঁজছে জায়গা। পার্টির লোককে ধরেছে সে, পেলে তো গুমটি তুলে নিয়ে সেখানে বসিয়ে দেবে। আর দীঘার একটা গুমটি থেকে ছোটো খাওয়ার হোটেল পর্যন্ত করে ফেলেছে জগন্নাথ জানা। খাওয়ার হোটেল থেকে থাকার হোটেল করে ফেলবে খুব শিগগির। অনন্ত এবার আর ছাড়ছে না। লোকের দরজায় দরজায় ঘুরবে না। ভিখিরির দশা হয়ে গিয়েছিল না!

সরস্বতীর কানেই যায় কথাগুলো। ভিতরে প্রবেশ করে কথার আয়ু শেষ হয়ে যায়। কিন্তু কথাগুলো তো একদিন বলে ক্ষান্ত হয় না অনন্ত। প্রতিদিনই বলে। কালীপুজোর আগের দিন বিকেলে নিয়ে এল ভানুকে সঙ্গে করে। ভানু একটু নিস্তেজ হয়ে গেছে। শ্রীপতি মাইতি তাকে বার বার মীরগোদা নিয়ে যেতে চাইছে। ভানু এড়াবে কতবার, কত মিথ্যে বলবে? সে ধরতে পারছে শ্রীপতি এইরকম করতে করতে একদিন অসন্তুষ্ট হবে খুব, তাকে আর পছন্দ করবে না, পছন্দ না করার কারণে বিদায় দেবে হোটেল থেকে। ভানু আর কতদিন বিনা কাজে পোষ্য হয়ে থাকবে মাইতিবাবু হোটেলিয়ার? কথাটা ঠাকুরানির। ঠাকুরানির গলার জোর বেড়েছে ঠাকুর ফিরে আসায়। ঠাকুর যেন মেঘমুক্ত আকাশ। কিছুই জানে না, কিছুই হয়নি। অনন্তকে কত পরামর্শ দিচ্ছে টাকাটাকে কীভাবে সদব্যবহার করতে পারে সে। অনন্ত অবশ্য সব কথা বাড়ি ফিরে বলে না বউকে। পঞ্চম ঠাকুর যে ফিরেছে তাও বলে না।

ভানু এলে তাকে দেখে সরস্বতী কেঁদে ফেলল, ‘ভানুদাদা!’

অনন্ত বলে, ‘লোকটাকে বসতে দে, পুজোর পরে এল।’

ভানু বলল, ‘তুমি চোদ্দো পিদিম দেবে না ঘরে?’

সরস্বতী বিনবিন করে, ‘সব তো সে করত।’

‘নেই যখন পিদিম তো জ্বালাবে।’

‘কেনে জ্বালাব,’ ফুঁসে ওঠে সরস্বতী, ‘কেনে জ্বালাবো ভানুদাদা, কী হবে জ্বালায়ে, মোর ভিটে আন্ধার হঁই গেছে, উ তো বাপ, বাপের তো পেটে ধরতি হয় না, ও কুন্তি তোরে কীভাবে পেটে লিয়ে ঘুরতাম মা।’

ভানু বলল, ‘যদি পিদিম না দাও, তার অকল্যাণ হবে।’

‘কার, মেয়্যার?’

‘হ্যাঁ, বাপ মা যা করে সব তো ছেলেমেয়ের জন্য।’

‘মেয়্যা নাই তো তার কল্যাণ কীসের?’

ভানু আচমকা গর্জে ওঠে, ‘নাই মানে, বেঁচে নাই।’

কথাটায় কুঁকড়ে গেল সরস্বতী। ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকে ভানুর মুখের দিকে। মুখখানি দেখে ভানুর কষ্ট হয় খুব। বুক ভেঙে যায় যেন। মনে হয় এখনই ফিরে গিয়ে পঞ্চম ঠাকুরকে টেনে নিয়ে যায় থানায়। পঞ্চম ঠাকুরকে দাঁড় করায় দীঘা বাজারে। সর্বসমক্ষে তার কীর্তি ফাঁস করে দেয়। লোকে খেপে উঠে পঞ্চম ঠাকুরকে মেরেই ফেলুক। সরস্বতীর শূন্য চোখ দুটি থেকে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ে। ভানু বোঝে কথাটা ওভাবে বলা ঠিক হয়নি। সে শূন্য আকাশের দিকে তাকায়। এরই ভিতরে আকাশ থেকে অন্ধকার নামতে শুরু করেছে। হেমন্তের গোধূলি, হিম হিম ভাব জাগতে আরম্ভ করেছে সবে। সরস্বতী উঠে গেছে। তার স্বামী প্রদীপ এনে রেখেছিল, সলতে পাকিয়েছে সে দুপুরে বসে। তেলের দাম খুব, তবু তো এনেছে কুন্তির বাবা। প্রদীপগুলি একটি একটি করে বাইরে নিয়ে এল সরস্বতী। উঠোন, দাওয়ার কোণে, দুয়ারে সাজিয়ে রাখতে লাগল নিঃশব্দে।

অনন্ত বলল, ‘নুনের কারবার শেষ, আর করবনি।’

‘কেডা করবে, যে খাটত সে নাই।’ প্রদীপের মুখে দেশলাই ঠুকতে ঠুকতে বলল সরস্বতী। প্রদীপটি জ্বলল, পৃথিবী আলোকময়ী হল। জ্বলন্ত প্রদীপ হাতে সরস্বতী অন্য প্রদীপগুলির কাছে গেল। একটি একটি করে জ্বালাল। চোদ্দোটি প্রদীপ জ্বলল একটির পর একটি। হাতের প্রদীপটি নিয়ে সরস্বতী তুলসীমঞ্চে রাখল। গলায় আঁচল টেনে গড় করে প্রণাম করল, ‘মোর মেয়্যাটি যেন ভালো থাকে, কল্যাণ হয় যেন উয়ার।’

ভানু দাস দেখল প্রদীপের আলোয় গৃহখানিতে যেন গ্রহ তারার শোভা লেগেছে। তাকে অনন্ত জল বাতাসা দিল। ভানু ঘুরে ঘুরে দেখছিল, গৃহখানিতে যেন লক্ষ্মীশ্রী এসেছে। এর আগে, সেই কলকাতা থেকে ফিরে ক–দিন যখন ছিল, কী দশাই না ছিল এ ভিটের। ভানু দেখল কুন্তির মায়ের অঙ্গে নতুন বস্ত্র। ভানু দেখল চুলেও তেল।

অনন্ত বলল, ‘চা করবা?’

সরস্বতী ঘর থেকে নতুন হ্যারিকেন বের করে। হ্যারিকেনের পলতেতে আগুন দিয়ে চিমনি লাগিয়ে দিতেই উজ্জ্বল আলো ছড়িয়ে পড়ে। ভানু দেখল হ্যারিকেনের চিমনি ঝকঝক করে মোছা। সরস্বতী নিঃশব্দে হ্যারিকেন হাতে রান্নাশালে ঢোকে। ভিতর থেকে একটি স্টোভ বের করে।

‘কত নিল স্টোভটা?’ ভানু জিজ্ঞেস করে।

অনন্ত বলে, ‘দেড়শ টঙ্কা, দু–টা মানুষ, ইস্টোপে হই যায়।’

ভানু দেখল স্টোভ জ্বালিয়ে নীল আগুনের উপর সসপ্যান বসায় সরস্বতী। ভানু দাওয়া থেকে উঠোনে নামে। আকাশে তাকায়। সেই আকাশ! যে আকাশ ছিল বোশেখে, ফাল্গুনে, শুধু বদল হয়েছে কিছু নক্ষত্রের। তারা জায়গা বদলেছে। উত্তর আকাশের ধ্রুবতারাটিকে চোখে পড়ে। জ্বলজ্বল করছে। আকাশময় তারার মেলা। সব তারা ফোটেনি। তবু কম নয়। ভানু দু–হাত আকাশে তোলে।

সরস্বতী ডাকে, ‘রহি যাবু তো ভানুদাদা?’

ভানু থাকবে। ভানু দেখছিল আগের বারের চেয়ে এ সংসারের হাল এবার যখন ভালো, রাতে থাকতে কোনো অসুবিধে হবে না। চা করে কাপ প্লেটে সাজিয়ে সামনে রেখে সরস্বতী স্টোভ নিভিয়ে অন্ধকারে নামল। ভানু দাস দীর্ঘশ্বাস শুনল, গভীর, দেহের গভীর, গভীর থেকে উঠে আসা। ভানুর মনে হল অন্ধকারে পৃথিবী নিশ্বাস ফেলল। ভানু আকাশে তাকায়, তারাগুলি জলবিন্দুর মতো ফুটে আছে আকাশের ঘন নীল চালচিত্রে। ভানুর মনে পড়ল মেয়েটির কথা। এমন শান্ত সংসার মেয়েটি দ্যাখেনি। সে যখন ছিল এই ভিটেবাড়ি, এই সংসার, সংসারের মানুষজন, অনন্ত আর সরস্বতী ছিল হতশ্রী। ভিখিরির দশা ছিল লোকটার। মেয়েটি কখনো দ্যাখেনি তার মায়ের চুলে তেল, মায়ের গায়ে নতুন বস্ত্র, ঘরে নতুন হ্যারিকেন, নতুন স্টোভ।

ভানু দাস দেখছিল চোদ্দোটি প্রদীপ যেন আকাশ থেকে নেমে আসা চোদ্দোটি তারা। প্রদীপের আলো কাঁপছে মৃদুমন্দ বাতাসে, আলো দুলছে উঠোনে। ভানু চায়ের কাপ রেখে উঠোনে নামল, বলল, ‘দোকানটা লাগায়ে দাও ভালো করে, চেষ্টা করো দীঘায় জায়গা নিতে, নতুন দীঘাতেও যদি পাও, তাতেও খুব লাভ।’

অনন্ত বলল, ‘হ্যাঁ, দোকানটার নাম দেব, কী নাম দেব কহ দেখি ভানুবাবু?’

ভানু বলল, ‘পরে ভেবো।’

‘সাইনবোর্ড তো লাগাব।’

‘পরে ভাবা যাবে।’ ভানু এড়িয়ে যেতে চাইছিল, কেননা সে টের পাচ্ছিল অনন্ত তার মুখ দিয়ে মেয়েটার নাম শুনতে চাইছিল। মেয়ের নাম লিখবে সাইনবোর্ডে। ভানু মাথা দুলিয়ে বলল, ‘আগে দোকান চালু হোক, পরে ওসব ভাবা যাবে।’

সরস্বতী বলল, ‘ভানুদাদা, কলকাতা যাবে?’

‘কেন?’ ভানু ঘরে তাকায়, এবার সে বুঝতে পারে ভিটেতে শান্ত ভাব, লক্ষ্মীশ্রী ফিরলেও যে চাপা বেদনাটি রয়েছে তার ভার বড়ো বেশি। কী করে থাকবে ভানু এখানে? ভানুর মনে পড়ছিল কুন্তির কথা। হতশ্রী মেয়েটি, চুলে তেল নেই, রোদে পুড়ে মুখ কালি বর্ণ, মেয়েটি যেন অন্ধকারে দাঁড়িয়ে দেখছে তার মা বাবাকে।

সরস্বতী বলল, ‘বাড়িটা দেখে আসি আবার।’

‘কী হবে, মেয়ে তো ফিরবে।’

‘কী কহিলে?’ প্রায় ছুটে এল সরস্বতী তার সামনে।

‘হ্যাঁ, ফিরবে তো।’ ভানু দাস ঢোক গেলে।

‘কবে ফিরবে ও ভানুদাদা?’

ভানু বলল, ‘ফিরবে, দীঘার সমুদ্র ও লোকের খুব ভালো লাগে।’

হতাশ হল সরস্বতী, বলল, ‘একবার যাই, দারোয়ানরেও তো জিগাস করা যাবে মেয়্যা কেমন আছে, জ্বালাব যে প’দীপ, কেনে জ্বালাব কহ দেখি ভানুদাদা, মেয়্যারে যদি না দেখি মনে আনন্দ থাকে?’

ভানু চুপ করে আকাশের দিকে চেয়ে থাকে ঘাড় উঁচু করে। সরস্বতী অন্ধকারে বিনবিনিয়ে বলে যাচ্ছিল বুকের কথাগুলি। ভানুর চোখ এতক্ষণে ছলছল করে উঠল। মেয়েটি নেই এ বাড়িতে, কিন্তু যেন বিপুল অন্ধকারের মতো ছেয়ে আছে চারপাশে সমস্ত বিন্দুগুলি। অন্ধকারে বিষাদে ভরা মুখখানি দেখতে পায় ভানু। ভানু টের পায় না নিজের অজান্তে তার চোখ থেকে জল গড়িয়ে ভিজে যাচ্ছে বুক।

চন্দনেশ্বর হিনাড়ি গাঁয়ের নগেন গিরির ঘুড়িটা শ্রীপতি মাইতির ঘোড়ার সঙ্গে মিলে গর্ভবতী হয়েছিল বছর চার আগে। ভানু দেখেছিল ঘুড়িটার পাশাপাশি ঘুরছে পক্ষীরাজ। হাত ধরাধরি করে যেন। গা ঘেঁষাঘেঁষি করে একসঙ্গে ঘাস খাচ্ছিল তারা চোদ্দোবেড়িয়ার চরে। ভানু আনতে গিয়েছিল ঘোড়াকে। তখন কার্তিকের আরম্ভ। তো সেই সময়ে আলাপ নগেন গিরির সঙ্গে। তিনি বার বার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছিলেন তাঁর ঘুড়ির ব্যবস্থা হয়ে গেছে বলে। মাইতিবাবুর ঘোড়ার জাত খুব ভালো, ওর বীজ পেটে নিয়ে ঘুড়িটা ভালোই বাচ্চা দেবে মনে হয়, বলেছিলেন গিরিমশায়। ভানু যাবে নগেন গিরির কাছে। মন খুব খারাপ হয়ে গেছে। কালীপুজো শেষ। রোদ, বৃষ্টি, মেঘ পার করে প্রকৃতি এবার থিতু হচ্ছে। আর ক–দিন বাদেই তো পক্ষীরাজ ফেরে চোদ্দোবেড়িয়া থেকে। অন্যবারে। এবার পথ শূন্য, চোদ্দোবেড়িয়াতে যায়নি।

কালীপুজো, দীপাবলির দিন পাঁচেক বাদে ভানু রওনা হল চোদ্দোবেড়িয়ার দিকে। পরে যদি এসে থাকে ওখানে? আশ্বিনে চোদ্দোবেড়িয়া যাওয়া তো ওর অভ্যেস, যদি গিয়ে থাকে? ঘুরতে ঘুরতে আবার চোদ্দোবেড়ে গিয়ে দেখল গোটা ছয়েক ঘোড়া, ঘুড়ি রয়েছে, সাদা নয় বাদামি, দুটো খচ্চরও আছে। মনখারাপ করে সে গিরি মশায়ের বাড়ি গেল, 'মশায় আছেন?'

নগেন গিরি সম্পন্ন গৃহস্থ। তাঁর একটি ঘুড়ি বাদে আরও তিনটে ছিল। একটি তাঁর, একটি তাঁর ছেলে সতীশের। আর একটি অতিরিক্ত হয়ে পড়েছিল। ঘুড়ির বাচ্চা হলে তার দোসর হবে। জমিতে লাঙল তো টানতে পারবে। কপালের ফের, ঘর এখন প্রায় শূন্য, পড়ে আছে একটা। চন্দনেশ্বর বাজারে গিরি মশায়ের ধান চালের কারবার, হিনাড়িতে কাজুবাদামের চাষ। পয়সাওয়ালা লোক। নাহলে কি এই যুগেও ঘোড়ায় চেপে ঘুরে বেড়ান। পায়ে শুঁড়তোলা নাগরাই, মাথায় নীল পাগড়ি।

গিরিমশায় ভানুকে দেখে বললেন, 'এসো ছন্দক মশায়, এসো, আর একজন কই?'

'কে?' চমকে উঠল ভানু।

'কেনে মোর জামাই।'

'জামাই!' ভানু ভ্যাবলা মেরে গেল।

গিরি মশায় বললেন, 'কেনে ঘোটনের বাপ?'

'ঘোটন কে?'

হা–হা করে হাসলেন ছ'ফুট লম্বা গিরিমশায়, 'এসো ভানুবাবু বলছি, এখনও কি তাঁর নেশা কাটেনি, নাকি যাওনি তুমি চোদ্দোবেড়ে?'

'আজ্ঞে তারে তো পাইনি।'

'পাওনি মানে?'

'বলে গিয়েছিলাম না বোশেখি পুন্নিমের পর, ওই দিন পলায়েছে আমার কন্থক।'

'তুমি তাহলে কন্থক হারানো ছন্দক! সে তো অনেক দিনের কথা, এটা কার্তিক মাস।'

ভানু কপালের ঘাম মোছে, কিন্তু গরম আর যাচ্ছে না, 'সেই বুদ্ধপূর্ণিমায় দিনেরবেলায় বোমা ফাটল, সেদিন রাত্তিরেই তো গেল!'

'দুফরে না বিষ্টি হইছিলা?' ভ্রূ কুঁচকে জিজ্ঞেস করেন নগেন গিরি।

'হ্যাঁ, হয়েছিল তো।'

'বোমার কথাটি তখন তো কহনি ভানুবাবু।'

ভানু মাথা দোলায়, 'খেয়ালই ছিল না।'

'উটা তাহলে ভাবতে হবে, দিনটা মোদের ইন্ডিয়ার পক্ষে শুভ ছিলা কি?'

ভানু চুপ করে থাকে। গিরিমশায়ের ডাকে তাঁর বৈঠকখানার ঘরে পাতা গদিতে বসে। এই বাড়িতে এই আধা জমিদারি ব্যবস্থা। গিরিরা হিনাড়ির সাতকেলে বাসিন্দা। জমি কম ছিল না। তার অধিকাংশ বেচে দিয়েছে, সরকারি খাসেও গেছে কিছুটা। গিরিদের জমিতে লাঙল টানত ঘোড়ায়। সেসব আজকের কথা নয়, এখন তো ট্র্যাক্টর আছে। ট্র্যাক্টর ভাড়াও দেন তিনি।

ভানু বলল, 'বোমার দিন ঘোড়াটা গেল, অ্যাটমবোমা তো?'

'কী কহিতে চাও, স্পষ্ট করে কহ দেখি।'

ভানু তার আন্দাজ বলল। 'অ্যাটমবোমার খবর টের পেয়ে কি পলাতক হল ঘোড়াটা?' তা শুনে হা–হা করে হাসেন গিরিবাবু, 'মানুষ পলাচ্ছে না অশ্ব পলাবে, ইটা কী রকম কথা হল?'

'আজ্ঞে ওরা বোঝে আগে।'

'কুথায় বোমা ফাটল, বোমায় মোদের শক্তি দিখানো হল, আর তাতে ইদিকের জন্তু পলাবে, পোখরান তো অনেক দূর!'

ভানু বলল, 'আনন্দ হয় নাই আপনার?'

'হাঁ, খুব বাজি ফাটানো হল পরদিন, সবই দিওয়ালি করে দিল খবরটা পেয়ে, মিঠাই বিলি হল; কতবড়ো খবর বলো, জাপানে দুইটা শহরে দুইটা ছোটো পড়িছিলা কত কাল আগে, মোরা পাঁচটা ফাটাই দিলাম অনেক বড়ো বড়ো, বুঝছ, উয়াতে ই জগত ধূলা হই যাবে।'

ভানু বলল সেই পুরোনো কথা, 'পোখরান দূরে হলে কী হবে; এখেনের মানুষ তো মনে মনে পোখরানে রয়েছে, আনন্দটা সমান। এক দেশ। পোখরানে তো ইন্ডিয়ার টাকাই চলে, ইন্ডিয়ার ফ্ল্যাগ ওড়ে।'

গিরিমশায় বললেন, 'উসব বাদ দাও ভানুবাবু, তুমি ভুল কথা কহিছ, বোমার জন্য সে পলায় নাই, বোমার কথা কহিতে মোর ভয় করে।'

'তবে!' ভানু চিন্তিত হল। পোখরানের সূত্রে সে নিশ্চিন্ত হয়ে ওই পথে খুঁজতে আরম্ভ করেছে তাকে। কিন্তু গিরিমশায় বলছেন অন্য কথা। ভানুর তত্ত্বকে তিনি হেসে উড়িয়ে দিচ্ছেন। বলছেন, 'ঘোড়াটা পালিয়েছে তার পুরাতন স্বভাবে।'

'আজ্ঞে, এটা কী বললেন?'

'ঠিকই কহিছি, অশ্ব অতি পুরাতন প্রাণী, ইটা জানো?'

আজ্ঞে তা কি আর জানি না, ভগবান বুদ্ধ কত হাজার বছর আগের!

'অশ্বর বয়স কত তা তুমি জানো ছন্দক?'

মাথা নাড়ে ভানু, 'না তো।'

'তার আগে কহ, অশ্ব যে পাও নাই তা মোরে কহি যাও নাই কেনে?'

'আজ্ঞে মনে ছিল না, ঘোড়াটাকে সেই থেকে খুঁজে বেড়াচ্ছি।'

নগেন গিরি বলেন, 'কন্থক তো কন্থকের বংশ বটে, আবার ঘোটনের বাবা বটে, বাবা পলাতক মা বাঁচি নাই, হায়!' নগেন গিরি রুমালে চোখের কোণ মোছে।

ভানু আহত হয়, 'সে ঘুড়িটা গেল কোথায়!'

'উপরে।' নগেন গিরি হাত তোলেন সিলিং–এর দিকে, বিড়বিড়িয়ে বলেন, 'ঘুরে এল, শুয়ে পড়ল, উঠলনি, থাক উকথা।' গলা ভার করে আসে গিরিমশায়ের।

'কোন মাসে?'

‘আষাঢ়ে, এক ফোঁটাও বিষ্টি ছিলনি, কী রোদ!’

‘ঘোটন ঘোড়াটা কোথায়?’

‘মোর বেটা নিয়ে গেছে, বেশ তাগড়াই হয়েছে, সাদা লেজ, সাদা কেশর, গা–টা বাদামি, ওর মা বাপ, দুটোই যেন ফুটি উঠিছে ওর ভিতরে।’

ভানু চঞ্চল হয়ে পড়ে এ কথা শুনে, জিজ্ঞেস করল, ‘খুব তেজি?’

‘হ্যাঁ, তেজি তো বটে, ঘাড় যখন তোলে, ধরা যাবে রাজার ঘোড়া রাজার বেটা, বড়ো বড়ো দুটা চোখ, লম্বা গলা, যাহারে গ্রীবা কহে, তুমার অশ্বের রং চিনিনি, ইটার সব রং চিনা মনে হয়, কীরকম পুষ্ট দেহ, সাড়ে তিন বছর বয়স, যখন দৌড়োয় সে, প্রাণভরে তাকায়ে দিখার মতো।’

‘অত ছোটো, ওর উপরে আপনার বেটা চাপল!’

‘বেটা তো তালপাতার সিপাই, সতীশরে তুমি দ্যাখোনি?’

ভানু মাথা নাড়ে, বলে, ‘তবু তো অ্যাডাল্ট মানুষ।’

‘অ্যাডাল্ট কহ, আরে তার বয়স একুশ, ওজন পঁয়তিরিশ কে জি, এর ভিতরে উনি দু–বার জন্ডিস হাঁকাইছেন, ভীষণ লোভা, বড়ো জিভ, শুধু খায়, কী করি বলো, একটাই তো বেটা’, নগেন গিরির চোখ ছলছল করে ওঠে, ‘পাঁচ মেয়্যার পর বেটা হল, তাহার পরও আবার মেয়্যা হল, ইটা মেয়্যা হতে হতে ভুল করে বেটা হই গিছে, কী করি বেটা তো বটে, গুণের মধ্যে শুধু অশ্বে চাপে ভালো, অশ্বে উয়ার খুব নেশা।’

ভানু বলল, ‘পরে ঠিক হয়ে যাবে।’

‘হবে না, ও যে কার বেটা, মোরই বটে, ওর মা জননী সাক্ষাৎ জননী, মোর ইস্তিরির কথা কহি, কিন্তু তিনিও তো পলকা, দু–টার জন্ম দিয়ার পর একেবারে শয্যাশায়ী, তাঁর যে ভাইটা আছে, আমার শালাবাবু সে ঠিক সতীশের মতো ডিগডিগে, মাথায় যত কুবুদ্ধি, শয়তানি, সতীশ হইছে উয়ার মামার মতো, তার মামার বয়স তো পঞ্চাশ, গ্যাসটিক–ম্যাসটিক আঠারোখানা রোগ লিয়ে ঘুরি বেড়ান তিনি, হাওয়া খেলিও এসিড হয়।’

ভানু প্রসঙ্গটি বদলায়, ‘আপনি না বলছিলেন অশ্ব অতি প্রাচীন প্রাণী।’

‘প্রাচীনই তো, পুরাতন, কত পুরাতন শুনবে, এই ধরো পাঁচ সাত কোটি বছরেরও আগে, ফসিল যে মিলেছে অশ্বের, তাতে ধরা যায় পুরাতন প্রস্তর যুগ—জানো ইসব? মানুষ পাথর দিয়ে মেরে ঘোড়ার মাংস খেত, আর ঘোড়ারা সব বুনো, দল বেঁধে ছুটি বেড়াত!’

‘সে তো জানি।’

‘এই যে চোদ্দোবেড়েতে সবাই একসঙ্গে আসে, ইটা সেই পুরাতন অভ্যাস কিনা কহ।’

ভানু বলে, ‘ইটা তো সব প্রাণীই করে, মানুষও।’

‘মানুষ কি বনে যায়?’

‘বনে গেল কবে?’

‘বন না হোক, নদীর চড়া, ওর’মই তো হয়, হত, বুনো ঘোড়া—বন্য অশ্ব দল বেঁধে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যেত তৃণভূমি মানে ঘাস জমিন সন্ধান করতে করতে, ই অশ্বগুলান সেই অভ্যেসে চোদ্দোবেড়েতে পলাত কি না কহ, নদীর ধারে বুনো ঘোড়ারা দল বেঁধে ঘাস খেয়ে বেড়াত, বেড়াত কি না কহ, এক জায়গায় ঘাস ফুরালে আর এক জায়গায় ছুটি যেত, বনজঙ্গল, পাহাড় টপকে চলে যেত কত দূর, অশ্বের ছুটা অভ্যেস, ঠিক কহিছি তো?’

ভানু দাস ঘাড় কাত করে, ‘হাঁ, ঘোড়া মানেই তো তাই।’

‘তুমার কন্থক হয়তো সেই কারণেই ত্যাগ করিছে তুমাদের, বনের ডাক শুনিছে।’

মাথা নাড়ে ভানু, ‘সে তো আশ্বিন মাসে যায়, বোশাখ মাসে যাবে কেন?’

'ওইটাই হল গোলমাল।' মাথায় হাত বুলিয়ে নগেন গিরি চুরুট ধরালেন। খুব কড়া তামাক। গন্ধ পাকিয়ে পাকিয়ে ঘরের ভিতর ছড়িয়ে পড়তে থাকে। বিড়বিড় করেন নগেন গিরি, 'তাহলে কি তুমার কথা ঠিক? তুমার ঘোড়া ভালো জাতের অশ্ব ছিলা, উয়ার সেন্স ভালো ছিলা হয়তো, টের পেয়েছিল বোমা–ফাটানি।'

ভানু বলল, 'ঠিক ধরা যাচ্ছে না, মনে হচ্ছে।'

'কিন্তু তা হবে কী করে, মোরা টের পাইনি, অশ্ব জানতে পারল, আশ্চর্য।'

ভানু চুপ করে আছে। নগেন গিরি তার যুক্তিকে মেনে নিয়েছে বলে ধরা যাচ্ছে না। আবার ফেলতেও পারছে না। আর সেও গিরিমশায়ের বুনো ঘোড়ার কথা উড়িয়ে দিতে পারছে না, কিন্তু বিশ্বাসও করতে চাইছে না। ভানু পকেট থেকে বিড়ি বের করে ধরায়, বিড়বিড় করে, 'আপনার যুক্তিটা কিন্তু ফেলনা নয় গিরিমশায়, মানুষ এমন কাজ করে যা দেখে ধরা যায় বুনোই ছিল মানুষের পূর্বপুরুষ, তেমনি ঘোড়াও তো।'

'কিন্তু তোমার কথাই–বা মিথ্যে বলি কী করে?'

'না, না আপনারটা সত্যি।'

'উঁহু, বোমা ফাটানোর খবরে পরদিন আনন্দ মিছিল হিলা চন্দনেশ্বরে, এক বেটা, রানীসাই গাঁর মিশ্রবাবুর বড়োছেলে চা দুকানে গলা ফাটাচ্ছিল অ্যাটমবোমা কী সব্বোনেশে বস্তু, তা শুনে দশজনে তাকে ধোলাই দিয়ে হাসপাতালে পাঠাই দিলা, যেন বোমা তাহাদের বাপে ফাটাইছে।'

ভানু বলে, 'কিন্তু পলাল ওই জন্য, আপনার কথা মতো।'

'মোর কথা মতো, তাহার মানে কী হিলা?'

'মানে বুনো ঘোড়ার অভ্যাস, দু–টা কথাই তাহলে সত্য হয়।

'দু–টো কী করে সত্য হবে?' গিরিমশায়ের কণ্ঠে বিস্ময়।

'হবে, বুনো ঘোড়া যদি বিপদের গন্ধ পায়, কী হবে?'

'পলাবে, ছুটে পলাবে।'

'যদি বোঝে মরণ অতি নিকটে?'

'দিকহারা হই পলাবে।'

'তেমন তো হত, সামনে, মাঠ, জঙ্গল, তা পার হয়ে গেল ঘোড়ার পাল, সেই জন্যও তো পলাত, বুনো জন্তুর তাড়ায় পলাত, ফাঁস নিয়ে মানুষ ঘুরছে তা দেখে পলাত, বনের পর বন পার হয়ে যেত, ঘোড়া তো নাকে বাতাস টেনেই ধরতে পারে বাতাসে কোন গন্ধ, যে শব্দ আর কেউ শোনে না, ঘোড়া টের পায়, বহুদূরে বিপদ থাকলেও নাকি ধরতে পারে?'

'পারে, খুব পারে।' বললেন গিরিমশায়।

'তবে তো আমার কথা, আপনার কথা দুটোই সত্য হল, আমার কন্থক ভয় পেল, বাতাসে, জ্যোতস্নায় মরণের গন্ধ টের পেল, তা যতদূরই থাকুক না কেন মরণ, তখন তাকে পলাতে হবে, কোথায় পলাবে নাহলে, তার মনের ভিতরে বনের ছায়া ফুটে উঠল।' বলতে বলতে ভানু চমকে ওঠে। সে ভানু দাস, শ্রীপতি মাইতির হোটেলের দালাল ব্যতীত কিছু নয়, আর ঘোড়াটার পালক মাত্র। সে এত কথা জানবে কী করে? মনের ভিতরে বনের ছায়া যে ফুটে উঠল তাই–বা জানল কী করে ভানু দাস? তাহলে কি সে সত্যিই ছন্দক, রাজপুত্রের ঘোড়ার পালক? কবে যেন একদিন কথাটা বলেছিল, সেই থেকে গিরিমশায় তো ওই নামে ডাকে! তার ঘোড়া কি বন দেখেছে, না কি ভানু নিজে দেখেছে? ঘোড়া মানুষের পোষ মেনেছে কম দিন নয়। 'কত হাজার বছর হবে ও গিরিমশায়, বুনো ঘোড়া পোষ মানল কবে?'

গিরিমশায় বলল, 'তা ধরো অনেক হাজার বছর হবে, এদিক–ওদিক হতিই পারে, হিসাব তো আন্দাজে, হাজার দশ।'

‘তাহলে ঘোড়া বন চিনত তার আগে, কী বলেন?’

‘হ্যাঁ, তাই তো হওয়ার কথা।’

সেই সময়, যখন ঘোড়ারা দল বেঁধে বনের পর বন পার হয়ে যেত, তখনই তো বন চিনত, পরে সে মানুষের তাঁবে এল, মানুষ তাকে বন থেকে বের করে আনল, তা কন্থক ভয় পাওয়ার পর তার মনে কি সেই অনেক হাজার বছর আগের বন জেগে উঠেছিল, সে তখন দলছাড়া, ভয় পেয়ে সাথিদের খুঁজতে বেরোল হাজার বছর আগের পুরোনো পৃথিবীর দিকে?

‘হ্যাঁ, এইটাই হল অভ্যাস, এইটা হলে দুজনার কথা থাকে।’

‘কিন্তু সেই পৃথিবী পাবে কোথায়?’

‘পাবে না, কিন্তু যখন সে ছুটল, তার মনে হাজার হাজার বছর আগের স্মৃতি ফুটে উঠল, উঠল কি না?’

‘এরকম হতে পারে?’

গিরিমশায় বললেন, ‘পারে।’

‘কী করে পারে, হাজার হাজার বছর আগেয় কথা মনে থাকবে কী করে, সে তো দ্যাখেনি, ধন্দটা আমার এইখানে, খোলসা করে দেবেন গিরিমশায়?’

নগেন গিরি বললেন, ‘দেব, মন দিয়ে বোঝো দেখি।’

ভানু বলে, 'মনের ভিতরে ছায়া পড়ল, সে কত হাজার বছর আগের কথা বলুন, কত জন্মের আগের কথা বলুন গিরিমশায়!'

ঘাড় কাত করেন নগেন গিরি, 'হ্যাঁ, তা হিসাব করাই যাবেনি, আর জন্মান্তর দিয়া এর ব্যাখ্যা তো হবেনি, মু তো জন্মান্তর মানিনি।'

'তবে কী করে জানল সে, বড়ো গাছ, অন্ধকার হয়ে আছে বনের ভিতরটা, যেখেনে পশু চলে চলে রাস্তা, সেই রাস্তা দিয়ে কোনোরকমে বেরিয়ে এল ঘোড়ার দল বনের বাইরে, নদীর ধার, ঘাসের জমিন, তা দেখে লাফ দিচ্ছে বুনোঘোড়ার পাল আনন্দে, তখন শোনা গেল বাঘের ডাক, নাকে এল বাঘ কিংবা মানুষের গন্ধ, মানুষও ফাঁস নিয়ে ঘুরছে ঘোড়া ধরবে বলে, তারা ছুটতে আরম্ভ করল ভয়ে—এইরকম মনে পড়ল কন্থকের? সে তো ছিল রাজপুত্রের ঘোড়া।'

'তা হোক, রাজার ঘরে আসার আগে তারা যে ছুটত একসঙ্গে তা মনে পড়ল।'

'সেই বন, নদীর পাড়, ঘাসের জমির ছায়া ভেসে এল মনে?'

'হ্যাঁ তাই, বিপদের গন্ধ এল নাকে, তখন মনে পড়তে লাগল সব।'

'কী করে মনে এল গিরিমশাই?'

নগেন গিরি আবার একটি চুরুট ধরান, সুখে ধোঁয়া টেনে বাতাসে উড়িয়ে দেন। গদিতে কাত হন, বিড়বিড় করেন, 'অনেকদিন বাদে প্রাণের সুখে কথা কইতে পারছি ভানুবাবু, কথা কহনের লকই নাই, এসব কথা কোন মানুষ শুনিবে কহ, বলছি মানুষ জন্মায় তো তার বাপ মার গুণ লিয়ে, চেহারা লিয়ে, ঠিক কি না?'

'হাঁ, তাই তো হয়।'

'বাপ মা যদি কালো হয়, ঠাকুরদা ধলা হয়, তো তুমি ধলা হই জন্মাইতে পারো, ঠিক কি না, মানুষ তার পূর্বপুরুষেরে লিয়ে জন্মায়।'

'হাঁ হাঁ, ইটা আর নোতন কথা কী?'

'মোর ঘোটন উয়ার মা আর তুমার কন্থকের মতন পেরায়, মানুষ যেমন তাহার পূর্বপুরুষের মতন হয়, অশ্বও তো তাই হয়, আর কিনা পূর্বপুরুষের গুণ মানে তো শুধু রূপের কথা কহি না...।'

ভানু অবাক হয়ে শুনছিল। প্রাণী কি তার পূর্বপুরুষের স্মৃতি নিয়েও জন্মায়, এটাও কি তার উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া হয়ে যায় জন্মানোর সময়? সেই স্মৃতি ঘুমিয়ে থাকে মাথার ভিতরে, স্তরের পর স্তরে লুকিয়ে থাকে মনের অন্ধকারে! একটি দুটি করে স্তর যখন ভাঙে, তখন জেগে উঠে পূর্বপুরুষের স্মৃতি। এর নাম জন্মান্তর নয়। এ হল তিন পুরুষ আগের ব্যাধি জেগে ওঠার মতো, পাঁচপুরুষ আগের স্বভাব জেগে ওঠার মতো ব্যাপার।

'এসব কে বলেছে আপনাকে?' ভানু জিজ্ঞেস করে।

'কেহ না, মু একা একা ভাবি ইসব, সাগরকূলে চলি যাই ভানুবাবু সন্ধ্যাবেলায় একা একা, চাহি থাকি সাগরপানে, কেহ নাই কোনোখানে, কীরকম তখন হই যাই, তখন বাতাসের সঙ্গে কথা হয়।'

'বাতাস, বাতাস কথা বলে?'

বলে, 'সেই তো সব দ্যাখে, দ্যাখে কি না?'

ভানু বলে, 'আপনি ঠিক আমার মতো!'

ভানু অবাক হয়ে লোকটার দিকে চেয়ে থাকে। অদ্ভুত! আশ্চর্য সব কথা বলছে। শুনতে গায়ের রোঁয়া সিধে হয়ে যাচ্ছে, মাথার অন্ধকারে ঢেউ উঠছে! আহা, এই লোকের সঙ্গে আগে কেন এমন আলাপ হয়নি তার! আগের মোলাকাত তো শুধু দেওয়া নেওয়ায় শেষ হয়ে গিয়েছিল। কন্থক তার ঘুড়িকে গর্ভবতী করেছিল, সেই কৃতজ্ঞতায় আহ্লাদে লোকটা তাকে ডেকে খাইয়ে দিয়েছিল, হাতে কিছু টাকা গুঁজে দিয়েছিল, কিন্তু এখন বোঝা যাচ্ছে লোকটা অতি সহজ নয়। লোকটা যেন কেমন! কী সব বলছে! ঘোড়াটার মাথার ভিতরে তার আগে জন্মানো হাজার পুরুষের স্মৃতি জমা হয়ে ছিল যে। কন্থক সেই স্মৃতি সঙ্গে করে জন্মেছিল। সেই স্মৃতি মাথায় নিয়ে মরেই যেত হয়তো, কিন্তু ওই যে পোখরানে বালির নীচে সেই দিন, বুদ্ধপূর্ণিমার দিন বিকেলে পর পর তিনটি বোমা বিস্ফোরিত হয়ে ধরিত্রী–গর্ভ ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে দিল। ধরিত্রী–গর্ভ থেকে তেজস্ক্রিয়তা উঠে বাতাসে কি ভাসেনি? ভেসেছিল। চাঁদের আলোয় কি মিশে যায়নি? গিয়েছিল। তা টের পেতেই ভয় পেল পক্ষীরাজ। তার রক্তের ভিতরে জেগে উঠতে লাগল সেই আদিম শিহরণ, যা বুনো ঘোড়ার দল পেয়েছিল কোনো এক দূর অতীতের প্রত্যুষে। চোখের সামনে জেগে উঠল শিহরণ জাগানো, মরণের ভয় জাগানো সেই স্মৃতি। তখন কি আর সে থাকতে পারে? বনের দিকে, শান্ত নদীর দিকে, খোলা পৃথিবীর দিকে, লক্ষ বছরের আগের প্রকৃতির দিকে দৌড়োল সে।

ভানু বলল, 'ও কি হিরোশিমার গন্ধ পেল, নাগাসাকির স্মৃতি জাগল নাকি আমার ঘোড়াটার ভিতরে?'

'হয়তো জাগল?'

'তা যে দেখেছিল, সে তো মরেছিল, যে দেখেছে সে কি আর স্মৃতি নিয়ে বেঁচেছিল গিরিমশায়, হিরোসিমার ঘোড়া কি এই ঘোড়ার পূর্বপুরুষ হতে পারে, তাহলে তো এও বাঁচত না, হিরোশিমার পূর্বপুরুষের দেহে যে বিষ ঢুকেছিল সেই বিষ তো এখনও রয়ে গেছে, বিষ নিয়ে বংশের সন্তান জন্মাচ্ছে।'

গিরিমশায় বললেন, 'তুমি দেখছি সবু জানো ভানুবাবু।'

'পক্ষীরাজ পলায়ে আমার চোখ খুলে দিয়েছে গিরিমশায়, আমার কথাটার জবাব কিন্তু হয় নাই।'

নগেন গিরি বললেন, 'তা না হোক, সি বাতাস তো বহি আসিছিলা, তুমি যে কহিলে জুছনায় পোখরানের খবর এল, বাতাসে উড়ে এল পোখরানের তাপ, তা থেকে সে যেমন টের পেল, তেমন হয়তো হিরোশিমার টায়েমে হইছিল।'

'বলছেন?'

'হাঁ, ইহার পেডিগ্রি কী, মানে বংশ পরিচয় জানো, কুথায় বাড়ি?'

'ও তো কপিলাবস্তুর রাজপুত্রকে ফেলে একা ফিরল নগরে, সঙ্গে আমি, এ জন্মে সাঁতরাপুর, মাইতিবাবুর বাড়ি ওখানেই।'

হা–হা করে হাসেন নগেন গিরি, 'কী যে কহ, সাঁতরাপুরের অশ্ব, ই কথা শুনলে অশ্বয় হাসি দিবে, দিবে কি না কহ, অশ্ব তো ই দেশে ছিলনি।'

ভানু বলে, 'কন্থক, তার মা বাপ সব এদেশি, কটকি ঘোড়া, কটক থেকে দুটো ঘোড়া এনেছিলেন মাইতিবাবুর ঠাকুরদা, সাঁতরাপুরে চলেন, মাইতিবাবুর মা বেঁচে, জানা যাবে সব কথা।'

আবার হাসলেন গিরিমশায়, 'কী যে কহ তুমি ভানুবাবু, অশ্ব ই দেশেরই লয়, অশ্ব ভিনদেশি প্রাণী, মু কহি এ ঘোড়ার অরিজিন কুথায়, কুন দেশের অশ্বর রক্ত উয়ার ভিতরে ছিল?'

'অশ্ব ভিনদেশি!' ভানু মাথা চুলকোয়, হ্যাঁ শুনেছে যেন কথাটা।

গিরিমশায় তখন ঘোড়ার ইতিহাস বর্ণনা করেন। শুনতে শুনতে ভানু বিস্মিত। কত কথা না জানেন মানুষটা! মধ্য এশিয়া, আরব দেশের ঘোড়া, না উত্তর আমেরিকার ঘোড়া, নাকি ইউরোপের ঘোড়া, নাকি বাহ্লিক, উরাল পর্বতমালার কোলের ঘোড়া ছিল এর পূর্বপুরুষ, তা কি জানে ভানু? ঘোড়া কারা আনল এদেশে? আর্যরা ঘোড়ায় চেপে ঢুকল সিন্ধু নদ পার হয়ে, এল তারা কৃষ্ণসাগর, কাস্পিয়ান সাগরের উত্তরের ভূমি থেকে, তবে না এ দেশের মানুষ ঘোড়ার টগবগ শুনল, যদি ভানু জানত কন্থকের পেডিগ্রি, তবে না ধরা যেত কোনদিকে পালাতে পারে,

কোন অভিমুখে, কোন বনের ছায়া, কোন নদীর ছায়া, কোন তৃণভূমি, কোন পাহাড়ি উপত্যকা, কোন সবুজের ছায়া জেগে উঠেছিল তার মনের ভিতরে। কত হাজার বছরের পুরোনো স্মৃতি ঘুম ভেঙে উঠে বেগবান করে তুলেছিল ঘোড়াটাকে? বলতে বলতে দুলতে লাগলেন গিরিমশায়।

ভানু দেখছিল বিকেল হয়ে এল প্রায়। বেলা ছোটো হয়ে এসেছে। তাকে তো এখনই বেরোতে হয়। না বেরোলে ফিরবে কী করে? সবে শুক্লপক্ষ গেছে, এখন চাঁদ ওঠে অনেক দেরিতে। আজ তৃতীয়া কি চতুর্থী হবে। চাঁদের আলোর জন্য অপেক্ষা করতে হবে অনেক রাত্তির পর্যন্ত। চন্দনেশ্বর থেকে ভ্যান রিকশা পাবে কি না কে জানে? গিরিমশায় থামলে ভানু বলল, 'এবার উঠতে হয়, অনেক দূর তো যাব।'

'ইখন কেনে, ঘোটনকে লিয়ে সতীশ ফিরুক।'

'রাত হয়ে গেলে যাব কী করে?'

'না গেলে, কী রাজকার্য রহিছে তুমার দীঘায়?'

ভানু ভাবল তাই তো, গিয়ে কী করবে? গিয়ে তো গাঁজাড়ু মাইতিমশায়ের সামনে বসতে হবে, কোকিলা বধূর প্রতি তার বাসনার কথা শুনতে হবে। তার চেয়ে ঘোটনকে দেখতে সে থেকে যাক। গিরিমশায়ের কাছে ঘোড়ার কত কথা আছে। ভানু জানেই না যে সব। জানলেও শোক কিছুটা কমবে। এই যে এখন তার মাথায় ভাবনা ঢুকেছে ঘোড়াটা কোন দেশের ছিল। কোন দেশের, কোন বনের, কোন নদীর, কোন পাহাড়ের, কোন হ্রদের ছায়া জেগে উঠেছিল তার মনে? তা জানতে পারলে তো আর কিছুই জানার বাকি থাকে না। শুধু খুঁজে বের করতে হবে পক্ষীরাজকে। পক্ষীরাজের দেহে কোন দেশের ঘোড়ার রক্ত? ও কি আরবি ঘোড়া, না কি গ্রিস দেশের ঘোড়া? আলেকজান্ডার ওর পূর্বপুরুষের পিঠে চেপে কি এ দেশে ঢুকেছিল সিন্ধু উপত্যকা দিয়ে?

'চুপ করি গেলা কেনে?' গিরিমশায় জিজ্ঞেস করলেন নিশ্চুপ ভানুকে।

'আজ্ঞে বলছেন তো আপনি।'

'তুমি কিছু কহিবে না?'

ভানু হাসে, বলে, 'উপায় কি আছে কোনো, বংশ পরিচয়টা জানলে হত।'

'কী করে জানবে?'

'আপনি কি জানবেন না আপনার ঘোটনের বংশ পরিচয়, বাপ মা'রে চেনেন, কিন্তু ওটি কোন দেশের ঘোড়ার বংশধর তা জানতে চেষ্টা করবেন না?'

গিরিমশায় বললেন, 'হয় কৃষ্ণ সাগরের কূলে কিংবা কাস্পিয়ান হ্রদ, উড়াল হ্রদের কূলে, অক্সাস নদীর ধারে ওর পূর্বপুরুষের বাস ছিল।'

'সেসব কোথায়?'

'দূর বহুদূর, দূর উত্তর–পশ্চিমে, ধরো গিয়ে এখনকার পেশোয়ার, ব্যাকট্রিয়া দিয়ে বোখারা, সমরখন্দ; বোখারা হল অক্সাস নদীর ইধারে, ও নদীরে আমুদরিয়াও বলে।' বিড়বিড় করছেন গিরিমশায়। ভানু অবাক হয়ে তাঁর দিকে চেয়ে আছে। অক্সাস নদী—আমুদরিয়া, সেটিও বেরিয়েছে উড়াল হ্রদ থেকে। আর একটা নদী সিরদরিয়া, সেটিও বেরিয়েছে ওই হ্রদ থেকে, একটি দক্ষিণ থেকে, একটি উত্তর থেকে। ঘোড়াটি ওখানকার হতে পারে। ওইসব নদীর জলে নিজেদের ছায়া দেখত রূপবান মানুষ সব, তাদের সঙ্গে রূপবান অশ্ব, রূপবতী অশ্বা, যাত্রা করল তারা সিন্ধু উপত্যকার দিকে। আবার হতে পারে অন্য কোথাও। কৃষ্ণ সাগর, কাস্পিয়ান সাগরের কূল থেকে দীর্ঘদেহী, কঠিন শ্বেতাঙ্গ মানুষগুলিকে বয়ে ঘোড়া ছুটল দক্ষিণ–পুবে। পথে কত পাহাড়, কত ছোটো নদী, বড়ো নদী, ঝরনা, কত তৃণভূমি, অরণ্য মরুভূমি ফেলে রেখে গিরিপথে খুরের শব্দ তুলে তারা এসে গেল সিন্ধু তীরে।

ভানু অন্ধকারে ঘোড়ার ডাক শুনল, একটি নয়, শত শত ঘোড়া একসঙ্গে চিঁহি রব তুলেছে। তাদের ভিতর থেকে পক্ষীরাজকে বেশ চেনা যাচ্ছে। তার গলা আলাদা। আর্যরা এল। তাদের দলপতির ঘোড়া ওটি।

গিরিমশায় হেসে উঠলেন, ‘ওই এল, ডাক শুনছ ভানুবাবু?’

ভানু লাফ দিয়ে উঠে এল, ‘সেই ঘোড়া?’

‘হাঁ, সেই অশ্ব।’

‘কালো জল যে সাগরের তার কূলে থাকত?’

‘তাই তো জানি।’

‘আমুদরিয়া নদীর ধারে থাকত?’

‘একবার কহিছি মনে করি রাখিছ?’

‘এসব আপনারে কে বলেছে?’

‘কেনে ঘোটনের মা কহিত।’

‘কী বলেন গিরিমশায়, এসব বিশ্বাস করতে হবে?’

‘হবে, উড়াল হ্রদের তীরের রূপবান এক অশ্বের বীজ ছিল তার দেহে, সেই বীজের সঙ্গে মিশি গিইছিলা তুর্কি অশ্বের বীজ, আরবি অশ্বের বীজ, কতরকম অশ্বের সহিত কতরকম অশ্ব মিশি গেলা, তারপর কী হল শোনো।’

ভানু শুনছে। ভানুর কানে এখনও চিঁহি চিঁহি ডাকটি লেগে আছে। ঘোড়া ঘরে ফিরে যেন আনন্দধ্বনি ছড়িয়ে দিচ্ছিল আকাশের অন্ধকারে। নাকে টেনে টের পেয়েছে কি ভানু দাসের গায়ের গন্ধ? ভানু এসেছে। কতদিন বাদে দেখা ভানুর সঙ্গে। সেই বুদ্ধপূর্ণিমার পর, আকাশে বাতাসে বিষ ছড়াল, মনে মনে ছড়িয়ে পড়ল বিষ, তারপর। ভানু শুনছে গিরিমশায়ের কথা। গিরিমশায় যেন গিরি পর্বতের মতো হয়ে উঠছেন। এত জানেন, কই ভানু তো জানত না এসব! আজ মনে কী আনন্দই না হচ্ছে। জানতে পারলে এত আনন্দ! গিরিমশায় বলছেন, যেসব জায়গা থেকে অশ্ব এল, সেসব জায়গা আর আমাদের সিন্ধু পারের দেশ তো একরকম নয়। উড়াল হ্রদের কূলের অত ঠান্ডা নেই এখানে, কৃষ্ণ সাগর, কাস্পিয়ান সাগরের বাতাস এখেনে আসে না। এখেনে আছে হিমালয়, এখানে আছে মস্ত মস্ত সাগর, মস্ত মস্ত নদী, নদীর পর নদী, নরম রোদ, নরম জ্যোতস্না, এর ভিতরে দৌড়ে, দাঁড়িয়ে, অশ্বের দল বদলে যেতে লাগল। আর যে মানুষগুলো এসেছিল এই ভূপ্রকৃতির টানে, তারা এখেনে এসে কালো মানুষের সঙ্গে মিলে গেল, হয়ে গেল ভানু দাস, নগেন গিরি, সতীশ গিরি।

অন্ধকারে ভানু উঠল, ‘ঘোটনবাবুরে দেখাবেন না?’

গিরিমশায় উঠে ঘরের দেওয়ালের সুইচবোর্ডে হাত দিয়ে আলো জ্বালান, বললেন ‘এর ভিতরেও অনেক কথা রহিছে যা বলা হয় নাই।’

ভানু বলল, ‘দেখে আসি তেনারে, নিয়ে চলেন।’

ভানু ঘর থেকে বেরোল নগেন গিরির সঙ্গে। উঠোনে হালকা অন্ধকার। ঘরের ভিতরে বসে যেমন মনে হচ্ছিল রাত হয়ে গেছে, আসলে তা হয়নি। গোধূলিবেলার মায়া জড়িয়ে আছে পৃথিবীর গায়ে। তার ভিতরে ভানু দেখল, উঠোনে দাঁড়িয়ে দুলছে যেন একটি প্রায় কঙ্কাল, সিড়িঙ্গে ভূত। চমকে উঠেছে সে। গিরিমশায় ডাকলেন, ‘সতীশ, ঘোটন কই?’

এই সতীশ! এত রোগা মানুষ কি ভানু আগে দেখেছে? ‘দাঁড়িয়ে আখ চিবোচ্ছে,’ বলল, ‘গইলিতে।’

‘খবদ্দার গইলি কহিবিনা, ক অশ্বশালা।’

সতীশ কথাটা কানেই নিল না, আখ চিবোতে লাগল উঠোনে দাঁড়িয়ে। বিড়বিড় করতে করতে নগেন গিরি এগোলেন। ভানু তাঁকে অনুসরণ করল। এগোতে এগোতে ভানুর মনে হল তার দিকে অবাক চোখ মেলে আছে কেউ। সে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল তাই। সতীশ দেখছে। আবছা অন্ধকারে চোখের মণিদুটো ঝকঝক করছে।

ভানু এগোতে এগোতে আবার শুনল চিঁহি চিঁহি, নগেন গিরি আপ্লুত স্বরে বললেন, ‘দেখলেন আমাকে টের পেয়েছে।’

ভানু দেখল গোধূলি অন্ধকারে ঘাড় তুলে তার দিকে তাকিয়ে পা তুলল ঘোটনবাবু, না, না কন্থক ডাকল তাকে, ‘ভাই ছন্দক, শেষপর্যন্ত এলে?’

মিলছে না, তবু যেন মিলছে। সাদা রংটা বাদামি হতে হতে থেমে গেছে আচমকা। লেজে আর ঘাড়ে রয়েই গেছে সাদা ভাবটি। বড়ো বড়ো চোখদুটি যেন সেই ঘোড়াটির। ভানু গায়ে হাত দেবে বলে এগিয়ে যেতে ঘোড়াটি অন্ধকারে গ্রীবা ঊর্ধ্বমুখী করে চিঁহি রব তুলল। নগেন গিরি বললেন, 'যাও ভানুবাবু, ভয় কোরো না।'

ভানু হালকা অন্ধকারে হাত বাড়িয়ে ঘোড়ার পিঠটা ছুঁয়ে ফেলতেই পা থেকে মাথা পর্যন্ত যেন বিদ্যুৎ প্রবাহিত হল। এ যে সেই ঘোড়া, একেবারে সেইরকম! ছদ্মবেশে লুকিয়েছে গিরিমশায়ের বাড়ি, বয়সও লুকিয়েছে মনে হয়।

গিরিমশায় বললেন, 'তোমার তাই মনে হচ্ছে?'

'হ্যাঁ,' ভানু বিহ্বল হল, 'আমার ঘোড়াই যেন।'

তখন আখ ছিঁড়তে ছিঁড়তে সতীশ এসে দাঁড়িয়েছে দুজনের পিছনে, 'খদ্দের এলা নাকি বাবা, বিচে দিবে ঘোটনটারে?'

'থাম, যত অলক্ষুণে কথা তোর মাথাতেই আসে।'

'নতুন লকরে বেগ দিবে, আজও মোরে ফেলি দিবার তাল করেছিল।'

নগেন গিরি বললেন, 'তালপাতার সিপাই হলে কী হবে, অশ্বে চাপে ভালো, কী করে যে পারে প্রথম থেকেই, আমার ঠাকুরদা নাকি ঘোড়া বশ করতি উস্তাদ ছিল, উ তাই হয়েচে।'

সতীশ গিরি হাসছে, 'কিন্তু ঠাকুরদার মতন বডিটা হলনি।'

'সব কি পাওয়া যায়!' দীর্ঘশ্বাস ফেললেন গিরিমশায়, জিজ্ঞেস করলেন, 'দেখা হল মিশ্রবাবুর সঙ্গে?'

'হল।'

'পরে কথা হবেখন, হ্যাঁ ভানুবাবু দেখলে তো!'

ভানু জবাব দিল না। সে চেয়েই আছে ঘোড়াটার দিকে। ঘোড়া ক্রমশ অন্ধকারে মিশে যাচ্ছে, ঘাড় আর লেজের সাদা দুই টুকরো ভেসে আছে মায়াবতী অন্ধকারে, অনেকক্ষণ বাদে সে বলে, 'যদি মাইতিবাবু চায়, দেবেন এটি?'

'কেনে দিব?' আচমকা ফুঁসে ওঠে সতীশ, 'লজর দিচ্ছ তুমি মশায়, লজরে পড়ে ঘুড়িটা মরে গেল, নাহলে উয়ারে দিয়ে আরও ক–টা বাচ্চা করাতাম, ঘুড়াশাল ভত্তি হই যেত।'

ভানু বলল, 'আমার ঘোড়ার রক্ত রয়েছে এর দেহে।'

'থাকুক,' সতীশ আখের রসের স্বাদ নিচ্ছে, 'আছে বলে লজর দিবেন, আপনি কে কহেন দেখি, ঘুড়ার সমুখ থিকে সরে আসেন দেখি, হাত দিবেন না, আর যদি যান ইমন টুসকি দিব যে উয়ার চাঁট খাবেন, মিশ্র বাবুর বেটারে এমন লাথ ঝাড়ছে, মাসটাক লাগবে ব্যথা যেতে।'

ভানু সরে এল, বলল, 'আমাকে মারবে না।'

'কেনে মারবে না?' সতীশ রুখে এল যেন।

ভানু বোঝে নগেন গিরির বিপরিত হয়েছে তার বেটা! বদমেজাজি রাগী। সে হাসল, 'তোমার চেয়ে আমি বেশি বুঝি।'

খিকখিক করে হেসে ওঠে সতীশ, 'কোনটা খচ্চর কোনটা ঘুড়া তা কি চেনো তুমি, কহ দেখি ঘুড়ার ইংরিজি কী, ঘুড়ির ইংরিজি বা কী?'

ভানু টের পায় সে ঘোড়া জানে, ঘুড়িটা ভুলে গেছে। তা বলে সতীশ গিরির কাছে হেরে যাবে কেন, বলল, 'যদি বলতে পারি তবে এটি দেবে তো, মানে কিনে নেব, রাজি আছ তুমি?'

ঘাবড়ে গেল সতীশ, 'বাহ্ তা হবে কেন, তুমি বড়ো চালাক, বাবা এ লকটা কী বলে, ঘোটনরে সত্যি নিতে এল?'

নগেন গিরি মাথা নাড়লেন, ঘুরে ফিরতে লাগলেন। ভানুও ফেরে আর একবার নবীন ঘোড়াটির গায়ে হাত দিয়ে। তার পিছনে সতীশ ফেরে। সতীশ বড়ো সন্দেহপ্রবণ। তার সন্দেহ হল অন্ধকারের মতো। সে পিছন থেকে ভানুর ঘাড় ধরল, 'ও মশায়, দীঘায় ঘর তো?'

'হ্যাঁ, সমুদ্রপাখি হোটেল।'

'দাঁড়ান, বাবা চলি যাক, মোর কথা রহিছে তুমার সহিত।'

ভানু দাঁড়ায়। নগেন গিরি এগিয়ে গেলেন! সতীশ জ্বলজ্বলে চোখে তাকে দেখছে, ওই আঁধারময়ী সন্ধ্যায় যতটা পারে জরিপ করে নিল, বলল, 'ঘোটনের জন্য বসি রহিছ দুফর থিকে?'

'হ্যাঁ।'

'বাবায় কী কহিছে, দিবে?'

ভানু মিথ্যা বলল, 'হ্যাঁ।'

'তুমি নিবে?'

ভানু বলল, 'ঠিক করিনি।'

'বাবার মাথার ঠিক নাই, কী যে বলে, কী যে করে, ব্যাবসাটা লাটে উঠার জুগাড় হইছে, কর্মচারীগুলান ভালো, তাই চইলছে, ঘোটনরে বিচে দিবার কী হল, কেমন সোন্দর অশ্ব, তেজি অশ্ব, শালা ইর মধ্যে ঘুড়ি খুঁজে, অ্যাডাল হই গিলা।'

ভানু ডাকল, 'এসো সতীশ, বারান্দায় বসে কথা বলি।'

'তুমি রাতি রহিবে?'

'হ্যাঁ, তোমার বাবা তো বললেন।'

'বাবার অই দোষ, ঠিকুজিকোষ্ঠি জানা নাই, রেখে দিল তুমারে, যদি ভোরবেলা ঘুড়া লিয়ে পলাই যাও।'

ভানু বলল, 'সেই প্ল্যানই তো রয়েছে।'

'খবদ্দার না, তা হিলা তুমি খুন হই যাবা, উটার বিষয়ে সব কথা তুমি জানোনি, উ হিলা পাগলা ঘুড়া, খেপা।'

'সে কী, কন্থক তো অমন ছিল না।'

'তার পূর্বপুরুষ ছিলা হয়তো।'

'কী বলো তুমি?'

ভানুর হাত ধরল সতীশ গিরি তার কেঠোহাতে, খুব শক্ত করে চেপে ভানুকে হিড়হিড় করে টেনে উঠোনে এনে ফেলল। বারান্দার আলো উঠোনে এসে পড়েছে। খাটিয়া পড়েছিল একটা, তার উপর চেপে বসিয়ে দেয় ভানুকে। নিজে তার সামনে উবু হয়ে বসে। মাথার উপর নক্ষত্রময় অন্ধকার আকাশ, যে ক-টি তারা ফুটেছে সব কী ঝলমলে? তারার আলো এসে পড়েছে সতীশ গিরির মুখে। সে বলল, 'খেপা, পাগলা, মু ছাড়া উয়ারে কেউ শাসন করতি পারেনি, বশ মানাতি পারেনি।'

ভানু নড়ে বসে, 'তুমি কি বানাচ্ছ?'

'বানাব কেনে, মোর ঘুড়া, মু কি বদনাম করতি পারি?'

'ঘোড়ারে দেখে তো তা মনে হয় না।'

'উটি ধুম পাগল! মাঝেমধ্যি উহার মাথায় পকা নড়ি উঠে, আরে মশায় তখন উ ঘোটনের কী দাপানি, বনবন করি ঘুরতি থাকে, ডাকতি থাকে, দেখি মনে হয় দুটা ডানা বাহির হিবে পিঠের দু-পাশ থিকে, আরিব্বাস, সে কী রোষ, দুটি পা আকাশে তুলে লম্ফ দেয়, ঝম্প করে, ইমন কি হতি পারে, ইহার পূর্বপুরুষ পক্ষীরাজ ছিল?'

'তার মানে, ছিলই তো, মাইতিবাবু তো বলে তার ঘোড়া পক্ষীরাজই।'

‘আহা, তা না ওটা তো নাম হিলা ঘুড়ার, মু কহি ডানা মেলা ঘুড়া, সি অশ্বর পাখনা থাকত পক্ষীর মতন।’

ভানু মাথা নাড়ে, ‘অমন ঘোড়া ছিল না।’

‘কে কহিছে?’

‘কেউ না, ছিল না তো ছিল না।’

‘তুমি জানোনি ভানুবাবু, ইহার পূর্বপুরুষ ডানা মেলা পক্ষীরাজ ছিলা।’

ভানু কী বলবে, চুপ করে চেয়েই থাকে। সতীশ গিরির সিড়িঙ্গে আধখানা দেহ তার সামনে যেন মাটি ফুঁড়ে উঠেছে, বাকি অংশটা মাটির নীচে।

তার বসারই ধরনে তেমনই মনে হয় ভানুর। সতীশ বলছে, তার ঘোড়া ঘোটনটি খাঁটি পক্ষীরাজের বংশধর। এখন তার মাতৃকুল না পিতৃকুল, কোন কুলে ছিল ডানা মেলা আদি পুরুষ তা খুঁজে বের করা দরকার। ভানু কি বলতে পারবে সব ঘোড়ারই ডানা ছিল কি না পূর্বকালে।

ভানু বলে, ‘তোমার বাবা জানেন বোধ হয়।’

‘জানেনি, বাবা যা জানে, তা না জানলেও কী হত?’

ভানু বলল, ‘তোমার বাবা অনেক জানেন।’

‘কুছুই জানেনি, বলে ইসব সত্যি নয়, ঘুড়ার ডানা ছিলনি।’

‘তাই তো হবে।’

‘না হবেনি, আমার সন্দেহ হচ্ছে ঘোটনের ডানা দুটা যে কোনোদিন বার হই যাবে, ডানা ফুটি যাবে, তারপর আর উয়াকে রাখা যাবেনি, উ আর রহিবেনি ই পৃথিবীতে, সাগর পার হই যাবে।’

‘সত্যি বলছ?’

‘হাঁ সত্যি, দ্যাখো ভানুবাবু, কথাটা পাঁচকান যেন না হয়, মু অই ঘোটনকে চিনি শুধু, আর কেহ চিনেনি, মোর বাবা গিরিমশায়ও না, গিরিমশায়কে ঘোটন সহ্য করেনি, এমন চাঁট মারে, একদিন গিরিমশায় উয়ার উপরে চাপতি গেলা, ইমন ঝটকা মারলা যে তিনি চিতপটাং, পা পিছলা আলুর দম, পাগলা ঘুড়া খেপেচে, নগেন গিরি পড়েচে, কপাল ভালো হাত পা ভাঙেনি, তা ভানুবাবু, তুমি কি সত্যি খরিদ করতে এয়েচ?’

ভানু হাসে, ‘না, না, এই তো সবে দেখলাম।’

‘দেখে কি তুমার পসন্দ হিলা?’

‘খারাপ লাগেনি, রোষ আছে।’

‘রংটা কেমন?’

‘বাপের ছায়া আছে।’

‘এত যদি পসন্দ, তবে কি খরিদ করিবে?’

ভানু ‘না’ বলতেই সতীশ গিরির দুটো চোখ আনন্দে ঝকমক করে ওঠে। চোখ দুটো খুব জ্বলজ্বলে অন্ধকারে, স্পষ্ট নজরে আসছে। সতীশ হাততালি দিল, ‘বাঁচালে ভানুবাবু, খরিদ করবা কেনে, যদি বা খরিদ করবা, পুরাটা লোকসান হই যাবে, তুমি লিয়ে গেলে, হুটেলের সামনে রহিল ঘোটন বাবাজি, তারপর হয়তো রাত্তির বেলায় জুছনার ভিতরে ডানা ফুটি গিলা, ডানা যদি একবার ফুটে, কে উয়ারে ধরি রাখে, হাঁ, ভানুবাবু তুমি না কহিছিলে তুমার ঘুড়া ইয়ার পিতা, তা সেই বাবাটি কই?’

ভানু গম্ভীর স্বরে বলে, ‘পালিয়েছে।’

‘তার মানে, কুথায় পালাল, কেনে পালাল?’

ভানু তখন ধীরে ধীরে সব কথা বলে। বুদ্ধপূর্ণিমার কথা বাদ দেয় না, পোখরানের বিস্ফোরণের কথা বলতে ভোলে না। তার কথা শুনে তিড়িং করে লাফ দিয়ে ওঠে নগেন গিরির সিড়িঙ্গে ছেলে সতীশ গিরি, 'হা ভগবান, সিই ঘুড়ারে তুমি খুঁজি বেড়াচ্ছ, তুমি ধরতি পারোনি সি ঘুড়া কুথায় গেল, ই তো প'ষ্কার ঘটনা, তুমার অশ্বর ডানা ফুটি গিইছে।'

'এ–এ হে, এসব কী বলো তুমি!' ভানু বিহ্বল হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

'যা কহি ঠিকই কহি।' দুটি লম্বা হাত ডানার মতো ভাসাতে থাকে সতীশ গিরি, 'খবর পাও নাই কুছু ভানুবাবু?'

'কী খবর?'

'পোখরানের বোমায় মোদের শক্তি অনেক বাড়ি গিছে, তা কেউ সহ্য করতি পারছেনি, উহার বিপক্ষে বলছে কত লক, যা পারে বলছে, তেমন একটা হল মোর বাপ নগেন গিরি, শালা দেশের ভালো হোক ইটা তিনি চান না, অথচ অ্যাটম বোমা কী না পারে, শত্রুরে কেঁচো করি দিতি পারে, দিখো দিঁইছে কি না, ইবার বাগদাদ, রোম, চীন সব মোদের হই যাবে, ইমনকি অই যে কহে, ভারত আবার জগতসভায় শেরেষ্ঠ আসন লবে, তাই হবে, কিন্তু কুছু লক সহ্য করছিনি, কুকথা কহিছে, ইবার দ্যাখো, বোমার রাতে ঘুড়ার ডানা ফুটি গেলা, বিশ্বাস হিলা তো উ বোমার কত শক্তি, লকে শুধু মিথ্যা রটায় ই হচ্ছে, উ হচ্ছে।'

ভানু বলল, 'থাক এসব, তুমি আবার এসব কথা বলো কেন?'

'বেশ করি, একশোবার কহিব, ঘুড়ার ডানা হয় না ইটা বাবায় কহে কিন্তু ডানা যে হয় তা পরমাণ হই গেল, তুমি তো নিজি দেখিছ।'

'কখন দেখলাম!' ভানু অবাক।

'এই তো কহিলে, তুমার ঘুড়া পুন্নিমা রাতে ডানা মেলে উড়ি গেল।'

'সে তো তুমি বললে।'

'মু কেনে কহিব, মু কহিছি ঘোটনের ডানা ফুটিবে, ইখন বুঝা যাচ্ছে কবে ফুটিবে, বোমাটা শত্রু দেশের উপর পড়ুক, তখন ঠিক ঘোটনের ডানা ফুটি যাবে, তা যদি না পড়ে ফের মরুভূমির নীচয় ফাটানো হোক, ডানা মেলে উড়ি যাবে ঘোটন, মু ঠিক খবর পাই যাব, মু উয়ার পিঠে চাপি যাব, কী বুঝলা ভানুবাবু?'

ভানু চুপ করে আছে। সে ভাবতে চেষ্টা করছিল কার সামনে বসে আছে। এ এক উন্মাদ! কীরকম হাসছে সতীশ! নগেন গিরি তো বলেনি একথাটা?

নগেন গিরি বলেছিল ছেলে তার মামার বাড়ির ধাত নিয়ে জন্মেছে! কিন্তু এ তো সম্পূর্ণ আলাদা মানুষ।

সতীশ বলল, 'চুপ করি রহিছ কেনে ভানুবাবু, কহ দেখি কীভাবে ডানা দুটি ফুটিলা, ও কি মরুভূমির দিকে উড়ি গেলা?'

ভানু চুপ। ভানুর গা ছমছম করে ওঠে। বাড়িটা কী নিস্তব্ধ। নগেন গিরি কোথায়, তাঁর বউই বা কোথায়, কাজের মুনিষ, কাজের বউ? এত বড়ো প্রাঙ্গণে অন্ধকারে তাঁরা দুজনই শুধু বসে আছে। খেয়ালই করেননি কখন বারান্দার আলোটি নিভে গেছে। লোডশেডিং। বারান্দায় দম কমানো একটি হ্যারিকেন। হিমে ভিজে যাচ্ছে ভানু দাস।

সতীশ বলল, 'তুমারে একটা কথা কহি ভানুবাবু, খুব গোপন রাখবা, যখন বোমাটি ফাটল, বাবার কী তর্জনগর্জন, মনে হয় যেন বাবারই মাথায় পড়িছে, নিজের দেশ বড়ো হইছে তাহাতে আনন্দ নাই, মোর খুব রাগ হচ্ছিল, মু তকে তকে ছিলাম, দিলাম বিষ খাউয়ে।'

'সে কী!' ভীত ভানু দাস বারান্দার দিকে হাঁটে। তাকে জাপটে ধরল সতীশ, 'যাবা কুথায়, শুনি যাও, বাবারে তো ডর লাগে, বাবারে তো দিবনি, বাবার ঘুড়িটারে দিলাম।' খিখি করে হাসে সতীশ, 'ঘুড়িটারে বিষ দিয়া মারি দিলাম, বাবা বুঝুক, বোমার কত শক্তি, ঘোটনটারে মোরে দিই দিইছে বলে ঘোটন বাঁচি গিইছে, আর উয়ার তো ডানা ফুটল বলে।'

ভানু ছিটকে সরে গেল। ডাকল গিরিমশায়কে। গিরিমশায় বারান্দাতেই অন্ধকারে বসে নিঝুম, হাত বাড়ালেন, 'আস ভানুবাবু!'

'কী বলে আপনার বেটা?'

'জানি, উন্মাদ, উন্মাদ।'

'সব শুনেছেন?'

'হ্যাঁ, তুমি ভোরবেলা রওনা হয়ে যেয়ো, আস্তাবলের দিকে খবদ্দার যেয়ো না, ও পাগলের খুব সন্দেহ, হয়তো আস্তাবলে ছুরি হাতে বসে থাকবে, কী বুঝলে?'

ভানু জিজ্ঞেস করে, 'এ রোগ কতদিনের?'

নগেন গিরি হাসলেন, 'একে কি রোগ কহিবে তুমি, রোগ কয় ইহারে?'

'আজ্ঞে তাই তো জানি।'

'সে রোগ ইটি নয়, ইটি হল গুপ্ত স্বভাব, আদিকাল থেকে মানুষ তার ভিতরে বহন করি চলিছে, ই স্বভাব কারোর জাগে, কারোর জাগেনি, আবার যার জাগে সে জাগায় আরও অনেকজনের ভিতরে, চাদ্দিকে ইমন ঢেউ উঠি যায় কখনো কখনো যে মানুষ ভালোমন্দ জ্ঞান হারাই ফ্যালে ই স্বভাবে পড়ে, আসলে ই স্বভাব ঘুমায়ে থাকে, যখন জাগে সাপের ঘুম ভাঙার মতো করে জাগে।'

দুটি নীল মশারির ভিতরে দুজনে বসে আছে। ঘরে নীল আলো। সন্ধ্যে থেকে নগেন গিরি বিষণ্ণ হয়ে আছেন। এখন কত রাত ভানু জানে না, তবে শুক্লপক্ষের তৃতীয়ার চাঁদ পূর্ব দিগন্ত থেকে কয়েক হাত উপরে উঠে এসেছে, ভানু বাইরে থেকে দেখে এল তা একটু আগে। শীর্ণকায় হলুদ চাঁদটি আকাশ পৃথিবীকে যেন বহু সহস্র বতসর পিছিয়ে নিয়ে গেছে, ভানুর তা মনে হয়েছে। কত যুগ, কত সহস্র বছর আগের নদীতীরে, তৃণভূমিতে ছুটে গেছে মাইতিবাবুর ঘোড়া! সেই পৃথিবীতেও তো এই চাঁদ উঠেছে এখন, সেই কৃষ্ণ সাগর, কিংবা কাস্পিয়ান সাগরের কূলে, উড়াল হ্রদের তীরে, আমুদরিয়া, সিরদরিয়া নদীর ধারে।

নগেন গিরি বললেন, 'তুমি কি ইতিহাস জানো ভানুবাবু?'

ভানু মাথা নাড়ে, 'না আজ্ঞে, কিছুই জানিনে, ছিলাম জুট মিলের লেবার, মিল বন্ধ, এসে পড়লাম দীঘা, ঘোড়াটার মায়ায় পড়ে গেলাম।'

নগেন গিরি বললেন, 'ই বড়ো সব্বোনেশে খেলা, যে খেলায় ঢুকি পড়ছে সবাই, ঘুড়ইটার কী দোষ ছিল? ছিলনি, অবোধ জীব, তারে বিষ দিল মোর উপর শোধ নিতে, কেনে কহ দেখি?'

ভানু মাথা নাড়ে, 'কী বলি বলুন?'

২একদিন কথায় কথায় মোর সহিত সতীশের ঝগড়া লাগল, বাপ বেটার ঝগড়া, আমি যত কহি মাথা ঠান্ডা করে ভাবা দরকার, ঘোড়ার ডানা হয় না, কোনো কালে ছিল না, সবটাই কল্পনা, তো সে কহে ছিল, ডানা ছিলই, একুশ বছরের বেটা যদি কহে ঘোড়ার ডানা ফোটে, ঘোড়া উড়ে যায় তো মেজাজ কি ভালো থাকে? যদি কহে যুদ্ধ না হিলা উপায় নাই, যুদ্ধ চাইই চাই, এতকাল বাদে একটা যুদ্ধের বাতাস উঠিছে, তবে কার মন ভালো থাকে? যদি বলে মানুষ মারা দরকার, মরণ চাই...!'

'কেন বলে, ও তো আপনারই বেটা?'

'শুধু কি সতীশ কহে, কত লক কহে।'

'সত্যি বলছেন?'

'সত্যিই তো, খুঁজ নাও, সবাই কহিবে যুদ্ধ লাগুক, যুদ্ধর কোনো বিকল্প নাই, ঘোড়ার ডানার কথা না কহে তো উরকম আর কিছু কহিবে, তা ছেল্যাটাকে সেদিন খুব ধমকাইছি, ও রাগে ফোঁস ফোঁস করতি করতি চলি যায়, পরদিন দেখি ঘুড়িটা মরে পড়ে আছে আস্তাবলে, কহে কিনা যুদ্ধ শুরু হিলা, যুদ্ধ লাগল, যুদ্ধে ঘুড়িটা মরিছে।'

ভানু বলে, 'এখন কী উপায়?'

'উপায় নাই, কেহ যদি কহে অশ্বর ডানা ফুটে, তো ফুটবে, কী করা যাবে।'

'তাতে ঘুড়িটা মরবে?'

'মরবে, উপায় নাই।'

ভানু বিড়বিড় করে, ‘ঘুড়িটার সাথে কন্থকের ভালোবাসা হয়েছিল।’

‘তা তো জানি।’

ভানুর মনে পড়ে চোদ্দোবেড়িয়ার চরে ঘুড়িটাকে নিয়ে আলাদা হয়ে গেছে ঘোড়াটা। চোদ্দোবেড়িয়া কেন, যেন আমুদরিয়া নদীর কূলে, কৃষ্ণ সাগরের তীরে, কাস্পিয়ান সাগরের কূলে নির্জনে কূজন করেছে দুইজনে। ভালোবাসিয়াছে। কত যুগের ভালোবাসা ছিল! কত জন্মের, জন্মান্তরের সেই ভালোবাসা থেকে জন্ম নিল কত সব তেজিয়ান ঘোড়া, কী রোষ তাদের, কী দাপট! আকাশে দু–পা তুলে উঠে যেতে চায় যেন, উড়ে যেতে চায় যেন। আহা রে, গিরিমশায়ের মুখের দিকে তাকানো যাচ্ছে না। ভাবতে তো ভালোই লাগে ঘোড়ার দুটি ডানার কথা, সেই ডানা মেলে পক্ষীরাজ ওড়ে তা ভাবতে ভাবতে ঘুম এসে যায় যেন। এক লহমায় পক্ষীরাজ পৌঁছে যায় সাগর থেকে পাহাড়ে, পাহাড় থেকে মরুভূমিতে। কিন্তু এ তো শুধুই স্বপ্ন, একে সত্যি ভাবলেই সব্বোনাশ। তাই ভেবে বসে আছে সতীশ।

নগেন গিরি বললেন, ‘ঘুড়িটার মৃত্যুর খবর কাউকে তুমি কহ না।’

‘আপনার বেটাই বলে দেবে।’

নগেন গিরি বললেন, ‘ওর কথা কেউ বিশ্বাস করে না।’

‘তবে আপনার চিন্তা কী?’

‘মাথায় যে যুদ্ধ, বোমা, রোষ ঢুকি গিইছে, কুথায় কী করে বসে, থাক ওসব, তুমি ইবার শুয়ে পড়ো ভানুবাবু, ভোরে উঠতি হবে।’

ভানু শুয়েছে, পাশের মশারিতে গিরিমশায়ও। ভানুর ঘুম আসে না। সে ভাবছিল ঘুড়িটা কি জানতে পেরেছিল কন্থক পালিয়েছে? যদি জানতে পারত তবে ঘুড়িটাও কি ঘরে থাকত? পালাত। ওরা যে সেই আমুদরিয়া নদীর তীর থেকে পালাচ্ছে, কৃষ্ণসাগরের রাত্রি থেকে পালাচ্ছে।

চিত হয়ে শুয়ে নগেন গিরি বললেন, ‘ঘুড়িটা খুব পেয়ারের ছিল, মুর ইখনও বিশ্বাস হয় না বিষ দিয়া উভাবে মারি ফেলবে, রাতে যদি সাড়াও দিত, তাহলে বাঁচি যেত, পশুর ডাক্তার আছে ই গাঁয়ে।’

‘নিঃশব্দে মরেছিল?’

‘হাঁ, একেবারে নিঃসাড়ে, ভোরে মু উঠে গিয়ে দেখি শুয়ে আছে চোখ উলটে, সেদিন সতীশ বেলা ন–টা পর্যন্ত ঘুমায়, জন্তুটারে মারি দিয়া, সব কাজ শেষ করি তবে শেষরাতি উ ঘুমাতি গিইছিল, ইবারে, ই আশ্বিনে ঘুড়িটা ফির পেটে বীজ লিত তুমার অশ্বর।’

‘তাই ঠিক করছিলেন?’

হাঁ, প্রেমের সন্তান জানো, উ সন্তান ভালো হয়।

ভানুর চোখ ছলছল করে ওঠে আপনাআপনি, বলল না কিছুই। এতক্ষণে গিরিমশায় উজাড় করে দিলেন নিজেকে। ঘরের বাতাস ভারী হয়ে ওঠে। ভানু চিত হয়ে শুয়ে থাকে। চোখের পাতা জোড়ে না। শুয়ে শুয়েই টের পায় ঘুমোননি গিরিমশায়ও। ভানু চোখ বন্ধ করে ঘুমিয়ে পড়তে চাইছিল, ঘুম আসছিল না। তার চোখের সামনে শীর্ণকায় সতীশ গিরির ভাঙাচোরা মুখখানি ভেসে উঠছিল বার বার। চোখ দুটিতে আগুন। ও যেন মানুষের চোখ নয়, বাঘের।

গিরিমশায় ডাকলেন, ‘ঘুমাইছ ভানুবাবু?’

‘নাহ্!’ দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভানু।

‘মোর ডর লাগে, যদি ঘোটনের ওই কপাল হয়?’

'ঘোটন তো ওর নিজের ঘোড়া।'

'হলে কী হবে, ওর কোনো হিসাব নাই, যা ইচ্ছে করতি পারে, যখন যিটা করবে, সিটার পিছনে যুক্তি খাড়া করি দিবে।'

'না, না তা হবে না, মায়া জন্মাবে না ঘোটনের উপর?'

'মায়া!' হাসলেন গিরিমশায়, 'দয়ামায়া থাকলি অবোধ জীবটারে বিষ দিয়া মারতি পারে, আহা! ইমন বিষ আনিছিলা, ছটফট করতি করতি মরি গিলা ঘুড়িটা, কিন্তু ডাক শুনিনি কেনে ওইটা অবাক হওয়ার।'

ভানু বলল, 'এর কোনো বিহিত করা যায় না?'

'কী করে?'

'এর বিপক্ষে কেউ দাঁড়ায় না?'

'কে দাঁড়ায়, ঢেউ উঠিছে ভানুবাবু, ইতিহাস যদি জানতে তুমি, টের পেতে কী হইছিলা একদিন, এ তো ঘুড়ি মরিছে, দাঙ্গায় মানুষ কি কম মরিছে, আবার মানুষ মারার ইঙ্গিত হিলা ঘুড়িটার মরণ, কতখানি রোষ, কতখানি হিংসা মাথার ভিতরে ঢুকি গিইছে কহ দেখি, দিনা দিনা তা আরও বাড়বে ভানুবাবু, যত অভাব তত হিংসা, অভাবী মানুষের ভিতর হিংসা জাগানোর খেলা চলিছে।'

'আপনার বেটার তো অভাব নেই।'

'হিংসা তো আছে মনে, মানুষের মনে ঘুমাই থাকে হিংসা, তা জাগি উঠিছে সব দিকে, ওর ভিতরেও জাগিছে, শয়তান দখল করি নিবে সব, খুব বিপদ দেখি সমুখে, ক–বছর ধরি কী চলিছে কহ দেখি।'

ভানু বলল, 'আমার ঘোড়াটাকে পাওয়া যাবে না তাহলে?'

'ইতদিন হই গিলা!'

'এতদিন হয়ে গেল বলে ফিরবে না?'

'মনে হয় তো।'

'আমিও তো কতদিন ঘরছাড়া, আমি কি ফিরব না?'

চমকে ওঠেন গিরিমশায়, 'তুমার বিষয়ে কুছুই তো জানা নাই।'

ভানু নিশ্চুপ। ভানুর মনে পড়েছিল ফুলরানির কোলের শিশুটির কথা। মুখখানি ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছে মন থেকে। ফুলরানির মুখখানা কেমন তাও যেন ভুলে যাচ্ছে সে। কন্থক কি এইভাবে ভুলে যাবে এই সমুদ্রতীর, হোটেল, সমুদ্রপাখি, তার বন্ধু ভানু দাস, মালিক শ্রীপতি মাইতিকে? সে কি ভুলে গেছে ঘুড়িটার কথাও? ফিরে গেছে আদিম যূথে? পূর্বজন্ম, পিতৃ–পিতামহের জন্ম, নদীতীর ধরে উৎসে পৌঁছে গেল নাকি পক্ষীরাজ? হতাশ ভানু দীর্ঘশ্বাস ফেলল, 'তাহলে আর কেন খুঁজি?'

'না খুঁজেই বা করবে কী?'

ভানু বিড়বিড় করে, 'ভোজপুরে চলে যাই।'

'ভোজপুর, আরা জিলা?'

'হ্যাঁ।' ভানু চোখ বুজে ফুলরানির ঢলোঢলো মুখখানি মনে করতে চাইছিল। ফুলরানি, তার বাবা মা, কোলে ধরা চাঁদটিকে। খোকার নাম দিয়েছিল বুড়ো শ্বশুর। কী নাম? তার ইষ্ট দেবতার নাম। ইষ্টদেবতা গোবিন্দ। দাদামশায় বলত গোবিন্দ, দিদিমা বলত গোপাল। তারপর! কেমনভাবে হাসত সেই সোনার চাঁদ, কেমনভাবে? আকাশের চাঁদ ডাকত কেমনভাবে? ভানু মনে করতে চাইছিল। এসব তার পূর্বজন্মের কথা মনে হয়। অনেক দূরের কথা।

গিরিমশায় ডাকলেন, 'ঘুমালে নাকি, আরা জিলা তো ভীষণ জায়গা! সেখেনে কী?'

'হ্যাঁ, তা বটে।' ভানু বিড়বিড় করে, 'সেখেনে পরিবার রয়েছে।'

'তুমার ডর লাগেনি?'

ভানু বলল, 'ডর করে কী করব?'

'কত দিন যাওনি?'

'অনেক দিন, অনেক বছর, আরা জিলায় আমি কোনোকালে যাইনি।'

গিরিমশায় বিস্মিত হয়ে উঠে বসলেন। ভানু দেখছে বিস্মিত গিরিমশায়ের স্ফীত চোখ দুটি তার দিকে চেয়ে স্থির। কিছুই বুঝতে না পেরে বিব্রত হয়ে পড়েছেন তিনি। ভোজপুর যায়নি ভানু তো ভোজপুরে তার পরিবার গেল কী করে? এই কথাটির জবাব কি ভানু দাস দেবে? ভানু দিল না। মৌন হয়ে থাকল। তার মৌনতায় বিষাদ না বিপন্নতা আছে তা অনুধাবন না করতে পেরে নিশ্চুপ বসে আছেন গিরিমশায়। অনেকক্ষণ বাদে ভানু বলল, 'ও জায়গায় প্রায়ই মানুষ মরে, ধান কাটার আগে, ধান বোনার সময়।'

'হ্যাঁ, আকাশে মেঘ উঠলিই হয়।'

ভানু বলল, 'এর কোনো বিহিত নেই?'

'না নেই, কত সব নাম রহিছে, বাথানিয়াটোলা, জাহানাবাদ, লছমনপুর বাথে কত নাম, মানুষ মারার জন্য উসব জায়গার নাম ছড়াই পড়িছে।'

'হ্যাঁ, কিন্তু আমি তো ওদেশে যাইনি কখনো, কী করে চিনব?'

'যদি চিনতি চাও, অসুবিধে হবেনি।'

'ওদিকে কি পক্ষীরাজ যেতে পারে?'

'সি তো ঘোড়াটা জানে।'

'আপনি কী অনুমান করেন?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলেন গিরিমশায়, 'এক এক জায়গায় এক এক রকমে মানুষ মারার বেবস্থা, মানুষের মনে হিংসা বাড়ি যাচ্ছে, কী মনে হয় তুমার?'

ভানু বলল, 'মানুষ তো এমনই, জন্তুর মতন প্রায়।'

'তুমি কি সেইরকম, মু কি সেইরকম? কহ দেখি।'

'তা না হোক, এই যে ঘুড়িটা মরল, এই যে মারণ বোমা ফাটানো হল, ও তো মানুষ মারার কল, জন্তুতে ক্ষুধায় জন্তু মারে, মানুষ ফুর্তির জন্য মারে।'

গিরিমশায় শুয়ে পড়েছেন। ভানুও চোখ বুজেছে। ধীরে ধীরে ঘুম এসে যায় দুজনের চোখে। ভোর হতে হতে ঘুমটি ভেঙে যায় ভানুর। বাইরে সবে আলো ফুটেছে তখন।

পায়ের দিকের জানালায় আবছা আলোয় ফুটে ওঠা পৃথিবী। সে চট করে উঠে বসল, আর না, দীঘায় ফিরতে হবে, খুব বিশৃঙ্খল হয়ে গেছে মন। সে মশারি তুলে বেরিয়ে এল, কপাট খুলে বারান্দায়। বারান্দা থেকে উঠোনে নেমে দেখল অদ্ভুত দৃশ্য। সতীশ গিরি উঠোনে দুটো ইট রেখে ডন দিচ্ছে। ফোঁস ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলছে শীর্ণকায় মানুষটি আবছা আলো–আঁধারে। তাকে দেখে দাঁড়াল, হাসল, 'শরীরই আসল, বডিই সব।'

ভানু কিছু বলে না, হাসি চাপল।

'শরীর চর্চা করি দেশমাতার চরণে নিবেদন করতি হবে নিজেকে।'

'কে বলেছে?' ভানু টিউবওয়েলের দিকে যেতে যেতে বলে।

'কে আবার কহিবে, তুমি দেখছি নগেন গিরির মতন।'

ভানু টিউবওয়েলের জলে মুখ ধুয়ে ফিরে এল। আলো আরও ফুটে গেল। উদার হয়ে যাচ্ছে প্রকৃতি। সতীশ গিরির সমস্ত দেহ ঘর্মাক্ত। গামছা দিয়ে গা মুছছে সে, বলল, 'তুমি ইসব বিশ্বাস করোনি?'

'করি, তবে এর ফলে যদি অবোধ প্রাণী মারতে হয়, এখানে বুঝো? তবে তো সব্বোনাশ।'

‘কে অবোধ’, সতীশ গিরি রুখে এল, ‘ইটা প্রতীকী, এখানো বুঝো?’

মাথা নাড়ে ভানু, বলল, ‘মায়া হল না তোমার, তুমি না নগেন গিরির বেটা, তুমি না নগেন গিরি মশায়ের বাপের নাতি।’

সতীশ বলল, ‘নগেন গিরিরে একটু সমঝানো দরকার ছিল, তারপর চুপ মারি গিইছে, যেমন কিনা অযোধ্যা কাণ্ড হিলা, তারপর উয়ারা ঠান্ডা, অযোধ্যা কাণ্ডর মতনই ইটা প্রতীকী কহিতে পারো।’

ভানু আর কথা বাড়ায় না, বলল, ‘আমি যাব, গিরিমশায়কে বলে দিয়ো।’

‘দাঁড়াও, মু তুমারে আগায়ে দিয়ে আসি।’

‘দরকার হবে, না একা পারব।’

‘না মোর সাথে চলো, বাসে তুলে দিব আমি।’

‘কেন?’ ভানুর ভ্রূ ভাঁজ হয়ে গেল, ‘অদ্ভুত তো, তুমি বাসে তুলবে কেন?’

‘তুমি কুথায় যাচ্ছ সত্যি করে জানা দরকার।’

‘কেন, জেনে কী হবে?’

‘তুমি লকটা কী উদ্দেশ্যে আসিছ জানিনি, অশ্ব তো খরিদ করলেনি, উ জন্য আসো নাই, তুমি কার পক্ষে বুঝা দরকার।’

‘কার পক্ষে মানে?’

‘বাবার পক্ষে না মোর পক্ষে, বাবার পক্ষের লক তুমি, কিন্তু তুমারে মোর পক্ষে আসতিই হিবে, শালা মোরা কী কাণ্ড করছি জানোনি, বোমা ফাটানো হিলা, আরও কত কী হিবে, দেহ চর্চা হচ্ছে, ঘুড়িটারে মারা হিলা, আগে অযোধ্যা কাণ্ড হিলা...।’ বলতে বলতে পেট চেপে বসে পড়ে সতীশ গিরি, ‘গ্যাসের ব্যথা, এক ঘটি পানি লিয়ে আসো ভানুবাবু।’

দুটি চোখ স্ফীত হয়ে বেরিয়ে পড়েছে প্রায়। জিভ বেরিয়ে পড়েছে সতীশের।

একটু আগে এই ঘরে প্রলয় হয়ে গেছে। চিতকার, কান্না, গর্জন সব মিলেমিশে একাকার হয়েছিল। এখন সব নিঝুম। ভারতী মেঝের উপর দেওয়ালের কোণে বসে আছে।

শ্রীপতি বাইরে গেছে। আবার এসেছে আবার গেছে। এখন রাত কম হল না। সমুদ্র ছাড়া সব অতল ঘুমে তলিয়ে। শ্রীপতি চুপচাপ বসেছিল, ভারতীর চোখে চোখ রাখতে পারছে না। মনে হচ্ছে ভারতী তার মনের কথা পড়তে পারছে। কী ভাবছে শ্রীপতি তা টের পাচ্ছে ভারতী। শ্রীপতির মন যে উড়ুউড়ু হয়েছে তা জেনে ফেলেছে ভারতী।

আর ভারতী! কোটরে ঢোকা চোখ নিয়ে হাঁ করে শ্রীপতির দিকে চেয়ে আছে। চোখের পলক পড়ে না। সে কিছুই ধরতে পারছে না। শ্রীপতি যে তার থাকবে না তা কল্পনাতেও আসে না। শ্রীপতি তার অবলম্বন। শ্রীপতিকে খড়কুটোর মতো ধরে রাখতে চাইছে ভারতী।

কাল থেকে আজ। ঝড়ের মতো কেটে যাচ্ছে। কিছু শ্রীপতির লক্ষে, কিছু অলক্ষে। সব কথা কেউ জানে না। একজন দুজন একটু আধটু। কাল দুপুরে মা আর বউ যে হাসপাতালে গেছে এ খবর পাবে কোত্থেকে? তখন তো শ্রীপতি বালিসাই। ভানু কোথায় জানে না। শ্রীপতি মীরগোদা যাবে যাবে করে বালিসাই গিয়েছিল রামনগর পার হয়ে।

সেই সময় মধুমিতা আর তার শাশুড়ি হাসপাতালে ডাক্তারকে ধরে পড়েছে। কী ব্যাপার? ভারতী, ওই নার্স, ও শ্রীপতি জানাকে তুক করেছে, সিস্টার, যিনি দেবীর প্রতিমূর্তি হবেন, তিনি একটা পরপুরুষের রক্ষিতা হয়ে যান কী করে?

হ্যাঁ, হতে পারে, মেয়েমানুষটা তো বেজম্মা, বংশ পরিচয় নেই, আদাড়েবাদাড়ে কুড়িয়ে পাওয়া বাচ্চা, তাই—।

ডাক্তার দু–হাতে বাধা দিয়েছে শ্রীপতির মায়ের মুখকে, ‘প্লিজ ওসব কথা বলবেন না, খুব খারাপ, খুব খারাপ।’

বয়স্ক মানুষটা সদাশয়। ভালো মানুষ। তিনি এইসব কথায় বিপন্ন বোধ করেছেন। বাস্টার্ড! হতে পারে কেন তাইই, সত্যিকারের জন্মসূত্রহীন। হারানো মেয়ে হতে পারে। বুড়ো মানুষটি বার বার রিকোয়েস্ট করেছেন, ‘এসব আমাকে বলবেন না, এসব আমার এক্তিয়ারে নেই, পার্সোনাল ব্যাপার।’

কিন্তু শ্রীপতির বউ আর মা হাল ছাড়েনি। মধুমিতার চোখ ছলছল করে ওঠে, সে ডাক্তারের হাত ধরে ফেলেছে, ‘আপনি না দেখলে আমরা যে মরে যাব, আমার স্বামী, বাচ্চা সব যাবে, পুরুষমানুষ খেয়ালে মেয়েমানুষ পুষুক, তা পুষতে পারে, সেটা ভয়ের নয় ডাক্তারবাবু, ওখেনে মন মজে না, ফুর্তি হয়, কিন্তু মেয়েমানুষ যদি পুরুষ রাখে, সে পুরুষের আর বেরোবার উপায় নেই, ডাইন তুক করেছে, আপনার ভারতী নার্স ডাইনি।’

ডাক্তার পায়চারি করছেন তখন। শেষ অবধি তিনি আর পারেননি, বলেছেন, ‘ঠিক আছে, মিস চৌধুরির সঙ্গে কথা বলে দেখব আমি, ঠিকই তো, বউ বাচ্চা সব আছে, তবু কেন মিস চৌধুরির ওখানে পড়ে থাকবে? খুব খারাপ খুব খারাপ, ভারতীর সরে আসা দরকার।’

শ্রীপতির মা মাত্রা যোগ করেছে, নার্সের যদি স্বভাব এমন ধারা হয়, তবে হাসপাতালে রুগি আসে কী করে? বেটাছেলে রুগি হলেই ভেড়া হয়ে যাওয়ার ভয়, নার্স মাগি তুক করে নেবে।

এই কথাই গতকাল রাতে ডাক্তার সান্যাল ভারতীকে বলেছে। ভারতীর নাইট ডিউটি ছিল। ডাক্তার সান্যাল বললেন, ‘তুমি যদি ট্রান্সফার চাও আমি চেষ্টা করতে পারি, ব্যবস্থা করব, তোমার এই জায়গা থেকে চলে যাওয়া উচিত, তোমার নামে খারাপ কথা আমি শুনতে পারব না।’

ভারতী নিশ্চুপ হয়ে গেছে।

সান্যাল জিজ্ঞেস করেছেন, ‘তোমার লাইফ হিস্টরি সব্বাইকে বললে কেন?’

ভারতী জবাব দেয়নি। নীরবে তার কাজ করেছে। মাঝরাতে ঘরে চলে এসেছে। এসে ঘুমিয়েছে কি চুপ করে থম মেরে বসেছিল তা ভারতী চৌধুরিই জানে। আজ ডিউটিতে যায়নি ভারতী। সকাল থেকে ঘর–বার করেছে। না ঘুমোনো চোখ দুটোয় লালচে আভা, চঞ্চলতা বেড়েছে।

ঠিক বিকেলে শ্রীপতি কেন সব্বাইকে একসঙ্গে পেয়ে যায় সে। শ্রীপতি যাচ্ছিল হোটেলে, ওর মা আর বউ আসছিল এদিকে। ভারতী দুইয়ের মাঝখানে গিয়ে পড়েছে।

'ও মা আমার এখানে একটু আসবে, কথা আছে।'

'ও মধুমিতা আমার এখানে একটু আসবে, কথা আছে।'

'ও মা তোমার ছেলেকে নিয়ে এসো।'

ওরা তিনজনেই চমকে গেছে। কণ্ঠস্বরটা কেমন যেন। শ্রীপতি থাকতে চাইছিল না। মা–বউকে সামনে রেখে ও ভারতীর সঙ্গে সহজ হয়ে কথা বলতে পারবে না। আর কথারই–বা কী আছে, সে ভারতীকে ছাড়তে চায়। অনেক হয়েছে, আর না, মা–বউ ডাক্তারের কাছে গিয়ে তার কাজটাই করে দিয়েছে। এ সুযোগ শ্রীপতি ছাড়বে কেন? মায়ের কাছে শুনেছে সে, সে এড়াতে চায়, 'কাজ আছে, পরে হবে।'

শ্রীপতির মা বলে, 'না বাছা সময় নেই।'

কিন্তু ভারতী ছাড়ে না, 'এসো–না তোমরা, এসো।'

রাস্তার ভিতরে গোলমাল পাকিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা ছিল। ভারতীর পিছনে পিছনে এসে উঠেছে তার কোয়ার্টারে। মধুমিতা দাঁতে দাঁত চেপে আছে। ঠোঁট কামড়ে ধরছে বার বার। শ্রীপতি গোলমালের ভয় করছিল। শ্রীপতির মা খুব শক্ত, বলছে, 'বাছা, কী বলার তাড়াতাড়ি বলো, মন্দিরে যাব।'

মধুমিতা হিসহিস করেছে, 'এলে কেন মা? বাজারি মেয়েমানুষের ডাকে আসতে হবে?'

'আহা।' শ্রীপতি থামাতে চায় বউকে।

কথাগুলো ভারতীর কানে গেছে কি না ধরা গেল না। সে খুব শান্ত স্বরে জিজ্ঞেস করল, 'ও মা, তোমরা কী বলে এসেছ?' সে কথার ভারে যেন বার বার নুয়ে পড়ে।

মধুমিতা চুপ করে দেওয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। শ্রীপতির মা বুঝে গেছেন ব্যাপারটা। বৃদ্ধা বলে ওঠেন, 'ভুল কিছু নয়। তুমি আমার ছেলেকে ছাড়ো মা, সংসার তো হয়নি তোমার, লোকেরটা ভাঙো কেনে?'

ভারতী থমকে যায়, তারপর আবার বলে, 'মা তোমরা, ওই কথা বলে আসতে পারলে! তোমাকে মা বলে ডেকেছিলাম।'

'ছেঁদো কথা ছাড়ো। তুমি লোকটাকে তুক করেছ, চলে যাও এখেন থেকে, চলে যাও।' আবার হিসহিস করে ওঠে মধুমিতা।

এত সব কথার ভিতরে শ্রীপতি চুপচাপ।

'ওগো তুমি কিছু বলবে না? আমার নামে কীসব বলে এসেছেন এঁরা, ডাক্তারবাবু বললেন।'

শ্রীপতি কী বলতে গিয়ে চুপ করে যায়। কিন্তু মধুমিতা যেন ঝাঁপিয়ে পড়ে, এগিয়ে এসে এক থাপ্পড়ে প্রায় শুইয়ে দিয়েছে ভারতীকে, 'লজ্জা করে না। বাজারি মেয়েমানুষ তো বাজারে যা, মোর সোয়ামিকে টানিস কেনে? লাইনে গে দাঁড়া...!'

ভারতী পড়তে পড়তে টাল সামলায়। তারপর তীব্র আর্তনাদ করে ওঠে, 'তুমি আমাকে মারলে!' সে ঘুরে শ্রীপতির দিকে তাকিয়েছে। শ্রীপতি তখন মাকে আর বউকে বলছে, 'চলে যাও, চলে যাও, এটা ভালো হচ্ছে না, ভদ্রলোকের মতো হচ্ছে না।'

মা ফুঁসে উঠেছে, 'আজ একটা কিছু হয়ে থাক।'

ভারতী একবার শ্রীপতির দিকে তাকায়, একবার মধুমিতার দিকে, বিড়বিড় করে বলে, 'আমাকে মারলে, ওগো তুমি কিছু বলবে না? তুমি কিছু বলো।' বলতে বলতে দু–হাতে কান চাপে ভারতী।

'তুমি আমার ছেলেকে ছাড়ো, তারপর কথা, না ছাড়বে তো থানায় যাব আমি, মন্ত্রীর কাছে চিঠি লিখে তোর চাকরি খাব, নার্সগিরি করিস না কী করিস তা জানাব।' শ্রীপতির মা বলল।

ঘটনা অনেকক্ষণ গড়ায়। শেষ অবধি মধুমিতা আর শ্রীপতির মা টানতে টানতে শ্রীপতিকে নিয়ে বেরিয়ে যায়। ভারতী ওখেনে বসে থাকে। বহুক্ষণ বাদে শ্রীপতি আবার ঘুরে আসে। শ্রীপতির ঘুরে আসার কারণ আছে। ভারতীকে বুঝিয়ে যদি বদলি নেওয়ানো যায়। ব্যাপারটা দশ–কান হওয়া তো শ্রীপতি মাইতি হোটেলওয়ালার পক্ষেও ভালো না। দিন দিন এসব নিয়ে গোলমাল হলে তার ব্যাবসাও মার খাবে। ভারতী যদি নিজে থেকে সম্পর্ক শেষ করে চলে যায় তো শ্রীপতি বাঁচে। এক মেয়েমানুষে কত দিন রুচি থাকে। আর এ তো পাগলির মতো হয়ে যাচ্ছে দিন দিন!

ভারতী আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করেছে, 'সব সম্পর্ক শেষ।' শ্রীপতি ভারতীকে চুপ করে থাকতে বলে, 'রেস্ট নাও।'

ভারতী বার বার জানলার কাছে গিয়ে মেঘ দ্যাখে, আস্তে আস্তে বলে, 'আমাকে সবাই একঘরে করে রেখেছে। কেউ কথা বলে না। দোকানপাট বাজার ঘাটে সব মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। লোকে কী করে জানল আমি পড়ে পাওয়া মেয়ে। জন্মের ঠিক নেই। তোমার মা বউ বলে বেড়াচ্ছে এসব, কীরকম অদ্ভুত চোখে লোকে তাকায়।'

শ্রীপতি চুপচাপ। ভারতীর জীবনের কথা শুনে ও কষ্ট পেয়ে মাকে বলেছিল। তখন সম্পর্কটা সকলের ভিতর সুন্দর। মা সবে হাসপাতাল থেকে ফিরেছে। মা কষ্ট পেয়েছিল। মায়ের চোখে জল ছিল। 'আহা, বড়ো দুঃখী ওই নার্সটা। কী সেবাই না করল, ও আমার মেয়ের মতো।' এখন মা–র মনে দুঃখ নেই। মা ঘেন্না করছে ভারতীকে তার ছেলেকে সরিয়ে আনার জন্য।

'চাদ্দিকে শুধু ফিসফাস গুঞ্জন, আমার জন্মের ঠিক নেই, আর আমি তোমার কী যেন! বলতে পারছি না—তোমার বউ আমাকে চড় মারল। তুমি কিছু বললে না?'

'শুনতে পাচ্ছ হো হো–ফুর্তির শব্দ। একটা মানুষকে ঘিরে কত মজা! ওগো তুমি কিছু বললে না, তোমার বউটা আমাকে—?'

শ্রীপতির কিছু বলার নেই। ভারতী মেঝেতে বসে বার বার কেঁপে কেঁপে উঠছে। মাথাটা চেপে ধরছে। মাথায় রাশি রাশি চুলের ভিতরে ওর ছোটোখাটো মুখখানি ঢেকে গেছে।

'তুমিও খুব মজা পেয়েছিলে তাই না! বেজম্মা, জন্মের ঠিক নেই যার। আত্মীয়স্বজন কেউ নেই, একা মেয়েমানুষ, তার সঙ্গে অনায়াসে মেশা যায়। তার মান–অপমানের দায় থাকে না তোমার।'

শ্রীপতির মুখ কালো হয়ে যায়, বলে 'চুপ করে থাকো, বড়ো বেশি বাড়াবাড়ি করছ!' কণ্ঠস্বরে একটু ঝাঁজ।

ভারতী হাঁ করে শ্রীপতির দিকে চেয়ে থাকে। তারপর হাসে। হাসতে হাসতে একেবারে স্বাভাবিক হয়ে যায়, 'ঠিকই তো, আর আমারই অন্যায় হয়েছে! আমি চলে যাব, তাইই ভালো, কী বলো?'

শ্রীপতি বলে, 'অনেকদিন হল তো, আমি তো তোমার জন্য মা বউ ত্যাগ করতে পারব না, বরং তুমি বদলি নিয়ে চলে যাও, জীবনে এরকম হয়।'

'হয়!' ভারতী শান্ত, 'কত কিছু হয় তাই না!'

শ্রীপতি মাইতি দেখছিল কী শান্ত হয়ে বসে আছে ভারতী। চেহারার জেল্লাটা এখন একটু ঝরে গেছে। যখন দেখেছিল প্রথম এই মেয়েকে, তখন আকর্ষণ ছিল শরীরে। কী মায়াবতী, স্নিগ্ধ চোখ দুটি! মুখখানিতে ঢলোঢলো ভাব ছিল। শরীরখানি ছিল কী সুন্দর! শ্রীপতি সহজেই ঝুঁকে পড়েছিল। এখন মনে মনে কোকিলার কথা ভাবছে। যেদিন দেখেছে কোকিলাকে শ্রীপতির সব টান ছিঁড়ে গেছে এখান থেকে।

শ্রীপতি দেখছিল, কেমন স্তব্ধ হয়ে বসে আছে ভারতী, কোথাও কোনো কম্পন নেই যেন। ভারতীর পুরোনো চোখ দুটিই আছে, সেইরকম, সেই মায়া, সেই চোরা চাহনি! শ্রীপতিকে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিতে হয়। নাহলে ওই

চোখের মায়ায় পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ওই চোখই তো সব্বোনাশ করেছিল তার। সব্বোনাশ কেন হবে? ভারতী নিজেকে কী সহজেই না নিবেদন করেছিল শ্রীপতির কাছে। কী আশ্চর্য! অত সহজেই যে পেয়ে যাবে তা ভাবেনি শ্রীপতি। কী মোহময় দুপুর ছিল সেটি। শ্রীপতি প্রায় সবটাই ভুলে গেছে। আবছা মনে পড়ে।

ভারতী ফিসফিসিয়ে বলল, 'তাহলে আমি চলে যাব?'

'আমি তো নিজের সংসার ভাঙতে পারব না।' বলতে বলতে শ্রীপতি বোঝে এসব ছেঁদো যুক্তি। তার সংসার ভাঙছে কই? ভাঙবে না। কোনোদিন ভাঙবে না। ভেঙে মধুমিতা যাবে কোথায়? পুরুষমানুষ এসব করে। মধুমিতা যে ভারতীকে অপমান করে যেতে পারে, ভারতীর গায়ে হাত তুলতে পারে তা তো তারই প্রশ্রয়ে। শ্রীপতি যদি রুখে দাঁড়ায় মধুমিতার সাহসই হবে না ভারতীর সামনে দাঁড়ানোর। শ্রীপতি যেমন চায় তেমনই করবে মধুমিতা। মধুমিতা টের পেয়েছে শ্রীপতির মন ঘুরছে, এতদিনের ক্ষোভ মধুমিতা উগরে দিচ্ছে। এতদিনের অপমান, হীনমন্যতার শোধ নিচ্ছে মধুমিতা এইভাবে ভারতীকে অপমান করে। শ্রীপতির মনে হয় আর এক–দু দিন মধুমিতা যদি ঢোকে এই কোয়ার্টারে, ভারতী এই সমুদ্রতীর ছেড়ে পালাবে। শ্রীপতির হাসতে ইচ্ছে করছে। মধুমিতা কি ভেবেছে শ্রীপতি আবার পত্নীঅন্ত প্রাণ হবে? হা হা হা...কী করে হবে শ্রীপতি পত্নীঅন্ত? তার যে মনই নেই মধুমিতায়। মধুমিতা যদি পারে ভারতীর সঙ্গে চুলোচুলি করে ওকে তাড়াক।

ভারতী নিশ্চুপ জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। শ্রীপতি ভাবছিল উঠে যাবে কি না। কিন্তু কৌতূহলে বসেই আছে।

বাইরে এখন মহা অন্ধকারের পৃথিবী। কার্তিকের হিমেল রাত। ভারতী দুটো হাত বাড়িয়ে বাতাস নিয়ে আসে তার মুখের কাছে। ওর মাথার ভিতরটা ঝনঝন করে বেজে উঠছে। সেই যে মেয়েটা মীনাক্ষী। মীনাক্ষীই তো। উঁহু সে তো এই ভারতীই! বসে বসে রোগা হয়ে গেল। গাল ভেঙে গেল, চোখ বসে গেল! আর সেই ছেলেটা যাকে একদিন কয়েক ঘণ্টা অন্ধকার দেখছিল সে! কী নাম যেন? দীপক! হাওয়া উঠছে! আহ্! কত বাতাস। জানলাদরজা হাট আলগা হয়ে বাতাস তুমুল হয়ে উঠেছে। ফুলপাহাড়ির বাঁধের ওধারে একটা মস্ত শিমুলগাছ ছিল। হাওয়ায় হাওয়ায় তুলো উড়ে আসত না! মেয়েগুলো ছাতে লুটোপুটি হয়ে সেই তুলো ধরত। কে বেশি ধরতে পারে!

তারপর আমাকে পুলিশ হোমে ফেরত দিল। সিঁদুর পরেছিলাম! ঘষে ঘষে সিঁদুর তুললাম। আবার কতকাল বাদে! ঠিক সেই বাতাস এল যেন। লাল, হলুদ, নীল, সবুজ, আকাশটা ফেটে সেই সব রং বেরোতে লাগল! শিমুল তুলোগুলো আকাশে উঠে মেঘ হয়ে গেছে। নীলের উপরে তুলো উড়ছে। আমি আসল পৃথিবীতে এলাম। সমুদ্রতীর, পুরুষমানুষ, আত্মীয়। আকাশে ফেটে ফেটে রং পড়ছে! মীনাক্ষী! নামটা যেন বড়ো ভুল!

হাসতে হাসতে শক্ত হয়ে যায় ভারতী। শিরা ধমনি আর চামড়ায় ঘেরা দেহটা কাঁপতে কাঁপতে উলটে পড়ে মেঝেতে। মাথাটা ঠুকে যায়। শ্রীপতি লাফিয়ে ওঠে, 'কী হল?'

ঘরে অল্প ওয়াটের বালব। গুমোট ভাব, ধুলোর গন্ধ। শ্রীপতি কী করবে ভেবে না পেয়ে, জলের কুঁজোটা নিয়ে এসে গড়িয়ে দেয় জল। ভারতী ভক ভক করে বাতাস নিচ্ছে। মুখ গহ্বর হাঁ হয়ে গেছে। আলজিব পর্যন্ত দেখা যায়।

শ্রীপতি বিপন্ন হল। এখন তো ডাক্তার ডাকতে হয়। সে দ্রুত স্নানঘরে ঢুকে মগ ভরতি জল এনে ভারতীর মুখে ছিটোতে থাকে। জ্ঞান না ফিরিয়ে সে যায় কীভাবে? কোনো মায়া আর নেই ভারতীর উপর, তা সত্ত্বেও গোপন কোনো টান তো রয়ে গেছে এখনও। যে চোখের মায়ায় সে এগিয়ে গিয়েছিল এই নারীর দিকে, সেই চোখ দুটিই এখন যেন ভয় দেখাচ্ছে তাকে। চোখের পাতা বুজিয়ে দিতে চায় শ্রীপতি। মরামাছের মতো ড্যাবডেবিয়ে চেয়ে আছে ভারতী। শ্রীপতির নিজেকে অসহায় মনে হতে থাকে। সে ভারতীর পাশে উবু হয়ে বসে তার শ্বাস–প্রশ্বাস লক্ষ করতে থাকে। চোখ ধীরে ধীরে বুজে যায়। ঘুমিয়ে পড়ছে যেন ভারতী। শ্রীপতি এবার যাবে। কিন্তু না ডেকে যায় কীভাবে? দরজা খোলা রেখে তো যাওয়া যায় না। ভারতীকে অস্ফুট স্বরে ডাকতে থাকে সে। চোখ দুটি বহুক্ষণ বাদে যেন খুলে যেতে থাকে।

ভারতী ঘুমঘোরে সাড়া দেয়, 'কী বলছ?'

'আমি এবার যাব।'

‘না থাকো, আর একটু।’

‘কাজ আছে।’

‘কোনো কাজ নেই।’ ভারতী তার দিকে পাশ ফিরে শোয়, কীরকম অদ্ভুত চোখে তাকায়, তাকে দেখতে থাকে। অচেনা মানুষ দেখলে যেমন চোখের ভাব হয় তেমনই ভাব ফুটে ওঠে যেন—শ্রীপতির মনে হয় তাই। শ্রীপতিরও যেন অচেনা মনে হয় ওই দৃষ্টি, সে ডাকল, ‘ভারতী!’

ভারতী ডাক শোনে না, নিস্পন্দ হয়ে গেছে চোখ দুটি। শ্রীপতির আচমকা মনে হয় চোখ চেয়েই ঘুমোচ্ছে যেন ভারতী। না কি জেগে আছে? সে ভারতীর গায়ে হাত ছোঁয়ায়। কোনো সাড়া নেই। আবার ডাকে অনুচ্চ গলায়।

শ্রীপতি কোনো জবাব না পেয়ে থম মেরে বসে থাকে। একবার ভাবে ঝাঁকুনি দিয়ে জাগিয়ে দেবে ভারতীকে। কিন্তু পারে না। এই যে চেয়ে আছে ভারতী। এখন তো মনে হচ্ছে আগের মতোই জেগেই আছে। জেগে আছে, তার কথা শুনতে পাচ্ছে না। শ্রীপতি আবার ডাকে। এবারও সাড়া পায় না। সাড়া না পেয়ে বসে থাকে।

সেই সময় ভারতীর চোখে স্পন্দন আসে। চক্ষুমণি যেন নড়ে উঠল। কালো মণিটি চোখের কোণে প্রায় লুকিয়ে গিয়েছিল, ধীরে ধীরে তা আঁখি গহ্বরের মধ্যখানে স্থিত হয়। শ্রীপতির মনে হল ঘুম ভাঙছে, অথবা জ্ঞান ফিরছে ভারতীর। শ্রীপতি অপেক্ষা করতে থাকে। ভারতী উঠুক, উঠে দরজা বন্ধ করুক। সে চিরকালের মতো ভারতীকে ছেড়ে যাবে। চিরকালের মতো ছেড়ে যাবে বলে শ্রীপতি একটু সময় দিচ্ছে ভারতীকে। চিরকাল অনেক, অনেক সময়, অনেক বছর, অনেক ঘণ্টা, অনেক অনেক দিন। বিপুল সময়পুঞ্জ। আর এই অপেক্ষাটা তার তুলনায় সামান্য, গণনায় আসে না এমন ক্ষুদ্র এই সময়। এটুকু ভারতীর জন্য ব্যয় করতেই পারে শ্রীপতি। আর ভারতীও যেন তা জেনে সময়টিকে দীর্ঘ করতে চাইছে জাগরণে, অজাগরণে, জ্ঞানে, অজ্ঞানে, চেয়ে থাকায়, না চেয়ে থাকায়। কী আশ্চর্য! চক্ষুমণিটি আঁখি গহ্বরের মধ্যস্থলে এসে আবার নিশ্চল হয়েছে। শ্রীপতির উপরে নিবদ্ধ সেই দৃষ্টিরেখা। শ্রীপতি এমনভাবে দেখছে যেন কোনো মৃতের চোখ। মৃতের চোখ সচল হলে যে বিস্ময় অধিকার করে জীবিতকে সেই বিস্ময় শ্রীপতিকে গ্রাস করছে একটু একটু করে।

যখন আকাশে সূর্য থাকে, সেই সময় পৃথিবীর চেহারা বার বার বদলায়। আলো কমলে একরকম, বাড়লে একরকম। বাতাস উঠলে একরকম; মেঘে পৃথিবীর অন্য এক চেহারা। সমস্ত দিন এই রূপ বদলের ফাঁকে ফাঁকে মানুষ অবাক হতে থাকে। মোহমুগ্ধ হয়ে পড়ে পৃথিবীর রূপের মায়ায়। ভাবে, সব আছে, সব আছে! কত বিভ্রমেই না পড়ে! বিষাদে, আনন্দে আকাশের সঙ্গে মানুষের মুখের চেহারাও বদলায়।

রাত অন্ধকারে ভুল হবার নয়। আকাশে তখন রং নেই। সমুদ্র কালো। শূন্যতায় কালোছায়া। অথবা কালোই শূন্যতা। তখন আর মায়ায় পড়বে না। মায়ায় পড়লে! সে বড়ো ভীষণ হয়। কোকিলা বধূ যেন বন্দি করার জন্য নিশিতে ডাকে। রাত আঁধারে তোমাকে যে নিশিতে পেয়েছে।

ভারতীর মাথার ভিতরে শিমুল ফুল, ফেটে ফেটে তুলো বেরিয়ে পড়ছিল। খুব কোমল সাদা শিমুল তুলো বেরিয়ে পড়ছিল। খুব কোমল সাদা শিমুল তুলো। লাল লাল ফুল—বিদীর্ণ হয়ে গিয়ে তুলো উড়ে যাচ্ছে আকাশময়। আবার এসো, আবার। ভারতী কাকে যেন হাত নাড়ছে। ফুলপাহাড়ির বাঁধ বেয়ে উধাও হয়ে যাচ্ছে।

ভারতী ঘুমঘোরে উঠে বসে। চোখ খোলে। চোখ ফেটে বেরিয়ে আসতে চায় রক্ত। সে শ্রীপতিকে দ্যাখে না। শ্রীপতি সামনে বসে আছে। ভারতী যেন দ্যাখে কেউ নেই। উঠে দাঁড়ায়। এগিয়ে জানালার কাছে যায়। জানালা দিয়ে অন্ধকারে তাকিয়ে থাকে নিঝুম হয়ে। ভারতীর নিঝুমতায় শ্রীপতিও আক্রান্ত হয় ধীরে ধীরে।

ভারতী অন্ধকারে হাত নাড়ে। তারপর গুটিগুটি ফিরে দাঁড়ায়। দরজার দিকে এগোয়। আহ্। সমস্ত দেহটা হালকা হয়ে গেছে। লাল ফুল, তুলো মেঘ, সোনা রোদ! কত মানুষ! আর সেই প্রাচীর ঘেরা বাড়িটা। ওখানে ইটের পাঁজার ভিতরে কেউটের বাসা। তার পিছনে মেয়েরা ছুটছে। মস্ত উঁচু দেওয়াল। দেওয়ালের ভিতরে কতটুকু আর আকাশ। কতটুকু বাতাস! কেউটে ফণা তুলেছে। মেয়েরা লাঠি বাগিয়ে হিংস্র হয়ে উঠেছে। সাপ আর মানুষ পারস্পরিক হিংস্রতায় পরস্পরকে চোখে চোখে রাখছে। তার ভিতর থেকে একটি মেয়ে প্রাচীরের ফাঁক খুঁজত, মস্ত লোহার গেটে গিয়ে ধাক্কা মারত নরম হাতে।

‘কোথায় যাচ্ছ?’ শ্রীপতি এগিয়ে এসেছে।

ভারতী কথা বলে না। মুখে আঙুল দেয়, ‘চুপ।’

পায়ে পায়ে যেন অভিসারে যাচ্ছে মেয়েটা। সন্ত্রস্ত ভঙ্গি। ওই তো দাঁড়িয়ে আছে! কে? ভারতী শ্রীপতিকে দেখে আঁতকে ওঠে। জেলখানার মতো প্রাচীর ডিঙিয়ে পৃথিবী, মানুষ, সমুদ্র!

‘কোথায় যাচ্ছ?’ শ্রীপতি আবার জিজ্ঞেস করে।

লোকটা খুব খারাপ! ঢ্যাঙা লম্বা, কালো। কোথায় দেখেছে? কোথায়? সব যে জেনে যাবে। এখন কোনোরকমে ঘর থেকে বেরিয়ে পাঁচিলের বাইরে চলে যেতে পারলে হয়। তারপর কে দেখবে, কে খুঁজে পাবে? পৃথিবীতে কত জায়গা, তার প্রত্যেকটার এক একটা নাম। ভূগোল বইয়ের ভিতর সব আছে। ম্যাপের ভিতরে বোঝানো! এঁকে এঁকে দেখানো। প্রতিটি জায়গার আলাদা আলাদা রং। আবার বনের এক রং, নদীর এক রং, পাহাড়ের এক রং। কত দেশ! মহাদেশ! সব আলাদা আলাদা। কী সুন্দর রংগুলি। লাল, হলুদ, নীল, সবুজ....।

সেইসব জায়গায় চলে যেতে পারলে আর জেলখানায় ফিরতে হবে না, ফিরতে হবে না।

‘কিন্তু এ কে?’ ভারতী লাফ মেরে বাইরে বেরিয়ে পড়ে। আর সঙ্গে সঙ্গে পিছনে শ্রীপতি, ‘যাচ্ছ কোথায়?’

ভারতী শুনতে পায় না। এতদিন কোথায় ছিল? আকাশটা এতবড়ো! এত তারা! এমন ঝলমলে আকাশটা ছিল তার অচেনা। এত বাতাস, এমন মোহময় রাত্রি! এমন সুগন্ধময় পৃথিবী! ভারতী পৃথিবীর পথে হাঁটে। শ্রীপতি তখন আবার ডাকে, ‘যাচ্ছ কোথায়?’

পালাও পালাও। ভারতী নিজেকে বলতে থাকে। মস্ত বড়ো কালো পুলিশ ভ্যান। মারতে মারতে তুলবে দীপককে। তারপর তাকে। তখন তাদের গোপনে বিয়ে হয়ে গেছে! মাথায় সিঁদুর। ভারতী ছেলেটার বুকে মাথা দিয়ে আছে। বাড়িটা নিঝুম। শেষরাতে দরজা নড়ে ওঠে। একবার, দু–বার, তিন বার! আর আর! ভারতী ছিটকে সরে যায়। ভয়ে কাঁপছে। পুলিশের ইউনিফর্মে একটা লোক দাঁড়িয়ে, আকর্ণ বিস্তৃত হেসে জিজ্ঞেস করল, 'যাচ্ছ কোথায়? ফুর্তি হচ্ছিল, যাচ্ছ কোথায়?'

শ্রীপতি ওকে আটকাচ্ছে, 'কোথায় যাচ্ছ?'

ভারতী দেখছে সেই পুলিশটি। মারতে মারতে দীপককে গাড়িতে তুলছে, মুখ দিয়ে অশ্রাব্য ভাষা থুতুর সঙ্গে ছিটিয়ে দিচ্ছে!

ভারতী কাঠ হয়ে দাঁড়ায়। তার মাথার ভিতরে ঝড় ওঠে। মাথার ভিতরের অন্ধকারে ঘা পড়ে। খুব হালকা ছায়া সরতে থাকে। 'চিনতে পারছি, না না, ভুল হচ্ছে!'

'দাঁড়াও।' শ্রীপতি বুঝতে পেরেছে গোলমাল হয়ে গেছে। তার ভয় করছে ভারতীর চাহনিকে।

হাসছে পুলিশ অফিসার। সামনে ড্রাইভারের পাশে ভারতী, তার পাশে অফিসার। পিছনে এতক্ষণ গোঙাতে গোঙাতে নিশ্চুপ হয়ে গেছে দীপক। পুলিশ অফিসার কেমন হাত রেখেছে তার পিঠে।

'পালাতে পারবে না কোথাও, সবদিকে লোক পাঠিয়েছিলাম।'

কিশোরী সরে বসে। থরথর করে কাঁপছে। আধাবয়সি লোকটার চোখ খারাপ। হাত রাখল তার ঊরুতে। আলতো চাপ দিল, তার গা ঘেঁষে বসেছে। জিজ্ঞেস করল, 'আলাপ হল কী করে?'

ভারতী জবাব দিল না।

'মিস দত্ত ফোন করতেই এভরি কর্নারে লোক পাঠিয়েছি!' লোকটা হাসছে! জিপটা তখন ঢুকছে থানায়।

থানা বাড়িতে কী গুমোট গন্ধ! সেই অনাথ আশ্রমের চেয়েও গুমোট, আঁধারময়। পুলিশ অফিসার বলল, 'আলাপ হল কী করে বলো, আড়কাঠি কিনা জানতে হবে তো, জানো না ফুঁসলে নিয়ে বেচে দেবে!'

মুখ নামিয়ে বসেছিল মেয়েটা। দীপককে ওরা কোথায় নিয়ে গেল জানে না সে। পুলিশ অফিসার নানা কথা বলছিল, উপদেশ দিচ্ছিল। সে অপেক্ষা করছিল সুলতা দিদিমণির জন্য। এসে কঠিন মুঠিতে তার হাত ধরবে।

'ঘরে চলো।' শ্রীপতি ওকে ধরেছে!

না, না, আর নয়। একটা মস্ত প্রাচীর। চারদিকে মস্ত উঁচু দেওয়াল। তার ভিতরে ইটের পাঁজায় কেউটের বাসা। আর কতগুলো মুখ শুকনো মেয়ে। বয়স হয়ে হয়ে ঝুঁকে পড়েছে। তারা কোনোদিন বড়ো আকাশ দ্যাখেনি, বড়ো মাঠ দ্যাখেনি। মাঠ, মাঠ, মাঠ, প্রান্তর বলে যাকে, দিগন্তে যার সীমা মিশে গেছে পৃথিবীর মাটিতে তা দ্যাখেনি, দেখেছে শুধু আড়াল। আড়ালের পর আড়াল। মস্ত প্রাচীর। প্রাচীরের ওপার থেকে কোকিল ডেকে ওঠে, শোনা যায়, ঘুড়ি ওড়ে, লেজ দেখা যায় আচমকা, বকের সারি উড়ে যায় কত দূর কে জানে!

'ফিরে চলো,' শ্রীপতি ডাকে।

ভারতী তীব্র আর্তনাদে শ্রীপতির হাত ছাড়িয়ে দৌড়োতে থাকে। আর ওখানে যাবে না। থাকবে না, থাকবে না। আলো বাতাস হাওয়া, পৃথিবীর মানচিত্রে কত জায়গা। কত রং! লাল, হলুদ, সবুজ, নীল, গোলাপি...ম্যাপের প্রত্যেকটি দেশের নিজস্ব রং, সেইসব রঙের ভিতরে চলে যাবে সে।

পুলিশটা প্রতিটি কর্নারে লোক পাঠাচ্ছে। তাদের ধরবে। ধরতে ওত পেতে বসে আছে সকলে। উত্তরে বাড়িঘরের মাথা দেখা যায় অন্ধকারে। পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে। পশ্চিমে লোকালয়, পুলিশের ভ্যান। দীপক পুবেও যাবে না। প্রতিটি কোণে দাঁড়িয়ে আছে পুলিশের চেহারা। হুকুম হয়েছে। বাস্টার্ডকে ধরে চার দেওয়ালের ভিতর ঢুকিয়ে দিতে। ইটের পাঁজার উপর বসিয়ে দেবে।

ভারতী অন্ধকারে দৌড়োচ্ছে! দীপক তুমি দৌড়োও। নাহলে সবার সামনে ধরে অপমান করবে, চড় মারবে। গোপনে আমাকে ভেবে নেবে কেপ্ট। বেজন্মা, রক্ষিতা। তার আবার সম্মান! 'না, না,' বলতে বলতে ভারতী অন্ধকারের সমুদ্রে উড়তে থাকে। কোথায় যাবে? উত্তরে? সেখানে মানুষ। পুবে মানুষ। পশ্চিমে? সেখানেও মানুষ।

আহ্! ওই তো দক্ষিণ দেখা যায়। ঘন অন্ধকারে ঢাকা পৃথিবীর প্রাচীনতম স্মৃতি। চলে যাবে সুদূর দক্ষিণে। হাওয়ায়, হাওয়ায়, অন্ধকারে, অন্ধকারে। মনে পড়ে যায় কত বড়ো মাঠ। সেই মাঠে পা দিয়েই মনে হল জেলখানা থেকে মুক্তি। আলোর দেশে প্রবেশ। এখন অন্ধকারের সমুদ্র যেন সেই আলোরই দেশ। হাওয়ার দেশ। হলুদ রঙের দেশ, সবুজ রঙের দেশ, নীল রঙের দেশ......ম্যাপে কেন দেশগুলোর নানা রং? ম্যাপ দেখে শুধু এই কথাই মনে হত যে তার।

শ্রীপতি ভাবছিল ভারতীর কী হল! কোথায় যাচ্ছে! সে এগোয়। অন্ধকারে দেখা যায় না কিছু। অন্ধকারে কি বর্ণহীন হয়ে গেল অনাথ আশ্রমের মেয়েটি?

আর সেই মেয়ে? দৌড়োতে দৌড়োতে এক সময় যেখানে পৌঁছোয় সেটা পৃথিবীর শেষ। সামনে অনন্ত অন্ধকার। ভারতী তার সামনে দাঁড়িয়ে হু–হু কান্নায় ভেঙে পড়ে। ঢেউ এসে আছড়ে পড়ে ওর পায়ের কাছে। সমুদ্র যেন বিপুল ক্রন্দনে মাথা কুটতে থাকে বেলাভূমিতে। সমুদ্র যেন তার কান্নায় মেয়ের কান্না মিশিয়ে দেয়। শ্রীপতি অন্ধকারে টের পেতে চাইছিল কোথায় ভারতী।

শ্রীপতির সেই মুহূর্তে মনে হল ভুল হয়ে গেছে। ঠিক হয়নি। কিন্তু এই বিপুলতার সামনে দাঁড়িয়ে মিথ্যাচারও তো করা যায় না। মনে হচ্ছিল ভারতীর সঙ্গে সম্পর্কটি না ভাঙলেই হত যেন। বউ যখন হাত তুলল, সে আটকাতে পারত। সে ডাকতে চাইছিল ভারতীকে। বেলাভূমি ধরে কোনদিকে গেল ঠিক নেই। শ্রীপতি নেমে যাবে সমুদ্রতলে, তখন পঞ্চম ঠাকুর এসে আটকায় তাকে, 'বাবু কুথায় যাচ্ছেন? মু কখন থিকে আপনারে খুঁজছি, রামচন্দর এয়েচে বালিমুঁড়া থিকে।'

'রামচন্দ্র! কেন?'

'আজ্ঞা তা উ জানে কেনে আসিছে, তবে সঙ্গে একটি মেয়্যাছেল্যা রহিছে।'

শ্রীপতি বলল, 'ভারতী কোনদিকে গেল?'

'যেদিকে যাক ঘুরি আসবেন উনি, আপনি হুটেলে চলেন, কীরকম যেন লাগল, কাছারিবাড়ি ফেলে চলি এলা।'

শ্রীপতি যেন বাঁচল। এই একটি সূত্র এখন তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারে। নাহলে অন্ধকারে ভারতীকে খুঁজতে হবে। সে এক বিড়ম্বনা হবে। কিছু ঘটে গেলে সে বিপদেও পড়তে পারে। চলল শ্রীপতি হোটেলের দিকে। শ্রীপতি চলল ভারতী চৌধুরিকে ফেলে রেখে। এই সময়ের মতো, এ জীবনের মতো চলল বোধ হয় শ্রীপতি মাইতি।

এ জীবনের মতো চলল শ্রীপতি। সত্যিই কি তাই? এ জীবনের সমস্ত কথা কি জানে কেউ? জেনে বসে আছে আগাম? কেউ কি পূর্বাভাষ পেয়ে যায় ভবিষ্যতের, যেমন পায় সাপ, ব্যাং, পিঁপড়ে ভূমিকম্পের আগে? কোনো কোনো মনুষ্যেতর প্রাণী যেমন আগাম জেনে যায় প্রাকৃতিক দুর্বিপাকের কথা, তেমন করে মানুষ কি জানতে পারে তার জীবনে কী অপেক্ষা করে আছে আগামী দিনগুলিতে? পক্ষীরাজও কি জেনে গিয়েছিল যে তাকে নিরুদ্দেশে যেতে হবে কোনো এক বৈশাখী পূর্ণিমার রাতে? সে কি বহুদিন ধরে অপেক্ষা করেছে ওই রাতটির জন্য? তার মনে কি বহুদিন আগে থেকে রাতটি আঁকা হয়েছিল? পক্ষীরাজ কি জেনে গিয়েছিল যেদিন ভগবান বুদ্ধ মাটির পৃথিবীর স্পর্শ নিয়েছিল দূর কপিলাবস্তু নগরে, সেদিনই তাকে হারিয়ে যেতে হবে প্রায় চিরকালের মতো? প্রায় এ জীবনের মতো, কেননা শ্রীপতি তো জানে না পক্ষীরাজ এ জীবনের মতো হারিয়েছে, না কি তার ফিরে আসার কোনো স্পষ্ট দিনক্ষণ আছে আগামীতে। শ্রীপতি তাই কী করে বলে সে চিরকালের মতো চলে যাচ্ছে ভারতীকে ছেড়ে? ভবিষ্যতের গর্ভে কি নিহিত আছে কে–বা জানে? মানুষ কি জানত যেদিন কপিলাবস্তুর রাজমহিষীর গর্ভ থেকে জন্ম নিয়েছিল এক আলোর শিশু, যেদিন সেই শিশু তার প্রেমময় দুই চক্ষু মেলে দেখেছিল এই পৃথিবীর

আকাশ, মাটি, সেই দিনই ধরিত্রী–গর্ভ ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে জন্ম নেবে এক হিংস্র দানব। বার বার জন্মাবে সে। বার বার তার রক্তচক্ষু দেখে মানুষের দুঃস্বপ্ন দীর্ঘস্থায়ী হবে। দানবীয় অন্ধকার আবৃত করবে মানুষের মন।

শ্রীপতি হাঁটতে হাঁটতে জিজ্ঞেস করল, 'মেয়েটি কে?'

'মেয়ে তো লয়, বউ।'

'বউ!' চমকে ওঠে শ্রীপতি, 'বিয়ে করল নাকি রামচন্দ্র?' জানে না ঠাকুর।

কৌতূহলে শ্রীপতির গতিবেগ বাড়তে থাকে।

ঠাকুর জিজ্ঞেস করে, 'অশ্ব কি আবার ঢুঁড়া হবে?'

'কেন?'

'না, বলছি কি আর একটা অশ্ব খরিদ করে নিন বাবু, উটা গেচে না গেচে, কত টাকা গেচে কহেন দেখি।'

শ্রীপতি হাসে, জবাব দেয় না। ঠাকুর যা বলছে তা কি সে জানে না? কত টাকা গেছে তা কি তার জানা নেই? অশ্ব খোঁজার নাম করে ভানু দাস বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে তাও কি জানে না সে? ইচ্ছে করলেই তো সাতটি ঘোড়া সে কিনতে পারে সাতটি রঙের। সে ক্ষমতা তার আছে। পক্ষীরাজ তো বুড়ো হয়ে যাচ্ছিল। তার ক্ষমতা কমে যাচ্ছিল। কিন্তু সে তো পক্ষীরাজ, তার পোষা পক্ষীরাজ। তাকে না জানিয়ে উধাও হবে তাই–বা কী করে হয়? ভানু খুঁজছে। খুঁজতে যাচ্ছে। তার যাওয়া মানেই যে পক্ষীরাজটিকে পাওয়া যাবে তা নয়, কিন্তু দশদিকের লোক তো জানতে পারবে বৈশাখী পূর্ণিমার রাতে পালিয়ে ছিল যে ঘোড়াটি, তা শ্রীপতি মাইতির। শ্রীপতির একটি ঘোড়া ছিল। সেই ঘোড়াটি পালিয়েছিল। সেদিন ছিল বুদ্ধপূর্ণিমা। পূর্ণিমার আলোয় ঘোড়াটি নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল, এই কথাটি ক্রমশ গল্পের মতো হয়ে উঠুক মানুষজনের কাছে। পূর্ণিমার রাতে আগে কখনো পালিয়েছে কারোর পোষা ঘোড়া?

'তোমার নাম?'

রামচন্দ্র বলল, 'আজ্ঞা বাবু, ওর নাম সুভদরা, জমি নিলা গরমেন, উয়াতে ভিখিরি হই গিছে, অনাথিনী, মোর নিকট আশরয় নিইছে, কাছারিতে কাম করে, ভানুবাবু সবু জানে, ভানুবাবু কহেনি, ও ভানুবাবু, কহনি তুমি?'

ভানু ঘাড় কাত করল, সে বলেছিল, কিন্তু বাবু শ্রীপতি মাইতি নানা কাজের মানুষ, তার কি সব মনে থাকে? না কি তিনি সব কানে নেন? বাবু কতদিক থেকে বিব্রত। বাবুর মেয়েমানুষটিতে আর মন নাই, আবার যাকে মনে ধরেছে সেই কোকিলা বধূর কাছে পৌঁছোতে পারছে না বাবু, এর সঙ্গে বাবুর ঘোড়াটি তো রয়েছেই। এখনও ফিরল না। হিম পড়ে গেল, কাশফুল ঝরে গেল, রাতের দিকে ঠান্ডা পড়ছে, এমন সময়ে কি সে বাইরে থাকতে পারে? কিন্তু রয়েছে তো! আরও কত ব্যাপার; সতীশ গিরির কথাটি তো বাবু এখনও জানে না। জানলে কি বাবুর মতি স্থির থাকবে? শোক পাবে তো! পক্ষীরাজের ভালোবাসার ঘুড়িটা, যার টানে সে ছুটে যেত চোদ্দোবেড়িয়ার চরে, তাকে কিনা বিষ দিয়ে মেরে ফেলল গিরিমশায়ের ছেলে সতীশ।

শ্রীপতি জিজ্ঞেস করে, 'স্বামী কোথায়?'

'আজ্ঞা বাবু, কেহ জানেনি, সোয়ামি তো উকে বিচে দিইছিলা অই ঠিকেদার পুলুশের নিকট, বড়ো দুঃখী, অভাগী।'

'তুই থাম তো, জিজ্ঞেস করছি তো ওকে।' শ্রীপতি ধমকে ওঠে রামচন্দ্রকে।

সুভদ্রা মাথার কাপড় টানল। বড়ো বড়ো চোখ দুটি বিস্তার করে তাকিয়ে দেখল রামচন্দ্রর মালিক শ্রীপতি মাইতিকে। এই মানুষটার কাছারিবাড়ি, এরই জমিজমা, হোটেল, এই মানুষটাই ছিল হারানো ঘোড়াটির মালিক, এই মানুষই নায়েব রামচন্দ্রর মালিক। সুভদ্রা মাথা নীচু করে গড় করল শ্রীপতি মাইতিকে। আগেও একবার মেঝেতে মাথা ঠেকিয়েছিল। এই দ্বিতীয় বারে গড় করে তাকে কথা বলতে হবে। কী বলবে সে? মাথা নামিয়ে নিম্নস্বরে বলল, 'কী কহিব বাবু, নায়েব সবু জানে।'

শ্রীপতি জিজ্ঞেস করে, 'কী জানে?'

'আজ্ঞা গরমিন জমিন সবু লিয়ে লিবে ভীমাপুরের, কাছারিবাড়ি ধান কাটার পর উঠি যাবে।'

ভানু মাথা গলায় কথার ভিতরে, 'কে বলেছে?'

'শুনা যাইছে।' রামচন্দ্র জবাব দেয়।

'ফের তুই কথা বলছিস!' শ্রীপতি ধমকে উঠে রামচন্দ্রকে।

'নায়েব কুথায় যাবে?' সুভদ্রা বিনবিনিয়ে বলে।

রামচন্দ্র অন্যদিকে ফিরে মাথা নামিয়ে নিল। শ্রীপতি বিড়বিড় করে, 'নিতে দেরি আছে, টাকা দিয়ে তো নেবে, নতুন আইনে টাকা না দিয়ে নিতে পারবে না, কিন্তু তোমার কী হে? আমার যাবে।'

'নায়েব কোথায় যাবে তা জেনে তোমার কী হবে?' শ্রীপতি জিজ্ঞেস করে।

'আজ্ঞা বাবু!' রামচন্দ্র ঘুরে তাকায়, 'আজ্ঞা মু আপনার চাকর, আপুনি যা করিবা তাই হিবে, কথা উটা লয় বাবু, অন্য কথা রহিছে, উ কহিতে পারিবেনি।'

শ্রীপতি ভ্রূ কুঁচকে তাকিয়ে থাকে। কথাটা কী? রামচন্দ্র এমন একটি মেয়েমানুষ নিয়ে এল কেন আচমকা? এখন তো ধান কাটার সিজিন। এ সময়ে রামচন্দ্রর আসার কথা নয়। কাছারি ছেড়ে চলে এল? এ সময়ে যদি জমির ধান কেটে নিয়ে যায় দুষ্ট লোকে? শ্রীপতি ধমকে ওঠে, 'ফের তুই কথা বলছিস, এখন কাছারি ছেড়ে এলি কেন?'

'আজ্ঞা বাবু।' ঘাড় ঝুলে পড়ে রামচন্দ্রর।

শ্রীপতি বলল, ‘কালই ভোর ভোর ভীমাপুর রওনা হবি।’

‘আজ্ঞা!’ রামচন্দ্র চোখ পিটপিট করতে থাকে।

পঞ্চম ঠাকুর বলে, ‘কাল বরং থাকুক।’

‘কেন?’ শ্রীপতি রাঙা চোখে ঠাকুরকে দ্যাখে।

‘আজ্ঞা বাবু, কষ্ট করে এল, একটা দিন থাকবেনি!’

শ্রীপতি বলল, ‘তুমি কাজে যাও দেখি।’

ভানু অবাক হয়ে যাচ্ছিল। শ্রীপতি আচমকা রুক্ষ হয়ে উঠেছে কেন? তুলকালাম হয়ে গেছে নার্সদিদির ঘরে, সেইজন্য? মেজাজ তো খারাপই রয়েছে বাবুর। মা বউ কিছুক্ষণ আগে বাড়ি গেছে ঝগড়াঝাঁটি করে। রামচন্দ্রর কপালই খারাপ, এল এমন দিনে যে বাবুর মেজাজই খারাপ। চাকরিটা না যায় ওর। তারপর বাবু যদি বলে, ‘যা ভানু যা, ভীমাপুরের কাছারিবাড়িতে নায়েব হয়ে থাক গিয়ে,’ ভানু কি থাকবে? ইশ! ভাবতেই লজ্জা হচ্ছে ভানুর। নায়েব রামচন্দ্র কেন এসেছে তা ঠিক ভানু জানে না। এসে তাকেই তো ধরে পড়েছে রামচন্দ্র, বাবুর অনুমতিটা চাই, সে আর সুভদ্রা বিয়ে করে কাছারিবাড়িতে থাকবে। তারপর কাছারিবাড়ি যদি উঠে যায়, বাবুর কাছে এসে পড়বে, বাবু যা হয় ব্যবস্থা করবে। বিয়ে না করে সুভদ্রাকে রাখতে পারছে না সে। আশপাশের লোক উঁকি মারছে, বেওয়ারিশ মেয়েমানুষ হয়ে গেছে কিনা সুভদ্রা। সুভদ্রাকে বাঁচাতেই তাকে বিয়ে করতে হবে রামচন্দ্রকে। আর!

ভানু দেখেছে কী শক্তসমর্থ পুরুষমানুষ এই রামচন্দ্র! কী স্বাস্থ্য! কী রোষ লোকটার! একা ওই কাছারিতে বসে অত জমি রক্ষা করছে। বাবু শ্রীপতি মাইতির কাছে তার ব্যক্তিত্ব মুছে গেলেও, ভীমাপুরের কাছারিবাড়িতে এই রামচন্দ্রই তো বাঘ। আশপাশের চাষাভুসোরা কেমন হীন, দীন হয়ে বসে থাকে কাছারির উঠোনে। এমন একটা জলজ্যান্ত পুরুষমানুষের একটা মেয়েমানুষ তো চাই নিশ্চয়। তার পক্ষীরাজ যেমন চোদ্দোবেড়িয়ার চরে গিয়ে গিরিমশায়ের ঘুড়িটাকে খুঁজে পেয়েছিল! আচমকা বুকের রক্ত যেন চলকে ওঠে ভানুর। কেমনভাবে বসে আছে রামচন্দ্র! ঠিক যেন বাবুর পোষা ঘোড়া। সেই পক্ষীরাজ। সে তো তবু আশ্বিনে দড়ি ছিঁড়ত, পালাত ঘুড়িটার জন্য, পালাত চোদ্দোবেড়িয়ার চরের জন্য, পালাত আর সব ঘোড়াদের সঙ্গে খেলার জন্য, রামচন্দ্র করে কী? পোষা মানুষই হয়ে থাকল।

বাবু শ্রীপতি বলল, ‘তোরা বাইরে গিয়ে বস, ঠিক আছে কাল থেকে যা।’

রামচন্দ্র যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। সুভদ্রা আর সে উঠে ঘরের বাইরে যেতে ভানুকে পাশে বসতে বলল শ্রীপতি, ‘ঠাকুর কী করেছে?’

‘কী করেছে মানে?’

‘অনন্তর মেয়েটা কই?’

‘আজ্ঞে,’ অনন্তকে জিজ্ঞেস করবেন বাবু।’

‘অনন্ত আমাকে বলেছে।’ শ্রীপতি পকেট থেকে সিগারেট বের করে। ধরিয়ে ধোঁয়া উড়িয়ে দেয় ঘরের সিলিং–এর দিকে। ধীরে ধীরে পাখাটা ঘুরছে। ক্লান্ত পাখির মতো ডানা কাঁপাচ্ছে যেন। শ্রীপতি বলল, ‘তুমি তো বলোনি কিছু আমাকে।’

‘কী বলব, আমি তখন তো ছিলাম না।’

‘এসে তো জেনেছিলি ভানু, জানাসনি কেন?’

ভানু চুপ করে থাকে। বাবুকে কেন জানাবে তা ভেবে পাচ্ছে না। আর বাবু তো দেরি হলেও জেনেছে এখন, বাবু কী করবে করুক। করার কী আছে, অনন্ত টাকা নিয়ে বসে আছে, কত টাকা নিয়েছে তা ভানু ভালোভাবে জানে না। ও বিষয়ে কোনো কৌতূহল প্রকাশ করেনি এ পর্যন্ত। টাকা নিয়ে এখন মেয়েটাকে ফেরত আনবে কীভাবে, বা ঠাকুরকে অভিযুক্ত করবে কোন পথে?

শ্রীপতি বলে, সে তো জানতই না এত কিছু। ভানু যে ওদের সঙ্গে কলকাতা পর্যন্ত গেছে তাও জানত না। অনেকদিন অনন্তর মেয়েটাকে দ্যাখেনি। মেয়েটা বেশ ছিমছাম, ভদ্রলোকের মেয়ের মতোই চালচলন, কথাবার্তা। কী সুন্দর বলেছিল ঘোড়া দেখেছে রং দ্যাখেনি, বর্ণহীন ঘোড়া। তো আচমকা মেয়েটার কথা জিজ্ঞেস করে ওর বাবার কাছ থেকে জানতে পারল সব। বলতে বলতে অনন্ত প্রায় কেঁদে ফ্যালে আর কী। পঞ্চম ঠাকুরকে দোষ দিল। পঞ্চম ঠাকুর আসলে আড়কাঠি। এ কাজ তো ভয়ানক কাজ। ধনেপ্রাণে মারা পড়বে শ্রীপতি অমন লোককে আশ্রয় দেওয়ার জন্য। ভানু চুপচাপ শুনে যায়। শ্রীপতি তার কাছে মতামত চাইছে বটে, কিন্তু তা না দিলেই–বা কী, সিদ্ধান্ত তো বাবুর নিজের। বাবু কি তার কথায় সিদ্ধান্ত নেবে, না বদলাবে?

শ্রীপতি বলল, 'ওদের তাড়াতে হবে।'

ভানু বলল, 'আমাকে বলে কী হবে বাবু, হোটেল আপনার, বিজনেস আপনার, আপনার কর্মচারী সব।'

শ্রীপতি বলে, 'রামচন্দ্র এ কাকে এনেছে সঙ্গে করে?'

'শুনলেন তো জমি ভিটে সব চলে গেছে গরমেন্টের হাতে, মিলিটারি নিয়ে নিল সব, নিয়ে নিল স্বামী সংসার সব।'

'সে তো শুনলাম, মেয়েটা রামচন্দ্রর সঙ্গে কেন?'

'তা কি বুঝায়ে বলতে হবে বাবু?' ভানু হাসতে চেষ্টা করে।

আচমকা শ্রীপতি খেপে উঠে, 'ওর এত বড়ো সাহস, ও জায়গা থেকে একটা মেয়েমানুষ নিয়ে এল এখেনে, কেন এল?'

'ওকে জিজ্ঞেস করুন।'

'তুমি জানো না ভানুবাবু?'

'আজ্ঞে, কী বলব?'

'ওরা কি একসঙ্গে থাকে, রামচন্দ্র আর সুভদ্রা?'

ভানু চুপ করে থাকে। তার মৌনতায় যা বোঝায় বুঝে নিক শ্রীপতি মাইতি। ভানু মনে মনে বিরক্ত হয়। মাইতিবাবু তার কাছে জানতে চাইছে কেন? মাইতিবাবু নিজে বুঝে নিক সব। কিন্তু মাইতিবাবু তো তাকেই দোষ দিতে আরম্ভ করল। ভানু এসে এই মেয়েমানুষের খবরটা বলেনি, তার পোষ্য হল রামচন্দ্র, পোষাঘোড়া পালাতে পারে, রামচন্দ্রর সেই সাহস নেই। ওর শুধু শরীরখানা রয়েছে, মাথা তো নিরেট। নিজের কোনো মতামতই নেই। বাবু যা বলে দিয়েছে অক্ষরে অক্ষরে তা পালন করে ভীমাপুরের কাছারিবাড়িতে বসে। সেই লোক কিনা আস্ত একটা মেয়েমানুষ সঙ্গে করে এতদূর এল! তার চেয়ে বড়ো কথা মেয়েমানুষটা তার কাছারিবাড়িতে থাকে রামচন্দ্রর আশ্রয়ে। রামচন্দ্রর এই আচরণ তো শ্রীপতির কাছে ভয়ের। রামচন্দ্রর এত সাহস হল কী করে? ভানু তার পয়সায় ভীমাপুর গেল, ঘুরে এল, কিন্তু কোনো খবরই আনতে পারল না! ভানু কি দ্যাখেনি এই মেয়েমানুষটাকে তখন?

ভানু বলল, 'দেখেছিলাম, কিন্তু কথাটা কি বলার মতন?'

শ্রীপতি রেগে গেল, 'বলার মতন নয় কেন?' ভানুর মাথাটিও কি ওই রামচন্দ্রর মতো নিরেট! কী আশ্চর্য! তার পোষা নায়েব কাছারিবাড়িতে একটা মেয়েমানুষ এনে তুলেছে সেটা কোনো খবর নয়? সেই খবরটা দেবে না ভানু? ভানুও কি ভীমাপুর, বালিমুন্ডায় গিয়ে ফুর্তি মেরে এসেছিল? ভানু কেন খবরই দেয়নি তা সন্দেহজনক মনে হচ্ছে শ্রীপতির কাছে। ভানু তো কোনো খবরই দেয়নি, অনন্ত সারের মেয়েটা যে বিক্রি হয়ে গেছে সে খবরটা জেনেও চেপে ছিল ভানু। শ্রীপতি কি বিশ–পঁচিশ হাজার খরচ করতে পারত না। মেয়েটা বাইরেই চলে গেল?

ভানু বিড়বিড় করে, 'আমি তো ওই দালালি করি না বাবু।'

শ্রীপতি এবার গলার স্বর নিম্নখাদে নামিয়ে আনে, 'আহা, সে–কথা বলছ কেন ভানুবাবু। খবরটা তো দেবে।' তার হোটেলের পঞ্চম ঠাকুর এমন একটা কাজ করল। তার কর্মচারী গোপনে আড়কাঠি হয়ে গেছে, তা শ্রীপতি নিজে জানবে না? না জানলে কোনদিন ব্যাবসা লাটে উঠবে তা কি জানে না ভানুবাবু?

ভানু চুপ করে থাকে। শেষের কথাগুলোর যুক্তি আছে। তার বলা উচিত ছিল মাইতিবাবুকে। ভানু মাথা নামিয়ে থাকে। আর রামচন্দ্রর কথাটাও তার রিপোর্ট করা উচিত ছিল বোধ হয়। কিন্তু কেন করবে? সে কি চুকলিবাজ? সে কি শ্রীপতি মাইতির খোঁচড়? তার কাজ কি খবর বয়ে আনা? কিন্তু তা যদি না হয়, তাহলে তার কাজ কী? ভানু ভাবলেশহীন চোখে তাকিয়ে থাকে মাইতিবাবুর দিকে। কী বলবে? কিছুই বলার নেই। সে তো শ্রীপতির কথামতো গৌরমোহন মদরঞ্জিওয়ালার বউটাকে পটাতে পারল না। শ্রীপতি মাইতির কোন কাজটা করেছে ভানু? ঘোড়াটি কি সে রাত্তিরে ছেড়ে দিয়েছিল? এখন শ্রীপতির যদি সেই সন্দেহ হয়, ভানু কি না বলতে পারবে? ভানুর মুখখানি অন্ধকার হয়ে গেছে। বুঝতে পারছে শ্রীপতি তার উপর ভরসা রাখতে পারছে না। আজ সমস্ত দিন, তারপর সন্ধ্যায় ঘটে যাওয়া ঘটনা শ্রীপতির মানসিক শৃঙ্খলা ভেঙে দিয়েছে। ভানু টের পাচ্ছে সে তোপের মুখে পড়েছে। সে বুঝতে পারছে শ্রীপতি তাকে সন্দেহ করতে শুরু করেছে। কিন্তু কেন? ভানুর তো হাসি পাচ্ছে। পক্ষীরাজকে সে ছেড়ে দেবে, কেন দেবে? কী লাভ? আর অতদিনের পোষা প্রাণী, ছেড়ে দিলেই চলে যাবে, ফেরত আসবে না? পোষা প্রাণী কি পালায়, না পালিয়ে থাকে? মাইতি বাবু কি ধরতে পারছে না কেন পালিয়েছে? সে তো টের পেয়েছিল ধরিত্রী–গর্ভে বিস্ফোরণের কথা। মাইতিবাবু যদি নগেন গিরির সঙ্গে কথা বলতে বসত, তাহলে জানতে পারত সব।

শ্রীপতি ডাকে, 'চুপ করে আছিস যে ভানুবাবু?'

ভানু বলে, 'যদি সন্দেহ করেন আর থাকা যায় না, আর ঘোড়াটা যখন নেই, আমি কী করে থাকি, শূন্যপৃষ্ঠ নিয়ে ফিরল সে, বিবিক্ত পৃষ্ঠং চ নিশাম্য বাজিনং পূনর্গবাক্ষাণি পিধায় চুক্রুশুঃ, তার শূন্যপৃষ্ঠ দেখে অন্তঃপুরবাসিনীরা গবাক্ষ রুদ্ধ করে কাঁদতে লাগল!

'এসব কথা কেন বলো, এসবের মানে কী, ঘোড়াটার নাম ছিল পক্ষীরাজ, তুমি কন্থক করে দিলে।'

'আমি যতবার গেছি, ঘোড়াটাকে আনতে পারিনি, শূন্য হাতে ফেরা কি কম কষ্টের, কুমারকে না নিয়ে কন্থক ফিরেছিল, আমি কন্থককে না নিয়ে...।'

'ভানুবাবু, আপনি কে বলুন দেখি, আমি তো এসব বুঝিনে কিছুই।'

বিষণ্ণ ভানু বেরিয়ে আসতে আসতে শুনল শ্রীপতি ডাকছে ঠাকুর–ঠাকুরানিকে।

ভানু বাইরে এসে দুজনকে ডাকতেই দেখল ঠাকুরের মুখখানি ফ্যাকাশে। তার চেয়ে বেশি ফ্যাকাশে ঠাকুরানির। সুভদ্রা বসে আছে কিচেনের বেঞ্চিতে। তার মুখখানি নত, হাতে এক কাপ চা। ঠাকুরানি জেরা করছিল বোধ হয়। ভানু জিজ্ঞেস করে, 'কী বললে ওদের?'

'কুছু না, কী হিবে ভানুদাদা?'

ভানু কিচেন থেকে বেরিয়ে দেখল বালিয়াড়িতে উবু হয়ে বসে রামচন্দ্র বিড়ি টানছে অন্ধকারে। ঠিক অন্ধকার নেই, হোটেলের জানালা থেকে এক স্তবক আলো গিয়ে পড়েছে বালিয়াড়ির উপর, আর সেই আলোর বিভায় অন্ধকার অনেকটা হালকা হয়ে গেছে। ঘোড়াটি ওই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকত, বালিয়াড়িকে পিছনে রেখে সমস্ত রাত। ভানু উঠে এল আবার বারান্দায়। কিন্তু ঠাকুর–ঠাকুরানির সঙ্গে কী কথা হচ্ছে মাইতিবাবুর তা কি গোপনে শোনা উচিত? আড়াল করতেই তো মাইতিবাবু ঘর থেকে সরিয়ে দিয়েছে তাকে।

ভানু নেমে এল আবার। কিচেনে ঠিক সেইভাবে বসে আছে সুভদ্রা। ভানু গিয়ে তার মুখোমুখি বসে, 'বিয়ে করেছ তোমরা?'

'মোর তো আগের বিয়ার সিঁদুর রহিছে ভানুদাদা।'

'ঠাকুরানি কী বলছিল?'

'ভয় দিখাইছিলা কহিছিল চলি যাই যেনে।'

ভানু এবার গলা শুনতে পায় ঠাকুরের, দুজনে বেরিয়ে এসেছে বারান্দায়। ঠাকুর তাকে ডাকল, 'ও ভানুবাবু, বাবুর কী হইছে?

‘কী হয়েছে তুমি জানো না?’

‘যদি দোষ হই থাকে মোর হইছে, শালো অনন্ত তার মেয়্যাটিকে জাহাজওয়ালার ঘরে কাজ করতি পাঠাল, মু হুঁই গিলা আড়কাঠি, আর তার জন্য ঠাকুরানির কাম যাবে, ই কেমন হিলা?’

ভানু অবাক, ‘সেকি, ঠাকুরানি কী দোষ করল?’

‘কী বলি কহ দেখি।’ বিড়বিড় করে ঠাকুর।

ভানু দ্যাখে ঠাকুরানি চোখ মুছছে আঁচলে। ভানু বুঝতে পারছে না কেমন হল ব্যাপারটা। ঠাকুরানির তো কোনো ভূমিকাই নেই, তার কাজ গেল, আর ঠাকুর বহাল থাকল? মাইতিবাবুর কি মাথা খারাপ?

তখন শ্রীপতি মাইতি বারান্দায় এসে দাঁড়ায়, গম্ভীর গলায় ডাক দেয় রামচন্দ্রকে, ‘অ্যাই রামা, শুনি যা হারামজাদা।’

রামচন্দ্র বলল, 'বাবু কহিলা ধান কাটার পর উসব কথা শুনিবে, হুটেলে ঠাকুরানির বদলে সুভদরা কাম করিবে, বাবুর মায়া হইছে।'

'তুমি কী বললে?' ভানু জিজ্ঞেস করে।

'আজ্ঞা মু কী কহিব, বাবুর উপরে মু কী কহিতে পারি, মু কাল বাদ পরশু সকালা ভীমাপুর চলি যাবু, সুভদ্রা ইখেনে রহি যাবে।'

'সুভদরা কী বলছে?'

'চুপ করি রহিছে, কুনো কথাই কহিছে না।'

'বিয়ে কবে হবে?'

'আজ্ঞা ধান কাটার পর, ইটা তো কাত্তিক মাস, মৌসির মাস ছাড়া তো বিয়া হিবে না, কাত্তিক মাসে বিয়া হয়নি।'

'তাহলে সুভদ্রা এখেনে থেকে যাবে?'

'আজ্ঞা বাবু ইটাই কহিলা, বিয়া হয় নাই, উয়াকে কাছারিবাড়ি রাখা তো 'রিকস' হই যাবু, উটা ঠিকওনি, তবে কিনা উ তো একজনার বউ ছিলা, মাথায় সিঁদুরও পরে, মু বাবুর কথাই শুনিব, সুভদরা রহি যাক।'

রামচন্দ্রর কথার সময় সুভদ্রা মুখ নামিয়ে—স্থির, নিস্পন্দ। ভানু এতক্ষণে বুঝল ঠাকুরানিকে কেন বিদায় দিচ্ছে মাইতি মশাই। রামচন্দ্র তাকে টানল, 'শুনো ভানুবাবু, বাবু কহিছে ধান কাটার পর সত্যিই যদি গরমিন জমিন ঘিরি দেয়, দখল করি নেয়, তখন মুকে হুটেলের ঠাকুর করি দিবে, ঠাকুর বটে মানিজারও বটে, সুভদরা ঠাকুরানি, ই ঠাকুরকে বিদায় দিবে সি সময়!'

'যদি জমিন থেকে যায়?'

'সিটা তো জানিনি, সি কথা তো কহেনি বাবু, কিন্তু জমিন রহিবেনি, বাতাসে কথা উড়ছ্যা, ধান কাটার পর তারকাঁটা দিয়া ঘিরি লিবে, জমিনের টঙ্কা বালেশ্বর থিকে দিয়া দিবে।'

ভানু চুপ করে যায়। শ্রীপতি মাইতি তার কর্মচারীকে নিয়ে কী করবে তা তার ব্যাপার। সে নিজে শ্রীপতির কর্মচারী কি না তা জানে না। শ্রীপতি খেয়ালি মানুষ, পয়সাওয়ালা মানুষ, সে শ্রীপতির ঘোড়ার দেখভাল করত। দীঘায় নেমে শ্রীপতির সঙ্গেই আলাপ হয়েছিল প্রথমে। শ্রীপতি তাকে চিনেছিল। ভবঘুরেকে হোটেলের কাজে বন্দি করেছিল। ঘোড়ার পরিচর্যা ঠাকুর করত না। ঠাকুরের অত সময় কোথায়? পয়সা মারার ধান্দা করবে, না ঘোড়াটাকে দেখবে? শ্রীপতি সব জানে। কিন্তু এও জানে ঠাকুর আর কত মারতে পারবে পয়সা, বরং ঘোড়াটাকে না দেখলে ক্ষতি হয়ে যাবে। তাই ভানু এল ঘোড়ার পরিচারক হয়ে। ভানু জীবনে কখনো ঘোড়ার গায়ে হাত দেয়নি তার আগে, কিন্তু আশ্চর্য, পক্ষীরাজ তাকে চিনে গেল ঠিক! ভানু এসেছিল বোশেখ মাসে, আশ্বিনে আবিষ্কার করল ঘোড়াটাও ভবঘুরে। পালায়, ফিরে আসে, আবার পালায়, তো এখন ঘোড়াটা নেই, ঘোড়া নেই যখন ভানু কী করতে আছে শ্রীপতি মাইতির কাছে? কিন্তু ঘোড়া যখন পালিয়েছে, আগের মতো ফিরেও আসতে পারে। তখন তো আবার কাজে বহাল হয়ে যাবে ভানু। এখনও অবশ্য বহালই আছে। তার কাজ যায়নি, ঘোড়াটাকে খুঁজে বের করাও তো কাজ। যতদিন পাবে না ততদিন খোঁজ। সবে তো ক–টা মাস হয়েছে, সময় তো ফুরিয়ে যায়নি! চাঁদ উঠছে, মেঘ, বৃষ্টি, আলো–অন্ধকার, সব রয়েছে। সমুদ্র রয়েছে, আকাশ রয়েছে, জ্যোৎস্না রাত্রি রয়েছে, হিম পড়তে শুরু করেছে, আকাশের যত তারা সব আছে, কোনো তারা সন্ধ্যায় অস্ত যাচ্ছে, কোনোটি মধ্যরাতে জেগে উঠছে। ওই যে মাথার উপরে ছায়াপথটি, আকাশগঙ্গা, যেমন ছিল তেমনই রয়েছে। ওই আলোর নদীর পশ্চিম ঘেঁষে অভিজিৎ নামের একটি নক্ষত্র আছে। ভানু তাকে চিনেছিল, এখন ধরতে পারে না, চোখ ঝাপসা হয়ে আসে। আরও কত চিনত সে, একেবারে পূর্বদিগন্ত ছুঁয়ে প্রায়, আকাশগঙ্গার শেষে ব্রহ্মহৃদয় ভেসে থাকে এই সময়। ভানু

চিনতে পারে না। চেনে শুধু উত্তরাকাশের ওই ধ্রুব নক্ষত্রটিকে! যে বৈশাখে কন্থক পালিয়েছিল, তখন ব্রহ্মহৃদয়টি পশ্চিমে দিগন্তের কাছে ছিল। সরতে সরতে অস্ত গিয়েছিল জ্যৈষ্ঠের শেষে। তারপর আবার ফিরে এসেছে আকাশমণ্ডলে। আকাশের গ্রহনক্ষত্রের শৃঙ্খলা একটুও ভাঙেনি। বৈশাখে ছিলেন সপ্তঋষি, উত্তর আকাশে, প্রায় মাথায় মাথায়, এখন সপ্তঋষিরা বিশ্রামে গেছেন। এই ক–দিন আগে তাঁরা অস্ত গেছেন পশ্চিমদিগন্তে, মাঘে আবার ফিরে আসতে আরম্ভ করবেন। ফাল্গুনে আকাশে জ্বলজ্বল করবে সাতটি ভাই। ঘোড়াটা কি জানে না এসব? যেখানেই থাকুক সে মাথার পরে আকাশ আছে। সেই আকাশে তার চেনা তারারা রয়েছে। সবই যখন আছে, সে ফিরবে না কেন? গাছগাছালি, বনবনান্তর, পাহাড়, নদী সব যদি থাকে সে যাবে কোথায়? কেন ফিরবে না? ফিরতে তাকে হবেই, আর ভানুকে খুঁজে যেতে হবে ঘোড়াটিকে। না পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। কখনো পথের ধারে, কখনো নদীর কূলে, কখনো বনের পাশে, হাটে, মাঠে, অশ্বত্থতলায়—যেখানে যেখানে কেউ কারোর জন্য অপেক্ষা করতে পারে, সেখানেই অপেক্ষা করবে ভানু।

পরদিন ঠাকুরানি খুব চোখের জল ফেলল। ঠাকুর ভোরবেলা ছুটে তার জন্য একটা কাজ ঠিক করে ফেলেছে নতুন দীঘার দিকে, কিন্তু থাকার জায়গা তো পাবে না সেখানে। আচমকা যে তার চাকরি চলে যাবে তা ভাবতেই পারেনি ঠাকুরানি। ঠাকুরানির বোনের বাড়ি আছে বালিসাই। সেখানে যাবে, না মাইতিবাবুর জন্য বসে থাকবে, সিদ্ধান্তে আসতে পারছে না। মাইতিবাবু আদেশ দিয়ে কাল রাতেই ফিরে গিয়েছিল সাঁতরাপুর। সকালে আসেনি, কিন্তু খবর পাঠিয়েছে রামচন্দ্র যেন থাকে। রামচন্দ্রকে কখনো নিরুদ্বেগ দেখছে, কখনো উদ্বিগ্ন দেখছে ভানু। ঠাকুরানি চোখের জল ফেলতে ফেলতে কাজ করছে। সমুদ্রপাখি হোটেলে থাকার জায়গা পেয়েছিল সে, জায়গা সমেত কাজ পাবেই বা কোথায় স্বামী–স্ত্রী? স্বামী–স্ত্রী কি? ধরা যায় না ঠিক। ভানুর কখনো সন্দেহ হয়, কখনো ভাবে সন্দেহ করার কোনো কারণ নেই।

ভানু জিজ্ঞেস করল, ‘তোমার কাজে গোলমাল হয়েছিল?’

ঠাকুরানি মাথা নাড়ে, ‘জানিনি।’

‘তাহলে ঠাকুরের জন্য কাজ গেল?’

‘জানিনি।’

রামচন্দ্র আর সুভদ্রা শিবমন্দিরে গেল। সমুদ্রের কাছে গিয়ে সকালটা বসে থাকল। ভানুর কাজ দেখা। ভানু দেখছে দুটিতে মিল হয়েছে খুব। পক্ষী আর পক্ষিণীর মতো দুজনে মুখোমুখি সমুদ্রের ধারে ঝাউয়ের ছায়ায় বসে আলাপ করছে। ভানুর আজ কোথাও যাওয়ার নেই। তার মনের ভিতরে কোথাও কোনো অন্ধকারে কাঁকর ঢুকে গেছে যেন। অস্বস্তি একটা রয়ে গেছে। ঠাকুরানির চাকরি আচমকা খেয়ে নিল মাইতিবাবু, ঠাকুরকে রেখে দিল! অপরাধ তো ঠাকুরের, ঠাকুরানি কী করল? ভানু টের পাচ্ছে, কিন্তু ভাবতে ভয় পাচ্ছে। সুভদ্রাকে রেখেই দিল শ্রীপতি মাইতি? রেখেই দিল ঠাকুরানির জায়গায়। রামচন্দ্রকে পাঠিয়ে দিল বালিমুন্ডা—ভীমাপুর। পাঠিয়েই দিল।

বিকেল বিকেল এল শ্রীপতি। ঠাকুরানি উশখুশ করতে লাগল। দুদ্দাড় করে নেমে এল নীচে, কিচেনে গিয়ে ঢুকল! ঠাকুর বেঞ্চে চুপ করে বসেছিল। ঠাকুরানি চাপা গলায় তাকে শ্রীপতির আসার খবর দিতে ঠাকুর বলল, ‘কুছু হবেনি, তুই যা।’

‘কাই যাবু?’

‘তার আমি কি জানি?’

‘তুমি ইটা কী বল ঠাকুরমশায়?’

‘মোর ভিটায় তো তুরে লিয়ে যাবনি।’

‘ঠাকুরমশায়, মু তুমার আশরয়ে ছিলাম।’

ঠাকুর মুখ গোমড়া করে বসে আছে। ঠাকুরানির কালো চকচকে দুটি চোখের কোণ চিকচিক করে উঠেছে। ঠাকুর ইঙ্গিত করল মাইতি মশায়ের কাছে যেতে। ঠাকুরানি কিচেন থেকে বেরিয়ে এল আঁচলের খুঁটে চোখের জল মুছতে মুছতে। বেরিয়ে ভানুকে পায়, 'ভানুদাদা!'

ভানু বলল, 'যাও বাবুর কাছে।'

'তুমি যাও ভানুদাদা, মু কী করিছি কুছুই জানিনি।'

ভানু ঢুকে গেল শ্রীপতির ঘরে। শ্রীপতি চিত হয়ে বিছানায় শুয়েছিল। ভানুকে দেখেও শুয়ে থাকল। ভানু টেবিলের লাগোয়া চেয়ারটিতে বসল। বসেই থাকল। শ্রীপতি উঠে বসল আচমকা, 'মেয়েছেলেটা যায়নি?'

ঠাকুরানি সমস্ত দিন চোখের জল ফেলছে।

'আমি কী করব? আমি তো ওর ঠিকা নিয়ে বসে নেই।'

ভানু বলল, 'রাখা যায় না?'

'না, ওকে তো আমি রাখিনি, রেখেছিল ঠাকুর, ঠাকুরের জন্য ওকে ছাড়লাম, ও ঠাকুরের রাখনি, বিয়ে করা বউ তো না।'

'আগে তো শুনিনি।'

'দরকার হয়নি তাই শোনোনি, আর শুনবে কেন, কথাটা কি বলার মতো, ঠাকুরের এত আস্পদ্দা, আমার হোটেলে খেয়ে, কাজ করে, আড়কাঠিগিরি করবে, আর আমি তা জানব না, তুমিও বলোনি ভানুবাবু, কিছুই বলোনি।'

'আজ্ঞে আমি বলার কে, আমি জানতাম আপনি জেনে যাবেন।'

'তুমি তো ভীমাপুরের কথাও...।' শেষ করে না শ্রীপতি।

ভানু চুপ করে থাকল। কথাটা কাল রাতেই শেষ হয়ে গেছে ধারণা ছিল, কিন্তু তা নয়। শ্রীপতি ভোলেনি, শ্রীপতি ফুঁসছে। বলছে, 'ও বেটা আমার নায়েব ও একটা মেয়েমানুষ তুলেছে কাছারিতে, কাছারি ওর বাপের?'

ভানু চুপ করে থাকে। মাইতিবাবুর কর্মচারী, বাবুর যেমন শাসন করার অধিকার আছে, তেমনই আছে যে–কোনো ব্যবস্থা নেওয়ার অধিকার। শ্রীপতি বলছে, সুভদ্রাকে রেখে দিতে সুবিধা হল ঠাকুরানিকে ছাড়া। ঠাকুরানি হল ঠাকুরের পোষা মেয়েমানুষ। ঠাকুরের বউ ছেলেমেয়ে সব আছে গাঁয়ে, দীঘার ঠাকুরানি তার সেবা করে। ঠাকুরানিকে ঠাকুরই এনেছিল। ঠাকুর খুব চালাক। মেয়েমানুষটাকে বউ পরিচয়ে কাজে ঢুকিয়ে নিল অথচ ওর বউ যে ঠাকুরানি নয় তা টের পেতে প্রায় মাস ছয়েক লেগেছিল শ্রীপতির, যখন গাঁ থেকে ঠাকুর মশায়ের সম্বন্ধী এল চন্দনেশ্বর মন্দিরের মানত পালন করার জন্য। ঠাকুরকে জব্দ করার এটা একটা উপায় হল। ঠাকুরানির জন্যই ঠাকুর তার কাজ ছাড়বে ঠিক।

ভানু বলল, 'ঠাকুরকে ছাড়লেই তো হত।'

উঁহু, তাহলে ঠাকুরের কাজ করবে কে? ভানুর দ্বারা ও কাজ হবে না, রামচন্দ্রও পারবে না। আর রামচন্দ্রকেও তো বুঝিয়ে দেওয়া দরকার সে যে কাজটা করেছে তা ঠিক নয়। সুভদ্রাকে রেখে দিয়ে রামচন্দ্রকে একা ভীমাপুর পাঠানোর জন্যও ঠাকুরানিকে ছাড়ানো হয়েছে। রামচন্দ্রর সঙ্গে সুভদ্রাকে ভীমাপুর ফেরত পাঠানো যায় না। কাছারির একটা মেয়েমানুষ নিয়ে থাকবে নায়েব, তা তো হতে পারে না। তাতে কাছারির বদনাম হবে মাইতিবাবুর। কাছারিটা হিসেব রাখার, মেয়েমানুষ নিয়ে থাকার জন্য নয়। নায়েব এসব করলে জমিজমা রক্ষাই দায় হবে। পুলিশের নজর পড়বে কাছারির উপর। তার কাছারিতে ওভাবে পুলিশের আনাগোনা হলে কাছারির মান থাকবে না। কাছারির পবিত্রতা নষ্ট হবে। সুভদ্রা মেয়েমানুষটি স্বামী ত্যাগ দেওয়া। শ্রীপতি দেখেই বুঝতে পারছে ওর স্বভাবও ভালো নয়। হতে পারে না। জেনেশুনে ওকে যেতে দেওয়া মানে রামচন্দ্রর ফুর্তির ব্যবস্থা করা।

ভানু বলল, 'ঠাকুরানি কাঁদছে।'

'কাঁদুক।' শ্রীপতি নির্মম। ঠাকুর ওকে বাঁচাক। আর ঠাকুরও বুঝুক কাজটা সে ভালো করেনি। ঠাকুরানিকে নিয়ে খুব সুখে ছিল ঠাকুর। সেই সুখ ভাঙা দরকার। শ্রীপতি বলছে, 'রামচন্দ্র তো কাল ভীমাপুর যাবে, আজই সন্ধ্যের পর ওকে সাঁতরাপুর পাঠিয়ে দেবে, এক জায়গায় থেকেও আলাদা হয়ে যাবে সে সুভদ্রার কাছ থেকে। সেই কাজটাই করা দরকার।' ভানুকে গাঁজা সাজতে বলে শ্রীপতি।

ঠিক সন্ধ্যের সময় দুটিতে ফিরল। রামচন্দ্র আর সুভদ্রা। ঠাকুর গেছে ঠাকুরানিকে বালিসাইয়ের বাসে তুলে দিতে। শ্রীপতি রামচন্দ্রকে ডেকে সাঁতরাপুর যেতে বলে। ওদিক থেকে ভ্যান রিকশা ধরে রামনগর গিয়ে বাস ধরে যেন রামচন্দ্র। একটু খরচ বেশি হবে। হোক।

রামচন্দ্র হাত কচলায়, এতক্ষণে সে টের পেল সুভদ্রা বউকে রেখে তাকে চলে যেতে হবে এখনই। বাবু বলছে, বাবু যাবে, রামচন্দ্র না বলে যেন ভীমাপুর ছেড়ে এদিকে না আসে, আসতে হবে না।

'আজ্ঞা আঘুন মাসে?'

'চোপ, যা বলছি তাই করবি।'

'আজ্ঞা তাই হিবে, কিন্তু সুভদরা?'

'আমার কাছে থাকল।'

'আজ্ঞা!' রামচন্দ্রর চোখমুখ বিপন্ন হয়ে উঠল। বিমর্ষতার ছায়া পড়ল। এতক্ষণে সে ধরতে পারছে সুভদ্রা দীঘায় থাকবে, সে থাকবে ভীমাপুরের কাছারিতে। কাছারি ত্যাগ করতে মানা করছে বাবু। ধান কাটার পরে ওরা আসবে। এখন সরকার জমি যদি নিয়ে নেয়, কত জমি নিচ্ছে সরকার তার হিসেব নেওয়া দরকার। নায়েব কাছারিতে থাকবে না, অথচ সমস্ত স্থাবর সম্পত্তি সরকার ঘিরে নেবে তা তো হয় না। শ্রীপতি বোঝাতে লাগল, এই সমস্ত অধিগ্রহণের কোনো হিসেব থাকে না, সরকারি সার্ভেয়ার যেমন বলবে তেমন হবে। এমন যদি হয় একশো বিঘে নিয়ে সার্ভেয়ার বলল, সত্তর বিঘে নিয়েছে, সেইভাবে যদি হিসেব দাখিল করে কালেক্টরের কাছে, তবে কালেক্টর সাহেব তাই মেনে নেবে। আবার সার্ভেয়ার যদি বিশ বিঘে নিয়ে, কুড়িটা–তিরিশটা দাগ দখল করে বলে পঞ্চাশ বিঘে নিয়েছে, পঁয়ষট্টিটা দাগ নিয়েছে, কালেক্টর তাও মেনে নেবে। সুতরাং সার্ভেয়ারকে বশ করতে হবে। সার্ভেয়ারকে দিয়ে কাছারিবাড়ির এরিয়া বেশি লেখাতে হবে, লেখাতে হবে হাজারটা নারকেলগাছ আছে, সেই সবের দাম সার্ভেয়ারের হিসেব মতো কালেক্টর দেবে। রামচন্দ্রের এখন ওই কাজ করা উচিত কাছারিতে পড়ে থেকে। ধান কাটার সঙ্গে সঙ্গে খুঁজে বের করা উচিত অধিগ্রহণ দপ্তরের সার্ভেয়ারকে, ছোটো বড়ো অফিসারদের। কত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব নায়েবের।

রামচন্দ্র বাধ্য ছেলের মতো সব শুনল, তারপর জিজ্ঞেস করল, বাবু কবে যাবে? বাবু গেলে তো খবর সব পাবে রামচন্দ্র। কোন খবর? তা কি আর খোলসা করে বলে সে? শ্রীপতি ভানু দুজনেই বুঝে নিল। শ্রীপতি হাসতে লাগল। নেশাটা ধরেছে তার, বলে, যাবে শিগগির, এমাসেই ধান কাটা হয়ে গেলে যাবে খবর নিতে, তবে নিজে না গিয়ে ভানুকেও পাঠাতে পারে।

রামচন্দ্র বলে, 'ভানুবাবুর অশ্ব উদিকে নাই।'

নাই! কী করে বুঝল রামচন্দ্র? থাকতেও তো পারে। ঘোড়াটা যে সমুদ্র উপকূল ধরে ছুটে যায়নি তা জানবে কী করে রামচন্দ্র? আকাট রামচন্দ্র! নির্বোধ রামচন্দ্র! শ্রীপতি বলল, এখনই যেন রামচন্দ্র সাঁতরাপুরে চলে যায়, তার মা দেখতে চেয়েছে তাকে। ভানুর আর ভালো লাগছিল না। আচমকা সে উঠে পড়ল। বেরিয়ে এসে দেখল সুভদ্রা বসে আছে কিচেনের ভিতরে, চেয়ারে আধময়লা আলোর ভিতরে। ভানুকে দেখে অন্ধকার মুখ নামায়।

রামচন্দ্র বেরিয়ে এসে ভানুকে ধরল, 'ভানুবাবু, তুমি কুছু কহিবে না?'

'কী!' ভানু ঘাড় ঘোরায়। দেখল মস্ত চেহারার লোকটা নুয়ে গেছে, কোনোরকমে উদগত অশ্রু চেপে রয়েছে। 'ধুস!' ভানু ঠেলে দিল রামচন্দ্রকে, বলল, 'আমি কী বলব, আমি কি তোর বাবু, যা না বাবুর পা ধর গিয়ে।'

রামচন্দ্র দাঁড়িয়ে রয়েছে। এই রামচন্দ্র আর কাছারিবাড়ির রামচন্দ্র এক নয়। কাছারিবাড়ির রামচন্দ্র অন্য লোক। তার অন্য রূপ, অন্য চেহারা। ভানু বলো, ‘কে তোকে নিয়ে আসতে বলেছিল সুভদ্রাকে?’

‘সুভদ্রা কহিছে রহিবেনি।’

‘তা কি আর হয়।’ ভানু মাথা ঝাঁকায়।

রামচন্দ্র বলে, ‘মোর ডর লাগিছে ভানুবাবু, তুমি কুছু কহ।’

ভানু হাসতে থাকে, ‘কী কহিব রে, কী কহিব, যা কাছারিতে গিয়ে সার্ভেয়ারকে খুঁজে বের কর, সুভদ্রা বাবুর কাছে থাকুক।’

ঠাকুরানিকে বাসে তুলে দেওয়ার পর পঞ্চম ঠাকুর অন্ধকার মুখে ফিরেছিল। মুখের অন্ধকারময়তা পরের দিনও ছিল। তারপর আস্তে আস্তে সে মেঘ কেটে গেছে। স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে ঠাকুর। ঠাকুরানি নাকি কাঁথির কোনো হোটেলে কাজ পাবে। দীঘার কাজটা হল না, থাকার জায়গা নেই বলে। কাঁথির হোটেল প্রায় সমস্ত রাতই খোলা থাকে। ডিউটিটা ওখেনে খুব কষ্টের। তবে টাকা বেশি। এই বৃত্তান্ত শেষ করে ঠাকুর বলছে, পাক না পাক, তার কী? পথের মেয়েমানুষ, কাজের খোঁজে ঘুরছিল দীঘায়, প্রায় কুড়িয়ে এনে তাকে এই হোটেলে কাজ দিয়েছিল সে। এই কাজ না পেলে কোথায় দাঁড়াত? কাজটা রাখতে পারল না যখন ঠাকুর কী করবে? কাজ রাখতে জানতে হয়। মেয়েমানুষ, শুধু কাজে হয়! কতদিন বলেছে সে বাবুর দেখভাল করতে, হাত–পা টিপে দিতে, যায়নি। ফলটা হল।

বিনবিন করছে পঞ্চম ঠাকুর সমুদ্রের ধারে বসে। ভানু একা বসেছিল, তার পাশে এসে বসেছে পঞ্চম ঠাকুর। হাসছে, বলছে, 'বাবুর মনে হয়েছে হোটেলে সময় দিচ্ছে বেশি, আর এই যে মেয়েছেলেটা এসেছে ভীমাপুর থেকে, সুভদ্রা, সে নাকি খুব কাজের, বাবুর পছন্দ হয়েছে।'

ভানু চুপ করে আছে। পঞ্চম ঠাকুর তাকে দিয়ে কথা বলাতে চাইছে। ভানু কথা বলছে না। বলতে ভালো লাগছে না। পঞ্চম ঠাকুর এসেছে বাজার করতে। বাজার করে ভানুকে নিয়ে ফিরবে। ভানুকেও খুঁজছে বাবু।

ভানু বলল, 'ঠাকুরানি যে তোমার বিয়ে করা বউ না, তা তো জানতাম না।'

পঞ্চম ঠাকুর বলে, 'ওই তো মেয়েছেলেটার দোষ, ঠাকুরানি নামটা ও নিজি নিইছিলা, ও নিজিই ইসব কহি বেড়াত, মু কি কহিছি কখুনো, কভু কহি নাই, বাবুরও কানে গিইছিলা কথাটা, তাই ওর কাম গেল, চালচলন ঠিক নাই, মাগি পয়সাও সরাত, গেছে ভালো হইছে।

ভানু মনে মনে হাসে। ঠাকুরানিকে নিয়ে কিচেনের দরজা বন্ধ করত পঞ্চম ঠাকুর রাতের বেলায়, এ তো তার নিজের দেখা। এতদিন ধরে দেখেছে ঠাকুর–ঠাকুরানি স্বামী–স্ত্রী। সম্পর্কটা মিথ্যে ভাবার কোনো উপায়ই ছিল না। এমনকি হোটেলে যদি মাইতিবাবু না থাকত, কোনো ঘর ফাঁকা থাকত, ঠাকুর–ঠাকুরানি সেই রুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করত, তাও তো দেখেছে ভানু। তারা যেন সুখী দম্পতি। ঠাকুর কীরকমভাবে শাসনে রাখত ঠাকুরানিকে। মাথার কাপড় ফেলতে দিত না। ঠাকুরকে খুব ভয় পেত মেয়েমানুষটা। আর ঠাকুরের জন্য তার কত উদ্বেগই না ছিল। এখন ঠাকুর বলছে পথের মেয়েমানুষ। বলছে ঠাকুরানি কেন মাইতিবাবুর সেবা করেনি। এই কথার মানে কী? ঠাকুর কি অন্য কথা বলতে চাইছে? ঠাকুর যে কতটা বদলে গেছে ঠাকুরানির বিদায়ে তা আজ সকালে দেখেছে ভানু। ঠাকুরের গলার স্বরই বদলে গেছে। ঠাকুর ক্রমে ক্রমে ভানুর দিকে চলে আসতে চাইছে। ভানুর গা ঘেঁষে থাকতে চাইছে। সুভদ্রার সঙ্গে যেভাবে, যে ভাষায় কথা বলছে ঠাকুর, তা ঠাকুরানি কল্পনাও করতে পারবে না। ঠাকুরানির বিদায় এবং সুভদ্রার প্রবেশ স্থির হয়ে গেলে ঠাকুর তার নিজের ভূমিকা টের পেয়ে গেছে।

ঠাকুর বলল, 'বাবু রহিছে ঘরে, বাবুর নার্স মেয়েমানুষটার কপাল পুড়ল, সি নাকি বদলি হই যাবে, বাবুর মনও বদলি হই গিছে।'

ভানু বলল, 'এসব থাক।'

ঠাকুর নিঃশব্দে হাসে, ঠাকুরের ঠোঁটের কোণে চোরা হাসি ফুটে ওঠে, বিনবিন করে বলে, 'মাইতিবাবুর মন যে কখন কুনদিকে ধায় বুঝারও উপায়নি, ধরারও উপায়নি, ঠাকুরানি যদি সেবা কইরত তবু কি রহিতে পারত, এক মেয়েমানুষের সেবা কতদিন পছন্দ হয় কহ।'

ভানু বলল, 'তুমি থামবে!'

'কেনে শুনতে ভালো লাগছেনি?'

'না, ওসব আমাকে বোলো না।'

‘কিন্তু ইটাই তো সত্য, দ্যাখো না কেনে একদিনেই বাবু কি ঠান্ডা, নোতন দাসীর হাতের চুড়ির নঠুন শুনা যাচ্ছে, উয়ার পায়ে আবার নূপুর আছে, ইটা কি জানো?’

ভানু ঘুরে তাকায়। ঠাকুর কীসব বলছে? কেন বলছে? তাকে শোনানোর উদ্দেশ্য কী? রামচন্দ্র কিনে দিয়েছিল পায়ের নূপুর। রামচন্দ্র নাকি ওর পায়ে নূপুর পরিয়েছিল যাওয়ার আগের দিন সন্ধ্যেয়। ঠাকুর নিজের চোখে দেখেছিল তা। ঠাকুর হাসছে, ‘রামচন্দ্রটা দামড়া ও পরাল নূপুর, সেই নূপুরের শব্দ শুনছে রামচন্দ্রর মালিক মাইতিবাবু। শুধুই ডাকাডাকি করছে ‘‘সুভদ্রা, সুভদ্রা’’ বলে।’

ভানু বলল, ‘আমায় বসে থাকতে দাও, তুমি তোমার কাজে যাও ঠাকুর!’

ঠাকুর খি–খি করে হাসে, ‘তুমারে যে বাবু স্মরণ করিছে, মোরে কহি দিল তুমারে ডাকি দিতে, তবে টুকুন পরে যেও, সুভদ্র দাসীর সহিত বাবু আলাপ কইরছে, তুমি গিয়া কী কইরবে কহ।’

ভানু কঠিন দৃষ্টিতে তাকায় ঠাকুরের চোখে। ঠাকুরের চোখের মণি তাতে কাঁপেও না। ঠাকুর বলছে, ‘সুভদ্রার হাতের রান্না ভালো, কাজ ভালো, ঠাকুরানি ছিল পথের, আর ই মেয়্যামানুষটা কাছারিবাড়ি থিকে আমদানি, ভালো তো হবেই, ইখন সব শান্ত থাকবে, ভানুবাবু, তুমি যদি ফির অশ্ব ঢুঁড়তে যাও বাবু টঙ্কা দিবে, বাবুর দিল খুলি যাবে।’

ভানু চুপ করে থাকে। সমুদ্রে তাকিয়ে থাকে। সমুদ্রের নীল ধীরে ধীরে শূন্যে পরিব্যাপ্ত হয়ে যাচ্ছে। অন্ধকার নেমে এল প্রায়। সে ঝম করে উঠে দাঁড়ায়। পঞ্চম ঠাকুর হল বিষধর। তার মুখ দিয়ে কোনো একটি কথা বের করে তা পৌঁছে দেবে শ্রীপতি মাইতির কানে। পঞ্চম ঠাকুরের শিরদাঁড়া ভেঙে গেছে। তা জোড়া লাগিয়ে উঠে দাঁড়াতে চাইছে আধবুড়ো লোকটা। ভানু ওকে সুযোগ করে দেবে না। পঞ্চম ঠাকুরকে ফেলে রেখে সে দ্রুত পা চালায়। কিন্তু ঠাকুর তাকে ছাড়ে না। আসতে থাকে গায়ে গায়ে। ভানু আকাশে ঘাড় উঁচিয়ে হাঁটছিল। মাইতিবাবু যখন ডেকেছে সে হোটেলেই ফিরবে এখন, ঘুরে, পঞ্চম ঠাকুরকে বলল, ‘তুমি আমার পিছনে আসছ কেন, যাও তো, কাজে যাও।’

ঠাকুর বলল, ‘ভানুবাবু, ঠাকরানি হইছে উচ্ছিষ্ট, উচ্ছিষ্ট তাই বাবু উয়ারে তাড়াই দিল, ইয়ারে যখন তা কঁইরবে তখনই ঠাকুর আশরয়।’

ভানু রাস্তার অন্যদিকে চলে যায় ঠাকুরকে এড়াতে। ঠাকুরের কথা সত্য, মিথ্যা সে জানে না, তবে এটা বোঝে সুভদ্রাকে রেখে দেওয়া ঠিক হয়নি মাইতিবাবুর। আবার ঠিক যে হয়নি, সে কথাও–বা বলে কী করে? ভানু দেখছে সমুদ্রের নীল এখন গভীর শূন্যতায় ছেয়ে যাচ্ছে। গোধূলিবেলা ফুরিয়ে গিয়ে সন্ধ্যা নেমে এল প্রায়। আলো নেই। এখন প্রায়ই আলো যাচ্ছে, কখন আলো যায় আর কখন থাকে ঠিক নেই। আবছা অন্ধকারে ভানুর মনখারাপ হয়। মনে পড়ে যাচ্ছে ভাদ্রমাসের সেই রাতটির কথা। ঘুমঘুম জ্যোৎস্না। সে দেখেছিল সুভদ্রা বউকে। তার অঙ্গে অঙ্গে বেদনার চিহ্ন। চিহ্নগুলি। মিলিয়েছে কি? মাইতিবাবু কি সব কথা শুনেছে? বলেছে কি সুভদ্রা দাসী? এখন এই অন্ধকারে বসে বলছে কি জমিজমা, সংসার, স্বামী যাওয়ার সেই দীর্ঘ বৃত্তান্ত। তা যদি শোনাতে পারে মাইতিবাবুর মন ঘুরতে পারে। ভানু ভাবল, আর কী? এসব তো রামচন্দ্র, সুভদ্রা আর শ্রীপতি মাইতির ব্যাপার। সে কে? ভালোমন্দর বোঝেই–বা কী সে? সুভদ্রাকে রেখে হয়তো বাঁচিয়ে দিল মাইতিবাবু। এ জায়গায় কাজ আছে, খেয়েপরে বাঁচার উপায় আছে, ভীমাপুরে কি তা আছে? রামচন্দ্র কি বাঁচাতে পারত ওকে? কাছারিবাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যেত যদি সুভদ্রাকে, রামচন্দ্রর কিছু করার থাকত? সেই হুমকি তো আসছিল। তাই ছুটে এসেছিল বিয়ে করার অনুমতি নিতে। আর রামচন্দ্র, সুভদ্রার জন্য কাছারিবাড়িতে যদি হামলা হত, শ্রীপতির দীর্ঘদিনের তালুক, জমিজমা বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ত। বালিমুন্ডা–ভীমাপুরের বিষয়সম্পত্তি, চাষবাস চলছে একটা নিয়মে, সেই নিয়মের উৎস যে কাছারিবাড়ি, সেখান থেকে যদি মেয়েছেলে লুট হয়ে যায়, নিয়ম ভেঙে পড়বে হুড়মুড় করে। চাষারা তো কেউই সুখে নেই, চাষারা তো কাছারির নায়েব, নায়েবের মালিকের হাতে সুবিচার পায় না। ভানু হাঁটতে হাঁটতে হোটেলে পৌঁছে দ্যাখে বারান্দায় হ্যারিকেন জ্বলছে। সামনের কিচেন–ডাইনিং–এর ভিতরে অন্ধকার নিঝুম হয়ে

ভেসে আছে। ভানু গলাখাঁকারি দিল, 'আরও আলো জ্বালাবে না?' বাবু এবার জেনারেটর আনবে, এবার তো টুরিস্ট আসার টায়েম, ঠান্ডা পড়ছে।

বারান্দার অন্ধকার থেকে অন্য কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'ভানুদাদা! ছন্দক!'

'কে, কোকিলা?'

গৌরমোহন অন্ধকারে উঠে দাঁড়িয়েছে, 'ভানুবাবু, মোরা এসে বসে আছি, মোরা পা দিলাম, আলো নিভল।'

'সুভদ্রা কই, সুভদ্রা বউ?' ভানুর গলায় উদ্বেগ।

'তুমাদের ঠাকরানি, অন্ধকারে বসে আছে রান্নাশালে।'

অস্ফুট নূপুরের শব্দ তুলে সুভদ্রা বেরিয়ে এল কিচেন–ডাইনিং থেকে। বারান্দা আর কিচেন–ডাইনিং–এ মধ্যবর্তী একফালি আকাশতলে দাঁড়িয়ে গোধূলি সন্ধ্যায় মুখ দেখাল, বলল, 'এনারা তুমার নিকট—!'

'বাবু কোথায়?'

'বাবু নিঁদ যাইছে, ঘরে রহিছে।'

ভানু বারান্দায় বসল বেঞ্চে, গৌরমোহনকে জিজ্ঞেস করতে যাবে তো সেই বলল কেন এসেছে। মদরঞ্জি বোনা শেষ। নিয়ে এসেছে। শুনে ভানু উঠে অন্ধকার ঘরের ভেজানো দরজা ঠেলে ভিতরে ঢোকে। বিলম্বিত লয়ে শ্বাস নেওয়ার শব্দ শুনল দাঁড়িয়ে। ডাকবে কি ডাকবে না ঠিক করতে না পেরে বেরিয়ে এসে দরজা আবার ঠেলে দিয়ে বলল, 'শরীর খারাপ নাকি?'

'কী জানি, মু তো চা দিলাম, চা নিলা।'

'ভরসন্ধ্যেয় ঘুমোচ্ছে কেন?'

'মু তো জানিনি।'

ভানু বসল, আবার বলল, 'আঁকা হয়ে গেছে! দেখাবে?'

'আলো আসুক,' কোকিলা বলে।

'আলো যদি দেরিতে আসে, ফিরতে হবে তো,' গৌরমোহন বলল।

'অন্ধকারে কি ধরা যাবে, হ্যারিকেনের আলোয়?'

ভানু বলল, 'এখন তো যেতে পারবে না, বাবু কিনবে, বাবু তো দেখবে, ঘুম ভাঙুক বাবুর, খোলো আমি দেখি।'

গৌরমোহন বলে, 'কোকিলার মাথায় যে কী ঢুকল, কেমন আঁকা করিছে দ্যাখো।'

ভানু ডাকল সুভদ্রাকে। বারান্দার কোণ থেকে পাকানো মাদুর নিয়ে এল কোকিলা। আলোটা উসকে দিল ভানু। বারান্দার ধারে সরে গেল বেঞ্চিটা টেনে। কোকিলা মাদুরের পাক খুলতে থাকে। দেওয়ালে কোকিলার অন্ধকার ছায়া কাঁপছে। গৌরমোহন হাত লাগাল কোকিলার কাজে। দুজনে মাদুরটি খুলে দেখাতে থাকে। মাদুর মানে মাদুরে বন্দি কন্থক। ভানু দেখল ঘোড়াটা মুখ বাড়াচ্ছে। এক ঝটকায় মাদুরটা টেনে খুলে দিয়ে কোকিলা বলে ওঠে, 'দ্যাখো ভানুদাদা, কেমন আঁকা করিছি, ধরিত্তি ফেটে আকাশ পর্যন্ত কালো ধুঁয়া উঠে যাচ্ছে, কন্থক পালাচ্ছে, তুমার অশ্ব যেমন ভাবে পলাইছিল ঘুড়াউয়ালা, তেমনি ভাবে পালাচ্ছে, এই দ্যাখো।'

হ্যারিকেনের গাঢ় অথচ অপ্রতুল আলোয় ভানু দেখল বারান্দাটি যেন পেয়ে গেছে মরুভূমির হলুদ রং। সেই হলুদ রঙের জমি ফেটে ধোঁয়ার কুণ্ডলী ছেয়ে ফেলছে নীল আকাশ, নীল শূন্যতা, নীল জ্যোৎস্না, নীল রঙের পৃথিবী। বাতাসে ভেসে যাচ্ছে তেজস্ক্রিয় মারণ বিষ। ভানু দেখছে ঘোড়াটির চোখ বিস্ফোরিত, নাসারন্ধ্র ফুলে উঠেছে, কেশরপুঞ্জ ঘাড়ের উপর দাঁড়িয়ে গেছে, আতঙ্কে ঘোড়াটির গায়ের সমস্ত রোম খাড়া হয়ে গেছে। মরুভূমির বালিতে ঢেউ। সেই ঢেউয়ে পক্ষীরাজের পা ডুবে গেছে। অস্ফুট আর্তনাদ করে ওঠে সুভদ্রা, 'এটি কী!'

'ঘুড়াউয়ালার ঘুড়া।'

ভানু বলল, 'তুমি এ কী আঁকলে?'

'তুমি যে বলে এলে!' বিড়বিড় করে কোকিলা।

'আমি কি এই বলে এসেছিলাম?'

'কহ নাই!' কোকিলা মাদুরের উপর ঝুঁকে পড়েছে, 'পোখরানের কথা কহিলে মোরে, পুন্নিমার দিনে মরুভূমিতে কী হল, তারপরেও কী হল।'

ভানু দরজায় গিয়ে ধাক্কা মারে, ডেকে ওঠে, 'বাবু, ও মাইতিমশায়।'

ঠিক তখনই জেগে উঠল শ্রীপতি। সে নিজে জাগছিল একটি দুঃস্বপ্ন থেকে। ভানুর ডাকে দুঃস্বপ্নটি হারিয়ে গেল মন থেকে। অন্ধকারে জেগেই ভানুর গলা শুনে ধড়ফড় করে নেমে এল খাট থেকে, 'কী হল, নতুন ঠাকরানির কী হল?'

'কিছু না, বাবু, আপনার পঙ্খিরাজ এঁকে এনেছে কোকিলা।'

'কোকিলা!' শ্রীপতি দরজা দিয়ে বাইরে তাকায়। বারান্দায়। বারান্দা থেকে দরজার মাপের আলো ঘরে ঢুকে খাট পর্যন্ত এসে বিস্তৃত হয়ে ঘরের অন্ধকারে হারিয়ে গেছে। শ্রীপতি দেখছিল বারান্দার আলোর খণ্ড থেকে আতঙ্কগ্রস্ত একটি সাদা ঘোড়া ঘরের অন্ধকারে যেন ছুটে আসতে চাইছে। আর তার পিছনে কুণ্ডলী পাকানো ধোঁয়া। এই ধোঁয়াই কি তার স্বপ্নে ঢুকে পড়েছিল। ভানু দেখছিল ঘরের বাইরেই মরুভূমির হলুদ রং ছড়িয়ে গেছে। ওই তো বসে আছ ভীমাপুরের বউটি। বউটি বড়ো চুপচাপ! শ্রীপতি ডাকছে বটে, কিন্তু তার নিজের কণ্ঠ থেকে দার্ঢ্য হারিয়ে গেছে যেন। সমস্ত দিন কতবার ডাকতে চেষ্টা করেছে শ্রীপতি, বোঝাতে চেয়েছে, কিন্তু পারেনি। সে ধীরে ধীরে বেরিয়ে এল, খুঁটিয়ে দেখল মদরঞ্জিটা, তারপর জিজ্ঞেস করে, 'এমন কেন?'

'ওইদিন যে মরুভূমি ফেটে গিয়েছিল দুফরে,' বলল কোকিলা।

'তার সঙ্গে পঙ্খিরাজ কেন?'

'এমনভাবে পালাচ্ছে ও।'

'কে আঁকতে বলেছে এমন করে?'

'কেহ না, মুর মনে হল, আঁকলাম।'

'এমন মনে হল কেন?'

'জানিনে বাবু, তবে এটাই সত্য।'

'না সত্য নয়।' শ্রীপতি বলল, 'মাদুর গোটাও।'

'নিবে না?' কোকিলা উঠে এল।

শ্রীপতির বলার আগে সুভদ্রা বলে ওঠে, 'ইটাই সত্য মু জানি।'

চমকে ওঠে শ্রীপতি। দেখল ভীমাপুরের বউটি ঘাড় ঘুরিয়ে তার চোখে চোখ রেখেছে, বলছে, 'ইটাই সত্য, ইমনই হইছিলা বাবু!'

'তুমি জানলে কী করে?'

'মু তো জানি। ইয়ার ভিতরে যা আছে সবু মুর জানা, দিখা।'

'এ মাদুরে আমি কী করব, এতে শোয়া যাবে না।'

'দেওয়ালে টাঙাই দিয়ো।' বলল কোকিলা।

শ্রীপতি দেখল কোকিলাকে। সেই কোকিলা, ভানু দাসের কোকিলা বধূ। এর মায়ায় পড়ে ভারতী চৌধুরি ধুলো হয়ে গেল তার মনে। কিন্তু এখন যে মনে হচ্ছে এ তো মায়াবতী নয়। কোনো মায়াই তো জাগাচ্ছে না। ওই যে সুভদ্রা বউ। তার টানে পড়ে আজ সমস্ত দিন শুধু হাঁপিয়েছে শ্রীপতি।

কোকিলা বলল, ‘ঘুড়া না পাও ঘুড়াউয়ালা, ঘুড়াটা কেন পলাল সি খবরটা তো জানবে, লকে তো তুমাদের কাছে শুনবে, তাই এমন আঁকা হল।’

শ্রীপতি এবার ঝুঁকে পড়ল মদরঞ্জির পর। মরুভূমির উপর। মরুভূমির হলুদ বালির উপর। ঝুঁকে পড়ে টের পেল বালির তাত ছড়িয়ে যাচ্ছে তার মুখমণ্ডলে। মুখের উপর ছড়িয়ে যাচ্ছে কালো ধোঁয়া। সে মুখ তুলে বলল, ‘এমন করে আঁকা ঠিক হয় নাই, এ মাদুর রাখা যাবে না।’

‘কেনে?’ সুভদ্রা গ্রীবা বাঁকিয়ে তাকিয়েছে।

শ্রীপতি নুয়ে গেল সুভদ্রার দৃষ্টিতে, বলল, ‘আমার ভয় করছে!’

‘সত্যি কি?’ কোকিলা জিজ্ঞেস করে, ‘সত্যি ডর লাগিছে?’

‘হাঁ সত্যি, মদরঞ্জিওয়ালা তুমি নিয়ে যাও, এ মাদুর ঘরে রাখলে ঝামেলা করতে পারে কেউ কেউ, আমার পক্ষিরাজ যাক।’ শ্রীপতির কণ্ঠস্বর স্তিমিত হয়ে গেল।

‘সে কী!’ ভানু আর্তনাদ করে ওঠে, ‘কী বলছেন বাবু, এ যে আমার কন্থক।’

‘যা বলছি, ঠিক বলছি, তুমি বুঝছ না।’ শ্রীপতি ঘরের অন্ধকারে গিয়ে ঢোকে, ‘বাতাস দেখছ না তুমি, কানে শোনো না!’

কোকিলা মাদুর গোটাতে থাকে। গোটাতে গোটাতে বলে, ‘ঠিক আছে এটি লিয়ে তুমার গৌরদাদা হাটে হাটে ঘুরবে, না বিকোক, লকে তো জানবে কেন পলাইছিল পঙ্খিরাজ।’

অন্ধকার থেকে শ্রীপতি বলল, ‘আমার উপায় নাই, এটি ঘরে রাখা যাবে না।’

‘ঠিক আছে বাবু, ঠিক আছে।’ মদরঞ্জিওয়ালি পাকিয়ে নিল মাদুর। মরুভূমি, বিস্ফোরণ, ছুটন্ত ঘোড়া সব অদৃশ্য হয়ে গেল।

সুভদ্রা বউ নেমে গেল অন্ধকারে। অন্ধকারে নেমে হাঁটতে লাগল। পরদিন সকালে উঠে ভানু শুনল নতুন কাজের মেয়েমানুষটা চলে গেছে একা একা।

ভানু বুঝল সাহস পেয়েছিল মদরঞ্জির উপর আঁকা দেখে। ভানুর মাথার ভিতরে মদরঞ্জিওয়ালির আঁকা ছবিটা গেঁথে গেছে। সে স্পষ্ট বুঝতে পারছিল কন্থক পালাচ্ছে। কিন্তু কোনদিকে? কোনদিকে যাবে সে? যেদিকে যাবে সেদিক থেকেই তো পালাতে হবে ঘোড়াটাকে।

ভানু সমুদ্রের ধারে ঝাউবনে বসে থাকল সমস্ত দিন। তার চোখ খুঁজছিল একটি শূন্য নৌকোকে। শূন্য নৌকো যেন ফিরে আসবে একা একা, মাঝি তাকে ছেড়ে চলে গেছে। ভানুর মনে হচ্ছিল সে নিজেই যেন সেই শূন্য নৌকোটি। সেই যেন সেই শূন্যপৃষ্ঠ অশ্ব, যে কুমারকে রেখে দিয়ে একা একা বিষণ্ন মনে ফিরল রাজধানীতে। কুমার গেছেন মৃত্যুকে জয় করতে। রোগ, জরা, মৃত্যুর শাসন থেকে মানুষকে মুক্ত করতে। মানুষের মনে আলো জ্বালাতে কপিলাবস্তুর রাজপুত্র গৌতম সর্বস্ব ত্যাগ করে প্রবেশ করলেন তপোবনে। তাঁর প্রিয় অশ্ব, প্রিয় সারথি ফিরেছিল ঘাড় হেঁট করে। তারপর অশ্বটি চলে গেছে সারথি ছন্দককে ফেলে। ভানু দাস কাঁপছিল, অশ্বটি কি যাত্রা করল রাজপুত্রের খোঁজে? রাজপুত্র যে বুদ্ধ হয়েছিলেন তা তো অজানা নয় কন্থকের। কন্থক কি বুদ্ধের কাছে ছুটে গেল? এ ছাড়া আর কোথায় যেতে পারে সে এই মরণগন্ধী পৃথিবীতে?

ভানু ভাবছিল সে এবার যাবে। এখান থেকে হাওড়া, হাওড়া থেকে ট্রেনে ভোজপুরের দিকে। ভানু ভাবছিল যাবে, রামনগর, কাঁথি হয়ে বাসে উঠবে। মোহনপুর দিয়ে বালিমুন্ডা। বালিমুন্ডা থেকে ভীমাপুর। ভানু ভাবছিল যাবে মীরগোদা, প্রাচীন জাহাজঘাটায়, মরা সমুদ্রের বালিয়াড়ি ভেঙে গৌরমোহন মদরঞ্জিওয়ালার ভিটেয়। সে ভাবছিল কাঁথি থেকে ট্রেকারে চেপে দৌলতপুর, দরিয়াপুর যাবে মদরঞ্জিওয়ালার বোনের বাড়ি, শিবরামকে নিয়ে রসুলপুরের নদীতীরে অন্ধকারে। ভানু ভাবছিল চলে যাবে বজবজ, সুরেন কুণ্ডুর চা–দোকানে, যাবে হিনাড়ি, গিরিমশায়ের ভিটেয়। এবার গিয়ে খুঁজবে ঘুড়িটার কবর। ভানু এইরকম, নানারকম ভাবতে ভাবতে হাঁটছিল। অঘ্রান পড়ে পড়ে, আজই অথবা কাল। ভানুর আর মন নেই এখানে, এই সমুদ্র উপকূলে। ভানু ভাবছিল চলে যাবে পিছনে। একবছর, দু–বছর করে হাজার বছর পিছনে। দু–হাজার, তিন হাজার, চার হাজার, পাঁছ হাজার বছর পিছনে আমুদরিয়া নদীর তীরে, অশ্বযূথে গিয়ে খুঁজবে তার কন্থককে। ভানু ভাবছিল চলে যাবে তপোবনের দিকে, কন্থক তপোবনের দিকে ধেয়ে গেছে কি না কে জানে। কন্থকের কি রাজপুত্রের কথা মনে পড়েছিল? তিনি তো সর্বস্বত্যাগী মহামানব হয়েছিলেন, জানে না কন্থক? ভাবতে ভাবতে ভানু অনন্ত সারের ভিটেয় এল।

‘তুমি বড়ো যাও না অনন্ত?’

‘নতুন কারবার, ছাড়ি যাবা যায়নি, থেকে যাবা তো ভানুবাবু?’

ভানু তো এসেছেই সন্ধ্যে পার করে, বলল, ‘থাকব, কিন্তু ঘোড়াটাকে কি দেখেছ, মাইতিবাবুর পঙ্খিরাজ? আমার কন্থক, শূন্যপৃষ্ঠ কন্থক।’

‘না তো দেখিনি, সেটি কি আবার পলাইছে?’

ভানু হাসল মনে মনে। অনন্ত ধরে নিয়েছে ঘোড়াটাকে পাওয়া গিয়েছিল। ঘোড়াটা ফিরেছিল। কবে ফিরেছে তা জিজ্ঞেসও করল না। অনন্তর মনে তা নিয়ে কোনো প্রশ্নও জাগেনি। পালায়, আবার ফেরে, সেই নিয়মেই যেন ফিরেছিল মাইতিবাবুর ঘোড়াটি। সেই কবে কার্তিক শেষ হয়েছে। কার্তিকের প্রথমেই তো ফিরে আসে পক্ষীরাজ, কে না জানে তা। কার্তিকে হিম পড়ে, কাশফুল ঝরে যায়, গাছের পাতায় ধুলো জমে, কেয়াবন কুশ্রী হয়ে যায়, তাই ঘোড়াটা আর থাকে না বাইরে। এ তো প্রকৃতির নিয়ম। অনন্ত ধরে নিয়েছে সেই নিয়মের কোনো ব্যত্যয় হয়নি। অনন্তর মুখোমুখি অন্ধকারে বসে আছে ভানু উঠোনতলে। হিমে শরীর ঠান্ডা হচ্ছে। ভানু অন্ধকারেই অনুভব করছিল ঘরখানি কী শান্ত! গৃহস্থের সংসার শ্রীময়ী হয়েছে। ভানু আকাশে তাকায়। তারায় তারায় আকাশখানি ঝলমলে। তবু সেই আকাশ থেকে হিম বিন্দু তার চোখের কোণে এসে পড়ল।

ভানু জিজ্ঞেস করল, ‘ঘোড়াটিরে চেনো তো?’

‘হাঁ, রংটি কী?’

ভুলে যাওয়ারই তো কথা। পঞ্চাশ জনকে জিজ্ঞেস করলে ঠিক ওই প্রশ্নটিই করবে। ঘোড়াটি বাদামি ছিল, না সাদা, না কি মিশেল ছিল সাদায় বাদামিতে? কালোয় সাদায়? কতবার দেখেছে তারা ঘোড়াটিকে, কিন্তু মনে রাখার কী আছে?

ভানু বলল, ‘ঘোড়াটির রং নাই।’

‘দেখলে খপর দিব।’ বলল অনন্ত, তারপর আচমকা ভানুর হাত ধরে ফেলে, ‘একটু ফাঁকে যাবা, ক–টা কথা বলি, শুনো ভানুবাবু, একটা খপর আছে।’

ভানু জিজ্ঞেস করে, ‘তোমার বউ কই?’

‘রান্নাশালে, চা কইরছে তুমার জন্যি।’ বলতে বলতে উঠে ভানুর হাত ধরে টানে অনন্ত, উঠোনের প্রান্তে চলে যায়, বলে, ‘পরশু দীঘা গেলাম দুজনায়, তুমারে খপর দিব ভেবেছিলাম, মনি অডারে টঙ্কা আসিছিলা।’

ভানু চুপ করে থাকে। কী বলবে? ভানু অনুভব করে টাকাটা পেয়ে আরও খুশি হয়েছে অনন্ত। টাকা কত তা নিয়ে কোনো কৌতূহল নেই তার। অনন্ত বলল, 'কেনে দীঘা গেলাম কহ দেখি, জানো কি ভানুবাবু?'

মাথা নাড়ে, 'না তো, কেন?'

অনন্ত চাপা গলায় খবরটা দেয়। দুজনে হাসপাতালে গিয়েছিল তারা। এখন তো যেতে হবে প্রায়ই, শুনছ ভানুবাবু, 'মোরা বাদ দিয়ে খপরটা তুমিই জানলে পেথম।'

ভানু অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে অনন্তর মুখের দিকে। তারার আলোয় মুখখানি উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে যেন। ভানু দেখল আলো রাখল সরস্বতী বারান্দায়। রান্নাঘরে ঢুকে গেল। চায়ের কাপ নিয়ে বেরিয়ে এল। ধীর গমনা। ভানু ফিরে এল আগের জায়গায়। বসল দড়ির খাটিয়ায়। চা নিয়ে পায়ের কাছে মাটিতে রাখল। সরস্বতী ঢুকে গেছে রান্নাঘরে। অনন্ত চায়ে চুমুক দিতে দিতে বলল, 'কুনো অভাব থাকছেনি, আষাঢ়ে হবে।'

ভানু অনেকক্ষণ বাদে উঠল, 'যাব।'

'যাবে কেন, থাকবেনি?'

'না, কাজ আছে।'

'অন্ধকারে, এত রাতে!'

'যেতে পারব।' ভানু হাঁটতে আরম্ভ করল।

ভেড়িবাঁধ দিয়ে হাঁটছে ভানু। যেন শূন্যের উপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। তার মাথার উপরে আকাশে আকাশে তাকে অনুসরণ করছে নক্ষত্রদল। ভানু হেঁটেই চলে। বালিমুন্ডা, হিনাড়ি, মীরগোদা, বজবজ, ভোজপুর, দরিয়াপুর, দৌলতপুর হেঁটে চলে সে। যাবে চোদ্দোবেড়িয়া, সেখানে সুবর্ণরেখা নদী, নদী মিশেছে সমুদ্রের সঙ্গে। সেই মোহনায় এক চর আছে। আশ্বিনে সবুজ ঘাসে ছেয়ে থাকে। তখন সেখানে কত বন্ধু! কত! কত! হাঁটতে হাঁটতে ভানু ঘুরে তাকায়। ওই দেখা যায় কুটিরখানি। আলো জ্বলছে। অন্ধকারে আকাশ থেকে একটি তারা বোধ হয় নেমে গেছে ওই কুটিরের উঠোনতলে। ঈশ্বর আবার মুখ তুলে চেয়েছেন ওই সংসারে। ওখানে আবার ঈশ্বর ছুঁইয়ে দিয়েছেন তাঁর নরম হাতখানি। তিনিই পারেন। কুন্তির মা আবার পেটে ধরেছে। ভরা পেটে বসে আছে উঠোনে। তারায় আলোয় তার মুখখানি সহাস্য। ভানু হাঁটছে। চোদ্দোবেড়িয়া...চোদ্দোবেড়িয়া...চোদ্দোবেড়িয়ায় আসে গিরিমশায়ের ঘুড়িটি। রূপসি ঘুড়ি। বাদামি আর সাদায় মেশানো রং, কপালে পর পর তিনখানা সাদা টিপ। কীভাবে ঘাড় বাঁকিয়ে তাকায়। ফোঁস ফোঁস করে। কীরকম চাহনি ফোটে রূপসির দুই চোখে। দুই চোখ দিয়ে কীরকম ডাকে! আমি চললাম। শরৎকাল এসে গেছে। চললাম। নীল আকাশ, সাদা মেঘের ভেলা, জ্যোৎস্না, ঠান্ডা বাতাস—আমি চললাম।

মনে পড়ে কি দুপুরটার কথা, 'হে সারথি ছন্দক?'

ভানু বলল, 'পড়ে মনে।'

'মনে পড়ে সে আমার কতকালের সাথি। কুমার বিসর্জন দিলেন আমাদের, আমরা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে অশ্রুপাত করেছিলাম। হায়, এ সংসার দুঃখের সমুদ্র, তখন বুঝিনি, এখন অনুভব করছি।

'মনে পড়ে আবার ভুলেও যাই। কতদিন হারিয়ে গেছে! কত কাল! কত যুগ! সেই উড়াল হ্রদের তীর থেকে হারিয়ে গেল, আমুদরিয়া, সিরদরিয়া নদীর কূল থেকে হারিয়ে গেল, হারিয়ে গেল গিরিপথের অন্ধকার থেকে। হারিয়ে গেল এই সমুদ্রতীর থেকে। উধাও হয়ে গেল। নায়কান বুড়ি তাকে বাতাস করে দিল।

'মনে পড়ে যায় সব। সেই দুপুরের কথা। ধারালো রোদের কথা। রোদ বোধ হয় অত গরম আমার জীবদ্দশায় হয়নি। আগুনের ভিতর দিয়ে হেঁটে এলাম। হাঁটতে হাঁটতে পা বেঁকে যাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল পড়ে যাব।

'আমি কন্থক, ছিলাম রাজপুত্রের ঘোড়া, রোদ্দুরে ধুঁকতে ধুঁকতে এলাম ছায়ায়। একা একা দাঁড়িয়ে আছি। চোখ বুজে এসেছে। গায়ে যেন ঠান্ডা হাওয়া লাগল। ঘাড় তুলে উপরে তাকালাম। মেঘের পুঞ্জ। কালো চুল এলিয়ে দিয়েছে কে যেন! বাতাস ঠান্ডা হয়ে গেল। মেঘের ছায়ায় বালি ঠান্ডা হয়ে গেল। ছায়া ঘনাইল বনে বনে। ছায়া

এল মনের ভিতরে। বৃষ্টি আসবে কি? এসো বৃষ্টি, এসো। প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে এসো। চোখের কাজল হয়ে এসো। বৃষ্টিতে দুটো চোখ ভিজুক।

'ভিজে মাটির গন্ধ উড়তে লাগল। ঘুমের ঘোরে ছিল শ্রীপতি। পাশে ভারতী শুয়ে। গল্প করছিল একটু আগে। কী গল্প! অনাথ আশ্রমের। শ্রীপতি বুকে চেপে ধরেছিল অনাথিনীকে। বড়ো মায়ায় ফেলেছে। তাকে সর্বস্ব নিবেদন করেছে। রতিক্লান্ত নারীও ঘুমোচ্ছিল। শ্রীপতি ঘুমের ঘোরে মেঘের ডাক শুনছিল।

'পৃথিবীটা সত্যিই সুখের। আগুন নিমেষে উধাও। প্রবল ধারার বৃষ্টি সব ভিজিয়ে দিল। আমাকেও। আমার গা ভিজল। ঝটকা মেরে মেরে জল ছাড়াতে ভালো লাগছিল গায়ের রোম থেকে। পেটের কাছে একটা ঘা। ঘায়ে একটাও মাছি নেই। আমি লেজটা দিয়ে বার বার জল ছড়াচ্ছিলাম।

'কী বৃষ্টি! কী বৃষ্টি! আকাশ ভেঙে পড়তে লাগল। মেঘ গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে ঝরে পড়তে লাগল। অন্ধকার নেমে এসেছে দুপুরেই। বাতাস বইছিল খুব। বাতাসে দিশাহীন হয়ে বৃষ্টি যেন ঢুকে পড়ছিল শরীরের ভিতরে। রক্তের ভিতরে প্রবেশ করছিল মেঘ। আমি দুটো পা তুলে বৃষ্টিকে ডাকছিলাম। কী আনন্দ! শরীর জুড়োল জগতের। আমারও। তারপর! বৃষ্টি আস্তে আস্তে কমতে লাগল। ফিসফিসে হয়ে একেবারে থেমে গেল। আমি দাঁড়িয়ে আছি। তারপর মেঘের নীল রংটা ছড়াতে লাগল পৃথিবীতে। অন্ধকার হয়ে এল। অন্ধকারের পৃথিবীতে চাঁদ ওঠে। চাঁদ উঠল। সুবর্ণ বলয়। চাঁদ ভাসতে ভাসতে এল আকাশের মাথায়। তখন আমি চমকে গেছি সত্যি!

'চাঁদের আলো পড়েছে এখানে সেখানে জমে থাকা জলের উপর। উপরের আকাশে সেই কালো মেঘ আর একটুও নেই। আমি দেখছি চাঁদের পাশ দিয়ে উড়ে যাচ্ছে সাদা দলা দলা মেঘ। মাটিতে জমে থাকা জলে প্রতিবিম্বিত জ্যোৎস্না ভেসে যাচ্ছে হাওয়ায়।

'মিলে যাচ্ছে। সব মিলে যাচ্ছে। ঋতু বদল হয়ে গেছে। গ্রীষ্মের পর বর্ষা, বর্ষা গিয়ে শরৎকাল এসে গেছে। গন্ধ পাচ্ছি শরৎকালের। আশ্বিনের। ঋতু ছড়িয়ে পড়েছে পৃথিবীময়। আমার কান খাড়া হয়ে উঠল। নাক তীক্ষ্ণ। জোরে জোরে নিশ্বাস নিচ্ছি। বাতাসে বাতাসে খবর আসছে—ঋতু বদলে গেছে, তৈরি হও। জোট বাঁধো, তৈরি হও।

'তৈরি হও, আকাশের নীলে সাদা ফেনার মতো মেঘ ভেসেছে। ওইতো ভরা নদী সুবর্ণরেখা, আর দূরে সমুদ্র। আলগা আলগা দখিনা বাতাস। চরভূমি ভরে গেছে সবুজ ঘাসে। কাশফুলে কাশফুলে নেমে এসেছে গিরিবাবুর বাড়ির সেই রূপসিটা। আছে ভোগরাই, রানীশাহী, চাঁদবালি, দেউলি সব জায়গার পালিয়ে আসা ঘোড়ারা। ছুটেছে চর বেয়ে। ঘাসে মুখ দিচ্ছে, ফুর্তিতে হইহই করে উঠছে।

ভালোবাসা হয়ে গেছে কারোর সঙ্গে কারোর। মনে পড়ছে না তারা কারা? কোত্থেকে এসেছে। ফুর্তিতে ফুর্তিতে সবাই আদিম। আদিম থেকে আদিমতর। ভিতরে জেগে উঠেছে বুনোঘোড়ার তেজ। বুনোঘোড়ার ফুর্তি। বুনোঘোড়ার স্বপ্ন। বনের স্বপ্ন, প্রান্তরের স্বপ্ন, নদীতীরের স্বপ্ন। মনে পড়ে যাচ্ছে আমুদরিয়া নদীর কথা, উড়াল হ্রদটির কথা। পুরুষপুর, সিন্ধুনদ, গিরিপথ যত। তারপর কপিলাবস্তু। রাত অন্ধকারে দুধঢালা জ্যোৎস্নায় ভিজে ভিজে হয়ে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে, পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন স্মৃতির সামনে দাঁড়িয়ে তারা যেন ফিরে যায়, বার বার ফিরে যায় সেই দিনে। কতকাল আগে! জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরছে পাল বেঁধে। সব জঙ্গল, সমস্ত পৃথিবীই তাদের। এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত অবধি বুনোঘোড়ারা পৃথিবীর বুক ফুঁড়ে চলে যায় কোথায় কোথায়। বাধা নেই ভালোবাসায়, বাধা সেই জীবনে।

'আমার ভিতরটা ফুলে ফুলে উঠতে লাগল। কোন ফাঁকে এই রাতে ঋতু বদল হয়ে গেছে। চন্দনেশ্বর, হিনাড়ির গিরিবাবুর ঘরে বড়ো হাওয়া সেই রূপসি, চকচকে বাদামি রং, কপালে তিনটি দুধ সাদা টিপ, গায়ে কোথাও সাদা আঁচড়। সে ফুর্তিতে টলমল হয়ে হাঁটছে জ্যোৎস্নার ভিতরে। নীল জ্যোৎস্নায় মিশে গেছে তার দেহ। শুধু তার ডাক শুনে তাকে চিনতে হবে। সে এমনভাবে ডাকে, রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে সর্ব অঙ্গ। ডাক শুনলাম যেন তার, প্রিয়তম, প্রিয়তম হে, এসো, আকাশ বদলে গেছে, বাতাস বদলে গেছে, চর ভরে গেছে কুচিকুচি ঘাসে, সবুজ মখমলে।

'আমি আর পারি না। ডাক এল। যাই যাই করে ছুটে যাই। যাই হে প্রিয়তমা, যাই আমি, দাঁড়াও, আসছি, আসছি করে ছুটে যাই সেই রাতে। হাওয়ায় উড়ে উড়ে ভেসে ভেসে পার হয়ে যাই ঘুমন্ত পৃথিবী। স্বর্গের দিকে ছুটে যাচ্ছি। প্রিয়তমা, রূপসি—আমি আসছিই!

'তারপর একসময় বেগ কমতে থাকে। বুঝতে পারি এসে গেছি সেই চরে। সব নিঝুম। ওইতো দূরে নদী, আর ওই দক্ষিণে সমুদ্র। চাঁদটা আবার মেঘে ঢাকে, মেঘ থেকে বেরোয়। জ্যোৎস্না ছড়িয়ে যায় আবার। জ্যোৎস্না নীল হয়ে যায়। নীল জ্যোৎস্নায় চোখ ধাঁধিয়ে যায়।

'শরৎকাল এসে গেছে। আবার মেঘ কেন? আমার বুক ছ্যাঁৎ করে ওঠে। সারারাত সমুদ্রের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছি। আসবে অন্য ঘোড়ারা। এসে গেছে। আমাকে দেখে লুকিয়েছে বোধ হয়। এও এক খেলা। নাকি আমিই এলাম প্রথম। স্বপ্নের ভিতরে ডাক শুনেছি রূপসি ঘুড়িটার, সেই ডাকে ছুটে এসে দেখি সে আসেনি এখনও। তাই কী? তাই–বা হয় কী করে? আমি লাফ দিলাম।

'সবদিকে লাফিয়ে গেলাম। কেউ নেই। তাহলে কী ওরা এসে পৌঁছোয়নি? আমি সারারাত সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে থাকি। ওই যে ফেনার মতো স্তূপ স্তূপ মেঘ উড়ছে। ওরাই তো লাফ দিয়ে মাটিতে নামবে। নেমে হয়ে যাবে গিরিমশায়ের রূপসি ঘুড়ি। তারপর! কী খেলা কী খেলা!

'তারপর আরও পশ্চিমে সমুদ্রের কোল ঘেঁষে পোড়া চাঁদ, আগুনরঙা চাঁদ ডুবে যায়। রাত শেষ হল। ওরা এখনও তো এল না। আমি তো ঋতু বদলের গন্ধে গন্ধে পালিয়ে এসেছি। ওরা এল না কেন? আশ্বিন যে এসে গেছে! আশ্বিনের খবর কি পৌঁছোয়নি ওদের কাছে?

'সূর্য উঠল। আমি এ কী দেখছি! সব নিঝুম। ছুটে যাই ঝাউ জঙ্গলের দিকে। কেউ নেই। ছুটে যাই কেয়াবনের দিকে। কাউকে পেলাম না। রোদ উঠছে। রোদ ছড়িয়ে পড়ল। আমি অবাক হয়ে চারদিক দেখছি। স্তব্ধতা আমাকে ঘিরে আছে।

'ওরা আসছে নিশ্চয়ই। নিশ্চয়ই আসবে। কিন্তু রোদ আগুন হয়ে যাচ্ছে। কাশফুল কোথায়? কাল রাতে লক্ষ করিনি। নাকি ছিল, দেখেছিলাম। এখন নেই। কাল রাতে যা যা ছিল এই চরে এখন তা নেই। এখন দেখতে পাচ্ছি, কাশফুল নেই, চর ঘাসে ছেয়ে নেই; তাহলে!

'রোদ চচ্চড়িয়ে বেড়ে যাচ্ছে। এমন হচ্ছে কেন? এমন তো হওয়ার কথা নয়। এ যে সেই রোদ। আমার গা–টা পুড়িয়ে দিতে লাগল। আগুনের কণারা লাফ দিয়ে নামছে। এ যে ভীষণ গ্রীষ্মের সেই রোদ। রোদ বাড়ছে। রোদ ঘন হচ্ছে। আগুনের স্রোত বইতে আরম্ভ করেছে।

'বাতাসে বালি উড়ছে। এ কোথায় এলাম? আমি পালাতে চাই আবার। কিছু মিলছে না। শুধু আগুন আগুন। ভুল করে চলে এলাম নাকি!

'গিরিমশায়ের রূপসি ঘুড়ি, তুমি কোথায়? কথা ছিল যে আসার। ঋতুর গন্ধে গন্ধে উড়ে এসেছি আমি। এ কী! বালিতে আমার পা বসে যাচ্ছে কেন? হাওয়ায় ঘূর্ণি। বালি উড়ছে! তাতা বালি আমার গা–হাত–পা পুড়িয়ে দিচ্ছে। আমার চোখে বালি এসে ঢুকে যাচ্ছে।

'কোথাও একটু ঘাস নেই। কাল রাতের ভিজে বালি একটু রোদ্দুরে শুকনো হয়ে উড়তে আরম্ভ করেছে। আমার পা সেই বালির ভিতরে ডুবে যাচ্ছে।'

চারদিকে ধু–ধু মরুভূমি। ঘোড়াটা তার ভিতরে পালাবার চেষ্টা করে। দৌড়োতে পারে না। বালিতে পা চলে না। রোদ্দুরে ঘুরপাক খায়। চোখে সব যেন আঁধার করে আসে।

'একটা নয়, দুটো নয়, কটা ডাঁশ পেটের ঘায়ে এসে বসেছে। কোত্থেকে তারা যে খবর পেয়েছে! আমি লেজ আছড়াই, শরীর কাঁপাই। তারা সরে না। ঘা–টা জ্বলে যাচ্ছে।'

ঘোড়াটা আর দাঁড়ায় না। ছুটতে আরম্ভ করে। ভয় পেয়ে যায় ভীষণ। এখানে সে এল কীভাবে? কখন এল? এখানে এমন সময়ে তো আসার কথা নয়। বাতাস ঠান্ডা নেই। রোদ ধারালো। মাটিতে একবিন্দু সবুজ নেই।

কেয়াবনে সবুজ নেই। এ সে এল কোথায়? এ তো চোদ্দোবেড়িয়া, কিন্তু চোদ্দোবেড়িয়া এমন নয়। ঘোড়াটা ছুটছে। ছুটতে ছুটতে তার জিভ বেরিয়ে যাচ্ছে। দাঁড়াচ্ছে। ছায়া খুঁজছে। ছায়া খুঁজে খুঁজে পা বাঁকিয়ে বাঁকিয়ে ঘোড়াটা হাঁটছে! পেটের ঘা থেকে রক্ত বের করে ফেলেছে ডাঁশে। ঘোড়াটার চোখে ঘোর। কোন পথে কোনদিকে হাঁটছে খেয়াল নেই। এমন তো কখনো হয়নি। এ জীবনে এমন হয়নি। এমন পৃথিবীও তো সে দ্যাখেনি। এ কোন দেশ? কোথাও কোনো ছায়া নেই। ঘোড়াটা হাঁটতে হাঁটতে দাঁড়ায়। তার ছায়া তার গায়েই মিলিয়ে গেছে। ঘোড়াটা ভয় পাচ্ছিল। এই রোদ, ছায়াবিহীন এই পৃথিবীই যদি তার নিয়তি হয়, সে ভীষণ ভয়ের। সে ধুঁকতে ধুঁকতে হেঁটে যাচ্ছিল নিরুদ্দেশের পথে।

ঘোড়াটা হাঁটছিল। সে বুঝতে পারছিল আশ্বিন আসেনি, আকাশ নীল হয়নি, কাশফুল ফোটেনি, বাতাস ঠান্ডা হয়নি, সমুদ্র শান্ত হয়নি—সব তার ভুল। সে বুঝতে পারছিল বর্ষা আসেইনি তো বর্ষার অবসান হবে কী করে? যে বৈশাখের ভিতরে ছিল সে, সাঁতরাপুর থেকে যে বৈশাখের পথে হেঁটে এল মালিক শ্রীপতি মাইতিকে চাপিয়ে কঠিন রোদে ধুঁকতে ধুঁকতে, সেই বৈশাখই রয়ে গেছে। কালবৈশাখীর মেঘ জমেছিল, সেই মেঘে বৃষ্টি হয়েছিল, সেই বৃষ্টি শেষ হয়ে গেছে, বর্ষার মেঘ এখন সমুদ্রের অতলে, তাদের ঘুম ভাঙেনি।

ঘোড়াটা বুঝতে পারছিল বড়ো ভুল হয়ে গেছে। আশ্বিনকে যেন সে স্বপ্নের ভিতরে দেখেছিল। আকাশ তাকে ঘোর মায়ায়, বিভ্রমে ফেলেছিল সেই পূর্ণিমার রাতে। সে এবার অনুভব করছিল যে বৈশাখ তাকে ঘিরে আছে তা আরও নিদয়া, কঠিন। যে পৃথিবীর পথে সে চলেছে সে যেন এক আগুনের পৃথিবী। ঘোড়াটা ছায়া চাইছিল, ছায়া পেলে দাঁড়ায়। দাঁড়িয়ে থাকে। দাঁড়িয়ে থাকে অনেকক্ষণ, অনেক সময়, অনেক মাস। সে পথ খুঁজছিল। কোন পথে গেলে পেয়ে যাবে চন্দনেশ্বর মন্দির, তারপর নতুন দীঘা, তারপর শ্রীপতি মাইতির হোটেল? সে মালিকের কাছে ফিরতে চাইছিল। এখন, এই এত শত বছর ধরে তার অভ্যাস বদলে গেছে, যদিও কখনো কখনো রাজপুত্রের স্মৃতি, সারথি ছন্দকের স্মৃতি, নদীতীরের স্মৃতি, বনভূমির স্মৃতি ফিরে আসে আচমকা, কিন্তু তা যে তাকে নদীতীরে, বনভূমিতে, অশ্বযূথে নিয়ে যাবে না, বুনোঘোড়ার পালে ফিরিয়ে দেবে না, সে কি তার অজানা? এই তো খুঁজে বেড়াচ্ছে হিনাড়ির গিরিমশায়ের পালিতা কন্যাটাকে, সেই রূপসিকে, যাকে সে সন্তান দিয়েছিল, আবার দেবে, সেই কামনায় না বাতাসের বেগে ছুটে এসেছিল চোদ্দোবেড়িয়ার চরে। মনের বেগে ছুটে এসেছিল বুনোঘোড়ার পালের দিকে। আশ্বিনে যখন চোদ্দোবেড়িয়ার চর চারপাশের নানা ঘোড়ার ডাকে, নানা ঘোড়ার ফুর্তিতে প্রাণময় হয়ে ওঠে, তখন তাদের ভিতরে হারানো স্মৃতি ফিরে আসে। অতীতের শৌর্য, বীর্য প্রাণময়তা জেগে ওঠে। এখন সে নিঃসঙ্গ। নিঃসঙ্গ ঘোড়াটির কিছুই মনে পড়ে না। মাথার ভিতরে কিছুই থাকে না আর। সে শ্রীপতি মাইতির হোটেলের কথাও যেন ভুলে যাচ্ছে। হারিয়ে যাচ্ছে সব। যেমন পথ হারিয়েছিল সে, তেমনিভাবে হারিয়ে যাচ্ছিল পথের চিহ্নগুলি, চেনা পথ অচেনা পথের ভিতরে ঢুকে যাচ্ছিল। সে বিষণ্ণ হয়ে এদিক-সেদিক দেখছিল। যদি সখিদের কাউকে দেখা যায়। ভোগরাই, রানীশাহি, হিনাড়ি, দেউলপোতা, কত জায়গার ঘোড়ারা সব আসত। সেইসব ঘোড়ারা কই? কোথায় তারা? ঘোড়াটা ডেকে উঠল, চিঁহি চিঁহি করে ডাকছিল, 'ভোগরাই, রানীশাহির পক্ষীরাজের দল, তোমরা কোথায়, তোমাদের টানে ছুটে এলাম, তোমরা কেউ নেই, সবুজ চরখানি বালি ধূসর। বাতাসে বালি উড়ছে। ঘূর্ণী হচ্ছে। তপ্ত বাতাসে চোখের ভিতরটা জ্বালা জ্বালা করছে।' ঘোড়াটা হাঁটতে হাঁটতে পৌঁছোল এক গাঁয়ে। গাঁ মানে ক-টা ঘর। পথের ধারে শিশুরা খেলছিল। কত সময়, কত দিন, কত বছর, কত যুগ বাদে মানুষের মুখ দেখল সে। দেখে তার আশা জাগল, মানুষ যখন তাকে চিনিয়ে দেবে মালিকের বাড়ির পথ। হয় সাঁতরাপুর, না হয় দীঘা। হয় দীঘা, না হয় হিনাড়ি, গিরিমশায়ের বাড়ি, রূপসি ঘুড়িটা আছে সেখানে, যে তাকে ডাক দিয়েছিল পূর্ণিমার রাতে। ছেলেপুলেদের দেখে শীর্ণকায় কন্থক ডেকে ওঠে, 'হিনাড়ি কোনদিকে? গিরিমশায়ের বাড়ি?'

ছেলেরা হইহই করে ওঠে, 'ঘোড়া, ঘোড়া, কোথাকার ঘোড়া?'

কন্থক তার পরিচয় দিল আকাশের দিকে ঘাড় উঁচিয়ে। তা শুনে ছেলেরা চিতকার করতে লাগল খেলা ভুলে, বলতে লাগল, 'ঘোড়া ঘোড়া, রাজপুত্রের ঘোড়া মানে অশ্বমেধের ঘোড়া!'

'ধর ঘোড়া, ধর ঘোড়া, অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়া ছেড়েছে রাজা!'

ঘোড়া, ঘোড়া, ঘোড়া! রব উঠতেই নিঝুম গ্রামখানি জেগে উঠতে লাগল। ঘোড়াটি দাঁড়িয়ে ছিল একটি সাঁইবাবুলের ছায়ার নীচে কোনোরকমে। ছায়াটা বড়ো ছোটো, সূর্য মাথায় উঠেছে, ছায়া আরও ছোটো হয়ে আসছে। ঘোড়াটা শুনছিল অশ্বমেধ যজ্ঞের কথা। ঘোড়াটা শুনছিল রাজার কথা। তাকে নাকি ছেড়েছে রাজা পৃথিবী পরিক্রমায়। সেই জন্ম যেন রাজপুত্র গৌতমের জন্মের বহু আগে, হিংসায় ভরা পৃথিবী তখন। যজ্ঞের ঘোড়া

ধরলেই যুদ্ধ লাগবে। ঘোড়াটা অলস দৃষ্টিতে ছেলেপুলেদের দেখছিল। রাজার ঘোড়া বলতে তার ভিতরে ঈষৎ তেজিভাব জেগেছে। তার যেন মনে পড়ে যাচ্ছিল অশ্বমেধ যজ্ঞটির কথা। কবে কোনকালে, কোন পুরাণের পৃথিবীতে সে বেরিয়েছিল যজ্ঞের ঘোড়া হয়ে। সেই স্মৃতি ফিরে আসছিল। সেই স্মৃতি শৌর্যের এবং বেদনার। মনে পড়ে সব, কত প্রাচীন দিনের কথা তা, সে ছিল রাজার ঘোড়া। অতি সুলক্ষণযুক্ত ঘোড়াটির গায়ের রং মেঘের মতো। মেঘবরণ ঘোড়াটির মুখখানি সোনালি হলুদ, দুই পাশের দুই পাঁজরে অষ্টমী তিথির দুই চাঁদ যেন ভেসে আছে! তার সমস্ত শরীর বিদ্যুৎপ্রভ, পেটের রং কুন্দফুলের মতো সাদা, চরণ হরিৎ বর্ণ, কান দুটি সিঁদুর রাঙা, তার জিহ্বা যখন দেখা যায়, মনে হয় প্রজ্বলিত অগ্নি বুঝি–বা। দুটি চোখ সূর্যের মতো তেজোময়, তার সর্ব অঙ্গে সুগন্ধ। সে ছিল অতি বেগবান। তার কপালে জয়পত্র বাঁধা। তার পিছনে পিছনে চলেছে রাজার সৈন্য। যে রাজ্যে ঢুকবে ঘোড়া, সেই রাজ্য যজ্ঞাধিপতি রাজার অধীন হয়ে যাবে।

‘এ তো একা এসেছে, সৈন্য সামন্ত কই?’ কে যেন বলে ওঠে।

হা–হা করে হাসে কে যেন, বলল, ‘লুকিয়ে আছে, ঘোড়াটাকে ধর।’

‘যজ্ঞের ঘোড়া সত্যি?’

‘যজ্ঞের ঘোড়া, যজ্ঞের ঘোড়া।’ রব উঠল। বালকদের চিতকারে নিঝুম গ্রামখানি জেগে উঠতে লাগল। কারা যেন ছুটে এল কোথা থেকে। তাদের পাকানো গোঁফ, রক্তাভ চোখ, মাথায় গেরুয়া পাগড়ি, দেহখানি দানবের মতো। ঘোড়াটিকে দেখে তারাও চিতকার করে ওঠে, ‘অশ্বমেধের ঘোড়া, নাহলে ঘোড়া আসবে কেন, এবার যুদ্ধ লাগবে।’

‘যুদ্ধের জন্য তো আমরা বসে আছি।’

‘যুদ্ধ নাহলে দাঙ্গা হবে।’

‘দাঙ্গার জন্য বসে আছি কতকাল।’

‘যুদ্ধ হবে, যুদ্ধ হবে, অনেকদিন সহ্য করা হয়েছে, আর সহ্য করা হবে না, যুদ্ধ, যুদ্ধ, ঘোড়াটিকে ধর, যুদ্ধ হবে।’

‘মানুষ মরবে যে।’

‘মরুক, কতদিন মানুষ মরেনি, কতদিন আনন্দ হয়নি! আটকাও ঘোড়াটাকে, রায়ট লাগাও ঘোড়া আটকে।’

‘কিন্তু একি সত্যিই অশ্বমেধের ঘোড়া? এ তো শাস্ত্রমতে সুলক্ষণযুক্ত নয়। এ তো মেঘবরণ নয়, সোনার বরণ মুখ নেই, চন্দ্র চিহ্ন নেই শরীরে। পেটে ঘা। অলক্ষুণে ঘোড়া, এ ঘোড়া পাঠালো কে?’

হা–হা করে হাসে একটা লোক, ‘যবন ঘোড়া, যবন মালিক হতে পারে ওর।’

‘ধর ঘোড়াটাকে, আটকা।’ বলে ধেয়ে আসতে লাগল লোকগুলো। তখন টের পেল কন্থক বিপদ সামনে। তার শরীরে বেগ এল। ঝিমিয়ে পড়া শরীর বিপদের ভয়ে টান টান হল। ছুটল সে। সে ছুটতেই পিছনে ছুটে আসতে লাগল লোকগুলো, ‘অশ্বমেধের ঘোড়া, মার, মার, ধর, ধর, যুদ্ধ লেগে যাবে, যুদ্ধ।’

যুদ্ধ, যুদ্ধ, যুদ্ধ না হলেও যুদ্ধ! রব উঠতে লাগল। সেই রব পরিব্যাপ্ত হল চতুর্দিকে। চারদিকে কথা উঠতে লাগল, অশ্বমেধের ঘোড়া ঢুকেছে, যুদ্ধ লাগল বলে। অশ্বমেধের না হলে যবনের ঘোড়া, তাহলেও যুদ্ধ। যুদ্ধ না হোক যুদ্ধের বাতাস বইবে। ঢিল মারতে মারতে ঘোড়াটার পিছনে ছুটে আসছিল মানুষজন। তারা সবাই ঘোড়াটাকে মেরে ফেলতে চায়। কতদিন মানুষ মারা হয়নি, ঘোড়াটাকে মেরে সেই মানুষ মারার যজ্ঞ আরম্ভ হোক। ঘোড়াটা ছুটছিল, বেগবান হয়ে উঠছিল ক্রমশ।

ঘোড়াটা বুঝতে পারছিল যদি ধরা পড়ে, মৃত্যু অনিবার্য। তার মৃত্যুর পরেই লেগে যাবে দাঙ্গা। দাঙ্গার একটা সূত্র চাই। যে–কোনো সূত্র। দাঙ্গার কোনো যুক্তি চাই না, আরম্ভের কোনো একটা উপায় চাই। সেই উপায়টা হল তার প্রাণ। সে যবনের ঘোড়া, না যজ্ঞের ঘোড়া এই নিয়ে কথা উঠল বলে। এরই ভিতর রব উঠেছে, ‘যবনের ঘোড়া, যজ্ঞের ঘোড়া। যবন...! যজ্ঞ...!’

সে তো কন্থক। এখন না হয় অশক্ত হয়েছে, কিন্তু সে তো সেই ঘোড়া যার রক্তে আছে অরণ্য, নদীতীর, আমুদরিয়া, সিরদরিয়া নামে দুই নদীর বাতাস, তৃণভূমির সুঘ্রাণ। সে ছিল রাজপুত্রের প্রিয়তম অশ্ব। সে কৃষ্ণ বর্ণের না হোক, তার শরীরে, তলপেটের কাছে সোনালি একটি চিহ্ন তো রয়েছে। সরু চাঁদের মতো। সেই চিহ্নই তো বলে দেয়, তার স্মৃতিতে অশ্বমেধ যজ্ঞ আছে। কোনো এক পুরোনো দিনে সে ছিল মেঘবর্ণ, বিদ্যুৎপ্রভাযুক্ত বেগবান অশ্ব। সে রাজার মহিমা, শৌর্য প্রচারে বেরিয়ে পড়েছিল জগত পরিক্রমায়। তার রাজা হবেন সসাগরা পৃথিবীর অধিপতি। এর চেয়ে আনন্দ কী হতে পারে? রাজা করেছেন নিরানব্বইটি যজ্ঞ, শততম যজ্ঞের কথা শোনাতে শোনাতে সে পার হয়ে যাচ্ছে নদী, পাহাড়, অরণ্য, শস্যভূমি, গ্রাম, নগর, রাজ্য, রাজধানী। একটি বৎসরকাল গেল পরিক্রমায়। ফিরে এল সে বৎসর অতিক্রান্ত হলে।

সে ছুটছিল। ছুটতে ছুটতে পার হয়ে যাচ্ছিল কত গ্রাম! কত শস্যহীন শস্যক্ষেত্র। কত ঊষরভূমি, বালুকাময় প্রান্তর। মনে পড়ে যাচ্ছিল সে ফিরল রাজধানীতে। বিজয়ী অশ্বকে বরণ করল পুরনারীরা। সে ফিরল দেশজয়ের খবর নিয়ে। বিজয়ী অশ্বকে যজ্ঞস্থলে নিয়ে গেল পুরোহিতরা। তারপর!

ঘোড়াটি দেখল সে কোনো এক অরণ্যে ঢুকেছে। কোন অরণ্য জানে না। সে হাঁপাচ্ছিল। জিভ বেরিয়ে এসেছিল। প্রজ্বলিত অগ্নির মতো ছিল যে জিহ্বা, তা এত করুণ হতে পারে জানা ছিল না। লালা ঝরছিল এক নাগাড়ে। লালায় ভিজে যাচ্ছিল বালি, মাটি।

সে টের পাচ্ছিল যে বালিতে সে অভ্যস্ত, সেই বালি নেই পায়ের নীচে। যে অরণ্য তার স্মৃতিতে আছে যুগযুগান্ত ধরে, সেই অরণ্যের সঙ্গে এই অরণ্যের মিল নেই। সে দেখছিল চারপাশে কাঁটাগাছ ফণিমনসার ঝাড়। এত বড়ো বড়ো কাঁটাগাছের ঝোপ সে আগে দ্যাখেনি। তার মাথায় ঘোলাটে রোদ। আকাশ হয়ে উঠেছিল ধূম্রবর্ণ। সে দেখছিল দূরে কোথাও যেন মেঘ উঠছে। লোকজনকে দেখা যাচ্ছিল না কিন্তু তাদের কণ্ঠস্বর কানে জেগে ছিল। যুদ্ধ না হয় দাঙ্গা, দাঙ্গা না হয় যুদ্ধ। অশ্বমেধের ঘোড়াটি গেল কোথায়? লোকজন হইহই করছিল, ওই যে আবার। আকাশ কালো হয়ে উঠেছে। যুদ্ধ লেগে গেল! যুদ্ধের জন্য মানুষ অধীর হয়ে উঠেছে।

ঘোড়াটি নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সে যে ভেবেছিল অরণ্যে ঢুকেছে, আসলে তা নয়। তার মনে অরণ্যের ভাব জেগেছিল। মনে মনে অরণ্যকে আকাঙ্ক্ষা করেছিল সে। অরণ্যই তাকে বাঁচাতে পারে। সে লুকিয়ে পড়তে পারে অরণ্যে। সে দূরের ধূম্রবর্ণ আকাশের দিকে চেয়েছিল। আহা! মেঘ থেকে যদি বৃষ্টি নামে সে বেঁচে যেতে পারে। কিন্তু সে যদি সত্যিই অশ্বমেধ যজ্ঞের জন্য প্রদত্ত হয়ে থাকে, তবে!

রাজার ঘোড়ার অধিকার নিলেন যজ্ঞের পুরোহিত। তার মনে পড়ে যাচ্ছিল সব। তাকে স্নান করানো হল, তাকে শুদ্ধ করে যজ্ঞের যূপকাষ্ঠের দিকে নিয়ে যাচ্ছে পুরোহিতের দল। পুরোহিত ঘোষণা করছেন, রাজা হয়েছেন রাজ চক্রবর্তী, পৃথিবীর অধীশ্বর। রাজা নিবেদন করছেন এই বেগবান অশ্বকে দিগ্বিজয়ী ইন্দ্রের প্রতি। তারপর! তার আর মনে নেই, সে দেখেছিল এক ভীষণ খড়্গ। সূর্যের আলোয় সেই খড়্গ জ্বলে উঠেছিল অগ্নির ন্যায়। সেই স্বর্ণাভ খড়্গখানি রক্তের লোভে নেমে আসছে তার উপর। সে কেঁদে উঠেছিল ভয়ে। এইটুকু!

কী হয়েছিল তারপর? সে শুনেছিল হয়তো, না কি জেনেছিল অন্য কোনো জন্মে। মৃত অশ্বটিকে নিয়ে বসে আছেন রাজমহিষীরা। অশ্বের বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করে হৃদয়খানি তুলে এনে যজ্ঞে দগ্ধ করতেন পুরোহিত। সেই দগ্ধ হৃদয়ের ঘ্রাণ নিতেন রাজা। রাজমহিষীরা গোপনে হয়তো চোখের জল ফেলতেন। অশ্বের মৃত শরীর নিয়ে সমস্ত রাত বসে আছেন তাঁরা। এক মহিষী অন্যজনকে বলছেন বেগবান অশ্বের শৌর্যের কথা। কথাগুলি।

ঘোড়াটির ভয় হচ্ছিল। সে ডাকছিল আকাশের মেঘকে। মেঘ এসে তার পৃথিবীকে শীতল করতে পারে। তার পায়ের নীচে আগুন, মাথার উপরে আগুন, তার চতুর্দিকের অগ্নিবলয় তাকে অধিকার করেছিল ক্রমশ। তার ভিতরে মানুষের কণ্ঠস্বরগুলি ঢুকে পড়ছিল দ্রুত। ঘোড়াটিকে ধরতে যারা এসেছিল তারা তাকে খুঁজে বের করতে চাইছিল। ঘোড়াটিও মানুষগুলিকে খুঁজে না পেয়ে অবাক হচ্ছিল। তাকে যারা মারতে এসেছে, তারা কোথায়? তারা কি পিছনে, সামনে, দক্ষিণে, বামে? কোনো দিকেই তাদের না দেখে যখন সে নিশ্চিন্ত হচ্ছিল সে শব্দের বিভ্রমে পড়েছে, তখন আবার গর্জন শুনতে পেল, 'কোথায় সেই যবন ঘোড়া?'

'কোথায় সেই যজ্ঞের ঘোড়া?'

সে জানে এক মহামানবকে আলোর পথে সে নিয়ে গিয়েছিল। ফিরেছিল শূন্য হয়ে। সে জানে না সে যজ্ঞের ঘোড়া কি না। সে জানে না সে যবনের ঘোড়া কি না। অথচ মানুষের গর্জনে তার মনে হচ্ছিল সে হয় যজ্ঞের ঘোড়া, না হয় যবনের ঘোড়া। যজ্ঞের ঘোড়াকে মরতে হবে, পুরোহিত তাকে বধ করবে, তার দেহ নিয়ে রাজমহিষীরা চোখের জল ফেলবে, আর যবনের ঘোড়া হলে তাকে খণ্ড খণ্ড করে ছড়িয়ে রেখে যাবে হত্যাকারীর দল! মরতে তাকে হবেই। তার পিছনে ঘাতকরা জোট বেঁধেছে, না মেরে তাকে ছাড়বে না। সে উত্তাপের হাত থেকে বাঁচার জন্য ধূমাবতী আকাশের দিকে ধেয়ে যেতে চায়। কী গভীর কালো ওই বর্ণ। মেঘের চেয়েও কালো এই ধূম্রবর্ণ। আর পারছিল না ঘোড়াটি।

সে টলছিল। তার পা ডুবে যাচ্ছিল বালিতে। এত বালি এল কোথা থেকে? এ কি সমুদ্র শুকিয়ে যাওয়া বালুকারাশি? এত বালি, এত গভীর বালুকাসমুদ্র সে আগে দ্যাখেনি। এত উত্তাপও যেন আগে কখনো অনুভব করেনি। বালির প্রতিটি কণা যেন অগ্নিকণার মতো পুড়িয়ে দিচ্ছে তার দেহ। আগুনের স্রোতে তার গায়ের চামড়া যেন ঝলসে যাচ্ছিল। সে আকাশে ঘাড় উঁচিয়ে মেঘ দেখতে চায়। বালির সমুদ্র ছেয়ে যাচ্ছিল মেঘে। মেঘ যেমন দিগন্ত থেকে ওঠে জলসমুদ্রে, এও তো তেমনই। মেঘের ছায়া যেমন জলে পড়ে, এও তো তেমনই। বালির রং বদলে কালো হয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু উত্তাপ বাড়ছিল ক্রমশ। আরও তাপ, আরও তাপ, লোহা গলে যাওয়ার মতো তাপ উঠছিল ধরিত্রী–গর্ভ থেকে, পৃথিবী গলে যাচ্ছিল হয়তো ধরিত্রী–গর্ভে। সেই সময় আবার গর্জন উঠল, 'যজ্ঞের ঘোড়া, না যবনের ঘোড়া? সে থরথর করে কাঁপছিল। তার মনে পড়ছিল...

'আমি কোথায়?' কেঁদে উঠল সে। 'এই কি আমার পৃথিবী? নদী, পর্বত, সমুদ্র, মেঘ, বৃষ্টি, বাতাস! আলোর পৃথিবী কি এই? হে রাজপুত্র, আমাদের বিসর্জন দিয়ে তুমি সর্বস্বত্যাগী হলে। এই পৃথিবী হিংসায় পূর্ণ–দুঃখের সমুদ্র, ব্যাধির ফেনায় বিকীর্ণ, জরার তরঙ্গে উদ্বেল, মৃত্যুর উগ্রতায় ভয়ংকর। তুমি সেই হিংসার পৃথিবীতে রেখে গেছ ছন্দক আর কন্থককে। হে কুমার, তুমি কি দেখতে পাচ্ছ না আমার পায়ের নীচে তপ্ত বালুকাসমুদ্র, মাথার উপরে ধূমাবতী আকাশ, আমার পিছনে হত্যাকারীর দল। হে গৌতম শাক্য সিংহ, এ আমি কোথায় এলাম? আমার যে শুধু তোমার কথা মনে পড়ে, সারথির কথা মনে পড়ে, তুমি কি ভুলে গেছ সব? এই যে আকাশে ফুটত সোনালি রঙের মেঘ, তার নীচে সারথি আর তুমি, হে সারথি ছন্দক!'

কে যেন আবার হাঁকল যবনের ঘোড়া। কে যেন ডাকল যজ্ঞের ঘোড়া। তোমাকে বধ করে তোমার ঝলসানো হৃদয়ের ঘ্রাণে রাজা পৃথিবীর অধীশ্বর হবেন। যবনের ঘোড়া, তুমিই–বা কোথায়? তোমাকে হত্যা করেও রাজা হবেন দিগ্বিজয়ী। যবনের ঘোড়ার রক্তে শুদ্ধ হবেন রাজ চক্রবর্তী। কন্থক ছুটল। কালোমেঘের দিকে ছুটল। সে মেঘের দিকে এগোতেই বর্ষণ শুরু হল। কালো বৃষ্টি ঝরে পড়তে লাগল মেঘ থেকে। এই সেই বৃষ্টি যা হিরোশিমা ভাসিয়ে দিয়েছিল বহু বর্ষ আগে। এই সেই মেঘ যে মেঘ হিরোশিমার আকাশ ছেয়ে ফেলেছিল অভিশপ্ত দিনটিতে, যে মেঘ এখনও মাথার ভিতরে বহন করে চলেছে মানুষ, হিরোশিমার মানুষ। কৃষ্ণবর্ষণ চারদিক অন্ধকার করে দিল। কৃষ্ণজলধারা নেমে আসছিল বালুকাসমুদ্রের উপর। ঘোড়াটি অন্ধ হয়ে গেল। তার গায়ের রোম খসে খসে যেতে লাগল। তার কেশর ঝরে যেতে লাগল, পুচ্ছ ঝরে যেতে লাগল। সে ছুটতে গিয়ে মুখ থুবড়ে পড়ল। নাক মুখ দিয়ে গলগল করে রক্ত বেরিয়ে এল। রক্তের লাল রং বাইরে বেরিয়েই কালো হয়ে গেল। ঘোড়াটি উঠতে চাইছিল। তার জিভ বেরিয়ে আসে। জিভ তেজস্ক্রিয় বাতাসে খসে যেতে থাকে। সে ধরতে পারে কালো আগুনের সমুদ্রে সে ঘুরপাক খাচ্ছে। ঋতু বদল হয়নি, শুধু সে ভুল করেছিল। ভুল তো হয়েই থাকে। প্রকৃতির এমন যাদু আছে বলেই প্রাণ আছে। প্রাণ থাকে। কিন্তু সেই ভুল কোথায় নিয়ে এল যে তাকে!

শেষবারের মতো দৌড়োতে গিয়ে ঘোড়াটা উলটে পড়ে যায়। আবার ওঠে। আবার পড়ে। বালির সমুদ্রে সে ডুবছিল আর উঠছিল। বালিতে, আগুনে স্নান করতে থাকে সে। অন্ধ চোখ দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল বেরোতে থাকে। ওই জল ব্যতীত আর কোথাও জলের চিহ্ন নেই এই হিরোশিমায়। চোদ্দোবেড়িয়া মুছে গেছে, কপিলাবস্তু মুছে গেছে, সমুদ্র মুছে গেছে, মুছে গেছে জ্যোৎস্না রাত্রি।

অন্ধ ঘোড়াটি তবু উঠে দাঁড়ায়। তার কেশর পুড়ে গেছে, পুচ্ছ পুড়ে গেছে, গায়ের চামড়া পুড়ে গেছে, সব রোম ঝরে গেছে। তাকে আর চেনা যাচ্ছিল না যজ্ঞের ঘোড়া বলে, যবনের ঘোড়া বলে।

অন্ধ ঘোড়াটি হাঁটছিল। বালিতে ডুবে ডুবে মুখ তুলছিল। তার মনে পড়ছিল আশ্বিনের কথা। কাশফুলের কথা। মেঘের কথা। জ্যোৎস্নার কথা। গিরিমশায়ের ঘুড়িটির কথা। রাত্রি হয়ে এল। আকাশ কালো। একটিও তারা নেই, চাঁদ নেই। কোথাও কোনো আলো নেই। শুধু তার মাথার ভিতরে বুদ্ধদেবের মতো প্রেমময় চাঁদ ছিল। আলো ছিল। চাঁদ আর আলোর স্মৃতি ছিল। সমুদ্র ছিল, বাতাস ছিল, সবুজ তৃণভূমি ছিল। ছিল সেই রাজপুত্র যার মাথায় মাথায় চলত সোনালি রঙের মেঘ, শ্বেতকবুতর উড়ত যে মেঘে, সেই মেঘের দিনগুলি স্মৃতিতে আছে। কন্থক মরে যেতে যেতে উঠে দাঁড়াতে চাইছে।